EHI PAPER VIII MODULES - 29-32

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

EHI

PAPER VIII

MODULES - 29-32

ELECTIVE HISTORY HONOURS

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোন বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে— যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোন শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশকিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

১৫তম পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, 2016

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : ঐচ্ছিক ইতিহাস **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম : পর্যায়

EHI-08 : 29-32

		রচনা	সম্পাদনা
একক	1-4	অধ্যাপিকা শ্যামলী সুর	অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী
একক	5-6	শ্রীমতী কঙ্কনা ধারা	„
একক	7-8	অধ্যাপক সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়	„
একক	9-10	অধ্যাপিকা তপতী ঘটক	„
একক	11-12	অধ্যাপক শান্তনু চক্রবর্তী	„
একক	13	অধ্যাপক কিংশুক চ্যাটার্জী	„
একক	14	অধ্যাপক জ্যোতির্ময় পালচৌধুরী	„
একক	15-16	অধ্যাপক শান্তনু চক্রবর্তী	„

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ড. অসিত বরণ আইচ

কার্য-নির্বাহী নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EHI-08

(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায় 29

পৃষ্ঠা

একক 1 ❑	মৈত্রীব্যবস্থা ও তার ফলাফল : ১৯১৯ সালে ইয়োরোপ	7-29
একক 2 ❑	নিরাপত্তার সন্ধানে	30-50
একক 3 ❑	ক্ষতিপূরণ সমস্যা — ১৯২৯ সালের মহামন্দা— অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ	51-71
একক 4 ❑	দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি	72-91

পর্যায় 30

একক 5 ❑	জাতিসঙ্ঘ বা লীগ অফ নেশনস	92-109
একক 6 ❑	নিরস্ত্রীকরণ	110-126
একক 7 ❑	নাৎসি উত্থান এবং ফ্যাসিবাদের উত্থান	127-138
একক 8 ❑	জাপানের আগ্রাসন—মাঞ্চুরিয়া সংকট—আবিসিনিয়া যুদ্ধ—স্পেনের গৃহযুদ্ধ—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথে	139-172

পর্যায় 31

		পৃষ্ঠা
একক 9	❑ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল	173-220
একক 10	❑ চীনের বিপ্লব	221-255
একক 11	❑ ঠাণ্ডা যুদ্ধের উদ্ভব এবং তার বিবর্তন	256-267
একক 12	❑ রাষ্ট্রসংঘ	268-274

পর্যায় 32

একক 13	❑ আরব জাতীয়তাবাদ (১৯১৯-১৯৫৬)	275-293
একক 14	❑ আফ্রিকায় জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম	294-320
একক 15	❑ উপনিবেশবাদ এবং নতুন নিয়ন্ত্রণ নীতি	321-331
একক 16	❑ নির্জোট নীতি	332-340

একক ১ ❑ মৈত্রীব্যবস্থা ও তার ফলাফল : ১৯১৯ সালে ইয়োরোপ

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২.১ ভার্সাই ও অন্যান্য চুক্তির শর্তসমূহ

১.২.২ ভার্সাই চুক্তি ও জার্মানি

১.২.৩ ভার্সাই চুক্তির ও উইলসনীয় আদর্শবাদ

১.৩ মৈত্রীব্যবস্থার সামগ্রিক ফলাফল

১.৩.১ পুরাতন ইয়োরোপকেন্দ্রিক শক্তিসাম্যের অবসান

১.৩.২ প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলির অবসান ও তৎসংক্রান্ত সমস্যা

১.৩.৩ নবীন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুবর্লতা

১.৪ সারাংশ

১.৫ অনুশীলনী, প্রশ্নাবলী ও উত্তরসংকেত

১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- ১৯১৯ সালে বিজয়ী মিত্রশক্তি ও পরাজিত জার্মানি ও অন্যান্য শক্তিগুলির মধ্যে সম্পাদিত সন্ধিগুলির শর্তসমূহ।
- ভার্সাই সন্ধির প্রতি জার্মানির দৃষ্টিভঙ্গি।
- সামগ্রিকভাবে ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে ১৯১৯ সালে চুক্তিসমূহের ফলাফল।

১.১ প্রস্তাবনা

বিসমার্কের সময়ের পৃথিবী থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুনিয়া সম্পূর্ণ আলাদা। মহাযুদ্ধের ফলে বিসমার্কের সময়ের রাষ্ট্রব্যবস্থার অবসান ঘটে। এক নতুন আন্তর্জাতিক বিশ্বের সূচনা হয়।

ধ্বংসের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন এসেছিল ১৯১৪ সালের ২৮ জুন বসনিয়ার রাজধানী সেরাজেভোতে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রান্সিক ফার্দিনান্দ ও তাঁর পত্নীর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে যে ইয়োরোপীয় যুদ্ধের সূচনা

হয় তা অনতিবিলম্বে এক বিশ্বযুদ্ধের রূপ নেয়। মিত্রপক্ষের সদস্য ছিল ; ইংলন্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া আর কেন্দ্রীয় শক্তির অন্তর্গত জার্মানি, ইতালি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও তুরস্ক। ১৯১৫ সালে ইতালি মিত্রপক্ষে যোগদান করে। যুদ্ধ চলতে চলতে ১৯১৭ সালে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়। একদিকে** সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে রাশিয়া যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ায়। অন্যদিকে জনমতের চাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য হয়ে মিত্রপক্ষে যোগদান করতে হয়।

এর আগে পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনও যুদ্ধ এত ব্যাপক আকার ধারণ করেনি। এত বেশি সংখ্যক দেশ কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েনি, অথবা এত উন্নত প্রযুক্তির মারণাস্ত্র ব্যবহৃত হয়নি। বিষাক্ত গ্যাস, ডুবোজাহাজ, ট্যাঙ্ক এবং বোমারু বিমান বিষিয়ে তুলেছিল পৃথিবীর আকাশ বাতাস। ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে নিহত হয়েছিলেন ১০,০০০,০০০০ মানুষ এবং আহত হয়েছিলেন ২০,০০০,০০০০ মানুষ। প্রত্যক্ষ অর্থক্ষয় হয়েছিল ১৮০,০০০,০০০,০০০ মার্কিন ডলার, পরোক্ষ ক্ষতি ১৫০,০০০,০০০,০০০ মার্কিন ডলার। সামগ্রিকভাবে, পৃথিবীর কোনও দেশ এমনকি ভারতবর্ষও এই ক্ষয়ক্ষতির পুরোপুরি বাইরে থাকতে পারেনি। ১৯১৪ সালের ৩ আগস্ট ইংলন্ড যুদ্ধে যোগদান করার পর, ইংলন্ডের বিদেশ সচিব স্যার এডওয়ার্ড গ্রে মন্তব্য করেছিলেন, "ইয়োরোপের সব আলো নিভে যাচ্ছে, আমাদের জীবদ্দশায় আর এই আলোগুলি জ্বলতে দেখবে না।" (The lamps are going out all over Europe; we shall not see them lit again in our lifetime. (উৎস : David Thomson—Europe Since Napoleon) একটি গোটা প্রজন্মের জীবনকাল কেটেছিল এই আশাহীন অন্ধকারে। ১৯১৮ সালের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় শক্তিগুলি একে একে পরাস্ত হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর বুলগেরিয়া আত্মসমর্পণ করে। ৩০ অক্টোবর তুরস্ক নতিস্বীকার করে। ৪ নভেম্বর অস্ট্রিয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে। চূড়ান্ত পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে জার্মানির রাজা কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম হল্যান্ডে পালিয়ে যান এবং বার্লিনে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন জার্মান সরকার ১১ নভেম্বর যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্রায় ৩২টি দেশের প্রতিনিধি একত্রে মিলিত হয়ে শান্তি স্থাপনের কাজ আরম্ভ করে। ভার্সাই সম্মেলনে মিলিত হয়েছিল মিত্রশক্তি (ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এবং কিউবা, ব্রাজিল, পানামা, গুয়াতেমালার মতো সহায়ক শক্তিগুলি। অনুপস্থিত ছিল গৃহযুদ্ধে লিপ্ত রাশিয়া। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙেরি, বুলগেরিয়া ও তুরস্ক প্রভৃতি পরাজিত কেন্দ্রীয় শক্তিগুলিকে সম্পাদিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করার অনুরোধ জানানো হয়। চুক্তি শর্ত সম্পর্কে তাদের অভিমত জানানোর কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার প্রায় দশ মাস আগেই মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন (১৯১৮, ৮ জানুয়ারী) মার্কিন কংগ্রেসের সামনে তাঁর বিখ্যাত চৌদ্দদফা নীতি পেশ করেন। তিনি চেয়েছিলেন, গোপন কূটনীতির অবসান ঘটিয়ে, সমুদ্রে নৌ-চলাচলের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে, অর্থনৈতিক বাধা অপসারণ করে, সকল অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে ইয়োরোপের বিভিন্ন জাতিকে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়ে, একটি জাতিসংঘ গঠন করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আবহাওয়া গড়ে তুলতে।

উইলসনের বিপরীত মেরুতে ছিলেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী জর্জ ক্লেমেসোঁ। জার্মানির বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহা এবং ফ্রান্সের নিরাপত্তারক্ষাই ছিল তাঁর প্রধান আগ্রহ।

---

* বিসমার্ক : ১৮৬২-১৮৭১ সাল পর্যন্ত প্রাশিয়ার চ্যান্সেলার ছিলেন। তিনিই ঐক্যবদ্ধ জার্মানির স্রষ্টা এবং ইয়োরোপীয় মৈত্রী ব্যবস্থার জনক।

** ভলাদিমির ইলিচ লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার বলশেভিক পার্টি সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে। সৃষ্টি হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন।

যুদ্ধ চলাকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ জার্মানিকে যুদ্ধের জন্য দায়ী সাব্যস্ত করে জার্মানিকে শাস্তি দেওয়ার কথা বলেন। কিন্তু শান্তি সম্মেলনে আহূত হবার পর তিনি আমেরিকা ও ফ্রান্সের দুই বিপরীত মতের সমন্বয়সাধন করার চেষ্টা করেন।

উড্রো উইলসন, জর্জ ক্লেমেসোঁ, লয়েড জর্জ এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রী ভিত্তোরিও অর্লান্ডো—এই চারজনই (Big Four) সম্মেলনের নীতি নির্ধারণ ও কর্ম পরিচালনার মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু অন্যান্য সদস্যরা আড্রিয়াটিক সমুদ্রে ফিউম বন্দরের ওপর ইতালির দাবি অস্বীকার করায় অর্লান্ডো সক্রিয় ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়ান। তাছাড়া, তিনি ইংরেজি ভাষায় খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না। অথচ ইংরেজি ভাষাতেই সম্মেলনের কাজ পরিচালিত হয়েছিল। এরপর থেকে বাকি তিন জনই প্রধান হয়ে ওঠেন।

জার্মানির সঙ্গে মিত্রপক্ষের ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২৮ জুন—এটি ছিল সেরাজেভো হত্যাকান্ডের পঞ্চম বার্ষিকী। তুরস্কের সঙ্গে মিত্রপক্ষের চূড়ান্ত শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয় ১৯২৪ সালের আগস্ট মাস—অর্থাৎ শান্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে লেগেছিল বেশ কয়েক বছর।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বিশ্বযুদ্ধোত্তর শান্তি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ইয়োরোপকেন্দ্রিক বিশ্বের অবসান ঘটে। রোমানভ, হ্যাবস্‌বার্গ, হোহেনজোলার্ন প্রভৃতি প্রাচীন রাজবংশ শাসিত সাম্রাজ্যগুলি অবলুপ্ত হয়। তাদের জায়গায় গড়ে ওঠে নব-প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি। জন্মলগ্ন থেকেই এই রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক, জাতিগত এবং রাজনৈতিক নানান সমস্যায় বিপন্ন হয়ে পড়ে। নানা কারণে বিশ্ব রাজনীতিতে ইয়োরোপের প্রাধান্য হ্রাস পায়।

১৮৯০ থেকে ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত বিপ্লব ইতিহাসের পালাবদল সূচিত করে। ১৯০০ সাল নাগাদ এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও পূর্ব এশিয়ায় জনসংখ্যাবৃদ্ধি দ্রুত নগরায়ণ দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলির আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে ইংলন্ডের একপাক্ষিক প্রাধান্য হ্রাস পায়, ক্রমেই তার স্থান দখল করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে মাথা চাড় দিয়ে ওঠে জাপান। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার কারণে ক্রমেই নেতিবাচক দিক থেকে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অর্জন করে। জেফ্রি ব্যারাক্লাফ (Geoffrey Barraclough) দেখিয়েছেন, ইয়োরোপকেন্দ্রিক পৃথিবীর অবসান ঘটেছিল। জন্ম নিয়েছিল বহুমাত্রিক জটিল বিশ্বরাজনীতি। এই রূপান্তরকে প্রায় বৈপ্লবিক রূপান্তর বলা যায়।

১.২.১ ভার্সাই ও অন্যান্য চুক্তির শর্তসমূহ

অধ্যাপক উইলিয়াম আর কেলরের (Keylor) মতে ভার্সাই সম্মেলনের মূল লক্ষ ছিল দুটি ; পৃথিবীর প্রায় অর্ধাংশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মানচিত্র পুনর্গঠন এবং শান্তিপ্রতিষ্ঠা।

ভার্সাই চুক্তিতে প্রায় ৪৪০টি ধারা ও অজস্র সংযোজন যুক্ত হয়েছিল। জার্মান রাজনীতিবিদরা সহজে এই চুক্তি মেনে নেননি। চ্যান্সেলার ফিলিপ শাইডেমান (Scheidemann) এই অপমানজনক চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করার চেয়ে পদত্যাগ করাই শ্রেয়তর মনে করেন। ক্যাথলিক দলের নেতা এরৎসবার্গার বুঝতে পেরেছিলেন চুক্তি স্বাক্ষরে অসম্মতি জানালে জার্মানির স্বাধীনতা বিপন্ন হবে, তাই তিনি ভার্সাই চুক্তি অনুমোদন করাই যুক্তিযুক্ত বোধ করেন।

(ক) **আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রিক পুনর্বিন্যাস :** পশ্চিম সীমান্তে জার্মানি ফ্রান্সকে আলসাস ও লোরেন ফিরিয়ে দিল, বেলজিয়ামকে দুটি ছোট অঞ্চল—ইউপেন (Eupen) ও মামেডি (Malmedy) ছেড়ে দিল এবং লাক্সেমবার্গের সঙ্গে গঠিত পূর্বতন শুল্ক সংঘ থেকে বেরিয়ে এল। সারের (Saar) কয়লাখনি অঞ্চল পনেরো

বছরের জন্য জাতিসংঘের কমিশনের অধীনে রাখা হল। ভবিষ্যতে গণভোটের মাধ্যমে ওই অঞ্চলের ভাগ্য নির্ধারণ করা স্থির হয়। যুদ্ধের সময় ফ্রান্সের কয়লাখনি বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে সার অঞ্চলের মালিকানা ফ্রান্সের হাতে হস্তান্তরিত হল। নবজাত চেকোশ্লোভাকিয়া হালস্‌ চিন (Hultschin District) জেলা লাভ করল। সুদেতেনল্যান্ড এবং অস্ট্রিয়ার বাসিন্দারা অনেকে জাতিগত ও ভাষাগত দিক থেকে জার্মান হলেও পূর্বতন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের নাগরিক হিসেবে তারা রাজনৈতিকভাবে জার্মান ছিল না ; তবু অস্ট্রিয়ার নাগরিকরা জার্মানির সঙ্গে যুক্ত হতে আগ্রহী ছিল। সুদেতেনল্যান্ড ছিল ঐতিহাসিক বোহেমিয়া রাষ্ট্রের অংশ। চুক্তি-প্রণেতারা ঐ অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক জার্মান জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হলেও ফ্রান্স এ ব্যাপারে আপত্তি করে। জার্মানি ও অস্ট্রিয়া তাদের সংবিধান থেকে সংযুক্তি সংক্রান্ত ধারা বাদ দিতে বাধ্য হয়।

জার্মানির উত্তর সীমান্তে শ্লেজউইগ প্রদেশটি ডেনমার্ককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ১৯২০ সালে গণভোটের মাধ্যমে উত্তর শ্লেজউইগের শতকরা ৭৫% মানুষ ডেনমার্কে এবং দক্ষিণে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ জার্মানির সঙ্গে সংযুক্তি চায়।

পূর্বদিকে জার্মানি প্রথম মিত্রশক্তি ও সহযোগী শক্তিগুলির হাতে মেমেল বন্দর ছেড়ে দেয়। এই বন্দরটি লাভ করে লিথুয়ানিয়া।

পোল্যান্ডের ভাগ্য নির্ধারণের প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল হয়ে ওঠে। জার্মানি পোলান্ডকে ছেড়ে দেয় পোসেন (Posen) নামক প্রদেশটি, পশ্চিম প্রাশিয়ার অধিকাংশ এবং সমুদ্র উপকূলে যোগস্থাপনকারী প্রায় চল্লিশ মাইল দীর্ঘ পথ। এই পথ (Polish Corridor) পূর্ব প্রাশিয়াকে জার্মানি থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে। চৌদ্দ দফা শর্ত অনুসারে ডানজিগ বন্দরকে একটি মুক্ত নগরী বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। ডানজিগ পোলাণ্ডের শুল্ক অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ডানজিগের বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার দায়িত্ব ও দেওয়া হয় পোল্যান্ডকে।

উত্তর সাইলেসিয়ার দুই লক্ষ বাসিন্দার ভাগ্য নির্ধারিত হয় গণভোটের মাধ্যমে। পশ্চিম প্রাশিয়ার ম্যারিয়েনওয়ার্ডার (Marienwerder) এবং পূর্ব প্রাশিয়ার আলেনস্টাইন (Allenstein) জেলায় ১৯২০ সালের গণভোটে জার্মানরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কয়েকটি গ্রামে পোলদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় সেগুলি পোলাণ্ডকে হস্তান্তরিত করা হয়। কয়লা এবং লৌহ আকরে সমৃদ্ধ উত্তর সাইলেশিয়ায় গণভোটের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। শতকরা ৬০% ভোট পড়ে জার্মানির পক্ষে এবং ৪০% পোলাণ্ডের পক্ষে। শেষপর্যন্ত জাতিসংঘ পরিষদ, মোট জনসংখ্যা ও জমির অর্ধেকের বেশি জার্মানিকে দিলেও, আর্থিক দিক থেকে সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি পোলাণ্ডের হাতে তুলে দেয়।

(খ) ভার্সাই সন্ধির ঔপনিবেশিক শর্ত অনুসারে পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলির ওপর জার্মানির অধিকার লুপ্ত হয়। পূর্ব এশিয়ার জার্মান উপনিবেশগুলি লাভ করে জাপান। জার্মানির অন্যান্য উপনিবেশগুলিতে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের (ম্যান্ডেট*) অভিভাবত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মিত্রশক্তি অধিকৃত অঞ্চলে জার্মান নাগরিক বা কোম্পানির সব সম্পত্তি ও অধিকার বাজেয়াপ্ত করা হয়।

---

* ম্যান্ডেট ব্যবস্থা—জাতিসঙ্ঘের সংবিধান অনুসারে পরাজিত শক্তিগুলি অপসারিত হবার পর পরিত্যাক্ত রাজ্যগুলিতে "বসবাসকারী জনগণ যদি আধুনিক জগতের জটিল পরিস্থিতিতে আত্মনির্ভরশীল না হতে পারে, তাহলে তাদের উন্নত দেশসমূহের অভিভাবকত্বে রাখা হবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের তরফে উন্নত দেশগুলি এই তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা প্রয়োগ করবে।"

(গ) অর্থনৈতিক শর্ত—অর্থনৈতিক দিক থেকে জার্মানিকে দুর্বল করে রাখার চেষ্টা করা হয়। জার্মানির বড় বাণিজ্য জাহাজগুলি ফ্রান্সকে এবং যুদ্ধজাহাজগুলি ইংলন্ডকে দেওয়া হয়। জার্মানি দশ বছরের জন্য ফ্রান্স, ইতালি ও বেলজিয়ামকে প্রচুর পরিমাণ কয়লা সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। জার্মানি মিত্রপক্ষকে ৫০০০ রেল ইঞ্জিন, ১৫০,০০০ মোটরগাড়ি দিতে বাধ্য থাকবে। পাঁচ বছরের জন্য জার্মানির এলব ও অন্যান্য নদীগুলি আন্তর্জাতিক শাসনাধীনে রাখা হয়। (এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ৩ সংখ্যক এককে আলোচিত হয়েছে।)

(ঘ) সামরিক শর্ত—ভার্সাই সন্ধির পঞ্চম অনুচ্ছেদে সামরিক শর্তগুলি উল্লেখ করা হয়। জার্মানিতে বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহের নিয়ম বাতিল করা হয়। বারো বছরের জন্য কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এক লক্ষ স্বেচ্ছাবাহিনী রাখবার অধিকার দেওয়া হয়। (২) রাইন নদীর পূর্ব তীর থেকে জার্মান সৈন্য অপসারিত হয়। (৩) হেলিগোল্যান্ডে নৌ-ঘাঁটি বিলুপ্ত করা হয়। (৪) জার্মান সেনাপতিদের বরখাস্ত করা হয়। (৫) ভবিষ্যতে জার্মানিকে সমরাস্ত্র নির্মাণ করতে নিষেধ করা হয়। (৬) জার্মান যুদ্ধজাহাজগুলি ইংলন্ডের হাতে তুলে দেওয়া হয়। (৭) রাইন নদীর পশ্চিম তীরের ত্রিশ মাইলের মধ্যে সব জার্মান দুর্গ ও সামরিক ঘাঁটি ভেঙে ফেলার আদেশ দেওয়া হয়। (৮) সামরিক শর্তগুলি কার্যকর করার জন্য রাইন নদীর বাম তীরে মিত্রপক্ষের সেনাদল মোতায়েন রাখা হয় এবং একটি কমিশন নিয়োগ করা হয়।

(ঙ) আইনসংক্রান্ত রাজনৈতিক শর্ত—সন্ধির শর্ত ও আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করার অপরাধে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মকে প্রধান যুদ্ধ-অপরাধী রূপে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু হলান্ডের সরকার পলাতক কাইজারকে মিত্রপক্ষের হাতে তুলে দিতে রাজি না হওয়ায় তাঁর বিচার সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত মাত্র বারো জনকে জার্মানির আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়।

ভার্সাই সন্ধির মূল নীতি অনুসরনে অন্যান্য পরাজিত রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মিত্রপক্ষের সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। 'সাঁ জার্মাঁর (St. Germain') চুক্তি (১৯১৯)—১০ সেপ্টেম্বর অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মিত্রপক্ষের সাঁ জার্মাঁর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রাচীন হ্যাবস্বার্গ সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে নতুন রাষ্ট্রগুলি জন্মলাভ করে। (১) অস্ট্রিয়-হাঙ্গেরির যুক্ত সাম্রাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করা হল। (২) নতুন অস্ট্রিয়া রাষ্ট্রের আয়তন সংকুচিত করা হয় এবং জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার ভবিষ্যৎ সংযুক্তির বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। (৩) বোহেমিয়া, মোরাভিয়া ও অস্ট্রিয় সাইলেশিয়া নিয়ে নতুন রাষ্ট্র চেকোশ্লোভাকিয়া গঠিত হয়। (৪) যুগোশ্লোভিয়া গড়ে ওঠে শ্লোভানিয়া, সার্বিয়া ও ক্রোয়াসিয়াকে নিয়ে। (৫) পোলান্ড গালিসিয়া, ও রুমানিয়া বুকাভিনা ও ট্রানসিলভানিয়া লাভ করে। (৬) ইতালি ত্রিস্ত (Trieste) ও সংলগ্ন পশ্চাদভূমি অধিকার করে। ইতালিকে ব্রেনার সীমান্ত দেওয়ার জন্য জার্মান অধ্যুষিত দক্ষিণ টাইরল ইতালির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

জার্মানির হাতে অস্ট্রিয়ারও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিলুপ্ত করা হয়। অস্ট্রিয়া মিত্রপক্ষকে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা অর্পণ করে। দানিয়ুব নদী-নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কতকগুলি বিশেষ শর্ত অস্ট্রিয়া মেনে নিতে বাধ্য হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অস্ট্রিয়ার আর্থিক দুর্দশা শোচনীয় হয়ে ওঠে। ভিয়েনাকে বেশ কিছুদিন অনাহারে কাটাতে হয়েছিল। এর ফলে মিত্রপক্ষ অর্থনৈতিক ধারণাগুলি কার্যকর করার চেষ্টা করেনি। অস্ট্রিয়ার ক্ষতিপূরণ কমিশন একটি ত্রাণ সংগঠনে পরিণত হয়েছিল।

অস্ট্রিয়ার সৈন্যসংখ্যাকে ৩০,০০০-এ সীমায়িত করা হয়, ভবিষ্যতে সৈন্য নিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়। যুদ্ধ উপকরণ ও যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা হ্রাস করা হয়।

মানচিত্র - ১

মানচিত্র - ২

নিউলির চুক্তি (১৯১৯) ; ২৭ নভেম্বর মিত্রপক্ষের সঙ্গে বুলগেরিয়ার নিউলির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রতিরক্ষার দিক থেকে গুরূত্বপূর্ণ পশ্চিম বুলগেরিয়ার চারটি ছোট ছোট ভূখণ্ড যুগোশ্লোভিয়াকে দেওয়া হয়, অথচ এই অঞ্চলগুলিতে বুলগেরিয়ারই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। (২) পশ্চিম থ্রেস ও ইজিয়ান উপকূল গ্রীসকে দেওয়া হয়, যদিও বুলগেরিয়া ঈজিয়ান উপকূলে যাওয়া-আসার অধিকার লাভ করে।

সামরিক ক্ষেত্রে বুলগেরিয়ার সৈন্যসংখ্যা ২০,০০০-এ সীমায়িত করা হয় এবং নৌ-বাহিনী অবলুপ্ত করা হয়।

বুলগেরিয়ার কাছ থেকে ৩৮ বছর ধরে ৫% সুদসহ ৯০,০০০,০০০ পাউন্ড দাবি করা হয়। বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কারণে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হ্রাস করা হয়। শেষ পর্যন্ত বুলগেরিয়া এক-তৃতীয়াংশ ক্ষতিপূরণ দেয়।

বুলগেরিয়া এই চুক্তিকে যুক্তিযুক্ত মনে করেনি। হাঙ্গেরির মতো বুলগেরিয়াও অন্তর্বর্তী পর্বে একটি সংশোধনবাদী* দেশ হয়ে ওঠে।

ট্রিয়ানের সন্ধি (১৯২০) ; দীর্ঘ বাদ-বি-সম্বাদের পর হাঙ্গেরীয়রা ট্রিয়ানের সন্ধি করে ১৯২০ সালের ৪ জুন। হাঙ্গেরী বানাতের অধিকাংশ, যুগোশ্লোভিয়া ও রুমানিয়াকে দিতে বাধ্য হয়। ট্রানসিলভানিয়া দেয় রুমানিয়াকে এবং শ্লোভাকিয়া ও রুথেনিয়া দেয় চেকোশ্লোভাকিয়াকে।

এছাড়া, হাঙ্গেরির সৈন্যিসংখ্যা ৩৫,০০০-এ সীমায়িত করা হয় এবং ক্ষতিপূরণ দিতে হাঙ্গেরিকে বাধ্য করা হয়। জার্মানির মতোই হাঙ্গেরির সমস্যাকে সামগ্রিকভাবে মীমাংসা না করে টুকরো টুকরো করে মীমাংসা করা হয়েছিল। সন্ধিচুক্তি সম্পাদনে বিলম্ব হওয়ায় সমস্যা জটিলতর হয়ে ওঠে। নবগঠিত হাঙ্গেরির আয়তন ছিল প্রাচীন হাঙ্গেরির এক-তৃতীয়াংশ, মোট জনসংখ্যা ছিল পূর্বতন জনসংখ্যার শতকরা ৪১.৬%। হাঙ্গেরির মাগেয়ার জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির অন্তর্গত হয়েছিল। সীমান্তের বাইরে সংখ্যালঘু ম্যগেয়ার জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি হয়ে উঠেছিল বাস্তব বা অলীক বিক্ষোভের সূত্র। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্বে হাঙ্গেরি অন্যতম গুরত্বপূর্ণ সংশোধনবাদী রাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল।

সেভর্‌ ও লোসানের সন্ধি (Sevres and Lausanne)—যদিও ১৯২০ সালে লয়েড জর্জ হাউস অফ কমনস্‌-এর সভায় বলেছিলেন সেভর্‌-এর চুক্তি তুর্কি অধীনতা থেকে অ-তুর্কি জনসাধারণকে মুক্ত করবে, কার্যত এই চুক্তি তুর্কি জনসাধারণকে ইউরোপীয় শক্তিগুলির শাসনাধীন করে তুলেছিল। (১) এশিয়া, মাইনর, থ্রেস, আদ্রিয়ানোপল ও গালিপলি গ্রীসকে দেওয়া হয়। (২) সিরিয়া ফ্রান্সকে ও পালেস্টাইন ও মেসোপটেমিয়া ইংলন্ডকে দেওয়া হয়। (৩) হজ্জাজের রাজাকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হয়। (৪) তুরস্ক সাম্রাজ্যের আয়তন এশিয়া মাইনরের মধ্যেই সীমায়িত হয়। (৫) তুরস্কের সৈন্যসংখ্যা ৫০,০০০-এ সীমাবন্ধ করা হয় এবং বিমানবন্দরগুলি মিত্রপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। (৬) কনস্টান্টিনোপল, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি তুর্কি বন্দরগুলি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয়। কনস্টানটিনোপলে বিদেশী বাহিনীর উপস্থিতিতে তুর্কি সুলতান ষষ্ঠ মোহম্মদ ১৯২০ সালে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

ইতিমধ্যে তুরস্কে বিদেশি শক্তিগুলির হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মুস্তাফা কামাল পাশার (১৮৮১-১৯৩৮) নেতৃত্বে একটি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল অঙ্কারায় অস্থায়ী সরকারের

---

* **সংশোধনবাদী** (revisionist) : জার্মানি, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি প্রভৃতি যে দেশগুলি ভার্সাই শান্তিচুক্তির সংশোধন বা পরিবর্তন দাবি করতে তাদের সংশোধনবাদী শক্তি বলে চিহ্নিত করা হত।

প্রতিষ্ঠা করে এবং সেভেরের চুক্তি মানতে অস্বীকার করে। মুস্তাফা কামাল শেষপর্যন্ত তুরস্ককে বিদেশি প্রভাবমুক্ত করেন। কামাল প্রথমেই আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের আদর্শ ঘোষণা করেছিলেন।

১৯২৩ সালের জুলাই মাসে তুরস্ক উত্তর আফ্রিকা এবং আরব-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি থেকে দাবি প্রত্যাহার করে নেয় এবং সাইপ্রাস দ্বীপকে ইংরেজের অধীনতাভুক্ত বলে স্বীকার করে নেয়। তারপর ২৩ জুলাই তুরস্ক ও মিত্রপক্ষের মধ্যে লোকসানের (Lausanne) চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে তুরস্ক পশ্চিম দিকে মারিস্তা নদী পর্যন্ত পূর্ব থ্রেস ফিরে পায়। কনস্ট্যান্টিনোপলকে তুরস্কের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়। স্ট্রেইট্স্ অঞ্চলের বেসামরিকীরণ করা হয় এবং শান্তির সময় এই অঞ্চলকে সকল জাতির জাহাজের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। তুরস্ক যুদ্ধে নিযুক্ত হলে শত্রুপক্ষের জাহাজ স্ট্রেইট্স্ অঞ্চলে ঢুকতে পারবে না। ইজিয়ান সমুদ্রের ছোট দ্বীপগুলি তুরস্ক, গ্রীস ও ইতালি ভাগ করে নেয়। ক্ষতিপূরণ, নিরস্ত্রীকরণ প্রভৃতি সেভরের সন্ধির দমনমূলক শর্তগুলি বাতিল হয়। তুরস্ক একটি প্রজাতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংখ্যা সংক্রান্ত চুক্তিসমূহ : নবসৃষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে সংখ্যালঘু মানুষের নিরাপত্তা ও সুযোগসুবিধার সমস্যাটি জটিল আকার ধারণ করে। জাপান-প্রস্তাবিত সকল জাতির সমান অধিকারের প্রস্তাব সমর্থিত হয়নি। তবে, সংখ্যালঘু সমস্যাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তারক্ষার জন্য নূতন রাষ্ট্র কমিটি (New States Committee) নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি সংখ্যালঘুদের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দিতে চায়নি। তবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সন্ধির মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। সামগ্রিক ভাবে সংখ্যালঘুদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাতিসংঘকে দেওয়া হয়।

১.২.২. ভার্সাই চুক্তি ও জার্মানি

ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলির সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য সমকালীন ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বাস্তবে, ভার্সাই সন্ধি সম্পাদিত হবার আগে যে প্রবল আশার সঞ্চার হয়েছিল, আর চুক্তি সম্পাদনের পর নৈরাশ্য এত প্রবল তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল পারিস শান্তি সম্মেলনের প্রকৃত কৃতিত্ব বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছে। এক সমসাময়িক কূটনৈতিকের ভাষায়, "আমরা যদি যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্যে যুদ্ধ করে থাকি, তবে নিঃসন্দেহে শান্তির অবসান ঘটানোর জন্য শান্তি স্থাপন করেছি।" (".........if we made war to end war, we have certainly made peace to end peace.") [Croizer, A. J., *The causes of the Second World War*] প্যারিসের শান্তিচুক্তি এক প্রজন্মের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায়। একনায়কতন্ত্র, গণহত্যা এবং ব্যাপক মারণযজ্ঞ বিপর্যস্ত করে তোলে আন্তর্জাতিক জীবন। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে লয়েড জর্জ লিখছেন, "গোটা ইয়োরোপ বৈপ্লবিক মানসিকতায় পরিপূর্ণ। ইয়োরোপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের সাধারণ মানুষ বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছে।

("The whole of Europe is filled with the spirit of Revolution. The whole existing order in its political, social and economic aspects is questioned by the masses of population from one end or Europe to the other.") ভার্সাই চুক্তির তাৎপর্য সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে দুটি পরস্পরবিরোধী মত প্রচলিত। অধিকাংশ ঐতিহাসিকই মনে করতেন, ভার্সাই সম্মেলনে ন্যায়নীতি ও সততা বিসর্জন দিয়ে জার্মানির প্রতি অবিচার করা হয়েছে। ১৯২০-এ দশকে অধ্যাপক ডাবলিউ. এইচ. ডসনের মতো ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করতেন অ-জার্মান জনগোষ্ঠীর স্বার্থে জার্মান স্বার্থের হানি করা হয়েছে। বিজয়ী মিত্রশক্তি জার্মানির প্রতি এক কঠোর না হলে, সম্ভবত জার্মানি চুক্তির শর্তগুলি স্বেচ্ছায় মেনে নিত।

জার্মান প্রচার মাধ্যমে এই সন্ধিটিকে জবরদস্তিমূলক শান্তিচুক্তি (dictated peace : *diktat*) বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। জার্মান সেনাধ্যক্ষ এবং রক্ষণশীল রাজনীতিবিদদের মতে, কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রবাদী ও ইহুদিরা তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে—তাদের পিছন থেকে ছুরি মারা হয়েছে (stab in the back)। জার্মান সেনানায়করা মনে করতেন জার্মানি যুদ্ধে পরাজিত হয়নি।

পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে মীমাংসায় না এসে বিজয়ী শক্তিবর্গ বিজিত দেশগুলির ওপর এই সন্ধিটি চাপিয়ে দিয়েছিল। বাস্তবে, প্রায় প্রতিটি সন্ধিচুক্তিই নির্দেশমূলক চুক্তি, কারণ একটি বিজিত দেশ স্বেচ্ছায় তার পরাজয়ের ফলাফল বড় একটা মেনে নেয় না। কিন্তু আধুনিক কালে সম্পাদিত অন্যান্য চুক্তির তুলনায়, ভার্সাই সন্ধিতে বিজিত শত্রুর প্রতি বিজেতার হুকুমদারির মনোভাব বেশিমাত্রায় দেখা যায়। অধ্যাপক ই. এইচ. কারের মতে, ভার্সাইতে জার্মানি প্রতিনিধিদের হাতে যে খসড়া চুক্তি দেওয়া হয়েছিল, তার ওপর তাদের লিখিত মতামত পেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়। জার্মান প্রতিনিধিদের মতামতগুলির কিছু বিবেচনা করে সংশোধিত ভাষ্যটি তাদের হাতে তুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুমকি দেওয়া হয়, পাঁচদিনের মধ্যে চুক্তিতে স্বাক্ষর না করলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হবে। সন্ধির খসড়া পেশ ও সন্ধিতে স্বাক্ষরদান : এই দুটি অনুষ্ঠান ছাড়া আর কোনো সময় জার্মান প্রতিনিধিরা মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিরা মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হন নি। এমন কি এই দুটি অনুষ্ঠানেও সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে সাধারণ ভদ্রতা ও সৌজন্য দেখানো হয়নি। স্বাক্ষরদান অনুষ্ঠানে দুই জার্মান স্বাক্ষরকারীদের মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক টেবিলে বসতে দেওয়া হয়নি। আসামীদের যেভাবে আদালতের কাঠগড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়, সেভাবে তাদের রক্ষীপরিবৃত অবস্থায় আলোচনা কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যুদ্ধকালীন তিক্ততা থেকে উদ্ভুত এইসব অপ্রয়োজনীয় অপমান জার্মানি এবং অন্যত্র এক সুদূরপ্রসারী মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল জার্মানি ও অন্যান্য দেশের জনমতের এক বিরাট অংশ প্রকারান্তরে বিশ্বাস করেছিল, জার্মানির কাছ থেকে জোর করে আদায় করা অনুমোদন, নৈতিকভাবে জার্মানির পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়।

ভার্সাই চুক্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সমালোচনা—এই সন্ধির শর্তাবলী জার্মানির পক্ষে কঠোর ও নির্মম, জার্মানিকে রাজনৈতিক ও সামরিক বিভিন্ন দিক থেকে দুর্বল ও পঙ্গু করে রাখার চেষ্টা করা হয়।

রাইন অঞ্চলকে বেসামরিকীকরণ করা হয়। এছাড়া, জার্মানিকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করে এক বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণের বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। সামরিক শর্তগুলিতে বিজয়ী ও বিজিত : উভয় পক্ষের পারস্পরিক দায়িত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় জার্মানি এককভাবে এই শর্তগুলি পালনে ব্যর্থ হয়।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক দিক থেকে শিল্পপ্রধান সার অঞ্চল জার্মানির হাতছাড়া হয়ে যায়। জার্মানি শতকরা ১৫% কৃষিক্ষেত্র শতকরা ১২% শিল্পক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত হয়। ভার্সাই চুক্তির অর্থনৈতিক ফলাফল আলোচনা প্রসঙ্গে বিখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ কে. এম. কেইনস্-এর বক্তব্যের উল্লেখ করা যায়। ১৯১৯-এর শেষে কেইন্স রচিত *The Economics Consequences of the Peace* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই বইটি ইয়োরোপে বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছিল। কেইন্স ভার্সাই সম্মেলনে ব্রিটেনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার আগেই তিনি পদত্যাগ করেন। তিনি ভার্সাই চুক্তির অর্থনৈতিক শর্তের তীব্র সমালোচনা করেন।

কেইন্সের মতে, মহাযুদ্ধের আগে ইয়োরোপীয় অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব শিল্পগত বিকাশ হয়েছিল। প্রচুর মূলধন অর্জন করে ইয়োরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলি নিজেদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য উন্নত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে মূলধন রপ্তানি করে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশে সাহায্য করেছিল। কিন্তু যুদ্ধের ফলে ছবিটি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। মহাদেশের বড় অংশে অর্থনীতি মৃত প্রায় হয়ে

গিয়েছিল। জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য ও শিল্পপণ্যের সরবরাহ ছিল অপর্যাপ্ত। এই অবস্থায় ভার্সাই চুক্তির অর্থনৈতিক শর্তসমূহ শুধু জার্মানিকে নয়, গোটা ইয়োরোপকেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আন্তঃমিত্রপক্ষীয় ঋণের কোনও সমাধানসূত্র বার করতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং জার্মানির ওপরে বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ চাপানোর ফলে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা লুপ্ত হয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয় জার্মানির ওপরে চাপানো অর্থনৈতিক শর্তাদি সংক্ষেপে তাঁর মতে, যুদ্ধের ফলে ইয়োরোপে 'সুখের যুগে'র অবসান হয়েছিল। ("The real task of the Peace Conference was to reestablish life and to heal wounds; ...... instead the moralism of Wilson, the demagogy of Lioyd George, the vindictive patriotism of Clemenceau and the greed of a score of little states resulted in a Carthaginian peace.") [J. M. Keynes, *The Economic Consequences of the Peace (1920)]*

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফরাসি ঐতিহাসিক মানতু (Etinne Montoux) তাঁর লেখা *The Carthaginian Peace or the Economic Consequneces of Mr. Keynes.* 1946 বইটিতে দেখান, কেইন্‌স্ যে আশঙ্কা করেছিলেন, বাস্তবে তা ঘটেনি। ভার্সাই চুক্তির ফলে, জার্মানির অর্থনীতির কোনও চূড়ান্ত ক্ষতি হয়নি। বস্তুত, ক্ষতিপূরণ শর্তাবলির মধ্যে বহু শর্তই কঠোরভাবে প্রয়োগ করা যায়নি। তাঁর মতে এই চুক্তির অর্থনৈতিক শর্তের ক্ষতির দিকটি অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করা হয়েছে। আসলে, এই চুক্তির রাজনৈতিক দুর্বলতাই ভবিষ্যতের পক্ষে বেশি ক্ষতিকারক হয়েছিল।

চতুর্থত, অধ্যাপক ই. এইচ. কার, গ্যাথর্নহার্ডি প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে ভার্সাই চুক্তির কঠোরতার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া রূপেই জার্মানিতে প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে। পরবর্তীকালে হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানি বলপূর্বক ভার্সাই চুক্তি সংশোধনের চেষ্টা করে এবং এ থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি প্রস্তুত হয়।

উপরোক্ত মতের বিরুদ্ধে অন্য ঐতিহাসিকদের বক্তব্য, পৃথিবীর কূটনৈতিক ইতিহাসে সব সময়েই বিজয়ী শক্তি বিজিতের ওপর একতরফা শর্ত আরোপ করে। এদিকে থেকে ভার্সাই চুক্তিতে প্রথম জবরদস্তিমূলক চুক্তি বলা যায় না। দ্বিতীয়ত, জার্মানি নিজেই ১৮৭১ সালে ফ্রাঙ্কফুর্ট সন্ধির শর্ত অনুসারে ফ্রান্সের প্রতি নির্মম আচরণ করেছিল। এছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে বলশেভিক রাশিয়ার সঙ্গে সম্পাদিত ব্রেস্টলিটভস্কের চুক্তি এবং রুমানিয়ার সঙ্গে সম্পাদিত বুখারেস্টের সন্ধি চুক্তিতে জার্মানির নির্মম স্বার্থপরতার পরিচয় পাওয়া যায়। তৃতীয়, ভার্সাই চুক্তি যে যুদ্ধবিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে সম্পাদিত হয়েছিল, সেই সময়ের পারস্পরিক ঘৃণা ও সন্দেহের পরিমণ্ডলে কোনো ন্যায্য চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব ছিল না। চতুর্থত, ডেভিড টমসন দেখিয়েছেন, ভার্সাই চুক্তি-প্রণেতাদের বিশ্ব-রাজনীতিতে নতুন শক্তিসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। ভবিষ্যতে জার্মানিতে সমরবাদী আক্রমণাত্মক রাষ্ট্রের উত্থানকে প্রতিহত করার চেষ্টা পদে পদে চুক্তিপ্রণেতাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছিল।

জে. নে. রে, এম. ট্রাক্টেনবার্গ (Trachtenberg) এবং ডাবলিউ. এ. ম্যাকডুগাল (McDougall) প্রভৃতি আধুনিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির তুলনায় ফ্রান্সের ক্ষতি হয়েছিল অনেক বেশি। ফ্রান্সের তুলনায় জার্মানির শিল্পকেন্দ্রগুলি অটুট ছিল, কারণ যুদ্ধ ঘটেছিল জার্মানির সীমানার বাইরে। কাজেই ফ্রান্সের ক্ষতিপূরণ ও নিরাপত্তার দাবী ছিল যুক্তিযুক্ত। এক ফরাসি সমালোচকের মতে ভার্সাই চুক্তিটি কঠোরতার দিক থেকে যথেষ্ট মৃদু ছিল (Too mild for its severity)।

তাছাড়া, ভার্সাই চুক্তি-প্রণেতাদের অন্যতম প্রথম দায়িত্ব ছিল জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপকে পুনর্গঠিত করা। জার্মানিকে পুরোপুরি ধ্বংস না করে অধীনস্থ রাজ্যগুলিকে

জাতীয়তার ভিত্তিতে তাদের ন্যায্য অধিকারীদের পুনরায় ফেরৎ দেওয়া হয়। এর ফলে বেশ কয়েকটি নতুন জাতীয় রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

সামগ্রিকভাবে জার্মানির ক্ষতি ছিল পূরণযোগ্য। ইয়োরোপীয় মহাদেশে তার ভৌমিক সঙ্কোচনের পরিমাণ ছিল সীমিত। ১৮৭০ সালের আগে আলসাস লোরেন ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। জার্মানিতে এব্যাপারে কেউ আপত্তি জানায়নি। পোলিশ করিডরের বাসিন্দারা অধিকাংশই ছিল পোল, কাজেই সেখানে জার্মানির কোনো জাতিগত দাবি ছিল না। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের বিকল্প অন্যত্র পূরণ করা সম্ভব ছিল। রূঢ় ও সার অঞ্চলে উৎপাদিত লোহা জার্মানির অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটিয়েও ফ্রান্সের ক্ষতিপূরণ করতে পেরেছিল। জার্মানি ডেনমার্ক ও বেলজিয়াম ছাড়া অন্য কোনো দেশকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়নি। বুলগেরিয়াকে বাদ দিলে, জার্মানির অন্যান্য মিত্র রাষ্ট্রের তুলনায় তার ভৌমিক ক্ষতি ছিল সবচেয়ে কম। সর্বোপরি, তার ভৌমিক ক্ষতি তার ভবিষ্যৎ পুনরুজ্জীবনের পথ রোধ করতে পারেনি, অথচ তার মিত্র রাষ্ট্রগুলি কোনোদিনই তাদের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে জার্মানিই ছিল ইয়োরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র। তাই, এ. জে. পি. টেলরের মতে জার্মানির অন্তর্নিহিত শক্তি অটুট ছিল। অন্যদিকে, ইয়োরোপকেন্দ্রিক পুরাতন শক্তিসাম্য ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু জার্মানিকে সংযত রাখার মতো কোনো বিকল্প ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়নি।

এমন কি, ভার্সাই চুক্তির কঠোরতাকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণও বলা যায় না। অধ্যাপক এ. জে. পি. টেলর দেখিয়েছেন, ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধ সমালোচনাই হিটলারের উত্থানের প্রধান কারণ হয়ে থাকলে ১৯২৩ সালেই হিটলারের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা সফল হত। কিন্তু হিটলার ক্ষমতা দখল করেছিলেন ১৯৩৩ সালে। তবে ভার্সাই চুক্তি প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে জার্মানির গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছিল। ভার্সাই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ভাইমার গণতান্ত্রিক সরকার জার্মান জনগণের পরাজয় ও আত্মসমর্পণের সূচক হয়ে উঠেছিল। ফলে জার্মানিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং জার্মান রাজনীতিতে গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলির প্রভাব বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হয়।

১.২.৩ ভার্সাই চুক্তি ও উইলসনীয় আদর্শবাদ

পূর্ববর্তী শান্তিচুক্তিগুলির সঙ্গে ভার্সাইচুক্তির প্রধান পার্থক্য ছিল তার আদর্শগত ভিত্তি। এই আদর্শবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন (১৮৫৬-১৯২৪) প্রস্তাবনা অংশে আমরা তাঁর কথা উল্লেখ করেছি। এখানে আমরা বিস্তারিতভাবে শান্তিসম্মেলনে তাঁর ঘোষিত নীতির তাৎপর্য আলোচনা করব।

উইলসন বিশ্বশান্তি বিনষ্ট করার জন্য তিনটি প্রবণতাকে দায়ী করেন—গোপন কূটনীতি, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রতি অবিচার ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য ছিল নিম্নরূপ—(১) গোপন কূটনীতির অবসান ঘটিয়ে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমস্যা ও বিবাদের মীমাংসা করতে হবে। (২) জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাম্যের ভিত্তিতে সমস্ত অবহেলিত জাতিকে মুক্ত করে তাদের পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা দিতে হবে। (৩) স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

উলসন প্রস্তাবিত চৌদ্দ দফা শর্তের উল্লেখযোগ্য ধারাগুলি হল—(১) গোপন কূটনীতির পরিবর্তে উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ; (২) শান্তি বা যুদ্ধের সময় সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলের পূর্ণ স্বাধীনতা ; (৩) শান্তিকামী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অবাধ বাণিজ্যিক আদান-প্রদান; (৪) আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার পক্ষে প্রয়োজনীয়

অস্ত্র ছাড়া অন্য অস্ত্র হ্রাস ; (৫) নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঔপনিবেশিক দাবির মীমাংসা সাধন ও ঔপনিবেশিক স্বার্থ অনুসারে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপনিবেশগুলি পুনর্গঠন ; (৬) রাশিয়াকে হৃত রাজ্য প্রত্যাবর্তন ; (৭) বেলজিয়ামকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা ; (৮) অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিকে স্বায়ত্বশাসনের অধিকারদান ; (৯) তুরস্ক সাম্রাজ্যের অমুসলমান জনগণকে স্বায়ত্বশাসনের অধিকারদান ; (১০) ছোট-বড় সকল রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য জাতিগুলির একটি সাধারণ সংঘ স্থাপন।

সাধারণত মনে করা হয় রাষ্ট্রপতি উইলসন চূড়ান্ত আদর্শবাদী, তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ বিমূর্ত ন্যায়ের আদর্শে—গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও জাতিসংঘের আদর্শ প্রতিষ্ঠায়। ক্লেমেসোঁ প্রখর বাস্তববাদী, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী। তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ ফ্রান্সের নিরাপত্তারক্ষা এবং জার্মানিকে চিরতরে ধ্বংস করা। ভার্সাই সম্মেলনের প্রতিটি পদক্ষেপে বাস্তববাদীর কাছে আদর্শবাদীর পরাজয় ঘটেছিল। বাস্তববাদীকে সাহায্য করেছিলেন মধ্যপন্থাবলম্বী লয়েড জর্জ কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়।

ক্লেমসোঁ বা লয়েড জর্জের বিরোধিতা উইলসনের নীতির ব্যর্থতার প্রধান কারণ নয়, প্রধান কারণ ইয়োরোপ সম্পর্কে উইলসনের অবাস্তব ধারণা। তাঁর ব্যর্থতার দ্বিতীয় কারণ, যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপ, বিশেষত পূর্ব ইয়োরোপের জটিল পরিস্থিতি। সেখানে চৌদ্দ দফা নীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে নীতিগুলির স্ববিরোধিতা প্রকট হয়ে ওঠে। (১) পোলান্ডকে সমুদ্রে যাবার পথ দিতে গেলে জার্মানি বঞ্চিত হয়। এড্রিয়াটিক সাগর অঞ্চলে ইতালি আর যুগোশ্লোভিয়ার দাবি মেনে নিতে গেলে, ন্যায়নীতি বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নীতি—কোনো নীতিই সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। পারস্পরিক আদানপ্রদান ও বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে সমস্যার মীমাংসা করা গেলেও, তাতে কোনোপক্ষই সন্তুষ্ট হয়নি। (২) জার্মানিকে এককভাবে যুদ্ধের জন্য দায়ী করে তার ওপর বিপুল ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ায় বিশ্ব অর্থনীতিতে ও জার্মান অর্থনীতিতে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া এড়ানো সম্ভব হয়নি। (৩) উপনিবেশগুলি পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়নীতির পরিচয় পাওয়া যায়নি। (৪) প্রতিটি রাষ্ট্রেই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অবস্থানের ফলে ভবিষ্যৎ জটিলতার রীজ রোপিত হয়েছিল।

এছাড়া ক্লেমসোঁ বুঝেছিলেন এবং জার্মানির ভবিষ্যৎ ইতিহাস প্রমাণ করেছিল, সবচেয়ে গণতান্ত্রিক সংবিধানও আগ্রাসী সমরবাদ ও উগ্র-জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি রোধ করতে পারে না।

এমন কি, উইলসনের ব্যক্তিগত সহযোগিতাতেই প্যারিসে 'মুক্ত রাজনীতি'র আদর্শ পরিত্যক্ত হয়েছিল। বৃহৎ চতুঃশক্তি চূড়ান্ত গোপনীয়তার মধ্যে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের পক্ষে জনমত বা প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

চাতুর্য ও কঠোরতায় উইলসন কিছু কম ছিলেন না। সম্মেলনে কোনো কোনো মুহূর্তে শঠতা এবং হিংস্রতার মধ্যে দিয়ে উইলসন তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছেছিলেন—যেমন, রাইনল্যান্ডের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের প্রশ্নে তিনি প্যারিস পরিত্যাগ করার ভয় দেখিয়েছিলেন—অথবা অর্লাণ্ডোকে ডিঙিয়ে তিনি ইতালীয়দের আবেদন জানিয়েছিলেন।

ডেভিড টমসন মনে করেন, সম্মেলনে উপস্থিত রাষ্ট্রনীতিবিদদের কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেই দায়িত্ব ছিল না, নিজ নিজ দেশের পার্লামেন্ট এবং জনমতের প্রতিও তাঁদের দায়বদ্ধ থাকতে হয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভার্সাই চুক্তির এক শক্তিশালী বিরোধী গোষ্ঠী ছিল। অনেক মার্কিনী মনে করতেন, এই চুক্তি জার্মানির পক্ষে যথেষ্ট কঠোর নয়, আবার উদারনৈতিকরা মনে করতেন, এটি অত্যন্ত কঠোর। এছাড়া, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূল ঝোঁক ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ তার বাণিজ্য ও শিল্পকে রক্ষা করতেই ব্যস্ত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন সেনেটাররা উইলসনের সিদ্ধান্তকে সার্বিক সমর্থন জানাননি।

সেনেটের অধিবেশনে অনুমোদিত হতে গেলে ভার্সাই চুক্তি ও লীগ চুক্তিপত্রের পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পড়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেনেটের সদস্যরা বিনা পরিবর্তনে লীগ-চুক্তিপত্রের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পড়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেনেটের সদস্যরা বিনা পরিবর্তনে লীগ-চুক্তিপত্র সংক্রান্ত শর্তটি পুরোপুরি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য বিদেশে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চান নি। অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভার্সাই চুক্তি ও লীগ চুক্তিপত্রের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ভ্রমণরত অবস্থায় রাষ্ট্রপতি উইলসনের মৃত্যু হয়।

যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে উইলসনের আদর্শকে পুরোপুরি কার্যকর করা সম্ভব না হলেও এই নীতিগুলির গ্রহণযোগ্যতা অস্বীকার করা যায় না। ফরাসী বিপ্লব ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলি ইয়োরোপের মাটিতে যে নবীন ধারার জন্ম দিয়েছিল, উইলসন সেই মতাদর্শগুলিকেই পরিপূর্ণ রূপদান করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান 'উন্মুক্ত রাজনীতির আদর্শ' এবং আন্তর্জাতিক বিবাদ-দি-সম্বাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য গঠিত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার ক্ষেত্রে এই সংগঠনের ভবিষ্যৎ ব্যর্থতার জন্য রাষ্ট্রপতি উইলসনকে দায়ী করা অযৌক্তিক। এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী সমকালীন কূটনৈতিক সমাজ ও যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সমস্যাদীর্ণ জটিল পরিস্থিতি।

১.৩.১ পুরাতন ইয়োরোপকেন্দ্রিক শক্তিসাম্যের অবসান

আধুনিক ইয়োরোপের ইতিহাসে জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থানের পাশাপাশি গড়ে উঠছিল শক্তিসাম্যের ধারণা। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে দিয়ে যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা করা হয়েছিল, সেই ধারণা সপ্তদশ শতকের রাষ্ট্রচিন্তাকে প্রভাবিত করে। ইয়োরোপীয় শক্তিসাম্যের ধ্রুপদী যুগ বলতে ১৬৪৮ সাল থেকে ১৮১৫ সালে নেপোলিয়নীয় যুগের শেষ পর্যন্ত বোঝায়।

জি. এল. ডিকিনসনের মতে ভারসাম্যের ধারণাটির দুটি অর্থ : এক অর্থ, দুই পক্ষের সমতা অর্থাৎ হিসাবে জমা ও খরচ যখন সমান থাকে। দ্বিতীয় অর্থ অসাম্য, অর্থাৎ ব্যাঙ্কে জমা আমানতে খরচের তুলনায় জমা অর্থের পরিমাণ যেমন সবসময়েই বেশি থাকে। শক্তিসাম্য নীতির প্রবক্তারা তাত্ত্বিক স্তরে সাম্যের আদর্শ ঘোষণা করলেও কার্যত এক অপরের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে চান, অর্থাৎ অসম পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চান।

অধ্যাপক সিডনি বি. ফে. *"এনসাইক্লোপিডিয়া অফ সোশ্যাল সায়েন্সে"* ভারসাম্যের ধারণাকে 'ন্যায্য ভারসাম্য' বলে অভিহিত করেছেন। এই আদর্শ কোনো একটিমাত্র রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রসমূহের ওপর প্রভুত্ব বিস্তারে বাধা দেয়। মূল শক্তিসাম্যের সীমানার মধ্যে থাকে নানা আঞ্চলিক শক্তিসাম্য। আঞ্চলিক শক্তির সংঘাত কখনও কখনও প্রভাবিত করে মূল শক্তিসাম্যকে, যেমন পূর্ব এশিয়া বা পশ্চিম এশিয়ার আঞ্চলিক সংঘাত সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এছাড়া, সবসময়েই একটি প্রধান শক্তির দায়িত্ব থাকে শক্তি সাম্য বজায় রাখা। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকে ইংলন্ডই ছিল ভারসাম্যরক্ষক। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শেষে ইয়োরোপে জার্মানির উত্থান ও শিল্পায়নের অগ্রগতি এবং বিংশ শতকের গোড়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংলন্ডের একক প্রাধান্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়েছিল।

যখনই কোনো শক্তি এককভাবে এই শক্তিসাম্যের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করেছিল তখনই তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে শক্তিজোট গড়ে তুলেছিল। বিসমার্কের নেতৃত্বে ১৮৮২ সালে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি গড়ে ওঠার প্রতিক্রিয়ায় ত্রিপাক্ষিক আঁতাত তৈরি হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইয়োরোপের শক্তিসাম্যকে পুনর্বিন্যাস করা। ভার্সাই চুক্তি-প্রণেতারা পৃথিবীর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত শক্তিসাম্য প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত হন। রুশবিপ্লব ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইয়োরোপের প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলির অবসান ঘটে ; প্রাচীন তুর্কি সাম্রাজ্য, রুশ সাম্রাজ্য, হ্যাবস্‌বার্গ সাম্রাজ্য এবং জার্মান সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির ফলে ইয়োরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে। রাজনৈতিক মানচিত্র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পালাবদল ঘটে। একদিকে ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে রাশিয়া এবং ইয়োরোপের বাইরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকা ও জাপান রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

শান্তিপ্রণেতাদের দায়িত্ব ছিল জাতীয় স্বাতন্ত্র্য, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং সামরিক নিরাপত্তা অনুসারে মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপের মানচিত্র পুনর্নির্মাণ করা। কার্যত, পূর্ব ও পশ্চিম ইয়োরোপের সমস্যার মীমাংসা হয়েছিল পৃথকভাবে।

এছাড়া, জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি, রাজনৈতিক ব্যবস্থার উত্থানপতন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা সঙ্কোচন ইয়োরোপের রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাসের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ইয়োরোপীয় রাজনীতির সীমানায় আধা এশিয় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইয়োরোপের বাইরে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের উত্থান ঘটেছিল। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে রাজনৈতিক সংঘাতের নতুন নতুন কেন্দ্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী পর্বে শক্তিসাম্যের ধারণা ও যৌথ নিরাপত্তার ধারণার মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১৯৯৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি উইলসন চৌদ্দদফা দাবির দ্বিতীয় ধারায় বলেন, "মানুষ ও ভূখণ্ডকে গরুছাগলের মতো, বা দাবার বোড়ের মতো এক সার্বভৌমত্ব থেকে আর এক সার্বভৌমত্বে হস্তান্তরিত করা হবে না। শক্তিসাম্য নীতি এখন থেকে চিরতরে পরিত্যক্ত হল।" ("People and provinces are not to be bartered about from sovereignty to sovereignty as if they were mere chattels and pawns in a game, now for ever discredited, of the balance of power.") কার্যত, উইলসনের এই আশা পূরণ হয়নি। জাতিসংঘের যৌথ নিরাপত্তার আদর্শ ও আঞ্চলিক স্তরে নিরাপত্তার আদর্শ (লোকার্নোচুক্তি, ১৯২৫ ও কেলগব্রিয়াঁ চুক্তি, ১৯২৮) ক্ষণিকের আশা জাগিয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল। ডেভিড টমসনের ভাষায়, "এটি ছিল মিশ্র ব্যবস্থার গোধূলি বেলা।" একটি অসম্পূর্ণ ইয়োরোপীয় সমবায় ও নবসৃষ্ট দুর্বল শক্তিসাম্যের সহাবস্থান ঘটেছিল। ("It was a twilight era of mixed systems." A newly recreated precarious balance of power coexisted with an imperfect Concert of Europe.) David Thomson, *Europe Since Nepoleon*.

১.৩.২ প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলির অবসান ও তৎসংক্রান্ত সমস্যা

আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি (১.৩.১) কীভাবে ইয়োরোপকেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অবসান ঘটেছিল। এখন আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব কীভাবে প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলির অবসান ঘটে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হ'ল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে প্রথমেই পতন ঘটেছিল জারতান্ত্রিক রাশিয়ার। ১৯১৬ সালে জার্মান সেনা বাল্টিক অঞ্চল ; পোল্যান্ড এবং ইউক্রেনে—রাশিয়ার গভীরে প্রবেশ করেছিল। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পেট্রোগাদে স্বর্তঃস্ফূর্ত খাদ্যদাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। সরকার এই সঙ্কটের সমাধান করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যেই জারতন্ত্রের অযোগ্যতার বিরুদ্ধে সোশ্যাল রেভলুশনারি, মেনশেভিক এবং লিবারেলরা সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে জার (১৮৬৮-১৯১৮) দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং অস্থায়ী সরকার কায়েম

হয়। এর আট মাসের মধ্যে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে। যে রাশিয়া যুগ যুগ ধরে সব রকমের রাজনৈতিক পরিবর্তন প্রতিহত করেছিল, সেই দেশে এই বৈপ্লবিক রূপান্তর দেশের ভেতরে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। বিপ্লবের আগেই লেনিন "জাতীয় পরাজয়ে"র তত্ত্ব ঘোষণা করেন এবং বিপ্লবের পর ১৯১৮ সালে বিজয়ী জার্মান পক্ষের সঙ্গে ব্রেস্টলিটভস্কের চুক্তি করেন। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে লেনিন ফিনল্যান্ড, এস্তানিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং পোল্যান্ড প্রভৃতি গুরুত্বপুর্ণ অঞ্চল ছেড়ে দেন।

এর পরেই উল্লেখ করা যায় অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের। এটি ছিল ইয়োরোপের সবচেয়ে বেশি মিশ্র-জাতির রাষ্ট্র—প্রায় ১৩টি পৃথক জাতিগোষ্ঠী এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির বৃহত্তম জনগোষ্ঠী ছিল স্লাভ—তার ম্যগেয়ার, চেক, শ্লোভাক, পোল, ইউক্রেনীয়, সার্ব, ক্রোট এবং স্লোভেন ইত্যাদি উপরিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হ্যাব্স্বার্গ সাম্রাজ্যের অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছিল এবং রাজনৈতিক কাঠামোতে ভাঙন ধরিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ১৯১৮ সালে বিভিন্ন স্লাভ নেতারা রাষ্ট্র সমবায়ের পরিবর্তে পৃথক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যখন ১৯১৮ সালের ৩ নভেম্বর অস্ট্রিয় সম্রাট মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁরা সাম্রাজ্য থেকে তিনটি রাষ্ট্রের জন্ম হয় : অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও চেকোশ্লোভাকিয়া। অবশিষ্ট অংশগুলি ইতালি, রুমানিয়া, পোল্যান্ড এবং যুগোশ্লোভিয়ার মধ্যে বিভক্ত করে দেওয়া হয়। এর মধ্যে যুগোশ্লোভিয়া ছিল নতুন রাষ্ট্র।

ধ্বংসপ্রাপ্ত তৃতীয় সাম্রাজ্যটি কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের জার্মান সাম্রাজ্য। ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমি শক্তিগুলি (অর্থাৎ ফ্রান্স ও ইংলন্ড) মার্কনি বাহিনীর সহায়তারে জার্মানির সীমান্ত অতিক্রম করে। অন্যদিকে, ইংলন্ডের নৌ অবরোধের ফলে জার্মান অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে পড়ে। পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে ৯ নভেম্বর কাইজার পদত্যাগ করেন এবং একটি অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন হয়।

১৯১৮ সালের শেষাশেষি তিনটি সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের ওপর গড়ে ওঠে এগারোটি নতুন রাষ্ট্র ; ফিনল্যান্ড এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোলান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া, যুগোশ্লোভিয়া, জার্মানি।

এই নবগঠিত রাষ্ট্রগুলির জন্মলগ্ন থেকেই এদের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। এই বিতর্কে তিনটি মত প্রাধান্য লাভ করে। প্রথমত, মাসারিকের (Masarky) মতো নবপ্রতিষ্ঠিত চেকোশ্লোভাকিয়ার নেতা এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন—'এই পরিবর্তন জাতীয়তাবাদের নেতিবাচক চরিত্রের অবসান ঘটিয়ে লাঞ্ছিত মানুষকে তাদের নিজের পায়ে দাঁড় করাল।'

এরিখ আইকের (E. Eyck) মতো জার্মান ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ বিপরীত মতের প্রবক্তা। তিনি ফিরে যেতে চেয়েছিলেন বহুজাতিক হ্যাবস্বার্গ সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে, তাঁর মতে এই সাম্রাজ্যেকে ভেঙে ফেলা একটি মৌলিক ভ্রান্তি। অধ্যাপক এ. জে. পি. টেলর উপরোক্ত দুটি মতের মাঝামাঝি বক্তব্য রেখেছেন। তিনি সাম্রাজ্যগুলির ক্ষণস্থায়িত্বের কথা স্মরণ রেখেও বলেছেন, এগুলিকে বাদ দিলে চলা অসুবিধাজনক। "যেভাবে প্লাস্টারের ছাঁচ ভেঙে যাওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গাকে ধরে রাখে, সেভাবে বংশানুক্রমিক সাম্রাজ্য মধ্য-ইয়োরোপকে ধারণ করেছিল। যদিও অঙ্গাপ্রত্যঙ্গা সচল হবার আগে ছাঁচটি ভেঙে ফেলতে হয়, তবু এটিকে বাদ দিয়ে অঙ্গা-প্রত্যঙ্গোর সচলতা সফল বা সহজ হয়ে ওঠে না।" (The dynastic Empire sustained Central Europe, as a plaster cast sustains a broken limb; thought it had to be destroyed before movement was possible, its removal did not make movement successful or even easy.") A. J. P. Taylor Quoted is Stephen J. Lee, *The European Dictatorships*.

উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রগুলিকে যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সেগুলি বিশ্লেষণ করলে উপরোক্ত মতগুলির আপেক্ষিক সত্যতা বোঝা যায়। এছাড়া, কেনই বা এই অঞ্চলগুলি আভ্যন্তরীণ সঙ্কট, একনায়কতন্ত্রের উৎসস্থল এবং আন্তর্জাতিক সংঘাতের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রসমূহের সামনে প্রথম সমস্যা হল জাতিগত গঠন। তত্ত্বগতভাবে প্যারিস সন্ধি যুক্তিসঙ্গত হলেও, এই ব্যবস্থা অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির প্রতি ন্যায়বিচার করেনি। নতুন রাষ্ট্রগুলির সীমানা এমনভাবে টানা হয়েছিল যাতে বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘু জার্মান ও ম্যগয়ার (Magyar) তাদের বাসভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ৩.১ লক্ষ সুদেতন জার্মান চেক শাসনের অন্তর্গত হয়েছিল, আর হাঙ্গেরীয় জনগোষ্ঠী চেকোশ্লোভাকিয়ার শাসনাধীন হয়েছিল। সুদেতনল্যান্ডের শিল্পগত গুরুত্বের ফলে এই অঞ্চলটি চেকোশ্লোভাকিয়ার অর্থনৈতিক অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। এই অঞ্চল অস্ট্রিয়ার হাতে তুলে দেওয়া ভৌগোলিকভাবে সম্ভব ছিল না। মিত্রপক্ষ কোনো মতেই এই অঞ্চলকে জার্মানির হাতে তুলে দিত না।

অ-শ্লাভদের পরিবর্তে যে শ্লাভদের বেশি সুযোগ দেওয়া হয়েছিল—তাও ঠিক নয়। কখনও কখনও একই জাতির অন্তর্গত উপগোষ্ঠীগুলির মধ্যে আর্থ-সামাজিক কারণে সংঘাত দেখা দিত। যেমন শ্লোভাকরা চেকদের বিরুদ্ধে একচেটিয়াভাবে ক্ষমতা অধিগ্রহণের অভিযোগ এনেছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে সাম্রাজ্যগুলি পতনের পর ডানিয়ুব অঞ্চলের জাতিগত সংঘাত আরও বেশি তীব্র হয়ে উঠেছিল।

অর্থনৈতিক বিরোধের ফলে জাতিগত সংঘাত আরো জটিল হয়ে উঠেছিল। যেভাবে সাম্রাজ্যের শিল্পভিত্তিক ও কৃষিভিত্তিক অঞ্চলগুলি বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে বন্টন করা হয়েছিল তাতে কোনও সমতা ছিল না। যেমন, চেকোশ্লোভাকিয়া সাম্রাজ্যের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৭% লাভ করলেও সাম্রাজ্যের ভারী শিল্পের মোট ৮০% লাভ করেছিল। তার ফলে চেকোশ্লোভাকিয়া যে কোন পশ্চিমি রাষ্ট্রের প্রতিযোগী হয়ে উঠেছিল। হাঙ্গেরি ৮০% থেকে ৯০% ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কাঠচেরাই উৎপাদন কেন্দ্র লাভ করলেও ৮৯% কম লৌহ আকর এবং ৮৫% কম কাঠ পেয়েছিল। বস্ত্রশিল্পের সুতাকলগুলি (Spinning mill) ছিল অস্ট্রিয়ার আর বস্ত্রবয়ন (weaving) শিল্পগুলি ছিল বোহেমিয়ায়। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচার জন্য তাদের শিল্পের পরিপূরক দিকটি তৈরি করে নিয়ে হয়েছিল। ২০-র দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই আশানুরূপ অর্থনৈতিক বিকাশ হয়েছিল। ১৯২৯ সাল থেকে মহামন্দার প্রভাবে এই অগ্রগতিতে ভাটা পড়ে।

রাজনৈতিক অস্থিরতার একটি কারণ অর্থনৈতিক সঙ্কট, অপর কারণ সাংগঠনিক ত্রুটি। ১৯১৮ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে প্রায় প্রতিটি উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রেই পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে চেকোশ্লোভাকিয়া ছাড়া মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপের প্রতিটি দেশেই গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছিল। [১.৩.৩. অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।]

চতুর্থ সমস্যাটি আরও জটিল। ক্রমশ উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রগুলি একে অপরের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। আবার বৃহৎ শক্তিগুলিও এই দ্বন্দ্বে পক্ষ অবলম্বন করে। হাঙ্গেরি তার প্রতিবেশী শ্লাভ রাষ্ট্রগুলির হাত থেকে ম্যগেয়ার অঞ্চলগুলি দখল করার সংশোধনবাদী নীতি অবলম্বন করে। অস্ট্রিয়া তার পূর্বতন মর্যাদা হারিয়ে জার্মানির সঙ্গে যুক্ত হতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। পোলান্ড সোভিয়েত ইউনিয়ন ও লিথুনিয়া অংশ নিয়ে ১৭৭২ সালের মানচিত্র ফিরিয়ে আনতে চায়। বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি নিজেদের সীমানা বজায় রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ১৯২০ সালের পর এই সকল প্রচেষ্টা থেকেই দুই শক্তিজোট গড়ে ওঠে।

একদিকে, অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরী, প্যারিস, চুক্তির সংশোধন দাবি করে এবং ইতালিও জার্মানির দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই প্রবণতা সম্পূর্ণতা লাভ করে জার্মানির অস্ট্রিয়া অধিগ্রহণে (Anschluss) এবং হাঙ্গেরির কনিটার্ন বিরোধী পক্ষে যোগদানে। দ্বিতীয় জোটের সদস্য ছিল পোলান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লোভিয়া ও রুমানিয়া। এই রাষ্ট্রগুলি একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সম্ভাব্য জার্মান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফরাসি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে।

১৯৩০-এর দশকে ফরাসি প্রভাব হ্রাস পায়। এর ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজ নিজ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জার্মানির সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু করে। চেকোশ্লোভাকিয়া শেষ পর্যন্ত জার্মানির বিরুদ্ধে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ১৯৩৮ সালে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মিউনিখ সঙ্কটে জার্মানি ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালির প্রতিনিধিরা চেকোশ্লোভাকিয়ায় অংশ দখল করে। চেকদের সঙ্গে আলোচনাও করা হয়নি। হাঙ্গেরি ও পোলান্ড সুদেতানল্যান্ড ও দক্ষিণ স্লোভাকিয়ায় তাদের স্বদেশীয়দের ওপর দাবি জানায়। ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে স্টালিন ব্রেস্টলিটভস্কের স্মৃতি মুছে ফেলার জন্য হিটলারের সঙ্গে পোলান্ড ও পূর্ব ইউরোপকে সোভিয়েত ও জার্মান প্রভাবিত অঞ্চলে বিভক্ত করার চুক্তি করেন। প্যারিস ব্যবস্থা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়।

১.১.৩ নবীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির দুর্বলতা ও সমস্যা

আগের অনুচ্ছেদে আমরা উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রগুলির নানান সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে সাংগঠনিক ও সাংবিধানিক সমস্যার উল্লেখ করেছি। এই অনুচ্ছেদে আমরা নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির দুর্বলতার কারণ বিশ্লেষণ করব। বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইয়োরোপে মানুষের আশা ছিল শান্তি ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। স্বাভাবিকভাবেই শান্তি ও গণতন্ত্র পরস্পরের পরিপূরক ধারণা হয়ে ওঠে। সকলেই আশা করেছিল ১৯১৯ সালের পৃথিবী গণতন্ত্রের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে উঠেছে। মিত্রপক্ষীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি জয়মাল্য লাভ করায় নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যেন স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও তুরস্কেও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক, রাশিয়া, জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির মতো স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরাজয় এবং ইংলন্ড, ফ্রান্স, ইতালি ও আমেরিকার মতো গণতান্ত্রিক দেশের জয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জয় সূচিত করেছিল। এই দেশগুলি যে সবচেয়ে বেশি শিল্পায়িত এবং সম্মিলিতভাবে এই দেশগুলিই যে সামুদ্রিক অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে তা সকলের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই, একের পর এক নবগঠিত রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করেছিল।

প্রথমে আমরা পৃথক পৃথক রাষ্ট্রের নিজস্ব সমস্যা আলোচনা করে, পরে মতাদর্শগত সমস্যাগুলি আলোচনা করব। জার্মানির প্রজাতন্ত্র কাগজে-কলমে একটি নিখুঁত গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করে। কিন্তু এই সংবিধানের প্রেক্ষাপট ছিল গৃহযুদ্ধ। যুদ্ধবিরতি ও সম্রাটের সিংহাসন ত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯১৮ সালের রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটেছিল। Spartacist-রা এই বিপ্লবের প্রয়াস নিয়েছিলেন। প্রথমে বার্লিন ও পরে মিউনিখে কাউন্সিল সরকার গঠিত হয়েছিল। অবশ্য এগুলি খুব শীঘ্রই দক্ষিণপন্থীদের দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯১৮ সালের শেষে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি (KPD) গঠিত হয়। তবে, ১৯১৯ সালে যখন নতুন জাতীয় সভা নির্বাচিত হয় রক্ষণশীল ও উদারনৈতিকরা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিলেন। শিল্পপতি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে সাময়িক আপোষ রফা সম্ভব হয়েছিল।

গণসার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে একজাতিক রাষ্ট্রের সংবিধানরূপে জার্মান সংবিধান রচিত হয়। কিন্তু ভাইমার প্রজাতন্ত্রের সংবিধান ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে মৌলিক স্ববিরোধ থেকে গিয়েছিল।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নেতিবাচক স্থগিতাদেশ দেওয়া ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় কাউন্সিলের আর কোনো ক্ষমতা ছিল না। বিচারবিভাগ, আমলাতন্ত্র ও সামরিক বিভাগে পুরাতনতান্ত্রিক আর্থসামাজিক শ্রেণীগুলির প্রাধান্য অটুট ছিল। প্রায় অপরিবর্তিত একটি সামাজিক বিন্যাসের ওপর আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেওয়ায় তা শেষ পর্যন্ত অকার্যকর হয়ে পড়ে।

পরাজয়, শান্তিচুক্তির শর্তসমূহ এবং মিত্রপক্ষের বিরুধে সাধারণ ক্ষোভের ফলে নতুন সরকার জনগণের আস্থা হারায়। এছাড়া, দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের কোয়ালিসন সরকার ছিল প্রথম থেকেই দুর্বল। ১৯২০ সালের ২০ মার্চ উল্‌ফ গ্যাঙ্গ ক্যাপের (Wolf Gang Kapp) এবং ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসে আডল্‌ফ হিটলারের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হলেও রাষ্ট্রক্ষমতা ক্রমশ রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থীদের হাতে চলে যায়। ১৯৩৩ সালে নাৎসি পার্টির ক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়ে জার্মানিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটে।

ইতালিতে তৃতীয় ভিক্টর ইম্যানুয়েলের নেতৃত্বে (Victor Emmannuel III) সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রথম বিশ্বযুধের পরেও টিকে ছিল। জার্মানির মতো ইতালির সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থাও গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের অনুকূল ছিল না। ইতালির সংসদীয় সরকারগুলি ছিল অস্থির ও অনিশ্চিত। ১৯১৯ সালে দক্ষিণ ইতালিতে লুটতরাজ এবং উত্তর ইতালিতে শিল্পকেন্দ্রিক বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। ডি. অ্যানানজিও ফিউমের একটি অংশ অধিকার করেন। আর্থিক নৈরাশ্যও কমিউনিস্ট বিপ্লবের ভীতিকে কাজে লাগিয়ে বেনিটো মুসোলিনির (Benito Mussolini) ফাসিস্ত দল দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ক্ষুব্ধ তরুণ, ভীত বুর্জোয়া ও শিল্পপতিরা সকলেই ফাসিস্ত ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ১৯২২ সালের ২৮ অক্টোবর মুসোলিনি রোম অভিযান করেন। রাজা তৃতীয় ইমানুয়েলের আহ্বানে তিনি ৩০ অক্টোবর মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ১৯২৪ সালের পর ইতালিতে পার্লামেন্টীয় শাসনের অবসান ঘটে এবং একনায়কতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

হাঙ্গেরিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল আরও ক্ষণস্থায়ী। উদারনৈতিক অভিজাত মিহালি কারোলির (Mihaly Karolyi) অস্থায়ী সরকার ছিল নিতান্ত ক্ষণিক। কমিউনিস্ট নেতা বেলা কুনের নেতৃত্বে হাঙ্গেরিতে একটি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিমি শক্তিগুলি হাঙ্গেরি অবরোধ করে। অবশেষে ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে অ্যাডমিরাল নিকোলাস হর্থি (Nicholas Horthy) ক্ষমতা দখল করেন এবং কার্যত একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। অস্ট্রিয়াতে খ্রিস্টিয়ান সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের মিলিত প্রয়াসে অস্ট্রিয়ার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই দুই পার্টির মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, অর্থনৈতিক বিক্ষোভ এবং সংসদীয় শাসনে অনভিজ্ঞতার ফলে ১৯৩৪ সালে অস্ট্রিয়ায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটে।

বাল্টিক সীমান্ত অঞ্চলে ভেঙে যাওয়া রুশ সাম্রাজ্যের রাজ্যাংশ নিয়ে গঠিত ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া, লাটভিয়ার ও লিথুয়ানিয়ায় চূড়ান্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি তুলনামূলকভাবে বেশি স্থায়িত্ব ও সাফল্য লাভ করেছিল। ১৯২০ সালে এস্তোনিয়ায়, ১৯২২ সালে লাটভিয়াও লিথুয়ানিয়ায় গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তিত হয়। অবশ্য, লিথুয়ানিয়ায় গণতন্ত্র দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুধের সময় ১৯৪০ সালে সোভিয়েত আগ্রাসনের ফলে তিনটি রাষ্ট্র স্বাধীনতা হারায়।

যুধবিধ্বস্ত বিভক্ত পোলান্ডকে ঐক্যবন্ধ করেন পিয়ানোবাদক পাডেরিস্কি—(Paderewski) ১৯২২ সালের প্রথম নির্বাচনেই রক্ষণশীল ও সমাজতান্ত্রিকদের বিরোধের ফলে এক সাংবিধানিক অচলাবস্থার সৃষ্টি

হয়। প্রথম নির্বাচনের কয়েক দিনের মধ্যেই রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করা হয়। ১৯২৬ সালে পিলসুদস্কি সেনাবাহিনী ও কমিউনিস্টদের সমর্থনে সংবিধান পরিবর্তন করেন।

জোড়া-তালি দিয়ে তৈরি দক্ষিণপূর্ব ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির গণতন্ত্র ছিল নিতান্ত ভঙ্গুর। যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং রুমানিয়ার সমস্যা ছিল নতুন জাতি গড়ে তোলা। বিভিন্ন জাতির সহাবস্থানের ফলে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, গণভোট প্রভৃতি আধুনিক পদ্ধতি রাজনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। অন্যান্য ডানিয়ুবীয় গণতন্ত্রগুলির তুলনায় চেক গণতন্ত্রই সবচেয়ে দীর্ঘ স্থায়ী হয়েছিল। চেকোশ্লোভাকিয়ার সফল শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি এবং হ্যবস্‌বার্গ সাম্রাজ্যের অভিজ্ঞ আমলাতন্ত্র চেক প্রজাতন্ত্রের সাফল্যের প্রধান কারণ।

তিক্ত জাতিগত হিংসা অশান্ত বল্কান অঞ্চলে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে তুলেছিলেন। আলবানিয়ার ইতিহাস বল্কান গণতন্ত্রের প্রহসনমূলক চরিত্র তুলে ধরে। ১৯২০ সালে মুসলমান উপজাতীয় নেতা আহমেদ বে জগু আলবানিয়ার প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালের বিপ্লবে বিতারিত হলেও পুনরায় ১৯২৫ সালে ফিরে আসেন এবং রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত হন। অবশেষে ১৯২৮ সালে সংবিধান পরিবর্তন করে জগু রাজা প্রথম জগ নামে আলবানিয়ার রাজা হন।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা গেল, নবসৃষ্ট ইয়োরোপীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি আভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় আকীর্ণ ছিল। স্বশাসনের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় আলোচ্য দেশগুলির পক্ষে সুষ্ঠুভাবে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে সংহত করায় কঠোর দায়িত্ব পালন করা প্রায় অসম্ভব ছিল। জাতিগত দ্বন্দ্ব বহু রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল। কোনো কোনো রাষ্ট্রে বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রবল হয়ে উঠেছিল। তৃতীয়ত, এই দেশগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির তুলনায় অনেক পশ্চাৎপদ ছিল। যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের আর্থিক সংকট এই পশ্চাৎপদতাকে তীব্রতর করে তুলেছিল। চতুর্থত, অর্থনৈতিক সংকট সমকালীন রাজনৈতিক দলগুলির ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। উদারনৈতিক দলগুলি গণসমর্থন হারায়। গণবাদী (populist) এবং ক্যাথলিক পার্টিগুলি দক্ষিণপন্থী হয়ে পড়ে। রক্ষণশীলরা গণতন্ত্রবিরোধী এবং স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে পড়ে। বামপন্থী পার্টিগুলি সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের মধ্যে দোদুল্যমান ছিল।

কে. জে. নিউম্যান দেখিয়েছেন, উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও অনুপাত মূলকপ্রতিনিধিত্ব ইতালিতে গণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছিল এবং জার্মানিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করতেই বিপুল সময় এবং প্রচেষ্টা ব্যয় হত। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকার মৌলিক রূপান্তর ঘটে যায়। রাষ্ট্রপ্রধানের পরিবর্তে তিনি বিবদমান গোষ্ঠীগুলির মধ্যস্থ হয়ে ওঠেন। জাতীয় সংকটের সময় রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষমতা অধিকার করেন। এছাড়া সংবিধানে গণতন্ত্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। জার্মান সংবিধানে ৪৮ নম্বর ধারা রাষ্ট্রপতির হাতে অভূতপূর্ব ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল। ১৯৩১ সালের পর থেকে জার্মান রাষ্ট্রপতি স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে ওঠেন।

এছাড়া, অন্তর্বর্তী পর্বে উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক নেতার অনুপস্থিতি গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিশেষভাবে দুর্বল করে তুলেছিল। ব্রিঁয়া বা স্ট্রেসেসম্যানের প্রতিভার সূক্ষ্মতা সাধারণ মানুষের কাছে ধরা পড়েনি। আলোচ্য পর্বের প্রায় প্রতিটি উল্লেখযোগ্য নেতাই ছিলেন গণতন্ত্রের সমালোচক—হিটলার, পিলসুদস্কি এবং আরও অনেকে। এদের রাজনৈতিক যুক্তি যত দুর্বল, ব্যক্তিগত সম্মোহনী শক্তি ছিল ততই প্রবল। জাতীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা ক্রমশ বৃহত্তর রাজনৈতিক গোষ্ঠীর পরিবর্তে ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুর্বলতার সাধারণ ও বিশেষ আভ্যন্তরীণ কারণগুলি ছাড়াও মতাদর্শগত বিকল্পের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুটি বিকল্প পন্থা এ সময়ে প্রাধান্যলাভ করেছিল—সাম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ।

১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্য রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে। সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি ধ্বংস করে।

প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে লেনিন সর্বহারা শ্রেণীর গণতন্ত্রের উল্লেখ করেছিলেন। এটি গণতন্ত্রে এক অভিনব রূপ। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার তত্ত্বে লেনিন নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রাধান্য তুলে ধরেন। তাঁর মতে সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থা সর্বহারা শ্রেণীর গণতন্ত্রের আদর্শকে বাস্তবায়িত করেছে।

লেনিন স্থাপিত বলশেভিক রাষ্ট্রই স্টালিনের পদাধিকার কালে এক আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বপরায়ণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। ১৯২৪ সালের পর ইয়োরোপ ও পৃথিবীর অন্যত্র বিপ্লবী নীতি প্রচারে এই রাষ্ট্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি।

১৯১৯ সালের লয়েড জর্জ বলেছিলেন 'গোটা ইয়োরোপ বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় উদ্দীপিত'। বাস্তবে ১৯২০ সাল নাগাদ অ-রুশ কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতা দখলের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে উঠেছিল। বাভারিয়া, হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া এবং ইতালির পো উপত্যকায় উগ্র বামপন্থী বিপ্লবগুলি চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়। তবে, সাম্যবাদ গণতন্ত্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে না পারলেও, সাম্যবাদ প্রচারের নীতি ও আশঙ্কা পশ্চিমি গণতান্ত্রিক নেতাদের তাড়িত করেছিল।

গণতন্ত্রের অনেক বড় শত্রু ছিল ফ্যাসিবাদ। ফ্যাসিবাদী তত্ত্বকে সংজ্ঞায়িত করা প্রায় অসম্ভব। তবে ফ্যাসিবাদের কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমত, ইংলন্ড ও ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রতি তীব্র ঘৃণা ফ্যাসিবাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য। ফ্যাসিবাদের দ্বিতীয় শত্রু হল মার্কসবাদ। ই. নল্টের ভাষায়, বামপন্থার বিরোধিতাই দক্ষিণপন্থার উৎস। অর্থনৈতিক থেকে ফ্যাসিবাদ একদিকে, সমাজতন্ত্রবাদ এবং ট্রেড ইউনিয়ন পন্থা এবং অন্যদিকে, ধনতন্ত্র ও বৃহৎ শিল্পের বিকল্প। ফ্যাসিবাদ শ্রেণী-সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে একটি তৃতীয় পন্থা নির্ধারণের প্রতিশ্রুতি দেয়।

চতুর্থত, ফ্যাসিবাদীরা ডারউইনের 'যোগ্যতমের অস্তিত্বে'র তত্ত্বকে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। এই তত্ত্ব একদিকে, দুর্বলের ধ্বংসসাধন এবং অন্যদিকে সামরিক ক্ষমতা বিস্তারের যৌক্তিক ভিত্তি রচনা করে। এর ফলে সমরবাদের গৌরব বৃদ্ধি পায় এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী তত্ত্ব শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

সংগঠনের দিক থেকে ফ্যাসিবাদী দল এক সর্বশক্তিমান নেতার দ্বারা পরিচালিত। সাধারণ মানুষ এই নেতার সম্মোহনী শক্তি, যুগান্তকারী প্রতিশ্রুতি এবং সরল সমাধানে আকৃষ্ট হন।

ফ্যাসিবাদের সমর্থক সাধারণ বেকার, কর্মচ্যুত লুম্পেন প্রলেটারিয়ত ও গ্রামের কৃষক ও জমির মালিক। শান্তিচুক্তির শর্তে ক্ষুব্ধ এক বিপুল সংখ্যক সামরিক পদাধিকারী এবং ভেঙে-যাওয়া সৈন্যবাহিনীর প্রাক্তন সৈন্য, ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকের আর্থিক সংকটে বিপর্যস্ত মধ্যবিত্ত এবং সাম্যবাদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা অর্জনের জন্য পুঁজিপতি ও বড় ব্যবসায়ীরা সমর্থন জানিয়েছিল ফ্যাসিবাদকে।

মতাদর্শগত বিকল্প পন্থার উন্মেষ ও বিকাশ এবং রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক অস্থিরতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বশাসন প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল। কাজেই অনতিবিলম্বেই যে নতুন রাষ্ট্রগুলিতে গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি পরিত্যক্ত হয়েছিল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কীভাবে চেকোশ্লোভাকিয়া ও বাল্টিক রাষ্ট্রগুলিতে

গণতন্ত্র এত দীর্ঘকাল অস্তিত্ব বজায় রাখল এটাই আশ্চর্যের বিষয়। যুদ্ধোত্তর পূর্ব ইয়োরোপের অস্থিরতা ও দুর্ভাগ্যের জন্য গণতান্ত্রিক সরকারগুলিকে দায়ী করা যুক্তিযুক্ত নয়। গ্রীস, বুলগেরিয়া এবং হাঙ্গেরির মতো যে দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল অথবা যারা দ্রুত পূর্বতন স্বৈরতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতিতে ফিরে গিয়েছিল তাদের অবস্থাও গণতান্ত্রিক দেশগুলির তুলনায় বিশেষ ভালো ছিল না। গণতন্ত্রের ব্যর্থতাও ইয়োরোপের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী ছিল। যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের পরিস্থিতি, বিশেষত অর্থনৈতিক সঙ্কট যুদ্ধোত্তর শান্তিব্যবস্থাকে অকার্যকর করে তুলেছিল। গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ১৯৩৯ সালে পৃথিবীর যে ১২টি দেশে গণতন্ত্র টিকেছিল, সেই রাষ্ট্রগুলিতেই মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল সবচেয়ে বেশি।

১.৪ সারাংশ

১৯১৪ সালের ২৮ জুন অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্দিনান্দ ও তাঁর পত্নীর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে যে ইয়োরোপীয় যুদ্ধের সূচনা হত তার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯১৮ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের চৌদ্দ দফা নীতি ঘোষণা ও জার্মান যুদ্ধবিরতি ঘোষণার মধ্যে দিয়ে।

১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে প্রায় ৩২টি দেশের প্রতিনিধি মিলিত হয়ে শান্তি স্থাপনের কাজ আরম্ভ করেন। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন তিন জন : মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন, ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেসোঁ ও ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ। উইলসন তাঁর চৌদ্দতফা নীতির মধ্যে দিয়ে মুক্ত রাজনীতি জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। ক্লেমেসোঁর লক্ষ্য ছিল জার্মানির ভবিষ্যৎ উত্থানকে প্রতিহত করে ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষা। লয়েড জর্জ এই দুই বক্তব্যের সমন্বয়সাধন করেন।

মিত্রপক্ষ জার্মানির সঙ্গে ১৯১৯ সালের ২৮ জুন ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জার্মানিকে যুদ্ধ-অপরাধী বলে চিহ্নিত করে তার উপর শাস্তিমূলক ধারা চাপিয়ে দেওয়া হয়। ভৌমিক ধারা, ঔপনিবেশিক ধারা, ক্ষতিপূরণ ধারা ও সামরিক ধারার মাধ্যমে জার্মানিকে শক্তিহীন করার চেষ্টা করা হয়।

এছাড়া, অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সাঁ জার্মাঁর চুক্তি, হাঙ্গেরির সঙ্গে ট্রিয়াননের চুক্তি, বুলগেরিয়ার সঙ্গে নিউলির চুক্তি, তুর্কি সুলতানের সঙ্গে সেভেরের চুক্তি ও মুস্তাফা কামাল পাশার সঙ্গে সম্পাদিত লোসানের চুক্তি সম্পাদিত হয়।

একদল ঐতিহাসিক মনে করেন ভার্সাই চুক্তি একটি জবরদস্তিমূলক চুক্তি। জার্মান প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাধারণ সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা হয়নি। নির্মমভাবে জার্মানিকে রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল ও পঙ্গু করে রাখার চেষ্টা করা হয়। এই নির্মমতার প্রতিক্রিয়ায় জার্মানিতে প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ উপ্ত হয়।

এই মতের বিরুদ্ধে বলা যায়, সব সময়েই জয়ী পক্ষ পরাজিতের ওপর কঠোর চুক্তির শর্ত আরোপ করে। জার্মানি নিজেও ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে অত্যন্ত কঠোর শর্ত আরোপ করেছিল। তাছাড়া, জার্মানির ক্ষতি ছিল পূরণযোগ্য, বরং ফ্রান্সের ক্ষতি ছিল অপূরণীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির ভূমিকাকেও কেবলমাত্র ভার্সাই চুক্তির সঙ্গে যুক্ত করা চলে না। কারণ, ১৯৩৩ সালে যখন হিটলারের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা সফল হল, তখন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন যে আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, তার জন্য সমকালীন হিংসাপীড়িত ইয়োরোপ কতটা প্রস্তুত ছিল এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। উইলসন নিজেও কতটা আদর্শবাদী

ছিলেন, সে বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে। তাছাড়া, মার্কিন সেনেট উইলসনের পরিকল্পনাকে সার্বিক সমর্থন দেয়নি। কাজেই শেষ পর্যন্ত উইলসনীয় আদর্শবাদ কার্যকর হয়নি।

ইয়োরোপীয় শক্তিসাম্যের ক্ষেত্রেও ভার্সাই চুক্তি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মধ্য ইয়োরোপের কেন্দ্রীয় শক্তিগুলির পরাজয়, বলশেভিক বিপ্লব, বিচ্ছিন্নতাবাদী পররাষ্ট্রনীতির বন্ধন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেরিয়ে আসা এবং দূরপ্রাচ্যে জাপানের অভ্যুত্থান ইয়োরোপকেন্দ্রিক বিশ্বের পরিবর্তে এক আন্তর্জাতিক পৃথিবীর আবির্ভাব চিহ্নিত করে।

চুক্তি-ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে হ্যাবস্‌বার্গ এবং জার্মান—এই দুটি সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে রোমানভ শাসনের অবসান ঘটে। এই তিন সাম্রাজ্যের শূন্যস্থান পূরণ করে চেকোশ্লোভাকিয়া, ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া ইত্যাদি এগারোটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। এই নবপ্রতিষ্ঠিত উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রগুলি নানান সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রথম, জাতিগত মিশ্রণের সমস্যা। বিভিন্ন জাতিভুক্ত মানুষ এক-একটি রাষ্ট্রে মিশ্রিত অবস্থায় ছিল। এর ফলে সংখ্যালঘু সমস্যা জাতিগত সংঘাত তীব্র হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক সম্পদের অসম বন্টনের ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাময়িকভাবে প্রতিহত করেছিল। তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতিতে অভিজ্ঞতার অভাব নানান সাংবিধানিক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। চতুর্থত, উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক বিরোধ এবং এই বিরোধে বৃহৎ শক্তিগুলির হস্তক্ষেপ অবস্থা জটিলতর করে তুলেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির জয় এবং উইলসনের আদর্শবাদী ঘোষণা ইয়োরোপে গণতান্ত্রিক মতাদর্শের সাফল্য সূচিত করে। নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যগুলিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। সংসদীয় শাসনে অভিজ্ঞতার অভাব, জাতিগত ও শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব, পশ্চাদপদ অর্থনীতি, সমাজতন্ত্র বাদ ও সাম্যবাদের বিরোধের সুযোগে রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী দলগুলির ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং যোগ্য নেতার অভাবে এই নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলিতে গণতান্ত্রিক প্রবণতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

মতাদর্শগতভাবে গণতন্ত্রের দুটি প্রধান বিরোধী শক্তি ছিল সমাজতন্ত্রবাদ ও ফ্যাসিবাদ। রুশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ সমস্যা ও গৃহযুদ্ধে বিব্রত থাকায় বাইরের বিপ্লবগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে পারেনি। অন্যত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রচেষ্টা ১৯২০ সালের আগেই ব্যর্থ হয়ে যায়। অন্যদিকে, ফ্যাসিবাদী নেতাদের সম্মোহনী নেতৃত্ব, অবাস্তব প্রতিশ্রুতি, নৈরাশ্য পীড়িত বেকার যুবক, যুদ্ধফেরৎ সৈনিক এবং মধ্যবিত্তকে আকৃষ্ট করে। বড় শিল্পপতিরা সম্ভাব্য সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আঘাত থেকে বাঁচার জন্য সমর্থন জানিয়েছিল ফ্যাসিবাদকে। ১৯১৯ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে যৌথ নিরাপত্তার ব্যর্থতা, মহামন্দা, নিরস্ত্রীকরণের ব্যর্থতা, তোষণ নীতি ও ফ্যাসিবাদের ক্রমিক অগ্রগতি পৃথিবীকে নিয়ে যায় নতুন এক মহাযুদ্ধের দিকে।

১.৫ অনুশীলনী প্রশ্নাবলি ও উত্তরসংকেত

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

১। ভার্সাই সন্ধি কি জার্মানির পক্ষে একটি জবরদস্তিমূলক সন্ধি? আলোচনা করুন।
উত্তর—১.২.২।

২। যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের পরিস্থিতি কি উইলসনীয় আদর্শ প্রয়োগের উপযুক্ত ছিল?
উত্তর—১.২.৩।

৩। প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলির অবসানের পর উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রগুলি কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল?
উত্তর—১.৩.২।

৪। নবীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি কি ধরনের মতাদর্শগত প্রতিবন্ধকতা এবং আভ্যন্তরীণ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল?
উত্তর—১.৩.৩।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। নিউলির চুক্তি কোন বছর কোন দেশের সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছিল?

২। তুরস্কের সঙ্গে কোন দুটি চুক্তি কোন কোন বছর সম্পাদিত হয়েছিল?

৩। উইলসনের চৌদ্দ দফা দাবির দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারার উল্লেখ করুন।

৪। গণতন্ত্রের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করুন।

১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। ডাবলিউ. সি. ল্যাঙ্গসাম ও ও. সি. মিশেল—*দ্য ওয়ার্ল্ড সিন্স*। 1991 (১৯৭১)।

২। এ্যালান শার্প, দ্য ভার্সাই সেটেলমেন্ট, *পীসমেকিং ইন প্যারিস* (১৯৯১)।

৩। ই. এইচ. কার প্রণীত দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : ১৯১৯-১৯৩৯, ভাষান্তর ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৯০)।

৪। ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস (১৯৯৪)।

একক ২ ❑ নিরাপত্তার সন্ধানে

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ যৌথ নিরাপত্তার ধারণা—নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা

২.২.১ জেনিভা প্রটোকল ও তার বর্থ্যতা—লোকার্নো চুক্তি (১৯২৫)

২.২.২ প্যারিসের চুক্তি—কেলগে ব্রিঁয়া প্যাক্ট (১৯২৮)

২.৩.১ নিরাপত্তার সন্ধানে ফ্রান্স

২.৩.২ নিরাপত্তা প্রচেষ্টার ব্যর্থতা

২.৪ সারাংশ

২.৫ অনুশীলনী, প্রশ্নাবলি ও উত্তরসংকেত

২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- ১৯১৯ সালে যৌথ নিরাপত্তার ধারণা
- জেনিভা প্রটোকল ও তার ব্যর্থতা—লোকার্নো চুক্তি
- প্যারিসের চুক্তি
- নিরাপত্তার সন্ধানে ফ্রান্স
- যৌথ নিরাপত্তার ব্যর্থতা

২.১ প্রস্তাবনা

১৯১৪ সালের পূর্ববর্তী এক শতকে ইয়োরোপের বৃহৎ শক্তিশালী পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের নিষ্পত্তি এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়ের সূচনা করে, তারই এক ব্যাপকতর ও উন্নততর রূপ লীগ কভেন্যান্ট। যদিও ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায় শক্তিসাম্যের ধারণার ওপরেই দাঁড়িয়েছিল, এই সংগঠনের দর্শনে আধুনিক যৌথ নিরাপত্তার ধারণাও অন্তর্নিহিত ছিল। 'শুধু বাইরের বিপদ থেকে নিরাপত্তা রক্ষাই নয়, সমবায়ের সদস্য কোনো শক্তি বিপজ্জনকভাবে ক্ষমতা বৃদ্ধি করলে তার বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধর পরিকল্পনাও সমবায়ের দায়িত্বের অন্তর্গত ছিল। অন্যদিক থেকে, জাতিসংঘ খুবই অভিনব, একেবারে পৃথক ধরনের একটি সংস্থা। এটির ভিত্তি একটি বহুমাত্রিক চুক্তি (multilateral treaty)—এই চুক্তির মাধ্যমে স্বাক্ষরকারীরা কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের পারস্পরিক বিবাদের মীমাংসা করার প্রতিশ্রুতি

দেয়নি, যে কোনো স্বাক্ষরকারী আক্রান্ত হলে তাকে রক্ষা করার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিল। ইয়োরোপীয় শক্তিসমবায়ের ধারণার মধ্যে একটি শাস্তিমূলক নিষেধাজ্ঞার ধারণা জন্মায়। এই অস্ত্র ব্যবহার করে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা এবং শান্তি রক্ষা সম্ভব হবে বলে আশা করা হয়েছিল। এই আশাই যৌথ নিরাপত্তার প্রাণ। উইলসন লীগের সদস্যদের কাছে যৌথ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দাবি করেছিলেন, কিন্তু লীগ কোনোদিনই যৌথ নিরাপত্তা-রক্ষাকারী সংস্থা হয়ে উঠতে পারেনি। লীগের সদস্যরা নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতেই বেশি আগ্রহী ছিল, আন্তর্জাতিক স্তরে যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। তাই অধ্যাপক ক্রোজিয়ার বলেছেন, "অন্তরের অন্তঃস্থলে লীগ ছিল পুরানো কূটনীতিকে বাঁচিয়ে রাখার উপযুক্ত একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক সম্মেলন, নতুন কূটনীতির প্রতি তার আগ্রহ ছিল নিতান্ত স্বল্প।" (At its heart the League was a permanent international conference, more in aid of the 'old diplomacy' than the embodiment of the 'new'.)

কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পারস্পরিক সন্দেহ ও বিদ্বেষের বাতাবরণে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর রাষ্ট্র সমানভাবে আস্থা রাখতে পারেনি। গড়ে উঠেছিল নানাধরনের আঞ্চলিক নিরাপত্তা প্রচেষ্টা। ফ্রান্স যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর শেষ পর্যন্ত আস্থা রাখতে পারেনি। সে গড়ে তুলেছিল তার নিজস্ব মৈত্রী ব্যবস্থা।

যৌথ নিরাপত্তা প্রচেষ্টার সমান্তরাল রেখায় চলেছিল নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনগুলি। অস্ত্র হ্রাস না ঘটলে নিরাপত্তা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। আবার নিরাপত্তার বোধ প্রতিষ্ঠিত হলে স্বাভাবিক ভাবেই অস্ত্র হ্রাসের পরিবেশ গড়ে উঠত। এই এককে আমরা আলোচনা করব কীভাবে' ৩০-এর দশকে একে একে যৌথ নিরাপত্তা প্রচেষ্টা, আঞ্চলিক নিরাপত্তা প্রচেষ্টা এবং ফ্রান্সের একক নিরাপত্তার অনুসন্ধান শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

২.২ যৌথ নিরাপত্তার ধারণা—নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা

বিশ শতকের গোড়া থেকেই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও নিরস্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ১৮৯৯ এবং ১৯০৭ সালে আহুত হেগ সম্মেলন এই আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার সূচক। মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের উদ্যোগে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যৌথ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা ও নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

জাতিসংঘের প্রস্তাবনায় (Preamble) বলা হয়েছিল, জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হল 'আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জনের জন্য যুদ্ধের পথ গ্রহণ না করার দায়িত্ব স্বীকার করা।'

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং যুদ্ধের পথ পরিত্যাগ করার জন্য রাজনৈতিক দর্শনের স্তর যৌথ নিরাপত্তার আদর্শকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণ করার পাশাপাশি প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রে নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কিন্তু যৌথ নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণের ধারণা দুটি শেষ পর্যন্ত পরস্পর বিরোধী হয়ে ওঠে।

চুক্তিপত্রের আট নম্বর ধারা অনুসারে জাতিসংঘের সমস্ত সদস্য স্বীকার করে নিয়েছিল, আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার জন্য জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজন মিটিয়ে প্রতিটি রাষ্ট্রকে জাতীয় অস্ত্রের পরিমাণ নিম্নস্তরের হ্রাস করতে হবে। একদিকে, মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি জার্মানিকে নৈতিকভাবে প্রতিশ্রুতি দেয়, জার্মানির নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে তারাও সাধারণভাবে নিরস্ত্রীকরণের দিকে অগ্রসর হবে। অন্যদিকে, তারা এটাও মেনে নিল যে অস্ত্রের পরিমাণ কমানোর ক্ষেত্রে 'জাতীয় নিরাপত্তা'ই প্রধান বিবেচ্য। অধ্যাপক ই. এইচ. কারের মতে এই দুটি নীতির পরস্পর বিরোধিতাই নিরস্ত্রীকরণ তথা যৌথ নিরাপত্তার প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

১৯২২ সালে ফরাসি সরকার দাবি জানায় কেবলমাত্র ফ্রান্সের বাড়তি নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হলে সে যুদ্ধাস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস করবে। ১৯১৯ সালে পর থেকে ফ্রান্সের নিরাপত্তার দাবি আরও সম্প্রসারিত হয়েছিল। পূর্ব ও মধ্য ইয়োরোপে ফ্রান্সের অনুগত রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তাও ফ্রান্সের নিরাপত্তার অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। যৌথ নিরাপত্তার আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠনরূপে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায় ব্রতী হলেও, এক দশকের মধ্যেই যৌথ নিরাপত্তা ও জাতীয় নিরাপত্তার ধারণার আপাত বিরোধিতা এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্যবাহিনীর পরিমাণ সম্পর্কে মতপার্থক্যের ফলে, জাতিসংঘের কাজ দুরূহ হয়ে পড়ে।

যুদ্ধের বিষয়ে কেবলমাত্র আংশিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল বলেই যে জাতিসংঘ অকার্যকর হয়ে পড়ে তা নয়। একটি সুসংগঠিত কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অভাবেই এই ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ে।

লীগ কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত ছাড়াই স্বতঃসিদ্ধভাবে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা সম্ভব ছিল। তত্ত্বগতভাবে আশা করা হয়েছিল এর ফলে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অবিলম্বে যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে। কিন্তু বাস্তবে, তা সম্ভব হয়নি।

বিংশ শতকের বিশের দশকে ইয়োরোপের নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রশ্নে তিনটি প্রধান প্রবণতা লক্ষ করা যায়—জার্মান প্রজাতন্ত্র চেয়েছিল শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করতে, ফ্রান্স ও তার ইয়োরোপীয় মিত্ররা চেয়েছিল যে কোনও উপায়ে জার্মানির ওপর শান্তিচুক্তি সংক্রান্ত বাধ্য বাধকতাগুলি চাপিয়ে দিতে। ইংলন্ড আমেরিকার সমর্থন পুষ্ট হয়ে শান্তিচুক্তির আপত্তিজনক ধারাগুলি বাদ দিয়ে জার্মানির সঙ্গে আপোষ করতে চেয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগে ইংলন্ডের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জকে রক্ষা করা, তার সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা এবং সামুদ্রিক পথকে নিয়ন্ত্রিত করা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং শান্তিচুক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার প্রধান অন্তরায় দূর করেছিল। জার্মান সীমান্তের বাইরে জার্মানির প্রভাব বিস্তারের পথ রোধ হয়েছিল। অন্যদিকে রুশ সাম্রাজ্যের পতন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের দ্বিতীয় বাধা দূর করেছিল। পূর্ব এশিয়ায় জাপানের আগ্রাসন-আকাঙ্ক্ষা ইয়াংসি নদীর উত্তর দিকেই আবদ্ধ ছিল, কাজেই ইংলন্ডের সামুদ্রিক স্বার্থের একমাত্র প্রতিবন্ধক ছিল ফ্রান্স। একদিকে, সিরিয়া ও লেবাননে ফ্রান্সের নবলব্ধ অভিভাবকত্ব (mandate) ও তুরস্কের সঙ্গে ষড়যন্ত্র এবং অন্যদিকে, ইংলন্ড পূর্ব ভূমধ্যসাগরে নিজের একক প্রাধান্য বজায় রাখতে আগ্রহী হয়ে ওঠায় ইংলন্ড ও ফ্রান্স পরস্পরের শত্রু হয়ে ওঠে।

নিজের সাম্রাজ্য বজায় রাখার জন্য ইংলন্ড ইয়োরোপে শক্তিসাম্য বজায় রাখতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, সে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নৌশক্তি ও বিমানশক্তি বৃদ্ধিকে প্রাণপণে ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছিল।

স্বাভাবিকভাবে ২০-র দশকে ইংলন্ড বল প্রয়োগের দ্বারা পশ্চিম ইউরোপের ভৌমিক বিন্যাসকে রক্ষা করতে প্রস্তুত ছিল না। আবার, উল্টোদিকে সে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য জার্মান অগ্রগতিকেও মেনে নেয়নি। ইংলন্ড ও ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে উভয় দেশের গুরুতর মতপার্থক্য ছিল। ফরাসিরা চেয়েছিল ভার্সাই চুক্তিকে কঠোরভাবে বলবৎ করতে, তাদের ধারণা হয়েছিল কোনো একটি ধারাকে প্রত্যাহার করে নিলেই জার্মানির সংশোধনকারী প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। ফ্রান্সের তুলনায় জার্মানির জনসংখ্যা ও শিল্পের দিক থেকে বেশি শক্তিশালী হওয়ায় সে সহজেই ইয়োরোপের শক্তিসাম্যকে বিনষ্ট করতে পারবে।

অন্যদিকে, ইংলন্ডের নীতিনির্ধারকেরা বিশ্বাস করতেন, ভার্সাইচুক্তির আপত্তিজনক ধারাগুলি প্রত্যাহার করে নিলে জার্মানিকে সন্তুষ্ট করা যাবে। আর, ভার্সাইচুক্তিকে পুরোপুরি প্রয়োগ করলে জার্মানিতে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা,

রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সামরিক দিক থেকে নিরাপত্তাবোধের অভাব জার্মানিকে প্রতিহিংসা পরায়ণ করে তুলবে ; অর্থাৎ পরোক্ষভাবে যৌথ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।

ভার্সাই চুক্তির পাশাপাশি একই সময়ে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ফ্রান্সের একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুসারে জার্মানি বিনা প্ররোচনায় ফ্রান্সকে আক্রমণ করলে, ব্রিটেন ও আমেরিকা তৎক্ষণাৎ ফ্রান্সের সাহায্যে এগিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু মার্কিন সেনেট ভার্সাই চুক্তি ও লীগ কভেন্যান্ট অনুমোদন না করায় ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায়। জাতিসংঘের সনদ ছাড়া সম্ভাব্য জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের নিরাপত্তারক্ষার কোনো উপায়ই রইল না। সে লীগের অনুমতি ব্যতিরেকেই রাইনল্যান্ড ও রূঢ় দখল করে নেয়।

প্রসঙ্গক্রমে জাতিসংঘে অনুমোদিত নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিস্তারিত আলোচনা করা যায়। লীগ চুক্তিপত্রে ১০ নম্বর ধারা অনুসারে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কোনো সদস্য বিনা প্ররোচনায় আক্রান্ত হলে তারা আক্রান্ত রাজ্যটির অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করবে। যদি কোনো সদস্য রাষ্ট্র তার দায়িত্ব অগ্রাহ্য করে অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে ১৬ নম্বর ও ১৭ নম্বর ধারা অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। ইংলন্ড ১০ নম্বর ধারাটি অনিচ্ছা সহকারে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য আন্তর্জাতিক কমিটি গঠনের যে প্রস্তাব ফ্রান্স দিয়েছিল তা ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। সনদের ১৬ নম্বর ধারা অনুসারে যে কোনো আগ্রাসী রাষ্ট্রের সঙ্গে জাতিসংঘের সদস্যদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা ছিল বাধ্যতামূলক।

এই চুক্তিপত্রের কতকগুলি ত্রুটি ছিল। প্রথমত, কোনো রাষ্ট্রীয় বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নিতে গেলে লীগ পরিষদের 'সর্বসম্মত সুপারিশে'র প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়ত, এই সর্বসম্মত সুপারিশ গ্রহণ করা, বা না করা সদস্যদের ইচ্ছাধীন ছিল। তৃতীয়ত, জাতিসংঘের প্রায় জন্মলগ্নেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সদস্যপদ ত্যাগ করায় অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা (Sanction) বলবৎ করা বা কার্যকর হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই, যৌথ নিরাপত্তার মূল ভিত্তিই দুর্বল হয়ে যায়।

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে আহুত রাষ্ট্রসংঘের প্রথম অধিবেশনই বেশ কিছু রাষ্ট্র ১০ এবং ১৬ নম্বর ধারা সংশোধনের প্রস্তাব দেয়। আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দ্রুত সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার বাধাগুলি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কানাডা ১০ নম্বর অনুচ্ছেদটি বাতিল করতে চায়।

স্ক্যানডিনেভিয়ার প্রতিনিধিরা ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখিত অর্থনৈতিক অবরোধ বলবৎ করার ব্যাপারে কিছু কিছু ব্যতিক্রমের দাবি জানায়। ১৯২১ সালে ১৬ নম্বর ধারার বিষয়ে প্রায় উনিশটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর ফলে, কোনো আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করার ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। জনৈক ফরাসী সমালোচকের মতে "আদি ১৬ নম্বর ধারার মূল শক্তি খর্ব করে তার পরিবর্তে লীগকে অন্য কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।" ("The result which we are in danger of having obtained is to have ruined the strength of original Article 16, without putting anything in its place.") উৎস : Gathorne Hardy, *A Short History of International Affairs (1920-39*। পরের বছর সাধারণ সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হয়, জাতিসংঘই আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলবৎ করার তারিখ স্থির করে দেবে। ১৯২২ সালে উপস্থাপিত একটি প্রস্তাব অনুসারে স্থির হয়, "১০ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখিত দায়িত্ব পালন নির্ভর করবে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের সংবিধানগত অধিকারের

উপর।" পারস্যের নেতিবাচক ভোটের ফলে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। ১০ নম্বর এবং ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদ দুটি আনুষ্ঠানিকভাবে সংশোধন না করা হলেও স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সঙ্কটের সময় এই অনুচ্ছেদ দুটি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা সহজ হবে না এবং জেনিভার কার্যনির্বাহক সভা কোনো দ্রুত সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনে আগ্রহী নয়।

এই পরিস্থিতিতে, গ্রেট ব্রিটেন ও ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের সদস্যদের কাছে লীগ প্রধানত আলাপ আলোচনার ক্ষেত্র এবং আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলার উপায় হয়ে ওঠে। তাদের মতে, চুক্তিপত্র যেভাবে স্বাক্ষরকারীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, তা একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়। ফলত, যে যৌথ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে জাতিসংঘ গড়ে উঠেছিল তা ক্রমশ মরীচিকায় পর্যবসিত হয়। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে শেষ পর্যন্ত নিজ নিজ নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব সামরিক শক্তি এবং মিত্র রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির ওপরেই নির্ভর করতে হয়েছিল।

যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় আস্থাশীল হওয়া এবং জোটবদ্ধতাকে নিরাপত্তারক্ষার প্রধান হাতিয়ার বলে মনে করার ফলে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি প্রায় প্রাক্-যুদ্ধ অবস্থায় ফিরে যায়। ১৯২২ সালে লর্ড রবার্ট সিসিল টেম্পোরারি মিক্সড্ কমিশনের সামনে চারটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন।

(ক) অস্ত্র হ্রাস পরিকল্পনাকে সফল করে তুলতে গেলে সাধারণভাবে সকলকেই এই পরিকল্পনাকে গ্রহণ করতে হবে।

(খ) নিরাপত্তারক্ষার প্রতিশ্রুতির ওপরেই অস্ত্রহ্রাস নির্ভর করবে।

(গ) নিরাপত্তার এই প্রতিশ্রুতি (guarantee) সকলের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য।

(ঘ) অস্ত্রহ্রাস সম্পর্কিত মুচলেকার ভিত্তিতেই এই ধরনের প্রতিশ্রুতি গড়ে ওঠা সম্ভব।

লীগের সাধারণ সভায় এই প্রস্তাবগুলি আলোচিত হবার পর লর্ড রবার্ট সিসিল ও কলোনেল রিকুইন (Col. Requin), যিনি তৃতীয় প্রস্তাবটির কঠোর সমালোচক ছিলেন, দুই জনে দুটি খসড়া প্রস্তাব জমা দেন। এই দুটি খসড়ার ভিত্তিতেই Draft Treaty of Mutual Assistance রচিত হয়।

খসড়া চুক্তিটি একটি সাধারণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে আঞ্চলিক মৈত্রী ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে, এই সমন্বয়ের মৌলিক ত্রুটি তুলে ধরে। একটি আক্রমণাত্মক যুদ্ধের (যা আন্তর্জাতিক আইনে অপরাধ বলে পরিগণিত) সম্মুখীন কোনো সদস্যকে সাহায্য করার দায়িত্ব প্রতিটি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রের, কিন্তু স্থলযুদ্ধ, নৌযুদ্ধ বা বিমান যুদ্ধের অধিকার কয়েকটি মুষ্টিমেয় ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের কুক্ষিগত ছিল। আক্রমণকারীকে চিহ্নিত করার দায়িত্ব জাতিসংঘের ওপর ন্যস্ত হলেও স্বেচ্ছায় আঞ্চলিক মৈত্রী ব্যবস্থা গড়ে তোলার অনুমোদন ছিল। তবে আঞ্চলিক মৈত্রী জোট ক্ষমতার অপব্যবহার করলে তাদের আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত করে লীগ তাদের শাস্তি দিতে পারত। এইভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছাড়া, অন্য কোনো কারণে গঠিত মৈত্রীজোটের সম্ভাবনা রোধ করা হয়। শাস্তিদানের দায়িত্ব প্রধানত ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির হাতে তুলে দেওয়ায় ইংলন্ড ও তার অধীনস্থ ডোমিনিয়নের ভূমিকার ক্ষেত্রে এক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়। ইংলন্ডের সাম্রাজ্য জগৎ-জোড়া। এই জগৎ-জোড়া সাম্রাজ্যের একাংশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে অথচ অন্য অংশে শান্তি বজায় থাকলে যে পরস্পর বিরোধিতার সৃষ্টি হত, তা এড়ানোর জন্য ইংলন্ড এই চুক্তির বিরোধিতা করে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার নিরপেক্ষ দেশগুলির আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত এই চুক্তি পরিত্যক্ত হয়।

২.২.১ জেনিভা প্রটোকল ও তার ব্যর্থতা

উপরোক্ত খসড়াচুক্তির আলোচনা মধ্যে দিয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি যৌথ নিরাপত্তার মূল সমস্যায় পৌঁছতে পেরেছিল। যৌথ নিরাপত্তা যে অস্ত্রহ্রাসের প্রথম পদক্ষেপ নয়, এটি যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান ভিত্তি, তা নীতিগতভাবে সব রাষ্ট্র মেনে নেয়। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব খসড়াচুক্তির ভস্মরাশি থেকেই একটি বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। পদ্ধতিগতভাবে, লীগের নিয়ন্ত্রণেই ফিরে যাওয়া হয়—লীগের নেতৃত্বেই পুনরায় শান্তিরক্ষা এবং আগ্রাসন প্রতিহত করার উপযুক্ত উপায় অনুসন্ধান করা হয়। জাতিসংঘের ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য গ্রীস ও চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধিরা ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে লীগের সাধারণ সভার পঞ্চম অধিবেশনে একটি দলিল পেশ করে। এই দলিলটির নাম, "Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes" (আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার খসড়া চুক্তি)।

ম্যাকডোনাল্ড ও এরিয়র উপস্থিতিতে এই খসড়া প্রস্তুত হয়। এই চুক্তিপত্রের মাধ্যমে জাতিসংঘের সনদেও সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। এছাড়া, বাধ্যতামূলক সালিশের মাধ্যমে যৌথ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়। ১৯২৪ সালের ২রা অক্টোবর প্রটোকলটি উপস্থাপিত হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই প্রায় ১৭টি দেশের সদস্য এতে স্বাক্ষর করে।

জেনেভা প্রটোকলে আক্রমণাত্মক যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। প্রথমত, দলিলে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র কখনই পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক আইন বা চুক্তির শর্ত ব্যাখ্যার ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা দিলে তা আন্তর্জাতিক আদালতে পাঠান হবে। তৃতীয়ত, সমস্ত বিরোধকে লীগ কাউন্সিলের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। চতুর্থত, লীগ কাউন্সিল কোনো বিরোধের মীমাংসা সম্বন্ধে একমত না হতে পারলে সালিশের কাছে পাঠান হবে। এই সালিশের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। পঞ্চমত, শান্তিপূর্ণ পন্থাগুলি যে অস্বীকার করবে তাকে আক্রমণকারী বলে চিহ্নিত করা হবে। ষষ্ঠত, আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, এমনকি প্রয়োজনবোধে সামরিক ব্যবস্থাও প্রয়োগ করা হবে। কোনো রাষ্ট্র নিজের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধ করলে লীগ কাউন্সিল তাকে সমর্থন করবে এবং সামরিক সাহায্য দেবে। সপ্তমত, যুদ্ধ সৃষ্টির শাস্তি হিসাবে আক্রমণকারী রাষ্ট্রের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। অষ্টমত, ১৯২৫ সালের ১৫ জুনের মধ্যে নিরস্ত্রীকরণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রস্তুতি সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশেষে, প্রয়োজন বোধে বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসম্বাদে হস্তক্ষেপ করার অধিকারও লীগ কাউন্সিলকে দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তিস্থাপন ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ জেনেভা প্রটোকল লীগের সনদের নানা ত্রুটি ও দুর্বলতা ছিল যেমন কোনো বিবাদে কাউন্সিল একমত না হলে, অথবা কোনো বিবাদ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে নির্ধারিত হলে, যুদ্ধ আটকানো যেত না। এই ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলি সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রথমত, এই প্রটোকল আক্রমণের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে তা স্থির করার চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ত, কোনো সমস্যার সমাধানে লীগ ব্যর্থ হলে কি উপায় অবলম্বন করা হবে সে বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশ ছিল না। জেনেভা প্রটোকল এইসব ক্ষেত্রে সালিশির প্রস্তাব করেছিল। সালিশির সিদ্ধান্তকেই সব রাষ্ট্রকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। তৃতীয়ত, আভ্যন্তরীণ সমস্যা সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করার জন্যও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র লীগের কাছে আবেদন জানাতে পারত। চতুর্থত, এই প্রথম নিরস্ত্রীকরণকে যৌথ নিরাপত্তার অঙ্গরূপে

দেখা হয়। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির ঐকান্তিক প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয়েছিল জেনেভা সম্মেলনে। ইয়োরোপীয় কূটনৈতিকরা শেষ পর্যন্ত যৌথ নিরাপত্তা অর্জনের সঠিক পথে পা বাড়িয়েছিলেন। কেবলমাত্র অস্ত্রহ্রাসের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবেই নয়, যৌথ নিরাপত্তা যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র ভিত্তি—তা নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। ("The paramount importance of security, not only as a preliminary step to any considerable limitation of armaments, but also as the only foundation on which a durable peace could be established, had been generally recognized.")

জেনেভা প্রটোকলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু কিছু আপত্তি উঠতে পারে। অধ্যাপক গ্যাথোর্ন হার্ডি দেখিয়েছেন, জেনেভা প্রটোকলে নির্ধারিত পদ্ধতি সব সময়ে সালিশির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা সম্ভব ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ, পোলিশ করিডরের বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। আইনের দিক থেকে আলোচ্য ভূখণ্ডে পোলান্ডের দাবি অবিসম্বাদিত। কাজেই এই বিষয়ে নিষ্পত্তি করার একমাত্র বিকল্প আপোষ-রফা। কিন্তু আপোষ-রফা, একপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও অপরপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য না হবার সম্ভাবনা থেকে গিয়েছিল। জার্মান রাজ্যের সঙ্গে পূর্ব প্রাশিয়াকে সংযুক্ত করতে গেলে পোলান্ডকে সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হ'ত। উত্তর থেকে দক্ষিণের পরিবর্তে পূর্ব থেকে পশ্চিমে একটি পথ গড়ে উঠত—যে পথ পোলান্ডের কাছে গ্রহণযোগ্য হত না। এই ক্ষেত্রে প্রটোকল নিরাপত্তা সমস্যার কোনো নতুন সমাধান দিতে পারেনি। সেই কারণেই শেষ পর্যন্ত এই প্রটোকলটি ব্যর্থ হয়েছিল।

১৯২৪ সালে এই প্রটোকলটি গৃহীত হলেও পরের বছর বসন্তকালে এই প্রকল্পটির মৃত্যু ঘটে। ইয়োরোপের ছোট ছোট দেশগুলি নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রটোকলকে সমর্তন জানালেও ইংলন্ড ও তার অধীনস্থ ডোমিনিয়নগুলি বিভিন্ন কারণে এই প্রটোকলে আপত্তি জানায়।

১৯২৪ সালের নভেম্বর মাসে লেবর সরকারের কর্ণধার এবং জেনেভা প্রটোকলের মুখ্য প্রবক্তা মাকডোনাল্ড সরকারের পতন ঘটে এবং রক্ষণশীল সরকার কায়েম হয়। এই সরকার মির ও রাশিয়ার সমস্যা নিয়ে বিব্রত থাকায় প্রটোকল অনুমোদনের বিষয়ে সময় প্রার্থনা করে এবং শেষ পর্যন্ত প্রটোকলের শর্তগুলি মেনে নিতে অস্বীকার করে।

প্রটোকলের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এসেছিল সমুদ্রপারের ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলির কাছ থেকে। ইয়োরোপের ঝটিকাকেন্দ্র থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার ফলে ব্রিটিশ ডোমিনিয়নযুক্ত রাজ্যগুলি কোনো সামরিক বা অর্থনৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেশী রাষ্ট্র কানাডা মার্কিন বিচ্ছিন্নতাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কানাডার রাষ্ট্রদূত ডাণ্ডুরান্ডের (Dandurand) মন্তব্যে প্রটোকলের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—"এই অগ্নি নিরোধক বীমায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সদস্য দেশের ঝুঁকি সমান নয়। দাহ্য পদার্থ থেকে বহু দূরে আগুনের বিপদমুক্ত একটি গৃহে আমরা বাস করি।" (In the association of mutual insurance against fire, the risks assumed by the different states are not equal. We live in a fire-proof house far from inflammable materials") অর্থাৎ, প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ জড়িত না থাকলে কোনও দেশই যৌথ নিরাপত্তা রক্ষীর দায়িত্ব পালনে আগ্রহী ছিল না।

লীগের একাদশ ধারা অনুসারে লীগ কাউন্সিলকে কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানে হস্তক্ষেপ করার যে অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তা কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের মনঃপুত হয়নি।

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ সামরিক সাহায্য দিতে অস্বীকার করে। তাদের আশঙ্কা ছিল এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডে সঙ্কট ছড়িয়ে পড়লে, তাদের ওপর সামরিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনের বোঝা নেমে আসবে। বিশেষত, তাদের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ ঘটবে বলে তারা অনুমান করেছিলেন। বাধ্যতামূলকভাবে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের নীতি ও আক্রমণকারী দেশকে যৌথভাবে শাস্তিদানের নীতি মেনে নিতে অধিকাংশ দেশই প্রস্তুত ছিল না।

লীগের মাধ্যমে যৌথ নিরাপত্তা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় ফ্রান্স জার্মানির সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে নিরাপত্তা সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করে। জেনেভা প্রটোকলের মাধ্যমে আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সার্বিক প্রতিরোধের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় আঞ্চলিক ভিত্তিতে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

আঞ্চলিক স্তরে নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার জন্য জার্মানি ফ্রান্সের কাছে ১৯২২, ১৯২৩, ১৯২৪ সালে বারংবার পারস্পরিক সমঝোতার প্রস্তাব করে। কিন্তু ফ্রান্স তা মেনে নেয়নি। তখন সে তার নিজস্ব মৈত্রী ব্যবস্থা গড়ে তোলায় ব্যস্ত ছিল। এর পরবর্তী পর্যায়ে সে তার প্রতিপক্ষ জার্মানির সঙ্গে আপোষ মীমাংসার নীতি গ্রহণ করে।

ইতিমধ্যে, ১৯২৩ সালে গুস্তাভ স্ট্রেসেসম্যান জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। তিনি তার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির দ্বারা অনুভব করেছিলেন, সামরিকভাবে দুর্বল জার্মানিকে ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে স্থান করে নিতে হলে সূক্ষ্ম কূটনৈতিক পরিকল্পনার আশ্রয় নিতে হবে। তিনি সঠিকভাবে অনুমান করতে পেরেছিলেন, ইংলন্ড পশ্চিম ইয়োরোপে ফ্রাঙ্কো-জার্মান দ্বন্দ্বের শান্তি পূর্ণ মীমাংসায় আগ্রহী। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক সমস্যা এবং কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতার আশঙ্কায় ক্লিষ্ট ফ্রান্স, জার্মানির সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে নেবার জন্য ইংলন্ডের অনুরোধে সাড়া না দিয়ে পারবে না।

জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এমন একটি প্রস্তাব দেন যাতে ফ্রান্সের নিরাপত্তার নিম্নতম দাবি মেনে নিয়েও জার্মানি বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তার লক্ষপূরণ করতে পারবে। ফ্রান্স চেয়েছিল জার্মানি পশ্চিম ইয়োরোপে স্থিতাবস্থা এবং রাইনের বেসামরিকীকরণ মেনে নেবে এবং এই দুটি ব্যাপারে ইংলন্ড দায়িত্বশীল থাকবে। শেষ পর্যন্ত ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে সুইজারল্যান্ডের লোকার্নো শহরে ফ্রান্স, ইংলন্ড জার্মানি, ইতালি এবং বেলজিয়াম-জার্মানি সীমান্ত স্বীকৃত হয়। একদিকে জার্মানি এবং অন্যদিকে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোলান্ডের মধ্যে সালিশি চুক্তি সম্পাদিত হয়। একদিকে ফ্রান্স এবং অন্যদিকে চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোলান্ডের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব গ্রহণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯২৫ সালের ১ ডিসেম্বর লন্ডনে এই চুক্তিগুলি বিধিবদ্ধ হয়। রাইনল্যান্ডের বেসামরিকীকরণ স্বীকৃত হয়।

সর্বত্র লোকার্নো চুক্তিকে স্বাগত জানান হয়। জার্মান, ফরাসি এবং ইংরেজ কূটনৈতিকরা এক সঙ্গে পান-ভোজন করলেন। ভার্সাই পরবর্তী ছয় বছরের তিক্ততার সাময়িক অবসান ঘটল। ব্রিঁয়াকে শান্তির দেবদূত (Archangel of peace) বলে অভিনন্দন জানান হয়।

লোকার্নো চুক্তির আপাত উচ্ছ্বাসের আড়ালে লুকিয়েছিল এর ত্রুটিগুলি। প্রথমত, জার্মানি তার পশ্চিম সীমান্তকে স্বেচ্ছায় স্বীকৃতি দেবার পরই সেই সীমান্ত রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করল। অর্থাৎ প্রমাণিত হল, জার্মানির উপর চাপিয়ে দেওয়া দায়িত্বের তুলনায়, স্বেচ্ছা আরোপিত দায়িত্বের নৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, গ্রেট ব্রিটেন যেভাবে কিছু সীমান্তরক্ষার দায়িত্ব স্বীকার করেছিল আবার কিছু সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব অস্বীকার করেছিল, তাতে অনুমান করা যায়, ইংলন্ডের কাছে নিরাপত্তার দিক থেকে বিভিন্ন সীমান্তের গুরত্বের তারতম্য ছিল। পশ্চিম ইয়োরোপে স্থিতাবস্থা রক্ষায় আগ্রহী হলেও ইংলন্ড পূর্ব ইয়োরোপের ভৌমিক সীমান্ত

রক্ষায় বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিল না। তৃতীয়ত, জার্মানির পশ্চিম সীমান্তকে অলঙ্ঘনীয় বলে মনে নিলেও ব্রিঁয়া বা চেম্বারলেন জার্মানির কাছ থেকে পূর্ব সীমান্তের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করেন নি। জার্মান বিদেশমন্ত্রী পোলান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে জার্মানির সীমানাকে অপরিবর্তনীয় বলে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অর্থাৎ, জার্মানি ভবিষ্যতে পূর্ব সীমান্ত লঙ্ঘন করার পথ উন্মুক্ত রেখেছিল। চতুর্থত, চেকোশ্লোভাকিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেনি বলে, তাদের গভীর আশঙ্কা হয় যে তাদের স্বার্থহানির বিনিময়ে পশ্চিমি দেশগুলি জার্মানির সঙ্গে আপোষ-রফা করে নিচ্ছে। সব মিলিয়ে প্রমাণ হয় যে, স্বেচ্ছায় দায়িত্ব স্বীকার না করলে ভার্সাই চুক্তি কার্যকর করা সম্ভব হবে না।

বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার সুযোগে জার্মানি ভার্সাই চুক্তি অন্তর্গত নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত ধারা পালনের কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি। এই সময় জার্মানিকে তোষণ করার জন্য ইংলন্ড ও ফ্রান্স জার্মানিকে বহু সুযোগ দিয়েছিল।

ফরাসি মন্ত্রী ব্রিঁয়া ফরাসি-জার্মান সীমান্তরক্ষা সম্পর্কে ইংলন্ডের নজরদারির প্রতিশ্রুতি অর্জন করলেও শেষ পর্যন্ত এই প্রতিশ্রুতি নিতান্ত অর্থহীন হয়ে পড়ে। তবে, ইংলন্ড নিরপেক্ষ জামিনদার (guarantor) হিসাবে কোনো পক্ষকেই সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণে উৎসাহিত করেনি।

লোকার্নো চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরই জার্মানি লীগের সদস্যপদ লাভ করে। জার্মানি এবং অন্যান্য দেশের সেনাবাহিনী কুচকাওয়াজে ব্যস্ত নয়, আন্তঃমিত্রপক্ষীয় ঋণশোধ শুরু হয়েছে, উৎপাদনের পরিমাণ এবং চাকরি পাবার অনুপাত প্রায় প্রাক্-বিশ্বযুদ্ধ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এই বন্ধুত্বপূর্ণ পরিস্থিতে জার্মানিকে জয়ী মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিদের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে ব্রিঁয়া মন্তব্য করেছিলেন, 'আজ থেকে নারীরা উদ্বেগমুক্ত হৃদয়ে ছোট শিশুদের দিকে তাকাতে পারবেন।' ("From this day forth women will be able to fix their eyes to little children without feeling their hearts torn by anxiety.")

ব্রিঁয়া যে লোকার্নো চেতনায় আন্তরিকভাবে উদ্বুদ্ধ হননি, তাঁর পরবর্তী কার্যকলাপ থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নবলব্ধ ফরাসি-জার্মান নৈকট্যের নীতির পরিপূরকরূপে ব্রিঁয়া ফ্রান্সের কূটনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে আরম্ভ করেন। তিনি অনুমান করেছিলেন, একদিন না একদিন স্টেসম্যানের সমঝোতা নীতি পরিত্যক্ত হবে। এ ব্যাপারে ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বামপন্থীদের কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থীদের প্রতিক্রিয়ায় প্রভাব-বিস্তার করেছিল।

লোকার্নো চুক্তির পরেও লীগ নিরাপত্তা স্থাপনের চেষ্টা করেছিল। ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে বহু নতুন প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। ১৯২৬ সালে ফিনল্যান্ডের প্রতিনিধিরা প্রস্তাব করে আক্রান্ত রাষ্ট্রকে লীগের সদস্যরা সহজ শর্তে ঋণ দেবে। ১৬ নম্বর ধারা অনুসারে আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যেমন অর্থনৈতিক বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, এটি তার বিপরীত ধারণা। কিন্তু এই ধারণাটি নিরস্ত্রীকরণ কনভেনশনের পরিপূরক হওয়ায়, এটি প্রস্তাবের স্তরেই থেকে যায়।

১৯২৭ সালে নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা বারে বারে বাধাগ্রস্ত হয়। তখন জেনেভা প্রটোকলকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রস্তাব ওঠে। ১৯২৭ সালে সাধারণ সভার অধিবেশনে পোলান্ডের প্রতিনিধিরা ঘোষণা করেন, "সব রকমের আক্রমণাত্মক যুদ্ধকে বর্তমানে এবং চিরতরে নিষিদ্ধ করা হবে।" এই ঘোষণা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১৯২৭ ও ১৯২৮ সালের মধ্যে সাধারণ সভার নিরাপত্তা ও সালিশি সংক্রান্ত কমিটি অক্লান্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে কাজ শুরু কের। নরওয়ের প্রতিনিধি প্রস্তাব করে, জেনেভা প্রটোকটেলর মতো একটি ব্যাপক ব্যবস্থা জাতিসংঘের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত না করে কতকগুলি আদর্শচুক্তির খসড়া রচনা

অনেক বেশি কার্যকর। এই আদর্শ চুক্তিগুলি যুগ্মভাবে দুটি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোট কর্তৃক গৃহীত হতে পারে। প্রাগ্রসর রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে সালিশি চুক্তি সম্পাদন করতে পারে। অনগ্রসর রাষ্ট্রগুলি আইনগত বিরোধগুলি সালিশিতে পাঠাতে পারে। যারা বাধ্যতামূলক সালিশি মানতে প্রস্তুত নয় তারা অন্য কোনো পদ্ধতি মেনে নিতে পারে। ১৯২৮ সালে এ-ধরনের প্রায় দশটি আদর্শ চুক্তির খসড়া পেশ হয়।

আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসার জন্য তিনটি অধ্যায় রচিত হয়। প্রথম অধ্যায় বলা হয় প্রত্যেকে যুগ্ম স্বাক্ষরকারী একটি স্থায়ী মীমাংসা কমিটি গঠন করবে, এই কমিশন পারস্পরিক বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য গ্রহণযোগ্য সূত্র সুপারিশ করবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সব আইনগত বিবাদ আন্তর্জাতিক আদালতের সামনে পেশ করার প্রস্তাব করা হয়। এই আদালতের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া বাধ্যতামূলক। তৃতীয় অধ্যায়ে আইন বহির্ভুত বিবাদগুলি একটি সালিশি কমিটিতে পাঠাতে বলা হয়। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র এক বা একাধিক অধ্যায় মেনে নিতে পারবে। এমন কি, তারা ইচ্ছে করলে কোনো বিশেষ ধরনের বিবাদকে এর আওতার বাইরে রাখতে পারে।

নিরাপত্তা সংক্রান্ত সব রকমের সমস্যা মেটানোর পক্ষে এই ব্যবস্থা যথেষ্ট নমনীয় হলেও আইনটির উল্লেখযোগ্য সাফল্য ঘটেনি। প্রথম অধ্যায়ের প্রস্তাব নতুন কিছু ছিল না। এর আগেই লোকার্ন চুক্তি ও অন্যান্য চুক্তিটি মীমাংসা কমিশন গঠনের প্রস্তাব ছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বক্তব্যতেও নতুন কিছু ছিল না। তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখযোগ্যভাবে লীগ কাউন্সিলকে বাদ দিয়ে কাজ করার কথা চিন্তা করা হয়। ১৯২৮ সালের মধ্যে কেবলমাত্র বেলজিয়াম, নরওয়ে, ডেনমার্ক এবং ফিনল্যান্ড এই অধ্যায়গুলি মেনে নেয়। হল্যান্ড ও সুইডেন শুধু প্রথম দুটি অধ্যায় মেনে নেয়।

(লোকার্নো চুক্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী পর্যায়ে পাবেন।)

২.২.২ প্যারিসের চুক্তি (কেলগ ব্রিঁয়া প্যাক্ট ১৯২৮)

লোকার্নো চুক্তির পরেও ব্রিঁয়া ফরাসি-জার্মান দ্বিপাক্ষিক মৈত্রীকে (detente) শক্তিশালী করে তোলার জন্য অন্যান্য শক্তির সাহায্য ও সমর্থন পাবার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ, ইয়োরোপের শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে দ্বি-পাক্ষিক মৈত্রীর গুরুত্ব ছিল অনস্বীকার্য। ১৯২৭ সালের ৬ই এপ্রিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার যোগদানের দশ বছর পূর্তিসূচক অনুষ্ঠানে মার্কিন জনগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গিয়ে ফরাসি বিদেশ মন্ত্রী যুদ্ধের পথ পরিত্যাগ করার উদ্দেশ্যে দুই দেশের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তির প্রস্তাব করেন। ব্রিঁয়া আশা করেছিলেন এই চুক্তির স্বাক্ষরকারী হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইয়োরোপে ফ্রান্সের নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করে তুলবে। কিন্তু, এ সময়ে ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাতের কোনো ক্ষীণ সম্ভাবনাও ছিল না। কাজেই মার্কিন রাষ্ট্রসচিব ফ্রাঙ্ক কেলগ এই প্রস্তাবকে নিতান্ত শীতলভাবে গ্রহণ করেন। প্যারিসে উইলসন প্রস্তাবিত ভেঙে যাওয়া ফরাসি-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার কোনো ইচ্ছা কেলগের ছিল না। কিন্তু শান্তিকামী মার্কিন জনমত ব্রিঁয়ার এই প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের সুযোগ খুঁজে পেয়েছিলেন। এই জনমতের চাপে পড়ে কেলগকে শেষ পর্যন্ত ফরাসি আহ্বানে সাড়া দিতে হয়। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কেলগ প্যারিসে একটি শান্তি প্রস্তাব পাঠান। এই প্রস্তাবে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিটিকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি আন্তর্জাতিক ঘোষণায় পরিণত করার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়।

সন্ত্রস্ত ফরাসি কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা হল এই চুক্তি লোকার্নোর মতো আঞ্চলিক চুক্তির যৌক্তিকতা নাকচ করে দেবে। কারণ লোকার্নোতে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সামরিক হস্তক্ষেপের

অধিকার দেওয়া হয়েছিল। অথচ এই ঘোষণায় কোনো নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতিদানের বাধ্য বাধকতা ছিল না। এর আগেও, ক্লেমেসোঁ চেয়েছিলেন জার্মানিকে শান্তিচুক্তির শর্তগুলি মানতে বাধ্য করা হোক। অথচ উইলসন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সার্বজনীন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। ব্রিঁয়াকেও ফ্রান্স ও আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক চুক্তির পরিবর্তে বহুদেশীয়, যুদ্ধবর্জন সংক্রান্ত ঘোষণা মেনে নিতে হয়। এই ঘোষণায় কোনো নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ অথবা অন্য বাধ্যবাধকতা ছিল না।

১৯২৮ সালের ২৭ আগস্ট ছয়টি বৃহৎ শক্তির প্রতিনিধিরা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও জাপান) তিনটি লোকার্নো চুক্তিভুক্ত দেশ (বেলজিয়াম,. পোলান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া) এবং ব্রিটিশ স্বশাসিত উপনিবেশগুলি ও ভারত প্যারিসে মিলিত হয়ে চুক্তিটি স্বাক্ষর করে। বিশ্বের অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রকেও এই চুক্তিতে যোগ দেবার আহ্বান জানান হয়। কেবলমাত্র, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, সৌদি আরব ও ইয়েমেন এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে।

চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে ‘পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতীয় নীতি রূপে যুদ্ধ বর্জন’-এর প্রতিশ্রুতির তাৎপর্য সম্পর্কে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে পত্রালাপ হয়েছিল। কার্যত, এই চুক্তির দ্বারা আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধঘোষণা নিষিদ্ধ হয়নি। আবার, কোনো পরিস্থিতিতেই প্রতিরোধ না করার চূড়ান্ত শান্তিকামী নীতিও এটি ছিল না। গ্রেট ব্রিটেন, তার আত্মরক্ষার অধিকারের সঙ্গে বিশ্বের কয়েকটি অঞ্চলের নিরাপত্তাকে যুক্ত করেছিল। কারণ, তার শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে আলোচ্য অঞ্চলগুলির ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আত্মরক্ষার অর্থ *মনরো নীতি লঙ্ঘিত হলে তার প্রতিকার করা। এই নানাধরনের ব্যাখ্যার ফলে চুক্তিটির সার্বজনীন চরিত্র বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। অনেকেই এই চুক্তিটিকে নিতান্ত নীতিগত ঘোষণা বলে মনে করেছিলেন, চুক্তিগত দায়বদ্ধতা স্বীকার করেননি। প্রতিটি রাষ্ট্র নিজেই, নিজের কাজের একমাত্র বিচারক ছিল। চুক্তিটির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের উপযুক্ত কোনো সংস্থা স্থাপিত হয়নি।

নানাদিক থেকে অসম্পূর্ণ হলেও যৌথ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্যারিস চুক্তি ছিল এক বিরাট পদক্ষেপ। ইতিহাসে এটিই ছিল প্রায় সার্বজনীন রাজনৈতিক চুক্তি। মনরো নীতি উল্লেখিত হওয়ায় আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের মতো দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যগুলি ক্ষুব্ধ হয়ে দূরে সরেছিল। এই সামান্য ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রায় ৬৫টি দেশ এই চুক্তি অনুমোদন করেছিল।

লীগের সদস্য সংখ্যার চেয়ে এই সংখ্যাটি ছিল সাতজন বেশি। এমনকি, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথমে ইতস্তত করলেও পরে এত উৎসাহিত হয়ে পড়ে যে, পারিস চুক্তি সাধারণভাবে স্বীকৃত হবার আগেই তারা প্রতিবেশীদের সঙ্গে এটি কার্যকর করার জন্য একটি আলাদা চুক্তি প্রস্তাব করে এবং তা সম্পাদন করে। এই চুক্তির কার্যকারিতায় পুরোপুরি আস্থাশীল না হয়েও, অনেক রাষ্ট্র মতৈক্যে আসার জন্যই এতে যোগ দেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধকে বেআইনী (Outlawry of war) ঘোষণা করেছিল। অর্থাৎ একটি বিশ্বজননী অলিখিত বিধানের দ্বারা যুদ্ধকে দোষণীয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই আইন লঙ্ঘনের শাস্তি দেবার বা আইন লঙ্ঘিত হয়েছে কিনা তা স্থির করার কোনো দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ ছিল না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিশ্বের রাজনৈতিক চেতনায় এই মূল্যবোধ গভীর রেখাপাত করেছিল।

---

* মনরো নীতি : মার্কিন মহাদেশে অপর কোন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করার নীতি। ১৮২৩ সালে প্রেসিডেন্ট মনরো এই নীতি প্রবর্তন করেন। (*America for the Americans*)

প্যারিস চুক্তির উৎসাহব্যঞ্জক অনুমোদন জাতিসংঘের যৌক্তিক অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। লীগের চুক্তিপত্রে জাতীয় নীতির হাতিয়ার রূপে যুদ্ধের ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়নি। কোনো সদস্য কি অবস্থায় বৈধ যুদ্ধের পথে কতদূর অগ্রসর হতে পারবে, তার সীমা সঙ্কুচিত করাই ছিল জাতিসংঘের রচয়িতাদের লক্ষ্য। প্যারিসের চুক্তির মাধ্যমে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলি আত্মরক্ষা ছাড়া অন্য কোনো কারণে যুদ্ধের পথ অনুসরণ না করার অঙ্গীকার করে। এই নুতন দায়বদ্ধতা চুক্তিপত্রের অঙ্গীভূত করে চুক্তিপত্রকে আরও শক্তিশালী করে তোলা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৯২৯ সালে ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা ও ব্যাপারে অনেকগুলি প্রস্তাব আনেন।

বিষয়টি কার্যকর করা যতটা সহজ মনে হয়েছিল, ততটা সহজ ছিল না। প্যারিস চুক্তি ছিল একটি যুদ্ধবিরোধী নৈতিক ঘোষণা, অথচ চুক্তিপত্রটি ছিল একটি রাজনৈতিক চুক্তি। প্যারিস চুক্তি সকল প্রকার যুদ্ধের নিন্দা করেছিল, কিন্তু কোনো শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেননি। অন্যদিকে চুক্তিপত্রটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুদ্ধ মেনে নিয়েছিল এবং অন্যগুলিকে নিষিদ্ধ করেছিল ; এবং নিষিদ্ধ যুদ্ধগুলির জন্য শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। এই দুই ভিন্নধর্মী ব্যবস্থাকে সংযুক্ত করা এবং কার্যকর করা ছিল অত্যন্ত দুঃসাধ্য। লীগের চুক্তিপত্রে, প্যারিস চুক্তির শর্তগুলি সংযোজিত করলে, এক ক্ষেত্রে যুদ্ধকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ আবার অন্য ক্ষেত্রে তা অনুমোদন করতে হ'ত। অর্থাৎ যুদ্ধ নিষিদ্ধ হলেও, মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে তা শাস্তি যোগ্য হত। এই নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে পড়ত এবং অবলীলায় চুক্তিপত্রের কিছু অংশ লঙ্ঘন করা সম্ভব হত। জাপান ও ইতালি অনতিবিলম্বে এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করতে শুরু করেছিল, একজন পুলিশী তৎপরতার সূক্ষ্ম ছদ্মবেশে, অন্যজন আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অজুহাতে।

আক্রমণ ঘটলে একটিমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা রইল ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদ ব্যবহার করে, কেবলমাত্র জাতিসংঘ উল্লিখিত নিষিদ্ধ যুদ্ধগুলি নয়, প্যারিসের চুক্তিতে যে সব যুদ্ধকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সেইসব ক্ষেত্রেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এইভাবে একই সঙ্গে চুক্তিপত্রকে জোরদার করা এবং প্যারিস চুক্তির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হত। ১৯২৯ সালে এই ধরনের প্রস্তাব ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা করেছিল। ফরাসি প্রতিনিধিরা তা আন্তরিকভাবে সমর্থন করে। কিন্তু এ ব্যাপারে, একটি আশঙ্কা থেকেই গেল। ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদের সম্প্রসারণ করলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে দায়িত্ব বেড়ে যেত।

হয়ত, ১৯২৯ সালে পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলি যৌথ নিরাপত্তার কারণে এই প্রস্তাব মেনে নিত। কিন্তু এই বিষয়ে আলোচনা ১৯৩০ সালের সংসদীয় অধিবেশন পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হয়। এই অবকাশে নানা সংশয়ের উদয় হয়। জাপান ও স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশগুলির কাছ থেকে এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা আসে। এই আপত্তি সত্ত্বেও, সংশোধনগুলির গৃহীত হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু গৃহীত সংশোধনগুলির চূড়ান্ত অনুমোদন করা যেত কিনা সন্দেহ। যাই হোক, পরবর্তী সংসদের বিবেচনার জন্য সংশোধনী প্রস্তাবটিকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ গ্রেট ব্রিটেন এক গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কটে ডুবে যায় এবং সেখানকার সরকার পাল্টে যায়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি চাপা পড়ে যায়।

এইভাবে জাতিসংঘের মাধ্যমে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পথে শেষে পদক্ষেপ ব্যর্থ হয়ে যায়। এই প্রচেষ্টার শুরু ১৯২২ সালে। জেনেভা প্রটোকল বানচাল হয়ে যাবার পর ১৯২৭ সালে পুনরায় এই প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। ১৯৩০ সালের সংসদীয় অধিবেশনের পর দ্রুত মেঘ জমতে থাকে। ১৯৩১ সালের গ্রীষ্মকালে ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকার নিরাপত্তা বিষয়ক সাধারণ আইন (General Act) অনুমোদন করলেও, এবং যুদ্ধ প্রতিরোধের উপায় সংক্রান্ত কম গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন গৃহীত হলেও এগুলি আগেকার উৎসাহ জাগিয়ে তুলতে পারেনি।

২.৩.১ নিরাপত্তার সন্ধানে ফ্রান্স

১৯১৯ সালের পর ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিধানের দাবী। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্স ছিল ইয়োরোপের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সামরিক শক্তি। নেপোলিয়নের সময় পর্যন্ত ফ্রান্সের অপ্রতিহত সামরিক গৌরব অব্যাহত ছিল। কিন্তু নেপোলিয়ন শেষ পর্যন্ত ইয়োরোপীয় শক্তিজোটের কাছে পরাস্ত হন। নব উত্থিত প্রাশিয়ার কাছে ১৮৭০ সালের পরাজয় ফ্রান্সের মোহভঙ্গ ঘটায়। ১৮৭১ সালের পর বিজয়ী জার্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্স বহু চেষ্টায় পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে এনেছিল।

১৯১৪ সালে ফরাসিরা অনুভব করেছিল ব্রিটিশ শক্তির দ্রুত হস্তক্ষেপ ছাড়া ছয় সপ্তাহের মধ্যে তারা পুনরায় একটি পরাজিত শক্তিতে পরিণত হত। ১৯১৮ সালের বিজয়ের আনন্দ ছিল নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী—আনন্দোৎসবের অন্তরালে এক গভীর দুশ্চিন্তার ছায়া পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছিল। ১৯১৮ সালের শরৎকালে কুলস কাঁবঁ (Cambon), বার্লিনের পূর্বতন ফরাসি রাষ্ট্রদূতকে সাবধান করে দিয়েছিল। [‘France victorious must grow accustomed to being a lesser power than France vanquished.’] জয়ী ফ্রান্স পরাজিত ফ্রান্সের তুলনায় একটি ক্ষুদ্রতর শক্তি’—এ বিষয় ফ্রান্সকে অভ্যস্থ হত হবে। এই মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে কেবলমাত্র ইয়োরোপে জার্মান রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রাধান্যের উল্লেখ করা হয়নি, আতলান্তিক সাগরের পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির উল্লেখও করা হয়েছিল। ১৯২০ সালে সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেমাজিঁও (Demangeon) *Le Dcline de.* । *Europe* গ্রন্থে আলোচনা করেন কীভাবে যুদ্ধোত্তর বিশ্বের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল ইয়োরোপ থেকে আমেরিকায় সরে যাবে। অর্থাৎ ফ্রান্সের আর্থিক অবনতি ঘটবে।

বিজয়ী ফ্রান্সের সবচেয়ে উর্বর অঞ্চলগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। উত্তরপূর্ব ফ্রান্সের ১০টি প্রদেশ (departments) যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। অপসৃয়মান পরাজিত জার্মান বাহিনী ফ্রান্সের মাটি ছেড়ে যাবার আগে শ্মশানে করে দিয়ে গিয়েছিল। কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায়, অর্থনৈতিকভাবে ফ্রান্সকে বিপর্যস্ত করার জন্যই তারা এই ধ্বংসলীলা চালায়। কয়লাখনিতে জল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, রেলপথ ও টেলিগ্রাফ লাইন উপড়ে ফেলা হয়। কৃষিক্ষেত্রে শেলেরে আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, এলোমেলোভাবে কাটা ট্রেঞ্চ জমিগুলিকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। গবাদি পশু হত্যা করে বাসগৃহ পুড়িয়ে ফেলে জার্মানরা পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়। উত্তরপূর্বে ফ্রান্সে শিল্প-কারখানা, কর্ষণযোগ্য ভূমি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং শ্রমিকের অভাব ফ্রান্সের উৎপাদনের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। এছাড়াও, যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য বিদেশে নিযুক্ত পুঁজি তুলে আনতে হয়েছিল। বিদেশি রাষ্ট্রগুলির কাছে বিপুল ঋণ হয়েছিল এবং রাশিয়া, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ও তুরস্কতে বিপুল প্রাক্-যুদ্ধ বিনিয়োগ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় ফরাসি অর্থনীতি ধ্বংসের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত অঞ্চলগুলির পুনর্গঠন এবং লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু, বিধবা, অনাথ এবং পঙ্গু প্রাক্তন সৈনিকদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন করতে গেলে, বিদেশি ঋণ শোধ করতে গেলে অর্থনীতিকে যেভাবে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে হত, তা ফ্রান্সের একক প্রচেষ্টায় করে তোলা ছিল অসম্ভব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ফ্রান্সের জনসংখ্যাগত দুর্বলতা এবং ভৌগোলিক অবস্থানগত দুর্বলতা (Vulnerability) প্রকট হয়ে উঠেছিল। বিশাল নদী এবং উত্তুঙ্গ পর্বত জার্মান সীমান্তের প্রাকৃতিক প্রহরী। পূর্বদিকে রুশ সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ায় জার্মান শক্তির পূর্ব সীমান্ত রাজনৈতিকভাবে সুরক্ষিত হয়ে পড়েছিল। ফ্রান্স ও জার্মানির জনসংখ্যা ও জন্মহারের তুলনামূলক তারতম্য ফ্রান্সকে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। ৩৯ মিলিয়ন ফরাসির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ৬৩ মিলিয়ন জার্মান, আলশাস লোরেনের ২ মিলিয়ন বাসিন্দা ফ্রান্সের অধীনে এলেও জনসংখ্যাগত

অনুপাতের উন্নতি হয়নি। যুদ্ধের আগেই ফ্রান্সের জন্মহার হ্রাস পেয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে ১.৪ মিলিয়ন সম্ভাব্য পিতার মৃত্যু ফরাসি জন্মহারের অবক্ষয় আরও তীব্র করে তুলেছিল। অনতিবিলম্বে জার্মান জনসংখ্যা ফরাসিদের দ্বিগুণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। যখন ৩০'-এর দশকের মাঝামাঝি জার্মানি ইয়োরোপে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে তখন সামরিক পরিষেবা দেবার মতো জনসংখ্যা ফ্রান্সে থাকবে না।

জার্মানিতে সামরিক পুনরুজ্জীবন ঘটলে কীভাবে তার মোকাবিলা করা যাবে তা নিয়ে ফরাসি কূটনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্কের সূত্রপাত হয়। ফরাসি পররাষ্ট্রনীতির পূর্বতন ঐতিহ্য অনুসারে জার্মানিকে বিভক্ত এবং দুর্বল করে রাখাই ফরাসি নিরাপত্তারক্ষার প্রধান উপায় বলে মনে করা হয়। কিন্তু, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার উইলসনীয় 'কূটনীতির নতুন পন্থা' ইয়োরোপীয় নিরাপত্তার ঊর্ধ্বে স্থান পেয়েছিল। মার্কিন প্রতিনিধিদের বিরোধিতার আশঙ্কাতেই শেষ পর্যন্ত ক্লেমেসোঁ জার্মানির প্রতি লঘুতর শান্তির প্রস্তাব পেশ করেছিল।

ক্লেমেসোঁর, উদ্দেশ্য ছিল ফরাসি সীমান্ত ও রাইন নদীর মধ্যবর্তী ভৌগোলিক ও সামরিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাইনল্যান্ডের নিরাপত্তা বিধান করা। তাঁর প্রস্তাব ছিল রাইনল্যান্ডকে জার্মানি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফরাসি সামরিক রক্ষণাধীন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে গঠন করা। ফ্রান্সের পক্ষে রাইনল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রয়োজনীয়।

ইঙ্গ মার্কিন পক্ষের চাপে, উইলসন প্যারিস ত্যাগ করার হুমকি দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত ফরাসিপক্ষ একটি আপোষ মীমাংসা মেনে নেয়। ফ্রান্স রাইনল্যান্ডে জার্মান রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেওয়ায়, আমেরিকা ও ইংলন্ড কতকগুলি রক্ষণাত্মক প্রতিশ্রুতি (guarantee) দেয় : (১) রাইন নদীর পশ্চিম তীরে এবং পূর্ব তীরে পঞ্চাশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ অঞ্চলে জার্মান সামরিক বাহিনী সমাবেশ করা অথবা দুর্গ নির্মাণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়, (২) ১৫ বছরের জন্য রাইনল্যান্ডে মিত্রপক্ষীয় সৈন্য মোতায়েন করা হয়। (৩) সম্ভাব্য জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে রক্ষা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলন্ড অভূতপূর্ব সামরিক সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

১৯২০-র দশকের প্রথমার্ধে ফ্রান্সের বিভিন্ন রাজনৈতিক পক্ষ গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে অসম্পাদিত চুক্তিটিকে পুনরুত্থিত করতে চায়। মার্কিন সেনেটের অনুমোদনের অভাবে এই চুক্তিটি শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়েছিল। ইংলন্ড একাকী ফ্রান্সের সুরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। অপ্রত্যাশিত জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে রক্ষা করায় ইংলন্ডের আইনগত আপত্তি ছিল। ফ্রান্স ও জার্মানির সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব স্বীকার করা ইংলন্ডের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে বা জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে অপরিহার্য ছিল না।

ইয়োরোপে শক্তিসাম্য বজায় রাখার প্রাচীন নীতি অনুসারে লন্ডন কোনো ইয়োরোপীয় শক্তিকেই অত্যধিক সামরিক ক্ষমতা অর্জনে উৎসাহিত করতে চায়নি। জার্মানির তুলনায় ফ্রান্স অধিক শক্তি সংগ্রহ করতে চাইলেও ইংলন্ড তার পুরোপুরি বিরোধিতা করে। ১৯২০ সালে ফ্রান্সের স্থলবাহিনী ও বিমান বাহিনী পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অপ্রতিরোধ্য ছিল। ফরাসি বিমানবাহিনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব সীমান্তে সুরক্ষিত করা। ইংলন্ড তার যুদ্ধকালীন বিমানবহর ভেঙে ফেলায় ফরাসি বিমান শক্তিতে আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিল।

ইংলন্ডের কূটনৈতিকরা জার্মানির বিক্ষোভের কারণগুলি দূর করে জার্মানিকে একটি সহযোগী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল। তাদের ধারণ ছিল এতেই ইয়োরোপের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে। অথচ, ফ্রান্সের মতে সবচেয়ে জনবহুল এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রসর শক্তি হিসেবে জার্মানি যে কোনো মুহূর্তে ইয়োরোপের তথা ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে।

যখন ফ্রান্স দেখল, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার 'প্রাকৃতিক নিরাপত্তা' (Physical Guarantee) রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণে প্রস্তুত নয় তখন সে দুটি বিকল্প পথ অবলম্বন করে : সন্ধির মাধ্যমে দায়িত্ব গ্রহণ ও মৈত্রী চুক্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

বিমূর্ত নিরাপত্তাসূচক চুক্তির পরিবর্তে সামরিক চুক্তি সম্পাদনই ফরাসি ঐতিহ্যের অনুকূল ছিল। এই নীতি অনুসারে অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে অস্ট্রিয়াকে পরিবেষ্টিত করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ফ্রান্স ইংলন্ড ও রাশিয়ার সঙ্গে আঁতাত গড়ে তুলে জার্মানিকে বেষ্টন করেছিল। যুদ্ধোত্তর পর্বে ফ্রান্স পুনরায় নিরাপত্তা অর্জনের নামে জার্মানিকে মিত্র রাষ্ট্রগুলি দ্বারা বেষ্টন করতে চাইল।

এছাড়া জাতিসংঘের সনদের অনুমোদন ছাড়া জার্মানির বিরুদ্ধে নিজেকে সুরক্ষিত করার কোনও উপায় ফ্রান্সের ছিল না। তাই ইউরোপের যে দেশগুলি ভার্সাই চুক্তির ভৌমিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখতে চায় তাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে ফ্রান্স আগ্রহী হয়ে ওঠে।

১৯২০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ফ্রান্স বেলজিয়ামের সঙ্গে একটি সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে। বেলজিয়াম জার্মানির কাছ থেকে ইউপেন ও মামেডি লাভ করায় ভবিষ্যতে জার্মান আক্রমণের দ্বারমুখ হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘকাল, নিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে বেলজিয়াম নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। কাজেই নিজের স্বার্থেই বেলজিয়াম ভার্সাই চুক্তির শর্তগুলি বজায় রাখার জন্য ফ্রান্সের সঙ্গে সহযোগিতা করে।

এরপর জার্মানির পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত পোলান্ডের দিকে মিত্রতার হাত প্রসারিত করে ফ্রান্স। জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া থেকে রাজ্যাংশ নিয়ে ১৯১৮ সালের ৩ নভেম্বর আধুনিক পোলান্ডের জন্ম। পোলান্ড ডানজিগ বন্দরে অর্থনৈতিক অধিকার এবং উত্তর সাইলেশিয়া লাভ করায় জার্মানি ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ক্ষুব্ধ জার্মানি ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে পোলান্ড ফ্রান্সের সামরিক সুরক্ষা প্রার্থনা করেছিল। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফরাসি-পোল মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর সঙ্গে একটি গোপন সামরিক চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছিল। পোলান্ডকে জাতীয় পুনর্গঠন এবং অস্ত্রনির্মাণের জন্য ফ্রান্স প্রভূত অর্থ দিয়েছিল। কয়েকজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ফরাসি কূটনৈতিক অনুযোগ করেছিলেন, এই কোন্দলপরায়ণ মিত্র, ফ্রান্সের সম্পদ না হয়ে বোঝা হয়ে উঠবে। তাছাড়া, ফরাসি সৈনিকরাও পোলান্ডের জন্য প্রাণ দিতে রাজি হবে না। পোলান্ডের অধিবাসীরাও ফরাসি সহযোগীদের দাম্ভিকতা এবং ফরাসি সামরিক দৌত্যের ব্যয়ভারে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তবে, এই সব ছোটখাট মত পার্থক্য এই সুদৃঢ় মৈত্রীকে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি। আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ফ্রান্স ও পোলান্ডের অবস্থান ছিল পাশাপাশি। জেনেভাতে ফরাসি ও পোল প্রতিনিধিরা প্রতিটি প্রকাশ্য বিতর্কে একত্রে অংশগ্রহণ ও ভোটদান করতেন।

ড্যানিয়ুব অঞ্চলে হাঙ্গেরি রাজ্য ভেঙে চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও যুগোশ্লোভিয়া রাজ্য গড়ে উঠেছিল— সম্ভাব্য হাঙ্গেরীয় আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এই রাজ্যগুলি নিজেদের মধ্যে ১৯২০-২১ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত করে। চেকোশ্লোভাকিয়া মূলত মধ্য ইয়োরোপের এবং রুমানিয়া বলকান অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যুগোশ্লোভিয়া এই দুটি অঞ্চলের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। উত্তরে যুগোশ্লোভিয়ার সীমান্ত ভিয়েনার একশত মাইলের মধ্যে এবং দক্ষিণপূর্ব ইজিয়ানের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে বিস্তৃত ছিল। তবে যুগোশ্লোভিয়ার কাছে হাঙ্গেরি প্রধান উদ্বেগের কারণ ছিল না। চেকোশ্লোভাকিয়া ও রুমানিয়ার তুলনায় যুগোশ্লোভিয়া হাঙ্গেরির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অংশ পেয়েছিল। অন্যদিকে এড্রিয়াটিক সমুদ্রে ইতালির প্রতিপত্তি যুগোশ্লোভিয়াকে গভীরভাবে ঈর্ষান্বিত করে তুলেছিল। এই তিনটি রাষ্ট্রের মৈত্রীকে ক্ষুদ্র আঁতাত (Little Entente) বলা হয়ে থাকে। ফরাসি কূটনৈতিকরা সচেতনভাবে এই তিন রাষ্ট্রের সঙ্গে এবং পোলান্ডের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের আশা ছিল এই চারটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র-জার্মান শক্তির প্রতিপক্ষ রূপে রাশিয়ার বিকল্প হিসেবে

কাজ করবে। সব মিলিয়ে, তাঁরা জার্মানিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ফরাসি প্রত্যাশার কেন্দ্রে ছিল চেকোশ্লোভাকিয়া। জার্মানির প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র চেকোশ্লোভাকিয়াই শিল্পগত ও সামরিক শক্তির দিক থেকে জার্মানিতে প্রতিহত করার উপযুক্ত ছিল। পশ্চিম চেকোশ্লোভাকিয়াতে প্রায় তিন লক্ষ জার্মান অধিবাসী ছিল। জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তুলে জার্মানি এদের ক্ষুব্ধ করে তুলতে চেয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই প্রাগের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ফরাসি মিত্রতার আহ্বানে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৯২৪ সালে ২৫ জানুয়ারি, দুটি দেশ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। অকারণে আক্রান্ত হলে দুটি দেশ পরস্পরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

১৯২৬ সালের ১০ জুন ফ্রান্স ও রুমানিয়ার ১১ নভেম্বর, ১৯২৭ ফ্রান্স ও যুগোশ্লোভিয়া পারস্পরিক মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। রুশ মৈত্রীর বিকল্প হিসেবে ফ্রান্স ইয়োরোপে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য কয়েকটি মিত্র রাষ্ট্রের বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে ধরে জার্মানিকে। ফ্রান্স সরকারি ও বেসরকারী সামরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে পোলান্ডের মতো অনুরূপ ব্যবস্থা অনুসারে ক্ষুদ্র আঁতাতভুক্ত দেশগুলির সৈন্যবাহিনীকে রণসম্ভার সরবরাহ করে ও ফরাসি সামরিক মিশন পাঠানোর ব্যবস্থা নেয়। চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও যুগোশ্লোভিয়া বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জেনিভা ও অন্যত্র ফ্রান্সের বিশ্বস্ত অনুগামী রাষ্ট্রের ভূমিকা নেয়। তবে ক্ষুদ্র আঁতাতের সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পর্ক এবং পোলান্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পর্কের চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। জার্মানিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ফ্রান্স ও পোলান্ড মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিকে ভার্সাই নির্ধারিত রাইন নদীর পাড়ে আটকে রাখে।

পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র আঁতাতের সঙ্গে ফ্রান্সের সমঝোতা হয় পরোক্ষভাবে, তার নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য। ক্ষুদ্র আঁতাতের তিনটি সদস্য রাষ্ট্র ভার্সাই সন্ধি কার্যকর করতে ফ্রান্সকে সাহায্য করবে, যদিও এ ব্যাপারে তাদের নিজস্ব স্বার্থ ছিল নগণ্য। ফ্রান্স সামগ্রিকভাবে ক্ষুদ্র আঁতাতকে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে ও যুগোশ্লোভিয়াকে বিশেষ করে ইতালির বিরুদ্ধে সাহায্য করবে। এর ফলে নিরাপত্তা সম্পর্কে ফ্রান্সের নিজস্ব ধারণার পরিমণ্ডল ব্যাপকতর হল। ফ্রান্স, শুধু ভার্সাই সন্ধির নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাইন নদীর পারে আটকে রাখা এবং পূর্বাঞ্চলে তার শক্তিবিস্তার প্রতিহত করাই ফ্রান্সের একমাত্র লক্ষ্য রইল না। ফ্রান্সের দায়িত্ব হল লিথুয়ানিয়ার বিরুদ্ধে পোলান্ডকে, হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে চেকোশ্লোভাকিয়াকে এবং বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুগোশ্লোভিয়া ও রুমানিয়াকে সমর্থন করা। এমন কি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির প্রতি তাদের দায়দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও ফ্রান্স তার মিত্র রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করেছিল। ফলে, ফ্রান্স, এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির অভিভাবকরূপে তার যোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছিল।

অধ্যাপক ই. এইচ. কারের মতে প্রচুর রণসম্ভার এবং এক বিশাল বিজয়ী সেনাবাহিনীতে সুসজ্জিত ফ্রান্স, ১৯২০ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে ইয়োরোপীয় রাজনীতির সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হয়। ফ্রান্স ছিল স্থিতাবস্থার সমর্থক ও সংশোধনবাদের ঘোরতর শত্রু। ১৮১৫ সালের পরবর্তীকালের মেটারনিখ যেমন ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন, তেমন ফ্রান্সও যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল।

কাগজে কলমে এই মৈত্রী ব্যবস্থা অত্যন্ত পরাক্রমশালী বলে প্রতীয়মান হলেও কার্যত, পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে ফ্রান্সের এই মৈত্রী ব্যবস্থার কতকগুলি উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা ছিল। তাই এই মৈত্রী ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ইয়োরোপে শান্তি বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল।

ফ্রান্সের মিত্র রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকটিই ছিল বহুজাতিক রাষ্ট্র। সংখ্যালঘু জাতিসমূহের ক্ষোভ ও হতাশা রাজনৈতিক ঐক্য ও সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। এর চেয়েও বড় সমস্যা হল, প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই বিভিন্ন ভূখণ্ডের দখলদারী নিয়ে হয় নিজেদের মধ্যে নয় জার্মানি ছাড়া অন্যান্য বিদেশি

রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। ১৯২০ সালে মার্শাল পিলসুদস্কি ইউক্রেন আক্রমণ করে রুশ ভূখণ্ড হস্তগত করেছিলেন। বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে রুমানিয়া বেসারাবিয়া নামক রুশ প্রদেশটি দখল করেছিল। যুগোশ্লোভিয়া অ্যাড্রিয়াটিকের উপকূল অঞ্চলে ইতালির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। টেশেনে (Teochen) পোল অধ্যুষিত কয়লাখনি অঞ্চলের অধিকার চেকোশ্লোভাকিয়ার হাতে চলে যায়। পোলান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এই মৈত্রী ব্যবস্থাকে দুর্বল করে তুলেছিল। পূর্ব ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ গোলোযোগ ও বৈদেশিক সংঘাত এই অঞ্চলের রাজনৈতিক স্থিতিকে বিশেষভাবে বিঘ্নিত করেছিল। জার্মানি চুক্তির নির্মম শর্তগুলি ভঙ্গ করতে চাইলেই পূর্ব ইয়োরোপের অস্থিরতা তাকে সাহায্য করবে।

ফরাসি মৈত্রী ব্যবস্থার ভঙ্গুরতার জন্য কিছু কিছু ফরাসি পদাধিকারী ইতালির সঙ্গে পরিপূরক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কিন্তু ফ্রান্সের যুদ্ধকালীন মিত্র ইতালি ইতিমধ্যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। আল্‌পস পর্বত অঞ্চলে এবং অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে ভৌমিক অধিকার বাড়াতে পারলেও ইতালীয় প্রতিনিধিরা ভার্সাই চুক্তি ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারেনি। এমনকি, ফিউম বন্দরটিও ১৯২৪ সালের পর ইতালির হাতে তুলে দেওয়া হয়। তবুও তাদের অভিযোগের অবসান ঘটেনি। বিশেষত, অর্থনৈতিক সঙ্কট, সামাজিক সংঘাত এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা ভার্সাই চুক্তির বিরুদ্ধে ইতালির জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়াকে শক্তিশালী করে তুলেছিল।

অধ্যাপক উইলিয়াম. আর. কেলর (William R. Keylor) প্রশ্ন তুলেছেন, ইংলন্ডের নিরুৎসাহ, পূর্ব ইয়োরোপীয় আঁতাতের দুর্বলতা এবং ইতালীয় প্রতিযোগিতায় বিপর্যস্ত ফ্রান্স কেন রাশিয়ার সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করেনি? প্রথমত, অক্টোবর বিপ্লবের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত প্রতিক্রিয়া মধ্য ইয়োরোপীয় সাম্যবাদী আন্দোলনের ব্যর্থতার পরেও প্রশমিত হয়নি। ১৯১৯ মার্চ মাসে স্থাপিত কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল (অথবা কমিনটার্ন) এবং ইয়োরোপের প্রায় প্রতিটি দেশে কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম, (এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি এই পার্টিগুলির বিশ্বস্ততা) ইয়োরোপের অভিজাত শাসকদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। ফ্রান্সে ১৯২০ দশকের গোড়ায় ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল মন্ত্রীসভা সাম্যবাদী রাশিয়ার প্রতি বিশেষভাবে বিরূপ ছিল। রাশিয়ার যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ানো এবং বিপুল পরিমাণ ফরাসি ঋণ ফেরৎ দিতে অস্বীকার করার স্মৃতি তারা ভুলতে পারেনি। এই কারণেই ফ্রান্স, রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে (১৯১৮-২০) প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির প্রধান সমর্থক হয়ে ওঠে। ১৯২০ সালে ইউক্রেনে অনুপ্রবেশ করে তারা পোলদের নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করতে উৎসাহিত করে।

এছাড়া, রাশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানও জার্মানি বিরোধী শক্তি জোট গড়ে তোলার অনুকূল ছিল না। ফ্রান্স যে যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, রাশিয়া জাতীয় স্বার্থের কারণে সেই ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বিরোধী হয়ে উঠেছিল।

'২০-র দশকের শেষে, স্পষ্ট হয়ে ওঠে নিরাপত্তার নামে ফ্রান্স ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিল তার ভিত্তি সাময়িক শক্তি জোট। অথচ ১৯১৪ সালেই এই ধরনের শক্তিজোট প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত অকার্যকারিতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

২.৩.২ নিরাপত্তা প্রচেষ্টার ব্যর্থতা

'যৌথ নিরাপত্তা' প্রতিষ্ঠায় লীগের ব্যর্থতা প্রায় লীগের জন্ম মুহূর্তে থেকেই প্রকট হয়ে উঠেছিল। তবু যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার আশায় বারে বারে লীগের সদস্য রাষ্ট্রগুলি লীগের অধিবেশনের মাধ্যমে, আঞ্চলিক

সমঝোতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অথবা নিজস্ব মৈত্রী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের তথা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু যৌথ নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণের সামূহিক প্রচেষ্টা বারে বারে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। এর বিপরীতে, ফ্রান্সের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা পূর্ব ইয়োরোপীয় শক্তি জোট যৌথ নিরাপত্তার বাতাবরণ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়, অথচ প্রাক্-যুদ্ধ সামরিক জোটের আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। এই আদর্শ স্বাভাবিকভাবেই যৌথ নিরাপত্তার অনুকূল ছিল না। এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় অন্যান্য শক্তিজোট গড়ে তোলার মানসিকতার জন্ম হয়।

১৯২২ সালে ৩৪টি দেশের প্রতিনিধি জেনোয়াতে ইয়োরোপের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানোর জন্য এক সম্মেলনে মিলিত হন। তাঁরা খবর পেলেন ইতালির রাপালোতে জার্মানির ওয়াল্টার র‍্যাথেনাও এবং রাশিয়ার জর্জ চিচেরিন এক মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন।

স্বাভাবিক ভাবেই, এই দুটি শক্তি পরস্পরের নিকটবর্তী হয়। দুটি শক্তিই ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়। উভয়েই—মিত্রপক্ষীয় বা ফ্রান্স নিয়ন্ত্রিত বৈরীভাবাপন্ন শক্তিজোটের ভয়ে সন্ত্রস্ত এবং উভয়েই নতুন বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপনে ব্যগ্র। জার্মানরা এই চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়ার সঙ্গে আরও ব্যাপকতর কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। তারা আশা করেছিল, সোভিয়েত সমর্থনে তারা ভার্সাই ব্যবস্থাকে বাতিল করতে পারবে। অন্যদিকে রুশ নেতারা, এই চুক্তির মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ইয়োরোপীয় শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে, ঋণ পেতে এবং ফ্রাঙ্কো-পোল মৈত্রীর ভীতি দূর করতে চেয়েছিল। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে জার্মানি সোভিয়েত সরকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং উভয়ে প্রাক্-বিশ্বযুদ্ধ ঋণ ও অন্যান্য দাবী বাতিল করে দেয়। মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিরা এই চুক্তির সংবাদে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন, কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই সম্মেলন ভেঙে যায়।

রাপালোর চুক্তির অব্যবহিত পরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন রুশ বিরোধী ইয়োরোপীয় শক্তি জোট গড়ে ওঠার সম্ভাবনায় ভীত হয়ে ওঠে। রাশিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করতে আরম্ভ করে। ১৯২৫ সালে তুর্কি প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরপেক্ষতার চুক্তি স্বাক্ষর করে, কারণ উভয় শক্তিই পাশ্চাত্য শক্তিগুলিকে বিশ্বাস করত না।

১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের অপর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯২৬ সালের শেষে আফগানিস্তান ও লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯২৭ সালে পারস্যের সঙ্গে একটি অনাক্রমণ চুক্তির আলোচনা শুরু হয়।

ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি নিরাপত্তার সন্ধানে শক্তিজোট গড়ে তোলার উৎসাহী হয়ে ওঠায় ইতালিও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চাইল না। যুদ্ধোত্তর যুগে পশ্চিম ভূমধ্যসাগর নিয়ন্ত্রণ করতে ফ্রান্স ও ইতালি দুজনেই আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। ফলত, উভয়পক্ষই সামরিক প্রস্তুতি, অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। তাছাড়া, ইতালির যুগোশ্লোভিয়ার অভিযোগ ছিল, ইয়োরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় তার অভিপ্রেত অঞ্চলগুলি ফ্রান্স অধিকার করেছে এবং ১৯১৯ সালে আরও বেশ উপনিবেশ লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

বেনিটো মুসোলিনি ক্ষমতায় আরোহণ করার পরেই ইতালিকে সুরক্ষিত করার জন্য মৈত্রী ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। ১৯২৪ সালে চেকোশ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লোভিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব ও নিরপেক্ষতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯২৬ সালে রুমানিয়া ও স্পেনের সঙ্গে চুক্তি হয়। ১৯২৬ সালে আলবানিয়ার সঙ্গে যথাক্রমে রাজনৈতিক চুক্তি ও প্রতিরক্ষামূলক চুক্তি ও স্বাক্ষরিত হয়। ১৯২৭ সালে হাঙ্গেরির সঙ্গে চুক্তির কথাবার্তা চলতে থাকে।

কাজেই, ল্যাঙ্গাসামের ভাষায়, ১৯২৭ সালে, যুদ্ধবিরতির নয় বছর পর ইয়োরোপ পুনরায় বিবাদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে, প্রাক্‌বিশ্বযুদ্ধ দুটি শক্তিজোটের (Triple Entente, Triple Aliance) পরিবর্তে ফ্রান্স, ইতালি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে তিনটি জোটের সূচনা হয়।

অন্যদিকে লীগ চুক্তিপত্রের ১০ নম্বর এবং ১৬ নম্বর ধারার স্ববিরোধী ব্যাখ্যার ফলে এবং ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিতভাবে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আস্থা রাখতে না পারার ফলে ১৯৩১ সালে জাপান যখন মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করল, তখন চীনের শত আবেদন সত্ত্বেও লীগ কাউন্সিল জাপানকে আক্রমণকারী বলে চিহ্নিত করতে পারল না বা শাস্তি দিতে পারল না। জাপান জাতিসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করল। জাপান খোলাখুলিভাবে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করায় পরবর্তীকালে একনায়কতান্ত্রিক শক্তিগুলির আক্রমণাত্মক পদক্ষেপের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। পৃথিবী সম্মুখীন হয়েছিল নতুন এক মারণ যজ্ঞের।

২.৪ সারাংশ

ইয়োরোপের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্যই উনবিংশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতকের গোড়ায় ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তিজোটে বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই শক্তিজোট দুটি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ইয়োরোপে শান্তি বিঘ্নিত হয়। প্রমাণিত হয়, শক্তিজোট গঠন নিরাপত্তা রক্ষার উপযুক্ত উপায় নয়।

বিধ্বংসী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যারিসের শান্তিচুক্তি প্রণেতাদের উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা। শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল দুটি উপায়ে : একটি যৌথ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং অপরটি নিরস্ত্রীকরণ।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার তিনটি উপায় ছিল : জাতিসংঘের মাধ্যমে যৌথ নিরাপত্তা অর্জন, আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে নিরাপত্তামূলক চুক্তি সম্পাদন এবং মৈত্রীজোট গড়ে তোলা।

প্রথমত, জাতিসংঘের মাধ্যমে সকল রাষ্ট্র মিলিতভাবে পারস্পরিক নিরাপত্তারক্ষার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতে পারত। তবে, লীগের চুক্তিপত্রে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ প্রতিহত করার কোনো নির্দিষ্ট পন্থা নির্দেশ করা হয়নি। জেনেভা প্রটোকলে চুক্তিপত্রের অন্তর্গত ১০ নম্বর এবং ১৬ নম্বর ধারার সংস্কার সাধন করে আক্রমণকারীকে চিহ্নিত করা এবং তার বিরুদ্ধে বিশেষ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারী করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

লীগের নেতৃত্বে যৌথ নিরাপত্তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হওয়ায় আঞ্চলিক স্তরে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আরম্ভ হয়। অর্থনৈতিক সমস্যা ও কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতার আশঙ্কায় দীর্ণ ফ্রান্স ক্রমেই জার্মানির সঙ্গে আঞ্চলিক ভিত্তিতে নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদনের গুরুত্ব অনুভব করে। অন্যদিকে, ১১৯২৩ সালে জার্মানির নবনিযুক্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রী গুস্তাভ স্ট্রেসেসম্যান সূক্ষ্ম কূটনীতির মাধ্যমে পশ্চিম ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে জার্মানিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে সুইজারল্যান্ডের লোকার্নো শহরে ফ্রান্স, জার্মানি, ইংলন্ড, ইতালি এবং বেলজিয়াম একটি চুক্তির মাধ্যমে ফ্রান্স ও জার্মানির পারস্পরিক নিরাপত্তার দাবি স্বীকার করে নেয়। লোকার্নো চুক্তি সাময়িকভাবে আশার সঞ্চার করলেও নিরাপত্তা সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করতে পারেনি।

১৯২৮ সালে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কেলগ ও ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রিঁয়ার নেতৃত্বে পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ শক্তিগুলি প্যারিসে মিলিত হয়ে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতীয় নীতিরূপে যুদ্ধের পথ বর্জন করে। যৌথ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে সূচিত হলেও প্যারিস চুক্তি নানান অসম্পূর্ণতার কারণে

শেষ পর্যন্ত অকার্যকর হয়ে পড়ে। ১৯৩১ সালে ইংরেজ ও ফরাসি সরকার নিরাপত্তাবিষয়ক সাধারণ আইন অনুমোদন করলেও জাতিসংঘের মাধ্যমে যৌথ নিরাপত্তা প্রচেষ্টা আগের উৎসাহ আর জাগিয়ে তুলতে পারেনি।

যৌথ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিধানের দাবি প্রবল হয়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ফ্রান্সের জনসংখ্যাগত দুর্বলতা, ভৌগোলিক অবস্থানগত দুর্বলতা এবং অর্থনৈতিক সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। অথচ জার্মানির শিল্পগত শক্তি প্রায় অটুট ছিল। জার্মানিতে সামরিক পুরুজ্জীবন ঘটলে কীভাবে তার মোকাবিলা করা যাবে তা নিয়ে ফরাসি কূটনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্কের সূত্রপাত হয়।

প্রথমে ফ্রান্স, ইংলন্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ফরাসী নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানায়। যখন ফ্রান্স দেখলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলন্ড এই দায়িত্ব স্বীকারে প্রস্তুত নয়, তখন সে দুটি বিকল্প পথ অবলম্বন করে ; সন্ধির মাধ্যমে দায়িত্ব গ্রহণ ও মৈত্রী চুক্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। ১৯২০ সালের পর জার্মানির পূর্ব সীমান্তে পোলান্ডের সঙ্গো এবং পশ্চিম সীমান্তে বেলজিয়ামের সঙ্গো ফ্রান্স মিত্রতা ও সামরিক চুক্তি সম্পাদিত করে। একইভাবে, ফ্রান্স ১৯২৪ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গো, ১৯২৬ সালে রুমানিয়ার সঙ্গো এবং ১৯২৭ সালে যুগোশ্লোভিয়ার সঙ্গো মিত্রতায় আবন্ধ হয়। এই চুক্তিগুলিতেও পারস্পরিক সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

অধ্যাপক ই. এইচ. কারের মতে প্রচুর রণসম্ভার এবং বিশাল বিজয়ী সেনাবাহিনীতে সুসজ্জিত ফ্রান্স, ১৯২০ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে ইয়োরোপীয় রাজনীতির সর্বোচ শিখরে আরোহণ করে। কিন্তু ফ্রান্সের মিত্র রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ অভ্যন্তরীণ সমস্যায় বিব্রত থাকায়, তাদের সাহায্য নিতান্ত অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অথচ মতাদর্শগত বিরোধের জন্য ফ্রান্স রুশমৈত্রী স্থাপনে আগ্রহী ছিল না।

অন্যদিকে, ইতালিকে মুসোলিনির উত্থান ঘটায়, তিনিও ক্ষুদ্র আঁতাত ভুক্ত দেশগুলির সঙ্গো মৈত্রী স্থাপন করেন। এইভাবে ১৯২৭ সালে যথাক্রমে ফ্রান্স, ইতালি ও রাশিয়ার নেতৃত্বে তিনটি পরস্পর বিরোধী শক্তিজোট গড়ে ওঠে।

ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি শেষপর্যন্ত যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আস্থা রাখতে না পারায় জাতিসংঘের ভূমিকা নিতান্ত অর্থহীন হয়ে পড়ে। ১৯৩১ সালে জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ প্রতিহত করতে না পারার ফলে ভবিষ্যতে আগ্রাসী নীতির জয়যাত্রার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

২.৫ অনুশীলনী : প্রশ্নাবলি ও উত্তরসংকেত

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

১। যৌথ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জেনেভা প্রটোকলের ভূমিকা কী ছিল? কেন এই প্রটোকলটি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়?
উত্তর—অনুচ্ছেদ ২.২.২

২। কেলগ-ব্রিঁয়া প্যাক্ট যৌথ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় কতটা সফল হয়েছিল?—আলোচনা করুন।
উত্তর সংকেত—অনুচ্ছেদ ২.২.২

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সের নিরাপত্তা প্রয়াস কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল? এই প্রয়াস কেন ব্যর্থ হয়ে যায়?
উত্তর—অনুচ্ছেদ ২.৩.১

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। যৌথ নিরাপত্তা বলতে আপনি কী বোঝেন?

২। ক্ষুদ্র আঁতাত কোন কোন দেশগুলিকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল?

৩। কোন কোন দেশের মধ্যে কোন সালে লোকার্নো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?

২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। জি. এম. গার্থোন-হার্ডি, এ শর্ট হিস্টরি অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ারস্ (১৯২০-১৯৩৯)(১৯৬৮)।

২। ই. এইচ. কার প্রণীত দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : ১৯১৯-১৯৩৯, ভাষান্তর ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৯০)।

একক ৩ ❑ ক্ষতিপূরণ-মহামন্দা-অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য
৩.১ প্রস্তাবনা
৩.২ ক্ষতিপূরণ সমস্যা
৩.২.১ বল প্রয়োগের পর্ব
৩.২.২ আপোষ মীমাংসা পর্ব — আন্তঃমিত্রপক্ষীয় ঋণ
৩.২.৩ ব্যর্থতার পর্ব
৩.২.৪ আন্তর্জাতিক তাৎপর্য-ফরাসি-জার্মান সম্পর্কের ক্ষতিপূরণ সমস্যার প্রভাব
৩.৩.১ মহামন্দা
৩.৩.২ মহামন্দার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য
৩.৪.১ অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ
৩.৪.২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৩.৪.৩ জার্মানি
৩.৫ সারাংশ
৩.৬ অনুশীলনী : প্রশ্নাবলি ও উত্তরসংকেত
৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- জার্মানি ও ক্ষতিপূরণ সমস্যা
- ১৯২৯ সালের মহামন্দা
- অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ

৩.১ প্রস্তাবনা

ভার্সাই চুক্তির শর্ত অনুসারে রাজনৈতিক ও ভৌমিক পুনর্গঠনের প্রশ্নগুলির সাময়িক হলেও ক্ষতিপূরণ সমস্যাটির দ্রুত মীমাংসা ছিল প্রায় অসম্ভব। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, ক্ষতিপূরণ দানের পদ্ধতি, কিস্তির সংখ্যা, সময়কাল ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্নের এক মত হতে মিত্র পক্ষের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছিল। এছাড়া, ক্ষতিপূরণ আদায়ের উদ্দেশ্য সম্পর্ক ফ্রান্স ও ইংলন্ডের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল।

ক্ষতিপুরণের প্রশ্নের সঙ্গো আন্তঃরাষ্ট্রীয় ঋণের সমস্যাটি জড়িত হয়ে আরও জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। মিত্রপক্ষ ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়েই যুদ্ধকালীন ঋণ শোধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজি হয়নি।

জার্মানি প্রথম দিকে মার্কিন ঋণের টাকায় ক্ষতিপূরণ দেবার চেষ্টা করলেও ওয়াল স্ট্রীটে শেয়ার বাজারে ধস্‌কে কেন্দ্র করে যে মহামন্দার (Great Depression) সূচনা হয় তা পৃথিবীর বৃহত্তম উত্তমর্ণ রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে বিপন্ন করে তোলে। এই সংকটের ঢেউ গিয়ে লাগে গোটা পৃথিবীর অর্থব্যবস্থায়। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাহায্যে একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সংকট এড়াতে পেরেছিল।

এদিকে মহামন্দা এবং অন্যদিকে জার্মানিতে ক্রমবর্ধমান দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা ক্ষতিপূরণ দেবার পুরো আবহাওয়া পাল্টে দেয়। বিশ্বের প্রতিটি দেশ পারস্পরিক অর্থনৈতিক আদান প্রদানের পরিবর্তে অর্থনৈতিক জাতীয়বাদের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যে সময় উদার উন্মুক্ত বাণিজ্যিক সম্পর্ক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক আস্থার মনোভাব ফিরিয়ে আনতে পারত সেই সময় অর্থনৈতিক জাতীয়বাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রত্যেককে বিচ্ছিন্ন করে তোলে। এই অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতাবাদ শান্তিরক্ষার অনুকূল ছিল না।

৩.১ ক্ষতিপূরণ সমস্যা

প্যারিসের শান্তিচুক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জনিত সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সূচিত করেনি—সমাধানের সূত্রপাত করেছিল মাত্র। ক্ষতিপূরণ (reparation) দেওয়ার প্রশ্নটি প্যারিসে অমীমাংসিতই থেকে গিয়েছিল।

পরাজিতের কাছ থেকে যুদ্ধের পুরো ব্যয়ভার আদায় করা বিজয়ীর সর্বজনস্বীকৃত অধিকার। এই অধিকারের সঙ্গো যুদ্ধ সংঘটনের নৈতিক বা আইনগত দায়িত্বের প্রশ্ন জড়িত নয়। পরাজিত জার্মানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে, কারণ জার্মানি যুদ্ধ-অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিল। চাপে পড়ে যুদ্ধ সংঘটনের দায়িত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হলেও জার্মানরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। প্রথমত, এই দায়িত্ব স্বীকার করার অর্থ, যে জার্মানরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁরা একটি অন্যায্য কারণে প্রাণ দিয়েছেন। এছাড়া, যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষর করে জার্মানি নিজে থেকে যে দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল, তাও অস্বীকার করা হয়। অধ্যাপক কেলর দেখিয়েছেন, জার্মান ক্ষোভের মূল কারণ প্রতীকী। ইতিহাসে প্রতীক অনেক সময় সত্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শান্তিচুক্তির ২৩১ নম্বর ধারায় ক্ষতিপূরণের উল্লেখ ছিল এবং জার্মান প্রতিনিধিরা স্বেচ্ছায় এই ধারা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। জন ফস্টার ডালেসের মতে এই ধারা জার্মানিকে মিত্রপক্ষের অযৌক্তিক দাবি থেকে রক্ষা করে। জার্মানিকে যুদ্ধের নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে নিতে হলেও তাকে বিধিবদ্ধ ভাবে আইনগত ক্ষেত্রেই ক্ষতিপূরণের কথা বলা হয়েছিল। কোনও ভাবে এই ধারাটি যুদ্ধ অপরাধ সংক্রান্ত ধারা বলে চিহ্নিত হয়ে যায়। অপরাধ শব্দটি উল্লেখিত হয়নি। এমন কোনো প্রমাণ দেওয়া যায় না, জার্মানিকে একপাক্ষিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, তুরস্ক ও বুলগেরিয়ার সঙ্গো প্রায় একই ভাষায় চুক্তি করা হয়েছিল। কিন্তু 'যুদ্ধ অপরাধ' সংক্রান্ত ধারার পুরাণকথা (myth)' ২০-র দশকে জার্মান সরকারগুলি বারে বারে উল্লেখ করেছিল এবং হিটলার পরবর্তীকালে কাজে লাগিয়েছিলেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসনের মতে, জার্মানি ১৯১৪ সালে বেআইনিভাবে বেলজিয়াম আক্রমণ করেছিল বলে বেলজিয়াম যুদ্ধজনিত অর্থক্ষয়ের জন্য ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী। কিন্তু বেলজিয়ামের ক্ষেত্রটি অভিনব, অন্যদেশের সঙ্গো এ ব্যাপারে তার কোনো তুলনা চলে না। ১৯১৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি উইলসন ফোর

এন্ড্‌শ বক্তৃতায় (Four Ends Speech) বলেছিলেন, "কোনো বাধ্যতামূলক জরিমানা দিতে হবে না, কোনো শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে না।" ("There shall be .... no contribution, no punitive indemnities")।

কোনো কোনো মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিদের মতে মিত্রপক্ষের যুদ্ধজনিত অর্থহানির সবটাই জার্মানির পূরণ করা উচিত। অভিজ্ঞ কূটনীতিজ্ঞদের মতে, জার্মানির কাছ থেকে যে পরিমাণ অর্থ দাবি করা হয়েছে আর সে বাস্তবে যে পরিমাণ অর্থ দিতে পারবে তার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। তাছাড়া, জার্মানি যে অর্থহানি পুরোপুরি পূরণ করতে পারবে এই প্রত্যাশা মরীচিকা মাত্র। কিন্তু প্রত্যেক প্রতিনিধিই স্বীকার করেছিলেন যে মিত্রপক্ষীয় বেসামরিক নাগরিকদের যে অর্থহানি হয়েছে, জার্মানি তা পূরণ করতে হবে। ১৯১৮ সালের ৫ নভেম্বর ঘোষিত নির্দেশে এই মর্মে মত প্রকাশ করা হয়।

ভার্সাই চুক্তিতে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত শর্ত ছিল কিন্তু ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি। নীতিগতভাবে স্থির হয়, বেসামরিক নাগরিকদের ক্ষতি, যুদ্ধবন্দীদের নির্যাতনের জন্য ক্ষতি, বেসামরিক সম্পত্তি ধ্বংসের জন্য ক্ষতি, প্রাক্তন সৈনিকদের প্রদেয় বার্ধক্যভাতা এবং বেসামরিক সম্পত্তি ধ্বংসের জন্য ক্ষতিপূরণ করতে হবে নগদ অর্থে। বাণিজ্য জাহাজ, কয়লা, পশুসম্পত্তি ও অন্যান্য বস্তু ধ্বংসের ফলে যে ক্ষতি, তা পূরণ করতে হবে অনুরূপ বস্তু দিয়ে। যুদ্ধের সময় জার্মানি মিত্রপক্ষের যে ধরনের জাহাজ ধ্বংস করেছে, তা ফিরিয়ে দিতে হবে। সবচেয়ে লাভবান হল ব্রিটেন, ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রপ্য কয়লার অধিকাংশ পেল ফ্রান্স, পশু সম্পত্তি পেল বেলজিয়াম।

জার্মানির সম্পদের ওপর ফ্রান্সের দাবি ছিল দুই ধরনের ঃ উচ্চমানের কয়লার মতো যে পণ্য ফ্রান্সে অমিল অথচ জার্মানিতে যার প্রাচুর্য, সেই কাঁচামাল, দ্বিতীয়ত, এমন নগদ অর্থ যা দিয়ে দ্রুতগতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঋণশোধ করা যাবে। ফ্রান্স জার্মানি থেকে পণ্যগুলিই ক্ষতিপূরণ চেয়েছিল, যেগুলি ফরাসি পণ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

ফ্রান্সের দাবির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যুদ্ধফেরৎ সৈনিকদের ভাতা সংক্রান্ত লয়েড জর্জের দাবি। এর ফলে ইংলন্ডের প্রাপ্যের পরিমাণ সবচেয়ে বৃদ্ধি পেত। একের পর এক দাবি মিত্রপক্ষের লোভ বাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রতিটি দেশের জনমতকে সন্তুষ্ট করতে দেশনায়কেরা ক্ষতিপূরণের অস্বাভাবিক দাবি উত্থাপন করেন।

মিত্রপক্ষীয় সদস্যরা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে একমত হতে না পারায়, জার্মানির দেয় অর্থ নির্ধারণের জন্য একটি ক্ষতিপূরণে কমিশন (Reparation Commission) গঠন করা হয়। ব্রিটেন,ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইতালি থেকে একজন করে সদস্য এবং জাপান, বেলজিয়াম ও যুগোশ্লাভিয়া থেকে একজন সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই কমিশন থেকে সরে যায়। সাধারণত, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম এক দিকে ভোট দিত, ব্রিটেন ও ইতালি অন্য দিকে। সভাপতি হিসেবে ফ্রান্সের একটি অতিরিক্ত ভোট থাকায় তার মতই জয়যুক্ত হত। এই কমিশনের দায়িত্ব ছিল ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং মিত্রপক্ষের হয়ে ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করা। অর্থের পরিমাণ নির্ধারিত না হওয়ায়, ১৯১৯ সালে জার্মানিকে একটি খালি চেকে সই করতে হয়।

ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে মিত্রপক্ষের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকয় সমস্যাটির সমাধান আরও জটিল হয়ে পড়ে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিশ্ববাণিজ্যের সমৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল ইংলন্ড জার্মানির প্রতি নমনীয় মনোভাব অবলম্বন করতে চেয়েছিল; কারণ, তাহলে জার্মানদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাবে না এবং জার্মানিতে ব্রিটিশ পণ্যের বাজার অটুট থাকবে।

ফ্রান্স বাণিজ্যিক দিক থেকে জার্মান বাজারের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। তবে নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার জন্য ফ্রান্স জার্মানিকে ক্ষতিপূরণের দাবিতে ক্লিষ্ট করতে চেয়েছিল। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর বিরোধিতায় ফ্রান্সের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

ক্ষতিপূরণলব্ধ অর্থের বন্টন নিয়েও মতবিরোধ হয়। ১৯২০ সালে স্পা নামক স্থানে আহুত সম্মেলনে স্থির হয় জার্মানির দেয় ক্ষতিপূরণ থেকে ফ্রান্স পাবে ৫২%, ব্রিটেন ২২%, ইতালি ১০% আর বেলজিয়াম ৮%,। আর বাকি অর্থ ছোট ছোট দেশগুলির মধ্যে ভাগ হবে। বেলজিয়ামের দুর্দশা সবচেয়ে ব্যাপক হওয়ায় তাকে ক্ষতিপূরণ লব্ধ অর্থের ওপর অগ্রাধিকার দেবার অঙ্গীকার করা হয়।

১৯২১ সালে প্যারিস সম্মেলনে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। জার্মানিকে মোট ৬৬,০০,০০০,০০০ পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। জার্মানিকে বছরে ১০০,০০০,০০০ পাউন্ড এবং রপ্তানিলব্ধ অর্থের শতকরা ২৫% দিতে হবে। এর সঙ্গে সংযুক্ত একটি চরমপত্রে বলা হয় যদি ১২ মে-র মধ্যে এগুলি অনুমোদিত না হয় তা হলে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনী রূঢ় উপত্যকা দখল করে নেবে।

ক্ষতিপূরণ সমস্যার সঙ্গে জড়িত আর একটি বিষয় আন্তঃমিত্রপক্ষীয় ঋণ সমস্যা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য মিত্রপক্ষীয় দেশগুলিকে প্রচুর পরিমাণে ঋণ দেয়। যুদ্ধশেষে ১৯২২ সালে আমেরিকা মিত্রপক্ষীয় দেশগুলিকে ঋণশোধের জন্য চাপ দিতে থাকে, কিন্তু মিত্রদেশগুলি যুদ্ধোত্তর সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ঋণ পরিশোধে তাদের অপারগতা ব্যক্ত করে। জার্মানির কাছে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের অর্থ না পাওয়া পর্যন্ত তাদের পক্ষে যুদ্ধকালীন ঋণ শোধ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু মার্কিন সরকার কোনো মতেই যুদ্ধকালীন ঋণের সঙ্গে যুদ্ধোত্তর ক্ষতিপূরণের প্রশ্নকে যুক্ত করতে চাননি। এইভাবে ক্ষতিপূরণ সমস্যা আন্তঃমিত্রপক্ষীয় ঋণ সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পদ্ধতির ক্ষেত্রেও বিরাট সমস্যা দেখা যায়। জার্মানি তিনটি উপায়ে ক্ষতিপূরণ দিতে পারত : স্বর্ণ হস্তান্তর করে, পণ্যের মাধ্যমে বা পরিষেবার মাধ্যমে। প্রথমত, স্বর্ণের মাধ্যমে নির্ধারিত অর্থ দিতে গেলে যে বিপুল স্বর্ণভাণ্ডার থাকা প্রয়োজন, তা জার্মানির ছিল না। এছাড়া এই স্বর্ণ হস্তান্তরিত হলে জার্মানিতে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসত। দ্বিতীয়ত, জার্মান অর্থনীতি প্রাক্ বিশ্বযুদ্ধ পর্যায় থেকে অনেক নেমে যাওয়ায় তার পক্ষে পণ্য দ্রব্য সরবরাহ সম্ভব ছিল না। এছাড়া, সমকালীন জার্মানিতে , অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ (৩.৪.১ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা আছে।) প্রবল হয়ে ওঠায় পণ্য দ্রব্য সরবরাহ করার মানসিকতাও ছিল না। পণ্য বোঝাই-এর (dumping) ভীতিও ছিল। পরিষেবা দানের তৃতীয় বিকল্প ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের প্রভাব কার্যকর ছিল। জার্মানির বাণিজ্যপোতগুলি অধিগৃহীত হওয়ায় পরিষেবা দানের বাস্তব উপায়ও জার্মানির হাতে ছিল না। শেষে বলা যায় যে কোনো পদ্ধতিতেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক না কেন, ক্ষতিপূরণদাতাকে দরিদ্র করার সঙ্গে সঙ্গে তা ক্ষতিপূরণ গ্রহীতাকেও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করত; জার্মানির পক্ষে অস্য দেশের পণ্য ক্রয় করার ক্ষমতা হ্রাস পেত এবং বিশ্ববাজার সংকুচিত হয়ে পড়ত।

ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধানকে তিনটি পর্যায়ে আলোচনা করা যায়ঃ প্রথম পর্যায়ে (১৯২২-২৩) বলপূর্বক আদায় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯২৪-১৯২৯) শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ সমস্যার মীমাংসা করার চেষ্টা করা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে (১৯৩০-৩৩) বিশ্বব্যাপী মহামন্দা ও জার্মানিতে নাৎসিবাদের প্রভাববিস্তারের ফলে ক্ষতিপূরণ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

৩.২.১ বলপ্রয়োগের পর্ব (১৯২২-২৩)

ক্ষতিপূরণ কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে জার্মানি ঠিক সময়েই ১৯২১ সালের আগস্ট মাসে ৫০,০০০,০০০ পাউন্ড মূল্যের কিস্তি দেয়। তিন বছরের মধ্যে এটিই জার্মানির দেওয়া শেষ কিস্তি। কিন্তু যুদ্ধোত্তর জার্মানির অর্থনীতি এই চাপ সহ্য করতে পারেনি। ১৯২০ সাল থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে জার্মান বাজেটে ঘাটতি বাড়তে থাকে।

জার্মান শিল্পপতিরা সুপরিকল্পিত ভাবে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করে। তারা কর ফাঁকি দিয়ে পুঁজি বাইরে পাঠিয়ে ক্ষতিপূরণের বোঝা এড়ানোর চেষ্টা করেন। ফলে সরকারের পক্ষে ক্ষতিপূরণের অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে ওঠে। জার্মান পণ্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে শুল্কের প্রাচীর তুলে দেওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মারফৎ অর্থ সংগ্রহের উপায় জার্মানির হাতছাড়া হয়ে যায়। জার্মান পুঁজি বাইরে যাওয়ায় ও রাজস্ব হ্রাস পাওয়ায় জার্মান বাজেটের ঘাটতি বেড়ে যায়। ফলে কৃত্রিম উপায়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে জার্মান সরকার সাময়িকভাবে সমস্যার সমাধান করে। কিন্তু মার্কের মূল্যহ্রাস, অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি এবং বাজেট ঘাটতির পরিপ্রেক্ষিতে জার্মান সরকারের পক্ষে ক্ষতিপূরণ দেওয়া একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

জার্মানির জীবনে এই মুদ্রাস্ফীতি ভার্সাই চুক্তির চেয়েও বড় বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। সব রকমের আমানত, নির্দিষ্ট সুদভিত্তিক বিনিয়োগ, ব্যাঙ্ক আমানত মূল্যহীন হয়ে পড়ে। মুষ্টিমেয় শিল্পপতি ও ফাটকাবাজরা মুদ্রাস্ফীতির দৌলতে ফুলে ফেঁপে ওঠে। অভিজাত শ্রেণী আগের তুলনায় দরিদ্র হয়ে পড়লেও, তাদের হাতে তখনও জমি, বিষয় সম্পত্তি ও বাসস্থান ছিল। করণিক ও ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধির তুলনায় শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু সবচেয়ে নির্মম আঘাত এসেছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর। সঞ্চিত আমানত হারাবার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রমিকের পর্যায়ে নেমে এল। এই অধিকারচ্যুত, মর্যাদাহীন মধ্যবিত্তই ভবিষ্যতে নাৎসিবাদের প্রধান সমর্থক হয়ে উঠেছিল।

জার্মানির অবস্থা বিবেচনা করে ইংরেজ সরকার দু বছরের জন্য জার্মানির দেয় অর্থের স্থগিতাদেশ দেয়। ফ্রনাস ইংলন্ডের প্রস্তাব মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। ফ্রান্সের মতে এই স্থগিতাদেশের সুযোগে জার্মানি দায়িত্ব এড়িয়ে যাবে। পঁয়কারে স্থগিতাদেশ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতকগুলি শর্ত আরোপ করেন — যেমন ফ্রান্স জার্মানির রং কারখানা ও খনিগুলি অধিকার করে নেবে। একটি তুচ্ছ নিয়মতান্ত্রিক কারণ দেখিয়ে, জার্মানিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়। জার্মানিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ফরাসি ও বেলজিয়ান সৈন্যবাহিনীর রূঢ় আঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে এই অঞ্চলেই জার্মানির ৮০% থেকে ৮৫% কয়লা, ৮০% ইস্পাত ও অশোধিত লৌহ আকর উৎপন্ন হত। বাণিজ্যপণ্য ও খনিজ পণ্যের ৭০% এই অঞ্চল দিয়ে চলাচল করত।

জার্মান সরকার একটি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন ঘোষণা করল। আক্রমণকারীদের সঙ্গে কোনোরকম সহযোগিতা করতে জার্মানদের নিষেধ করা হল। ক্ষতিপূরণ দেওয়া ও পণ্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। জার্মানি অধিকৃত ও অনধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে একটি সীমারেখা টেনে দিল। ফরাসিরা এই সীমানা পেরিয়ে কোনো কিছু পাঠানো নিষিদ্ধ করে একটি পাল্টা বয়কট আরম্ভ করল। ইংরেজ সরকার এ ব্যাপারে ফরাসি সরকারের সঙ্গে কোনো সহযোগিতা করেনি। ফরাসি বাহিনীর উপস্থিতির ফলে জার্মানির অর্থনৈতিক জীবন স্তব্ধ হয়ে যায়। জার্মান রাজকোষ দেউলিয়া হয়ে পড়ে।

একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন রূঢ় অঞ্চলের সমস্যাকে জটিলতর করে তোলে। ফ্রান্স ও বেলজিয়াম গোটা জার্মানি থেকে দাঙ্গা বাজ মানুষদের রাইনল্যান্ডে জড়ো করে, তাদের অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে একটি

বিচ্ছিন্নতাবাদী রাষ্ট্র গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের গভীর আপত্তি ছিল। রাইন অঞ্চলের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ১৯২৪ সালে ফরাসি সহায্য তুলে নেওয়ায় এই আন্দোলনের অবসান ঘটে।

বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে উভয়পক্ষেরই মানব সম্পদ নষ্ট হয়েছিল। এই আন্দোলনের অর্থনৈতিক ফলাফল ছিল আরও মারাত্মক। ফ্রাঁর মূল্যামান প্রায় এক চতুর্থাংশ ক্ষয় পেয়েছিল। জার্মান মুদ্রা মার্ক প্রায় মূল্যহীন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ফরাসি পক্ষ স্বীকার করতে বাধ্য হয়, জার্মানির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সামর্থ নেই। জার্মান সরকারও বিনা শর্তে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়। এইভাবে ক্ষতিপূরণের প্রথম পর্বের অবসান ঘটে।

৩.২.২ ক্ষতিপূরণের আপোষ-মীমাংসার পর্ব

ফ্রান্স ও জার্মানি উভয়পক্ষের সুর নরম হওয়ায় ইংলন্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই সমস্যা সমাধানের আবেদন জানায়। ইতিমধ্যে ফ্রান্স ও জার্মানিতে রাজনৈতিক নেতৃত্বেরও পরিবর্তন হয়েছিল। জার্মানিতে গুস্তাভ স্ট্রেসেসম্যান (Gustav Stresesman) (১৮৭৮-১৯২৯) ১৯২৩-২৯ পর্যন্ত জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে পশ্চিমি রাষ্ট্রে সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে চান। ফ্রান্সেও ১৯২৪ সালের নির্বাচনে পঁয়কারে মন্ত্রীসভার পতন ঘটে এরিয়র (Herriot) নেতৃত্বে একটি প্রগতিশীল মন্ত্রীসভা কায়েম হয়। এই মন্ত্রীসভা বলপূর্বক শান্তি প্রতিষ্ঠার নীতি চিরতরে পরিত্যাগ করে।

ক্ষতিপূরণ পরিশোধ ঠিক মতো আরম্ভ করার আগে জার্মান অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন ছিল। ১৯২৩ সালের শেষের দিকে মার্কিনী, ব্রিটিশ, ফরাসি, বেলজিয়ান ও ইতালীয় সরকার নিযুক্ত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি বাস্তব অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জার্মানির পরিস্থিতি সুবিন্যস্ত করার দায়িত্ব লাভ করে। মার্কিন বিশেষজ্ঞ জেনারাল ডয়েসের নেতৃত্বে ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে প্যারিসে এই কমিটির কাজ শুরু করে।

ডয়েস কমিটি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পেশ করে। (১) জার্মানিতে অর্থনৈতিক ও রাজস্বসংক্রান্ত সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রূঢ় অঞ্চলে থেকে সৈন্য অপসারণ করতে হবে। (২) জার্মানিতে রাইসমার্ক (Reichsmark) নামে একটি নতুন মুদ্রা চালু করতে হবে। একটি ব্যাঙ্ক স্বাধীনভাবে এই মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণ করবে। (৩) জার্মানি ৪০,০০০,০০০ পাউন্ড, বিদেশি ঋণ লাভ করবে। (৪) ক্ষতিপূরণের অর্থ সংগৃহীত হবে পরিবহন কর, রেলপথ আমানত, শিল্পগত ডিবেঞ্চার (deventure)* এবং সুরা, চিনি ও তামাক থেকে সংগৃহীত কর থেকে। (৫) জার্মানি মার্কের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেবে — এরপর বিদেশি সরকারগুলি বিদেশি মুদ্রার সঙ্গে মার্কের বিনিময় করে নেবে। জার্মানি অর্থ সংগ্রহের জন্য ঋণপত্র ছাড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঋণপত্রের অর্ধেকের বেশি ও গ্রেট ব্রিটেন এক-চতুর্থাংশের বেশি কেনে। এই উদ্যোগের সাফল্য পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে। (৬) ক্ষতিপূরণ আদায় প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য একজন বিদেশি এজেন্ট জেনারেলকে নিযুক্ত করা হয়। লন্ডন কনফারেন্সে (১৯২৪) ইংলন্ড, ফ্রান্স ও জার্মানি ডয়েস পরিকল্পনা অনুমোদন করে।

সাময়িকভাবে ক্ষতিপূরণ সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান হবার ফলে শুধু জার্মানি ও মিত্রপক্ষের সম্পর্কের উন্নতি হল না, ইংলন্ড ও ফ্রান্সে সম্পর্কেরও উন্নতি হল। দ্বিতীয়ত,. সাময়িকভাবে জার্মান অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ঘটল, জার্মান ব্যবসা-বাণিজ্য ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল, নিয়মিতভাবে ক্ষতিপূরণের কিস্তি জমা পড়তে লাগল। সর্বসাধারণের মনে জার্মানির সদর্থক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা ফিরে এল। রূঢ় থেকে ফরাসি ও বেলজিয়ান বাহিনী অপসারিত হল। কিন্তু ডয়েস পরিকল্পনা ক্ষতিপূরণ দেবার সময়সীমা নির্ধারিত না করায় জার্মানি অর্থ সঞ্চয় করে রাখার কোনো অনুপ্রেরণা পায়নি। ফলে জার্মানির উদ্বৃত্ত অর্থ বিদেশি ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা হয়েছিল এবং সামগ্রিকভাবে জার্মান অর্থব্যবস্থা বিদেশি নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। জার্মানি ঋণভারে জর্জরিত

* ডিবেঞ্চার-একটি বণিক সংস্থা বা সরকারের দেওয়া ঋণপত্র।

হয়ে পড়ে। পরবর্তী পাঁচ বছর জার্মানির প্রতিটি পৌরসভা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের কাছ থেকে বিরাট অঙ্কের দেনা করে। বিপুল পরিমাণ বিদেশি পুঁজি পরোক্ষভাবে জার্মানিতে উৎপাদনের জোয়ার এনে দিয়েছিল।

লোকার্নো চুক্তির পর থেকে ফ্রান্স-জার্মান সম্পর্কের উন্নতি ঘটায় জার্মানি রাইনল্যান্ডকে বিদেশি সৈন্যমুক্ত এবং সার উপত্যকাকেও ফরাসি প্রভাবমুক্ত করার দাবি জানায়। দ্বিতীয়ত, জার্মানি ডয়েস পরিকল্পনা নির্ধারিত কঠোর আর্থিক নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। তৃতীয়ত, উভয়পক্ষই চাইল ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করতে। চতুর্থত, ইংলন্ড ও ফ্রান্সের জনমতও রাইনল্যান্ডকে বিদেশি সৈন্যমুক্ত করার দাবি জানায়।

আলোচ্য সমস্যা সমাধান করার জন্য ১৯২৯ সালের ৭ জুন ইয়ং পরিকল্পনা পেশ করা হয়। জেনেভা চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রগুলি থেকে দুজন করে বিশেষজ্ঞ নিয়ে এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে দুজন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। প্রবীন মার্কিন বিশেষজ্ঞ আওয়েন ইয়ং (Owen Young) সভাপতি নির্বাচিত হলেন এবং তাঁর নাম অনুযায়ী এই কমিটি ইয়ং কমিটি নামে অভিহিত হল।

ক্ষতিপূরণ সমস্যার স্থায়ী সমাধান করার জন্য ইয়ং কমিটি সুপারিশ করে, (১) গড়পড়তা ১০০,০০০,০০০ পাউন্ড অর্থ সাঁইত্রিশটি বাৎসরিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। এছাড়া ছোট অঙ্কের বাইশটি বাৎসরিক কিস্তি শোধ করতে হবে। এই বাইশটি কিস্তির অর্থের পরিমাণ যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দেয় আন্তঃমিত্রপক্ষীয় ঋণের সমান হয়। এই ব্যবস্থা চালু থাকবে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত। (২) জার্মান অর্থব্যবস্থাকে বিদেশি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হল। অর্থ হস্তান্তরের দায়িত্ব উত্তমর্ণ দেশগুলির পরিবর্তে জার্মান সরকারে হাতে ন্যস্ত করা হয়। (৩) প্রতিটি বাৎসরিক কিস্তির প্রায় এক তৃতীয়াংশ অর্থ (৩৩,০০০,০০০ পাউন্ড) নিঃশর্ত দেয় বলে বিবেচিত হবে। বাকি অংশ শোধ করতে গিয়ে বৈদেশিক বিনিময় সংক্রান্ত কোনো অসুবিধা দেখা দিলে, জার্মানি দুই বছরের জন্য তা স্থগিত রাখতে পারবে। শেষত, একটি আন্তর্জাতিক সেটেলমেন্ট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। এই ব্যাঙ্কের কাজ হবে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত অর্থ আদায় ও বিতরণ, বাৎসরিক কিস্তিলব্ধ অর্থের ভিত্তিতে একটি আন্তর্জাতিক ঋণপত্র ছাড়া ও সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব পালন করা।

কতকগুলি অপ্রত্যাশিত অসুবিধা অতিক্রম না করে ইয়ং পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। শ্রমিক সরকারের অর্থমন্ত্রী (Philip Snowden) ফরাসিদের কোনোরকম সুযোগ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর দাবি অনুসারে ইয়ং পরিকল্পনার একটি সংশোধিত খসড়া অনুমোদিত হয়। ১৯২৯ সালে হেগ শহরে আহুত একটি সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ১৯৩০ সালের ৩০ জুনের মধ্যে রাইন অঞ্চল থেকে সমস্ত মিত্রপক্ষীয় সৈন্য অপসারণ করা হবে। আশা করা হয় তার আগেই ইয়ং পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব হবে।

৩.২.৩ ব্যর্থতার পর্ব ঃ ১৯৩০-৩৩

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল ইয়ং পরিকল্পনা ক্ষতিপূরণ পরিকল্পনার স্থায়ী সমাধান করতে পারবে। কিন্তু ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্তরে জার্মানি তথা গোটা বিশ্বে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটে যাতে ক্ষতিপূরণ সমস্যার স্থায়ী সমাধান অসম্ভব হয়ে পড়ে।

১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে স্ট্রেসেসম্যানের মৃত্যুর পর জার্মান রাজনীতি এক গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়। জার্মান রাজনীতিতে মধ্যপন্থী দলগুলির জনপ্রিয়তা ক্রমশ হ্রাস পায় এবং তাদের আসন সংখ্যা কমতে থাকে। অন্যদিকে বামপন্থী দক্ষিণপন্থী দলগুলির আসন সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। ১৯২৪ সালে নাৎসি

দলের ১৪টি আসন ছিল, ১৯৩০ সালে তা ১০৭-এ গিয়ে পৌঁছায়। অন্যদিকে ১৯২৪ সালে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির ৪৫টি আসন ছিল, ১৯৩০ সালে তাদের আসন সংখ্যা বেড়ে হয় ৭৭টি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহামন্দার পরিপ্রেক্ষিতে জার্মান অর্থব্যবস্থা ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। ডয়েস পরিকল্পনার যুগে মার্কিন অর্থ এক চক্রাকার আবর্তনে আবর্তিত হচ্ছিল—আমেরিকা থেকে ঋণ হিসেবে জার্মানিতে, জার্মানি থেকে ক্ষতিপূরণের দাবিদারদের কাছে, সেখান থেকে পুনরায় আন্তঃরাষ্ট্রীয় ঋণ হিসেবে এই অর্থ আমেরিকায় ফিরে গিয়েছিল। ১৯২৭-২৮ সালে জার্মানি ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয় অর্থের প্রায় পাঁচগুণ বেশি বিদেশ থেকে ধার করেছিল। রাজস্ব বাড়লেও ব্যয় আরও বেশি বেড়েছিল, সব মিলিয়ে বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ বেড়েই চলেছিল। মহামন্দার ফলে মার্কিন ঋণ পাওয়া এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। নবনিযুক্ত চ্যান্সেলার ব্রুনিং কঠোরভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইলে তাঁর পতন ঘটে। এর অনেক আগেই ইয়ং কমিটির জার্মান অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ রেইখ্‌শ্‌ ব্যাঙ্কের গভর্নর হালমার শ্যাকটে (Schacht) সতর্ক করে দিয়েছিলেন, প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ জার্মানির সাধ্যের অতীত।

এই অবস্থায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট হুভার (১৯৩১) এক ঘোষণার দ্বারা এক বছরের জন্য বিশ্বের সমস্ত আর্থিক লেনদেন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এর ফলে জার্মানি ক্ষতিপূরণ দেওয়া থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি পেল।

১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসে জার্মান সরকার ঘোষণা করল যে ভবিষ্যতে ক্ষতিপূরণের বাৎসরিক কিস্তি দিতে গেলে জার্মানির অর্থনৈতিক জীবন ভেঙে পড়বে। ব্যাঙ্ক অফ ইনটারন্যাশানাল সেটেলমেন্ট এ ব্যাপারে পরামর্শ দেবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করে। এই পরামর্শদাতা কমিটি (Basle) বাসলে ৭ ডিসেম্বর মিলিত হয়ে জানায় ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে দেয় বাৎসরিক কিস্তি দেওয়া জার্মান সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই প্রতিবেদনে বিভিন্ন সরকারে পারস্পরিক ঋণ সম্পর্কে আপোষ রফা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসে (Lausanne) লোসানে এই সম্মেলন আহুত হবার কথা ছিল। কিন্তু ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে তখনও পর্যন্ত ফ্রান্সে ও ইংলন্ডের তীব্র মতপার্থক্য থাকার ফলে, ১৯৩২ সালের জুন মাসে অবশেষে এই সম্মেলন আহুত হয়। এই সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় জার্মানি ১৫০ মিলিয়ন পাউন্ড এক কালীন দিলে ক্ষতিপূরণ প্রশ্নের অবসান ঘটবে। কিন্তু এই সময়েই ২ জুলাই অপর একটি চুক্তিতে বলা হয় মিত্রপক্ষের সঙ্গে তাদের উত্তমর্ণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঋণশোধের প্রশ্নটির চূড়ান্ত মীমাংসা হলে, তবেই ক্ষতিপূরণ প্রশ্নের নিষ্পত্তি ঘটবে। এইভাবে ক্ষতিপূরণ প্রশ্নটি শেষ পর্যন্ত আন্তঃমিত্রশক্তি ঋণের সঙ্গে জটিল গ্রন্থিতে জড়িয়ে যায়। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্ষতিপূরণ সমস্যাটি পুনরায় উন্মোচিত হবার সম্ভাবনা ছিল না বললেই চলে। কারণ, ১৯৩৩ সালে নাৎসিরা সব রকমের বিদেশি ঋণশোধ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। এছাড়া, জার্মানির অভ্যন্তরীণ আর্থিক সংকট জার্মানিতে বিনিয়োজিত বিদেশি পুঁজিকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়েছিল।

৩.২.৪ ক্ষতিপূরণের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

ক্ষতিপূরণ সমস্যা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং অভ্যন্তরীণ ইতিহাসে গভীর প্রভাব রেখে গিয়েছিল।

কার্যত, জার্মানি ক্ষতিপূরণ হিসেবে ঠিক কতটা অর্থ দিয়েছিল তা সূক্ষ্ম গাণিতিক গবেষণার বিষয়। অধ্যাপক এ. জে. পি. টেলর দেখিয়েছেন, সে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ঠিক কতটা অর্থ দিয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বণিকদের কাছ থেকে ধার করেছিল । হিসেব করলে দেখা যায় যুদ্ধের অব্যবহিত পরে সে বিভিন্ন বস্তুর (in kind) মাধ্যমে যে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল, তাছাড়া আর কোনো ক্ষতিপূরণই তাকে

দিতে হয়নি। তার উত্তমর্ণরা তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে যে পরিমাণ অর্থ পেয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি অর্থ তারা জার্মানিতে বিনিয়োগ করে হারিয়েছিল। অধ্যাপক ডেভিড টমসন এই সমস্যাকে 'এক অন্তঃসারশূন্য বিরাট বুদ্ধুদে'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। জার্মানি দেখিয়ে দিয়েছিল একটি অধমর্ণ রাষ্ট্র কীভাবে উত্তমর্ণ রাষ্ট্রগুলিকে বাধ্য করে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে। উত্তমর্ণ রাষ্ট্রগুলির আশা ছিল, তারা শেষ পর্যন্ত তাদের সম্পদ ফেরৎ পাবে। কিন্তু তারা ঠকেছিল। ১৯২৪ থেকে ৩১ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অধমর্ণ রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে শোধ পেয়েছিল দুই বিলিয়ন ডলার, অথচ সে জার্মানিকে ধার দিয়েছিল ২.৫ বিলিয়ন ডলার। কার্যত, ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য যে অর্থ জার্মানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ঋণ হিসেবে পেয়েছিল তার একটি অংশ জার্মানি তার আর্থিক পুনর্গঠনের কাজে লাগিয়েছিল।

অন্যদিকে, ক্ষতিপূরণ সমস্যা অপ্রত্যাশিতভাবে মিত্রপক্ষীয় দেশগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। প্রচুর জার্মান জাহাজ ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাওয়ায় ইংলন্ডের জাহাজ শিল্পে মন্দার সৃষ্টি হয়েছিল।

সামগ্রিকভাবে ক্ষতিপূরণ সমস্যা ও যুদ্ধকালীন ঋণশোধ সমস্যা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিশ্ব বাণিজ্যকে নঞর্থকভাবে প্রভাবিত করেছিল। প্রথমত, ক্ষতিপূরণ সমস্যাকে সরাসরি মিত্রপক্ষীয় ঋণের সঙ্গে জুড়ে দিতে পারলে আন্তর্জাতিক ঋণশোধের সমস্যার একটি সহজ সমাধান করা সম্ভব হত। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি সরাসরি ক্ষতিপূরণলব্ধ অর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আপত্তি জানায়। দ্বিতীয়ত, যে সময়, অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল, এবং সম্পদ ও পরিষেবার দ্বিপাক্ষিক চলাচল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রগতির জন্যই অপরিহার্য ছিল,সেই সময় পুঁজি বা অর্থের একপাক্ষিক চলাচল বাণিজ্যিক অচলাবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

ক্ষতিপূরণ ও যুদ্ধকালীন ঋণ সমস্যা রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে পৌনঃপুনিক তিক্ততা ও প্রতিহিংসা পরায়ণতা সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য যখন বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা দরকার, তখন এই তিক্ততা এক অমঙ্গলের আবহাওয়া গড়ে তুলেছিল।

আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বিশেষ করে, "জার্মানিকে অর্থ দিতে বাধ্য করার" একগুঁয়ে জেদ ফ্রান্স ও জার্মানির সম্পর্ককে চিরতরে তিক্ত করে তুলেছিল। এ. জে. পি. টেলরের ভাষায় 'ক্ষতিপূরণ ছিল একটি প্রতীক। এটি সৃষ্টি করেছিল ক্ষোভ, সন্দেহ এবং আন্তর্জাতিক শত্রুতা। অন্য সব কিছুর তুলনায় এটিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ উন্মুক্ত করেছিল।' ("Reparation counted as symbol. They created resentment, suspicion, and international hostility. More than anything else, they cleared the way for the Second World War") *Origins of the Second World War.* টেলরের এই বক্তব্য পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। এটিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ বলা যায় না।

বিশেষত, ফরাসি-জার্মান সম্পর্ক তিক্ততর হয়ে উঠেছিল। প্রথমত, রাইনল্যান্ডের দক্ষিণে ফরাসি বাহিনীর আচরণ ছিল বিজয়ীর মতো। দ্বিতীয়ত, রাইনল্যান্ডে ফরাসি বাহিনীতে একটি অশ্বেতকায় সৈন্যদলের উপস্থিতি তীব্র জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। ফরাসি ঐতিহ্যে শ্বেতকায় ও অশ্বেতাকায় মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না । কিন্তু জার্মানরা এতে অপমানিত বোধ করে। কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিকদের তথাকথিত অন্যায় আচরণ জার্মান প্রচারযন্ত্র কাজে লাগিয়েছিল। তৃতীয়ত, রাইনল্যান্ডে ফরাসি সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছিল। তবে শেষ বর্যন্ত এই আন্দোলন সফল হয়নি। চতুর্থত, ফ্রান্স রূঢ় অধিকার করায় জার্মানরা নিষ্ক্রিয়

প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে। ফ্রান্স পাল্টা প্রতিরোধ শুরু করে। পঞ্চমত, ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারে ফ্রান্সের অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি জার্মান-ফ্রান্স সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

তবে ১৯২৪ সালের পর স্ট্রেসেসম্যানের নেতৃত্বে ফ্রান্স-জার্মানি সহযোগিতার পর্ব শুরু হয়। একদিকে দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা প্রচেষ্টা এবং রাইনল্যান্ড অঞ্চলকে বিদেশি শত্রুমুক্ত করার চেষ্টা হয়। এর পাশাপাশি জার্মানি ক্ষতিপূরণের প্রথম কিস্তি দিতে আরম্ভ করে।

জার্মানির ওপর অবাস্তব দাবি চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে কেইনস তীব্র প্রতিবাদ জানান। তাঁর বক্তব্য দুর্ভাগ্যক্রমে হিটলারীয় প্রচারের প্রধান উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তিনি অন্তত একটি সঠিক অনুমান করেছিলেন যে এই ক্ষতিপূরণ কয়েক বছরের বেশি আদায় করা যাবে না।

ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ স্বর্ণ সম্ভার আমেরিকার সিন্দুকে গিয়ে জমা হয়। আমেরিকা অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতির ভয়ে এই সোনা সিন্দুক থেকে বের করেনি। অথচ, পৃথিবীর অন্যান্য সব জায়গায় সোনার অভাবে স্বর্ণমান ছেড়ে দিতে হয়েছিল— এ ব্যাপারে নেতৃত্বে ছিল গ্রেট ব্রিটেন। ১৯২০-র দশকের গোড়ায় ক্ষতিপূরণকে কেন্দ্র করে যে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছিল এবং ১৯২৯ সালের গোড়ায় যে বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রভাবে গোটা পৃথিবীর অর্থনীতি সঙ্কটাপন্ন হয়েছিল—দুটি ঘটনা পরস্পরের সঙ্গে অমোঘ যুক্তিকাঠামোয় যুক্ত।

৩.৩.১ মহামন্দা (১৯২৯)

১৯৩১ সালে জে. এম. কেইনস (Keynes) বলেছিলেন, “আমরা আজ আধুনিক পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনৈতিক সংকটের মাঝে দাঁড়িয়ে আছি—এই বৃহত্তম সংকট প্রায় পুরোপুরি অর্থনৈতিক কারণ থেকে জাত”। (“We are today in the middle of the greatest economic catastrophe-the greatest catastrophe due almost entirely to economic causes of the Modern World”) উৎস : P. Fearson, *“The Origins and Nature of the Great Slump”*. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরম্ভ করে এই মহামন্দা পৃথিবীর সকল শিল্পায়িত অগ্রসর রাষ্ট্র থেকে অনুন্নত প্রাথমিক উৎপাদক (primary producer) রাষ্ট্র পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

কেন এবং কীভাবে এই মহামন্দার সৃষ্টি হল। এই জটিল ঘটনাক্রমের যে কোনো ব্যাখ্যা অনুমান মাত্র, কারণ এখনও পর্যন্ত অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকেরা এই সঙ্কটের বিস্তারিত তথ্য সম্পর্কে একমত হতে পারেননি। তবু মহামন্দা সম্পর্কিত সর্বজনগ্রাহ্য যুক্তিগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপিত করা যায়।

মহামন্দা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ায় প্রমাণ হয়, বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল এবং কতকগুলি সূত্র দ্বারা গ্রথিত। উনিশ শতকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচামালের উৎস, উৎপাদিত পণ্যের বাজার এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু হয়। এই অনুসন্ধানের সূত্র ধরেই বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত এই ধারাবাহিকতায় ছেদ ঘটায়। তবে ১৯২০-র দশক থেকেই এই আদান-প্রদান আবার চালু হয় আর এই বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের সূত্রেই সমৃদ্ধির পাশাপাশি সঙ্কটের ঢেউও পৌঁছে যায় দূরে দূরান্তে। উনিশ শতক থেকেই অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সাত থেকে দশ বছর পর পর তেজি ও মন্দা বাণিজ্যের চক্রাকার আবর্তনে আবর্তিত হত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ইতিহাস থেকে প্রমাণ করা যায়, ১৯১৩ সাল নাগাদ ইয়োরোপের কয়েকটি প্রধান রাষ্ট্র সমৃদ্ধির চূড়ান্ত শীর্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল. কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ এই সমৃদ্ধিকে ১৯১৯-২০ পর্যন্ত থমকে রাখে, ১৯২১-২২ সাল থেকেই মন্দার প্রবণতা এসে যায়। এই প্রবণতা অনুসারে ১৯২০ দশকের শেষাশেষি বাণিজ্যিক মন্দা ছিল প্রত্যাশিত।

যখন এই মন্দা এসে পৌঁছল, তখন দেখা গেল এটি সাধারণ নিয়মমাফিক চক্রাকার মন্দা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ একটি ঘটনা। বিশ্ব অর্থনীতির বিকাশে ভারসাম্যের অভাব এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল, যেখানে প্রতিটি সাফল্যের আড়ালে লুকিয়ে ছিল প্রগাঢ় সঙ্কট। অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রেই এই আপাত বিরোধিতার উপস্থিতি প্রকট হয়ে উঠেছিল।

যুদ্ধোত্তর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল সবচেয়ে বড় উৎপাদক, ঋণদাতা এবং পুঁজি বিনিয়োগকারী। মার্কিন অর্থনীতির অগ্রগতি গোটা শিল্পায়িত বিশ্বের অর্থনৈতিক বিকাশকে কম বেশি প্রভাবিত করেছিল। '২০-র দশকের দ্বিতীয়ার্ধে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকার ৩% মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, অথচ পৃথিবীর শিল্পজাত পণ্যের ৪৬%, মোট তেলের ৭০%, মোট কয়লার ৪০%, উৎপন্ন হ'ত আমেরিকায়। তাছাড়া, আমেরিকার উদ্বৃত্ত পুঁজির প্রবাহ জার্মান ক্ষতিপূরণ এবং আন্তঃমিত্রপক্ষীয় ঋণশোধ সমস্যার সমাধান করতে সাময়িকভাবে সাহায্য করেছিল। সে বিশ্বের অর্থবাজারে অর্থের উপযুক্ত গতিশীলতা (liquidity) বজায় রেখে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল।

ইয়োরোপে কয়লা, ইস্পাত ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ওপর অত্যাধিক ঝোঁক পড়ার ফলে ভোগ্যপণ্য কেন্দ্রিক নতুন শিল্পগুলি অবহেলিত হয়ে পড়েছিল। কাজেই ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মানির মতো ইয়োরোপীয় দেশগুলি বিশ্ববাণিজ্যে তাদের পূর্বতন অবস্থান থেকে ক্রমশ নেমে যেতে লাগল। এর বিপরীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোটর গাড়ি শিল্পের মতো ভোগ্যপণ্য শিল্পকে প্রাধান্য দিয়ে ইয়োরোপের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে গিয়েছিল। কৃষিক্ষেত্রেও একই ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। ইয়োরোপ এবং উত্তর আমেরিকা অধিকতর দক্ষতা এবং ব্যাপকতর প্রযুক্তির প্রয়োগে উৎপাদন বৃদ্ধি করে কৃষিপণ্যের মূল্যাহার কমিয়ে ফেলে. কৃষিপণ্যের দাম কমে যাওয়ায় অশুভ ছায়া পড়েছিল কাঁচামাল উৎুপাদনকারী রাষ্ট্রগুলির ওপর। অর্থনীতির দুটি ক্ষেত্রেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রগতি কার্যত, অন্যান্য রাষ্ট্রে অগ্রগতির গতিরোধ করেছিল। শিল্প উৎপাদনের গৌণ ক্ষেত্রে (Secondary) সে বিশ্বের বাজারকে রপ্তানি বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিল, অথচ ইয়োরোপীয় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সে শুল্ক প্রাচীর অবলুপ্ত করতে প্রস্তুত ছিল না। আবার, উৎপাদনের প্রাথমিক (primary) ক্ষেত্রে, অর্থাৎ কৃষি ও কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে চাহিদা সীমায়িত হওয়ায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উৎপাদনের চূড়ান্ত পর্যায়ে সহজেই পৌঁছে গিয়েছিল।

পুঁজি সরবরাহ করে বিদেশে বাণিজ্যকে চাঙ্গা করার ক্ষমতা পরোক্ষভাবে বাণিজ্যিক মন্দার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করেছিল। ১৯২০-র দশকে পুঁজির কোনো অভাব ছিল না। ১৯২৫ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৯০০,০০০,০০০০ ডলার ইয়োরোপীয় দেশগুলিকে ঋণ দিয়েছিল। এর ফলে আমেরিকার অর্থনৈতিক প্রাধান্য প্রমাণিত হয়েছিল। মার্কিন ডলারের সাহায্যেই জার্মানির পক্ষে ক্ষতিপূরণের কিস্তি মিটিয়ে উদ্বৃত্ত অর্থে পুনর্গঠনের কাজ করা সম্ভব হয়েছিল। আবার, অন্যদিক থেকে মার্কিন বিনিয়োগের কতকগুলি নেতিবাচক দিক ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অধমর্ণ হবার বৃত্ত হড়ে তুলেছিল। প্রথমত, মার্কিন ঋণের সাহায্যে জার্মানি মিত্রপক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল, তারা আবার সেই অর্থের সাহায্যে আমেরিকার যুদ্ধকালীন বিনিয়োগের ওপর সুদ দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর দরিদ্রতর দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ শোধ করার জন্য তার কাছ থেকেই পুনরায় অর্থ ধার করে। পণ্য উৎপাদনে মার্কিন স্বনির্ভরতার ফলে পণ্যের মাধ্যমে ঋণ শোধ করার কোনো উপায় ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে, বিনিয়োগ বাড়ালেও ব্যবসার পরিমাণ বাড়নি, কেননা ঋণশোধ করা হল সোনা দিয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সোনার কোনও কার্যকারিতা ছিল না। সেখানে আরও বেশি সোনা যাওয়া মানে, খনিতে ফিরে যাওয়ার মতোই অবস্থা। সোনা অমিল, জিনিসের দাম পড়ে যায়, আমেরিকায় মহামন্দা আসার আগেই

গোটা পৃথিবীতে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় অধমর্ণদের ঋণশোধ করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। ১৯২৯ সাল নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সমস্ত সরবরাহকৃত সোনার ভাণ্ডারে পরিণত হয়। তার ফলে পণ্য বিনিময়ের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বিকৃত হয়ে পড়ে।

পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে এই বিকৃতি জন্ম দেয় তৃতীয় স্ববিরোধের। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ইংলন্ড বহু চেষ্টায় ১৯২৫ সালে পাউন্ডকে স্বর্ণমানে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল। ১৯২৮ সালে ইংলন্ড অন্যান্য দেশগুলিকে তার উদাহরণ অনুসরণ করতে উৎসাহিত করে। তাতে বাণিজ্যিক অস্থিরতা দূর হবার বদলে আরও বেড়ে যায়। বিভিন্ন দেশের সরকার নিজেদের মুদ্রার মূল্যহার বাড়াতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বর্ণ রফতানির পথ প্রশস্ত করে। ১৯২৭ সালের জেনেভা সম্মেলন এই অর্থনৈতিক সঙ্কট দূর করার জন্য মিলিত হলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। বিভিন্ন দেশ সংরক্ষণমূলক বাণিজ্যনীতির আড়ালে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

১৯২৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহামন্দা নেমে আসে। গত এক দশক জুড়ে অপর্যাপ্ত পুঁজি সরবরাহের সাহায্যে মার্কিন শিল্পের দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সচেতনভাবে পুঁজি সরবরাহের নীতি গ্রহণ করেছিল। ১৯২৮ সালে শেয়ার বাজারে মূল্যহার ২৫% বেড়ে গিয়েছিল, ১৯২৯ সালে তা ৩৫%, বৃদ্ধি পায়। ১৯২৫ সালের পর থেকেই ফাটকাবাজি বেড়ে গিয়েছিল। ১৯২৮ সালে ফেডেরাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার বাড়িয়ে পুঁজির বাজারে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। সাগর পারে বিনিয়োজিত পুঁজি আমেরিকায় ফিরিয়ে আনার ফলে অভ্যন্তরীণ পুঁজি ফুলে ফেঁপে ওঠে। যতদিন অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের তেজিভাব বজায় ছিল, ততদিন সঙ্কট প্রকট হয়ে ওঠেনি। ভোগ্যপণ্যের চাহিদার তুলনায় যোগান এত বেড়ে গিয়েছিল যে উৎপাদন হ্রাস অপরিহার্য হয়ে ওঠে। অনন্ত অর্থনৈতিক সম্ভাবনার ধারণা মরীচিকায় পরিণত হয়।

বাণিজ্যিক চক্রে ধীর আবর্তনের কারণ উৎপাদক মণ্ডলীর অসংগঠিত আশাবাদ। দশটি কাপড়ের চাহিদা থাকলে ১০০টি কাপড় উৎপাদন করা হল— অর্থাৎ ৯০টি কাপড় ক্ষতি স্বীকার করে কম দামে বাজারে ছেড়ে দিতে হল। ১৯২৯ সালে আমেরিকা ৫,৩৫৮,০০০ মোটরগাড়ি, ৫৫০০০০০০০ টন ইস্পাত এবং মোট জনসংখ্যার তিনগুণ বুট জুতো উৎপাদন করেছিল। জুতো কারখানার আরও তিনগুণ উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল। এর পাশাপাশি আমেরিকার প্রাকৃতিক সম্পদ বিপুল, বেতনহার অত্যন্ত চড়া। কাজেই সে বাইরের পৃথিবীতে উৎপাদিত পণ্য চড়া শুল্কের প্রাচীর দিয়ে আটকে রাখতে চেয়েছিল।

আলোচ্য পরিস্থিতিতে আমেরিকা নিজের পণ্য রপ্তানি করতে চাইলে তাকেই সেই পণ্য কেনার অর্থও ধার দিতে হ'ত। সেই সময় যুদ্ধ ঋণ একটি বিতর্কিত বিষয়, রাশিয়ার মতো বৃহৎ রাষ্ট্রের বিপুল ঋণ মুকুব করে দেওয়া হয়েছিল, কাজেই লগ্নিকারীরা দীর্ঘস্থায়ী ঋণ দিতে অস্বীকার করেছিল। অধিকাংশ ঋণই ছিল স্বল্পমেয়াদী ঋণ, যা যে কোনো মূহুর্তে ফেরৎ নেওয়া যাবে। ফলত, পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র অত্যন্ত অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অস্থিরতা জন্ম নেয়। পূর্বতন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি— যেমন সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড প্রত্যেকেই স্বল্পমেয়াদী ঋণের ওপরেই নির্ভরশীল ছিল। এই রাষ্ট্রগুলি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজির পাহাড়ে জমে গিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই অলস পুঁজি তারা বিভিন্ন দেশকে ধার দিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা বা বিনিময় মাধ্যমের অবমূল্যায়নের গুজব ছড়ালেই এই পুঁজি ফেরৎ চাওয়া হ'ত। লোকার্নো পর্বের অর্থনৈতিক আশাবাদের ভিত্তি ছিল নিয়ত পরিবর্তমান। যে কোনো মূহুর্তে বিপর্যয়ের ভীতি ধ্বংস করে ফেলত আপাত সমৃদ্ধিকে।

কাজেই শেষ পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে বা শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনের আধিক্য নয়, ফাটকা বাজির বুদ্বুদ ফেটে যাওয়াতেই ঘটেছিল বিপর্যয়—এই ঘটনাকে তুষার ঝটিকার সঙ্গে তুলনা করা হয়। ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে ওয়ালস্ট্রীটে শেয়ার বাজারে ভাঙনের পদচিহ্ন শোনা যায়। ২৪ অক্টোবর কৃষ্ণ বৃহস্পতিবার শোয়ারের মালিকরা উন্মাদের মতো শেয়ার বিক্রি করতে আরম্ভ করে। ঐ একদিনে প্রায় ১৩ মিলিয়ন শেয়ার বিক্রি হয়। ২৯ তারিখে আরও ১৬.৫ মিলিয়ন শেয়ার হস্তান্তরিত হয়। ঐ মাসের শেষে আমেরিকার লগ্নিকারীদের ৪০,০০০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়। সরকার এবং ব্যাঙ্কগুলি শত চেষ্টাতেও এই ধ্বংস আটকাতে পারল না। নভেম্বর মাসে আরও একটি সর্বনাশা ধস্ মার্কিন অর্থ ব্যবস্থাকে স্তব্ধ করে দিল। পুঁজি আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে গেল।

মন্দার প্রভাবে শিল্পগত উৎপাদন ও জাতীয় আয় অর্থক হয়ে গিয়েছিল। জাতীয় উৎপাদনের হার এক তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েছিল, কর্মক্ষম নাগরিকদের ২৫%, কর্মহীন হয়ে পড়লেন। এক তৃতীয়াংশ ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পাইকারি মূল্যহার ৩২%, হ্রাস পেয়েছিল। সামগ্রিকভাবে কৃষিপণ্যের মূল্যহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। ১৯৩০ সালে প্রায় ১৩৪৫টি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে যায়। ১৯২৯ থেকে ৩০ সালের মধ্যে মার্কিন পুঁজিপতিরা বিদেশে ঋণ দেওয়া ৬৮%, হ্রাস করে তারপর বন্ধ করে দেয়। তার ফলে আমদানি প্রায় ৪০% হ্রাস পায়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে রক্ষা করার জন্য কঠোরতম শুল্ক আইনের মাধ্যমে ৫৯%, শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়ে (Hawley Smoot Tarriff Act. 1930) গ্যাথর্ন হার্ডির ভাষায় "অ্যাটলাস কাঁধে করে যে পৃথিবীকে ধারণ করে রেখেছিল , তা পিছলে পড়ে চূর্ণ হয়ে গেল।" ("...the world slipped with a crash from the shoulders of the Atlas who had sustained it.")

৩.৩.২ মহামন্দার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

বিশ্ব অর্থনীতি অমোঘ যুক্তি কাঠামোয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রভাব সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে সময়ের চালু ঠাট্টা ছিল 'আমেরিকার হাঁচলে সারা পৃথিবীর ঠান্ডা লেগে যায়।' ১৯২০-র দশকের অর্থনৈতিক ও আর্থিক কাঠামো ছিল ভঙ্গুর; সুতরাং আমেরিকার বিপর্যয় খুব সহজেই অন্য অর্থনীতিগুলিকে বিপর্যস্ত করেছিল।

১৯২৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইয়োরোপকে ঋণ দেওয়া বন্ধ করল। এর ফলে পৃথিবীর একটা বড় অংশের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেল। আবার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাবার ফলে মূল্যহার নেমে গেল। মূল্যহার নেমে যাওয়ায় কাঁচামাল উৎপাদনকারী রাষ্ট্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হল। দক্ষিণ গোলার্ধে অস্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিম গোলার্ধে আর্জেন্টিনায় কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস পায়। কফির বাজার পড়ে যাওয়ার পরের বছর ব্রাজিল দেউলিয়া হয়ে পড়ে মধ্য ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে শিল্প বাণিজ্য স্তব্ধ হয়ে যায়।

মহামন্দার প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে গভীর সঙ্কট ছাড়াও বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অভিঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুত পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে কে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তা চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। বিভিন্ন অর্থনীতির মধ্যে তুলনামূলক বিচারও সহজ নয়। ১৯৩৬-এ আমেরিকার The Brooking Institution শিল্পোৎপাদনের ভিত্তিতে জার্মানি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও পোলান্ডের অর্থনীতিকেই সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত বলে নির্দিষ্ট করেছিল। এর পরেই ছিল চেকোশ্লোভাকিয়া. হল্যান্ড ও অস্ট্রিয়ার স্থান। শিল্পায়িত দেশগুলির মধ্যে জাপান সব থেকে কম প্রভাবিত হয়েছিল; ব্রিটেনের বিপর্যয়ও আপেক্ষিকভাবে কম অনুভূত হয়েছিল। অন্যদিকে, ফ্রান্সে এর প্রভাব শুরু হয় একটু দেরিতে। কিন্তু ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি অন্যত্র অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন শুরু হলেও, ফ্রান্সের অর্থনীতি ক্রমশ নিম্নমুখী হয়েছিল। ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি।

শিল্পোৎপাদনের সারণী (১৯২৯ = ১০০)

	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩২	১৯৩৫
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৮৯	৯৩	১০০	৮১	৫৪	৭৬
ইংলন্ড	৯৬	৯৪	১০০	৯২	৮৪	১০৬
সোভিয়েত ইউনিয়ন	৬৪	৮০	১০০	১৩১	১৮৩	২৯৩
জার্মানি	১০২	৯৯	১০০	৮৬	৫৩	৯৪
অস্ট্রিয়া	৯০	৯৯	১০০	৮১	৬০	৭৭
ফ্রান্স	৭৯	৯১	১০০	১০০	৬৯	৬৭
পোলান্ড	৮৭	১০০	১০০	৮২	৫৪	৬৬
জাপান	৮৩	৯০	১০০	৯৫	৯৮	১৪২

উৎস : *Statistical Yearbook to League of Nations,1935-7, (Geneva, 1937)*

অর্থনৈতিক পরিস্থিতির তারতম্য অনুসারে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীতে ছিল স্বর্ণমান গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি, পোল্যান্ড, হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও সুইজারল্যান্ড। এই রাষ্ট্রগুলি দেশীয় অর্থব্যবস্থাকে মহামন্দার গ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য শুল্ক সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্রিটেন ও তার সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বর্ণমান ত্যাগ করে পাউন্ডের মাধ্যমে লেনদেন আরম্ভ করে। এই দেশগুলিকে স্টার্লিং গোষ্ঠী বলা হয়। এখানে মুদ্রামূল্যহ্রাস পায়। পরে সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড ও এস্তোনিয়াও স্টালিং গোষ্ঠীতে যোগদান করে। ক্রমে স্পেন, পোর্তুগাল, গ্রীস এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশিষ্ট দেশগুলির নেতা জার্মানি। এরা স্বর্ণ রপ্তানি নিষিদ্ধ করে স্বর্ণমানে ত্যাগ করে। জার্মানি বিনিময় নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করেছিল। ১৯৩৩ সালের পর নাৎসি সরকার দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়। মধ্য ইয়োরোপের যে দেশগুলি জার্মানির কাছে ঋণী ছিল, তাদের সঙ্গে বাণিজ্য করে। এমনকি, জার্মানি পণ্য-বিনিময় পদ্ধতিও অবলম্বন করেছিল— যেমন জার্মান কয়লার বিনিময় ব্রাজিলের কফি, জার্মান সারের বিনিময়ে মিশরের তুলো। এমন কি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও মার্কিন তুলোর সঙ্গে জার্মানির পণ্য বিনিময় করতে আগ্রহী ছিল।

জার্মান অর্থব্যবস্থায় মহামন্দার প্রভাব পৃথক উল্লেখের দাবি রাখে। ১৯৩২ সালের আগে পর্যন্ত জার্মানি মুদ্রা সংকোচন (deflation), মজুরিহ্রাস, সরকারী ব্যয় হ্রাস ইত্যাদি নীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সঙ্কটের মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মন্দা দীর্ঘায়িত হওয়ায় এই পরিকল্পনাগুলি প্রত্যাহার করে নিতে হয়।

১৯৩৩ সালে জার্মানির কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ব্যাঙ্কের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। জার্মানি ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করে। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি জার্মানির রাজনৈতিক জীবনেও বিপর্যয় নেমে আসে। ১৯৩৩ সালে ভাইমার প্রজাতন্ত্র বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। নাৎসিরা প্রথম থেকেই ইয়ং পরিকল্পনা স্ট্রেসেসম্যানের পরিপূর্ণতার নীতির (fulfilment) বিরোধিতা করেছিল। অর্থনৈতিক সঙ্কট তাদের যুক্তির সত্যতা প্রমাণ করে। গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী সাফল্যের মাধ্যমে নাৎসি নেতা অ্যাডল্‌ফ হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। জার্মানির ইতিহাসে একনায়কতন্ত্রের জয় সূচিত হয়।

মহামন্দার প্রথম পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল অস্ট্রিয়ায়। ১৯৩১ সালের ১১ মে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অবস্থিত ক্রেডিট অ্যানস্টাট (Credit Anstalt) দেউলিয়া হয়ে যায়। অথচ এই সংস্থাটি ছিল আন্তর্জাতিক আদান প্রদানের কেন্দ্রবিন্দু। মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। জানুয়ারী মাসে অস্ট্রিয়া জার্মানির সঙ্গে শুল্ক ইউনিয়ন গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ফ্রান্সের কূটনৈতিক চাপে এই চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়।

ইংলন্ডেও এই মন্দার গভীর প্রভাব পড়েছিল। এক বিপুল পরিমাণ সোনা ইংলন্ডের রাজকোষ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এই সঙ্কটের চাপে পরবর্তী নির্বাচনে একটি রক্ষণশীল জাতীয় সরকার (National Government) কায়েম হয়। সৈন্যবাহিনীর বেতন হ্রাস করায় ইনভার গরডনে একটি নৌ-বিদ্রোহ হয়। ইংলন্ডের বাইরে এই ঘটনাকে একটি গুরুতর বিপ্লব বলে ধরে নেওয়া হয় এবং ইংলন্ডের অর্থের ওপর আন্তর্জাতিক আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। পরিস্থিতির চাপে পড়ে ইংলন্ড স্বর্ণমান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থায় নেতৃস্থানীয় দেশের মৌলিক অর্থনৈতিক দুর্বলতা উন্মোচিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সাগরপারের বাজারগুলি ওপর নিয়ন্ত্রণ চলে যাওয়ায় ইংলন্ডের পক্ষে পূর্ব গৌরব অর্জন করা আর সম্ভব হয়নি।

একদিকে কঠোর বাজেট নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যদিকে, ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে (বাড়ি তৈরি শিল্প, মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্প ইত্যাদি) গুরুত্ব আরোপ করে বাজেটে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলেও শিল্পের প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলিতে মন্দা দীর্ঘায়িত হয় এবং কর্মহীনতা বৃদ্ধি পায়।

পরিস্থিতির চাপে, অবাধ বাণিজ্যনীতির প্রধান প্রবক্তা ইংলন্ডে ৮৬ বছরের নীতি পরিত্যক্ত হয় ইম্পোর্ট ডিউটিস অ্যাক্টের (১৯৩২) মাধ্যমে। অটওয়া কনফারেন্সে অধীনস্থ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্হিবাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়।

মহামন্দার গোড়ার দিকে ফ্রান্স সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ফ্রান্স অযৌক্তিকভাবে স্বর্ণমান ধরে রাখার চেষ্টা করায় আন্তর্জাতিক বাজারে অন্যান্য জাতীয় মুদ্রার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে অধীনস্থ উপনিবেশগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করলেও ফ্রান্স বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ফরাসি রাজনীতিতে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় স্থায়ী পার্টি ভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আন্তঃরাষ্ট্রীয় ঋণশোধের প্রশ্নটি মহামন্দার সঙ্কটকে জটিলতর করে তোলে। রাষ্ট্রপতি হুভার এক বছরের জন্য সকল আন্তর্জাতিক ঋণশোধের ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ দেন। ইংল্যান্ড এ ব্যপারে স্বাগত জানালেও ফ্রান্স তার ক্ষোভ জানায়। শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ অধমর্ণ রাষ্ট্রই যুদ্ধকালীন ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে তাদের অক্ষমতা জানায়। প্রথমে ফ্রান্স, তারপর ইংলন্ড এবং ১৯৩৩-এর পর সব রাষ্ট্রই ঋণশোধ বন্ধ করে দেয়।

মার্কিন সরকার অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের মোকাবিলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সেনেটের কাছ থেকে বিশেষ অধিকার অর্জন করে মার্কিন অর্থব্যবস্থাকে দৃঢ় সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। নানাদিক থেকে সুরক্ষা দিয়ে মার্কিন অর্থব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার এই প্রকল্প নিউডিল (New Deal) নামে পরিচিত।

[৩.৪.১. অনুচ্ছেদে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।]

বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কট দূর করার আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাগুলি বিশেষ সাফল্য অর্জন করেনি। ১৯৩১ সালের ২০ জুন ঘোষিত হুভার স্থগিতাদেশ (Hover Moratorium) ফ্রান্সের বিরোধিতায় কার্যকর হতে পারেনি। ফ্রান্সের আপত্তি মেনে নেওয়ায় ৬ জুলাই এই স্থগিতাদেশ গৃহিত হয়। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রাইস ব্যাঙ্ক থেকে ১০০ মিলিয়ান মার্ক তুলে নেওয়া হয়। জার্মান অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

জার্মানির বিপর্যয় পর্যালোচনার জন্য মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিরা (২০ জুলাই) লন্ডনে মিলিত হয়। ফ্রান্স জার্মানিকে সহায্য করার বিনিময়ে এমন অবাস্তব রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আমানত দাবি করে যে সম্মেলন ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৯৩১ সালের ১৯ আগস্ট বাসলে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্কার্স্ কমিটির অনুমোদন অনুসারে জার্মানিকে ছয় মাসের জন্য বিদেশি মুদ্রায় ঋণ দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এ বছরের শেষে জার্মানি ক্ষতিপূরণ দিতে অপারগতার কথা জানায়।

১৯৩২ সালে জানুয়ারী মাসে আন্তঃমিত্রপক্ষীয় ঋণের প্রশ্নে যে সম্মেলন হবার কথা ছিল ইংলন্ড ও ফ্রান্সের মতপার্থক্যের ফলে তা পিছিয়ে যায়। ১৯৩২ সালের জুন মাসে লোসান সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগ দেয়নি। কারণ, মার্কিন সিনেট ঋণ হ্রাস করার বা স্থগিত রাখার বিরোধী ছিল। ১৯৩৩ সালের ১২ জুন লন্ডনে আহুত ওয়ার্ল্ড মানিটারি অ্যান্ড ইকনমিক কনফারেন্সে মুদ্রামানের ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কারণ, ৩ জুলাই নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রপতি সকলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেন। গ্যাথোর্ন হার্ডির মতে 'এটি যুদ্ধোত্তর ইতিহাসের অন্যতম প্রধান আশাভঙ্গ।' ("It was a major disappointment of post war history.")

কার্যত, এই মন্দার ফলে এমন একটি বিপর্যয় ঘটে যা যুদ্ধোত্তর বিপর্যয়ের থেকেও গভীর। অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে গোটা পৃথিবীতে একটা দম আটকানো পরিবেশের সৃষ্টি হয়। প্রাচুর্য দারিদ্র্যের জন্ম দেয়, ধনবণ্টনের অসাম্যের ফলে প্রাচুর্য ও অনাহারের সহাবস্থান ঘটে। বাণিজ্যিক সঙ্কট, বাণিজ্য সঙ্কোচনের সঙ্গে যুক্ত হয় রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সঙ্কট। এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলল। দুই শত বছরের প্রাচীন 'লেসে ফেয়ার' (অবাধ বাণিজ্য নীতি) নীতির অবসান ঘটে।

অর্থনৈতিক সঙ্কটের ছায়া পড়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। ১৯৩০ -এর দশকের মাঝামাঝি থেকে মন্দাজনিত হতাশা, বেকারি, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদির ফলে পশ্চিম ইয়োরোপের প্রাচীন সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে অস্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রবণতা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। ইংলন্ডে মোসলের নেতৃত্বে ব্রিটিশ ফ্যাসিস্ত আন্দোলন, ফরাসি ফ্যাসিস্ত লীগ প্রভৃতি উগ্র দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ইতালীয় ফাদিবাদের পাশাপাশি জার্মানিতে নাৎসিবাদ শক্তিশালী হবয়ে ওঠে। সুদূরপ্রাচ্যে জাপানে সামরিক বাহিনীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই, অর্থনৈতিক সঙ্কট বিশ্বশান্তি ও যৌথ নিরাপত্তার দিক থেকেও কম ক্ষতিকারক ছিল না।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সংকটের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল মূল্যবোধের সংকট, মনস্তাত্ত্বিক সংকট। অধ্যাপক ই. এইচ. কার তাই ১৯৩১ সালকে বলেছেন, 'বিপর্যয়ের বছর'।

ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লবের পর থেকে এ্যাডাম স্মিথ প্রভৃতি ধ্রুপদী পলিটিক্যাল ইকনমির প্রবক্তারা মুনাফার অবাধ মুক্তির সঙ্গে মানুষের জীবনের সর্বাঙ্গীন মুক্তিকে জড়িয়ে দিয়েছিলেন। জ্ঞানদীপ্তি আন্দোলনে যুক্তির মুক্তি আর অবাধ বাণিজ্যের মুক্তি মিলিয়ে জন্ম নিয়েছিল মুক্তপন্থা (leberalism)।

কিন্তু অবাধ বিনিয়োগ ও ফাটকাবাজি ১৯২৯ সালে ধ্বসে পৌঁছে দিয়েছিল। মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক উদ্যোগ ১৯৩১ সালের বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। এই অবস্থা থেকে রক্ষা পাবার জন্য ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ আত্মরক্ষাত্মক অস্ত্রশস্ত্র যৌথ উদ্যোগে কোনো রাষ্ট্রের আর আস্থা ছিল না। তার পরিবর্তে প্রাধান্য লাভ করেছিল বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতীয় অর্থনীতি।

৩.৪.১ অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ

১৯২৯ সালের মহামন্দার প্রতিক্রিয়ায় আমেরিকাসহ অন্যান্য ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি কম বেশি বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি অবলম্বন করে। এই অবস্থাকেই অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ বলা হয়ে থাকে।

জার্মান ভাষায় অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের অর্থ অটার্কি (autarky)। অটার্কি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা। অটার্কি শব্দটি প্রকৃত অর্থাৎ জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সীমানার মধ্যে বাণিজ্যিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা। অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে— কখনও সংরক্ষণমূলক বাণিজ্যনীতি, কখনও বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার প্রতিযোগিতা এড়িয়ে জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়া। বহু পূর্বেই আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন, ফ্রিডরিশ লিস্ট-এর মতো জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদরা রাষ্ট্রীয় স্তরে জাতীয় স্তরে স্বয়ং সম্পূর্ণতার তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। এদের দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল অস্ত্র উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা। এই দুটি খণ্ডিত যুক্তিই শেষ পর্যন্ত হিটলারের নাৎসিবাদে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছিল। কারণ, এই পর্বে এই তত্ত্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ইয়োরোপের নবজাত রাষ্ট্রগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ। অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরির উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রসমূহ চড়াশুল্ক প্রাচীর প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে তাদের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক সীমান্তগুলি ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে অযৌক্তিক। এছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডা, লাতিন আমেরিকার বৃহৎ রাজ্যগুলি শিল্প সংরক্ষণনীতি অনুসরণ করেছিল। এই সংরক্ষণ কতকগুলি বিশেষ দেশ বা বিশেষ পণ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নও পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানায় সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিল।

১৯৩০-এর পরবর্তী পর্যায়ে মহামন্দা ও বিনিময় ব্যবস্থার সংকটের ফলে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ এক বিকৃত আগ্রাসী রূপ নেয়। প্রথমত, দীর্ঘদিন ধরে বেকারি সমস্যায় জর্জরিত ইয়োরাপীয় রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ করে কৃত্রিম উপায়ে বেশি সংখ্যক লোককে চাকরি দিতে চেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, জার্মানি ও অন্যান্য দেশ বিপুল পরিমাণে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণে জড়িয়ে পড়েছিল। অথচ এই ঋণের পেছনে কোনো নির্দিষ্ট আমানত ছিল না। বিশেষত ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত সমস্যা সমস্ত পরিস্থিতিকে জটিলতর করে তোলে। তৃতীয়ত, ইতালি ও জার্মানিতে বেকার সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য অস্ত্রশিল্পকে সুসংগঠিত করে তোলা হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই দুটি দেশ আগ্রাসী পররাষ্ট্র নীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের প্রভাবে প্রতিটি দেশই আগ্রাসী পররাষ্ট্র নীতির আশ্রয় নেয়নি।

৩.৪.২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : নিউ ডিল

মহামন্দাজনিত সংকট থেকে মুক্তিলাভ করার জন্য নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এক বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের আশ্রয় নেন— এটি নিউ ডিল নামে পরিচিত। নিউ ডিলের লক্ষ্য সাধারণ অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন নয়— এটির তিনটি দিক— ত্রাণ, পুনর্বাসন ও সংস্কার।

মহামন্দার ফলে বিনা দোষে কর্মচ্যুত এক বিপুল জনতার উপস্থিতি রাষ্ট্রের সামনে এক তীব্র সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। বিকল্প কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতিতে অভূতপূর্ব জরুরী অবস্থায় সুসজ্জিত প্রেসিডেণ্টকে অসমাপ্ত সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ত্রাণ ও সংস্কারের জন্য

যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, তা অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের অনুকূল ছিল না। সময়ের অভাবে রুজভেল্ট একই সঙ্গে নানা রকমের সংস্কারে হাত দিয়েছিলেন—এক সংস্কারের সাফল্য অন্য সংস্কারের ব্যর্থতা ডেকে এনেছিল।

শিক্ষাক্ষেত্রে ন্যাশনাল ইনড্রাস্ট্রিয়াল রিকভারি অ্যাক্ট (NIRA) যুগপৎ ত্রাণ ও সংস্কারের দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছিল। প্রেসিডেন্টের বিশল্যকরণীর যাদুস্পর্শে প্রথমদিকে আমেরিকার জনজীবনে অভূতপূর্ব বেগ সঞ্চারিত হয়েছিল। উচ্চতর মজুরি দিয়ে শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু মন্দার ফলে পুঁজি বিলুপ্ত হয়ে যায়। কম পরিশ্রমে বেশি মজুরি পাবার ফলে মূল্যহার এমনভাবে বেড়ে গিয়েছিল তাতে সংস্কারের মূল উদ্দেশ্যেই বিনষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে, উৎপাদকদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দর কমানোর দায়িত্ব আর রইল না। তার ফলে শ্রমিকের ক্রয় ক্ষমতার সঙ্গে কোনো সাযুজ্য না রেখেই মূল্য বৃদ্ধি পেল। তার ফলে এই আইনের মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে গেল। অবশেষে ১৯৩৫ সালের মে মাসে সুপ্রীম কোর্টের আদেশ বলে NIRA অসাংবিধানিক বলে ঘোষিত হয়।

১৯৩৬ সালের জানুয়ারি মাসে কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত আইনেরও একই পরিণতি হয়েছিল। এগ্রিকালচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাক্টের (A.A.A) লক্ষ্য ছিল কৃষি উৎপাদনের মূল্যহার বৃদ্ধি করা। প্রথমে কৃষকদের উৎপাদন হ্রাস করতে বাধ্য করা হয়। এর বিনিময়ে তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। এই ক্ষতিপূরণের দায় গিয়ে পড়ে ভোগ্যপণ্য ক্রেতার ওপর। এতে কৃষকের সাময়িক লাভ হলেও বাজারে ভোগ্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় তার অবস্থার উন্নতি ঘটেনি।

রাজস্বক্ষেত্রে রুজভেল্টের নীতি সবচেয়ে গুরুতর আপাত বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। তিনি প্রথমেই ব্যয় সঙ্কোচন, নিয়োগ সঙ্কোচন এবং সুষম বাজেট রচনার চেষ্টা করেন। তাঁর ব্যাঙ্কনীতি সাময়িকভাবে সরকারের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়ে এনেছিল। কিন্তু ত্রাণসংক্রান্ত ব্যয়ের ভার তাঁর ব্যয় সঙ্কোচনের প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। ১৯৩৩ সালে তিনি স্বেচ্ছায় স্বর্ণমান ছেড়ে দিয়ে মুদ্রাস্ফীতি চোরাবালিতে পা বাড়ান। ১৯৩৪ সালে ডলারের মূল্য আগের তুলনায় ৫৯% হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৩৪ সালের মে মাসে রৌপ্যক্রয় সংক্রান্ত আইন পাশ হওয়ায় সমস্ত রূপা আমেরিকার সিন্দুকে জমা হয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার শেয়ার বাজারে সোনা ও রূপার ১ : ৩ অনুপাত প্রতিষ্ঠা করা।

এই আইনের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য ছিল অনভিপ্রেত। চীনে রৌপ্য মুদ্রা চালু থাকায়, তার অর্থভাণ্ডার শূন্য হয়ে গেল। চীনে শেষ পর্যন্ত রৌপ্যমান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। চীনের অর্থনৈতিক সংকট ইয়োরোপীয় শক্তিগুলির উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রশান্ত সাগর অঞ্চলে শক্তিসাম্য বজায় রাখার মার্কিন স্বার্থ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পথ উন্মুক্ত হয়।

প্রচলিত ধারণা অনুসারে রুজভেল্টের 'নিউ ডিল' অভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ধ্বংসের পথ রোধ করেছিল। কিন্তু ৩০-এর দশকে ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের মূল কারণ ক্রমবর্ধমান অস্ত্রসজ্জা। এর ফলে কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্য এবং শ্রমের এক বিপুল চাহিদা সৃষ্টি হয়—যা কল্যাণকামী পরিকল্পনার গণ্ডি ছাড়িয়ে অর্থনীতিকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যায়। "আধুনিক ইতিহাসের ট্র্যাজিক পরিহাসে বৃহদায়তন সংগঠিত হিংসা বা তার প্রস্তুতি, বেকারি এবং অভাবের সবচেয়ে কার্যকর সমাধান হয়ে উঠেছিল।" ("It is perhaps the most tragic irony of modern history that organized violence on a large scale or the preparation for it, has proved to be the most effective remedy for the economic problems of under consumption and unemployment") Keylor. *The Twentieth Century World.*

৩.৪.৩ জার্মানির অটার্কি

জার্মানিতে ১৯৩৩ সালে নাৎসি পার্টি ক্ষমতায় আরোহণ করে। বেকারি ও অর্থনৈতিক সংকট কাটানোর জন্য নাৎসি সরকার সচেতনভাবে ভারী শিল্প ও সরকারী জনকল্যাণমূলক কাজে (Public works) অর্থ বিনিয়োগ করে। প্রাথমিকভাবে শতকরা ৪৪% বেকারত্ব ১৯৩৮ সালে কম ১% ভাগে এসে দাঁড়ায়। হিটলারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল দুটি ঃ জনগণকে পালন করা এবং একইসঙ্গে জার্মানিকে একটি শক্তিশালী সামরিক ও শিল্পভিত্তিক রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলা।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যবর্তী সময়কে আংশিক ফ্যাসিবাদের যুগ বলা হয়। একই সঙ্গে জার্মান রাষ্ট্র চাকরি সৃষ্টি করে, বেকারত্ব দূর করে, মজুরি হার নিয়ন্ত্রণ করে এবং ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষমতা হ্রাস করে। এই সময় জার্মান, অর্থনীতির পরিচালক ছিলেন (Schacht) শ্যাকটে। তিনি বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু ১৯৩৬ সাল নাগাদ হিটলার সাবধানী নীতিতে অধৈর্য হয়ে পড়লেন। তিনি সামরিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে অর্থনৈতিক অস্ত্রসজ্জার গুরুত্ব তুলে ধরেন। গোয়েরিং-এর পরিচালনায় চতুর্বার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকর হয়। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল বাণিজ্যিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা বা অটার্কি (Autarky) প্রতিষ্ঠা। অধ্যাপক সওয়ার (W. Sauer) মনে করেন এই পরিকল্পনার সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। অন্যদিকে অধ্যাপক ক্লেইনের (B.H. Klein) মতে হিটলার যতদিন সম্ভব সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন। অর্থনীতিকে ধ্বংস করে ভোগ্যপণ্য ক্রেতাদের বিরূপ করতে তিনি চাননি।

কিন্তু চতুর্বার্ষিকী পরিকল্পনা যে ১৯৪০ সাল নাগাদ জার্মানিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে চেয়েছিল, তা অনস্বীকার্য। আলোচ্য পর্বে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সামরিক প্রস্তুতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে কঠোর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ফলে পুঁজি, শ্রম এবং সম্পদকে পুরোপুরি সামরিক প্রয়োজনে নিযুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। এই সামরিক প্রস্তুতিই কার্যত ১৯৩৬ সালের পর থেকে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটাতে পেরেছিল। প্রধানত দুটি উপায়ে জার্মানি এই অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে পেরেছিল। প্রথমত, জার্মানির রাসায়নিক শিল্প, কৃত্রিম রবার, কার্পাস ও পশম উৎপাদন করতে সক্ষম হওয়ায়, এই কাঁচামালগুলির জন্য জার্মানির পরনির্ভরতা দূর হল। দ্বিতীয়ত, জার্মানি দুর্বল পূর্ব ইয়োরোপীয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির উপর তার নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করল ; কারণ এই দেশগুলি ছিল কৃষিজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। পোলান্ড, হাঙ্গেরি, রুমানিয় প্রভৃতি দক্ষিণপূর্ব ইয়োরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করার ফলে প্রভূত পরিমাণে গম, কাঠ, তেল এবং অন্যান্য কাঁচামাল জার্মানির হস্তগত হল। এছাড়া, এই দেশগুলিতে জার্মানি তার উদ্বৃত্ত পণ্যজাত দ্রব্য বিক্রি করতেও সক্ষম হল।

সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই হিটলার ১৯৩৮-৩৯ সালে আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে পেরেছিলেন। এছাড়া, মহামন্দার ফলে পূর্ব ইউরোপে ফরাসি প্রভাব হ্রাস হওয়ায় বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও হাঙ্গেরির নবপ্রতিষ্ঠিত সরকারগুলির সঙ্গে নাৎসি জার্মানির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের পথ উন্মুক্ত হয়। মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপে বৃহত্তর জার্মানি গঠন ও নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গা (Lebensraum) পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং নির্ভরযোগ্য মিত্র হিটলারের হাতে এল। হিটলারের চূড়ান্ত পদক্ষেপ (Anschluss, 1938) অস্ট্রিয়া অধিগ্রহণ এবং পোল্যান্ড আক্রমণ (১৯৩৯) পৃথিবীকে ঠেলে দিল আরও একটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে।

প্রসঙ্গক্রমে ফ্যাসিবাদী ইতালিতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের প্রভাব উল্লেখ করা যায়। গম উৎপাদনে স্বয়ম্ভর হবার জন্য মুসোলিনি গমের যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ছোট চাষীদের উৎখাত করে ধনতান্ত্রিকরাই কৃষিক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করে। শিল্পক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর হবার জন্য ইতালি ক্রমশ আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করে।

৩.৫ সারাংশ

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্বে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি একটি মৌলিক স্ববিরোধের সম্মুখীন হয়। তাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল, অথচ তারা নিজের স্বার্থহানি করে একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিল না। পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবে দুই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় ঃ একদিকে, কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত বিচ্ছিন্ন জাতীয় অর্থনীতি অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক স্তরে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি।

ভার্সাই চুক্তি প্রণেতারা জার্মানিকে যুদ্ধের জন্য দাবী ঘোষণা করে তার ওপর একপাক্ষিকভাবে ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপিয়ে দেয়। কিন্তু ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত সমস্যার নানানদিক সম্পর্কে মিত্রপক্ষের ফ্রান্স ও ইংলন্ডের মতপার্থক্য গুরুতর সংকটের সৃষ্টি করে। ফ্রান্স চেয়েছিল জার্মানির কাছ থেকে সর্বাধিক পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায় করে জার্মানিকে দুর্বল করে তুলতে। ইংলন্ড জার্মানিতে তার পণ্যের বাজার নষ্ট করতে চায় নি। সে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ক্ষেত্রে নমনীয় মনোভাব নিয়েছিল।

ক্ষতিপূরণের প্রশ্নের সঙ্গে মিত্রপক্ষীয় শক্তিগুলি আন্তঃমিত্রপক্ষীয় ঋণের সমস্যাকে যুক্ত করতে চেয়েছিল। মিত্রপক্ষ জার্মানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে লব্ধ অর্থ দিয়েই আমেরিকাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঋণ মেটাতে চেয়েছিল। কিন্তু মার্কিন সেনেট এ ব্যাপারে তাদের গুরুতর আপত্তি জানায়।

জার্মানি প্রথমদিকে মার্কিনী ঋণের অর্থে ক্ষতিপূরণ দেবার চেষ্টা করে। জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্ট্রেসেসম্যানের উদ্যোগে ক্ষতিপূরণের কিস্তি দেওয়া আরম্ভ হয়। অবস্থা যখন স্বাভাবিক হয়ে আসছে সেই সময় মহামন্দার প্রভাবে জার্মানিতে মার্কিন ঋণ দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। জার্মানি ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল সকল দেশের উত্তমর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শেয়ার বাজারে ধ্বস নামে। এই ধ্বসের ধাক্কা গিয়ে লাগে পৃথিবীর সমস্ত দেশের অর্থ ব্যবস্থায়। পৃথিবীর সব দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। একদিকে, আমেরিকাতে শিল্পজাত ও কৃষিজাত উৎপাদনের প্রাচুর্য ও অন্যদিকে চড়া আমদানি শুল্কের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। অধমর্ণ রাষ্ট্রগুলির অর্থ ছিল না, তাই তারা সোনা দিয়ে মার্কিন ঋণ শোধ করার চেষ্টা করে। তার ফলে সমস্ত পৃথিবীর সোনা গিয়ে মার্কিন কোষাগারে জমা হয়। সোনার বিনিময় মূল্য এবং প্রতীকী মূল্য উভয়ই অবলুপ্ত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণমান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ক্রমে ইয়োরোপের প্রধান দেশগুলি স্বর্ণমান ত্যাগ করে। আন্তর্জাতিক লেনদেন বন্ধ হয়ে যায়।

এই সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের আশ্রয় নেয়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক স্তরে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের পরিবর্তে সংরক্ষণমূলক বাণিজ্যনীতি, দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তি, দেশীয় বাণিজ্যকে ভর্তুকি দেওয়া ইত্যাদি নানা কৃত্রিম উপায়ে দেশীয় অর্থনীতিকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। কিন্তু এই স্বার্থপরতা, এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার অনুকূল ছিল না। বিশেষত, জার্মানিতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ এক উগ্র সমরবাদী রূপ নেয়। পৃথিবী দ্বিতীয়বার বিধ্বংসী যুদ্ধের মুখোমুখি হয়।

৩.৬ অনুশীলনী ঃ প্রশ্নাবলি ও উত্তর সংকেত

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ক্ষতিপূরণ সমস্যার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আলোচনা করুন।
উত্তর — ৩.২.৪

২। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ১৯২৯ সালের মহানন্দার প্রভাব আলোচনা করুন।
উত্তর — ৩.৩.২

সংক্ষিপ্ত বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। মহামন্দা বলতে আপনি কী বোঝেন?
উত্তর — ৩.৩.১

২। ক্ষতিপূরণ সমস্যা ও আন্তঃমিত্রপক্ষীয় ঋণের সম্পর্ক কী?
উত্তর — ৩.৪.১

৩। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ কাকে বলে?
উত্তর — ৩.৪.১

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। জি. এম. গ্যাথোর্ন হার্ডি—এ শর্ট হিস্ট্রি অফ ইন্টারন্যাশানাল অ্যাফেয়ার ১৯২০—৩৯ (১৯৬৮)।
২। স্টিফেন জে. লি. অ্যাসপেক্টশ্ অফ ইয়োরোপীয়ান হিস্ট্রি ১৭৮৯—১৯৮০ (১৯৯৭)।
৩। পি. ফিয়ারসন, দ্যা অরিজিনস্ অ্যান্ড নেচার অফ দ্য গ্রেট স্লাম্প (১৯৯০)।

একক—৪ ❐ দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য
৪.১ প্রস্তাবনা
৪.২.১ উইলসনীয় আদর্শবাদ ও মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি
৪.২.২ বিচ্ছিন্নতাবাদের যুগে বিশ্বরাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৪.২.৩ মনরো-নীতি ও পশ্চিম গোলার্ধে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি
৪.২.৪ দূরপ্রাচ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (ওয়াশিংটন সম্মেলন)
৪.৩.১ সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতিতে আদর্শবাদের (সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের) পর্ব
৪.৩.২ ধনতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে সমঝোতার পর্ব
৪.৩.৩ হিটলারের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি
৪.৩.৪ গ্র্যাণ্ড অ্যালায়েন্স
৪.৫ সারাংশ
৪.৬ অনুশীলনী ঃ প্রশ্নাবলি ও উত্তরসংকেত
৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন—

- ১৯১৯—১৯৩৯ সালের মধ্যে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি
- ১৯১৯—১৯৩৯ সালের মধ্যে সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি

৪.১ প্রস্তাবনা

আমরা ১ এককে ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি ১৯১৭ সালের দুটি ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে : (১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদান (২) রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

যুদ্ধে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট উইলসন ঘোষণা করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করার ফলে যুদ্ধের চরিত্র পাল্টে গেছে। যুদ্ধ আর ক্ষমতালিপ্সু শক্তিগুলির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নয়, যুদ্ধ এখন ন্যায় যুদ্ধ (Justwar) পৃথিবীকে গণতন্ত্রের উপযুক্ত করে তোলার প্রক্রিয়া। যতদিন পৃথিবীতে গণতন্ত্রবিরোধী এবং অগণতান্ত্রিক সরকারের অস্তিত্ব আছে, ততদিন তারা সর্বক্ষণ আক্রমণাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কখনই যুদ্ধ চায় না। এছাড়া, শান্তিপূর্ণ পৃথিবীতে অস্ত্রের প্রয়োজন কমে যাবে কাজেই বিভিন্ন দেশের উৎপাদন ক্ষমতা সামরিক প্রস্তুতির পরিবর্তে অর্থনৈতিক বিকাশে নিয়োজিত হবে।

লেনিন উইলসনীয় আদর্শবাদকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, এটি ইয়োরোপের বুর্জোয়া (লিবারলিজম) উদারনৈতিকবাদের মতোই ধনতান্ত্রিক অপরাধে আগ্রহী। লেনিনের মতে উইলসন ইয়োরোপীয় শাসকশ্রেণীর মতোই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংরক্ষিত করতে চান। একমাত্র বলশেভিকরাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে নতুন সমাজের জন্ম দিয়েছে।

উইলসন লেনিনের অভিযোগগুলি সম্পর্কে সচেতনা ছিলেন। তিনি চৌদ্দ দফা ঘোষণার মধ্যে দিয়ে লেনিনের সমালোচনা উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু লেনিন চৌদ্দ দফা ঘোষণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছিলেন এই নীতিগুলি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংস্কার করতে পারবে না। রাষ্ট্রসংঘ শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির একটি সংঘমাত্র এবং এই সংঘই বিশ্বরাজনীতির নিয়ন্তা।

তবে ১৯১৭-১৮ সালে মার্কিন আদর্শবাদ ও সোভিয়েত বিপ্লবপন্থার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। উভয় রাষ্ট্রনেতাই আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয়তার মধ্যে গভীর সম্পর্ক স্বীকার করেছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে কখনই সৌহার্দমূলক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। বিশেষত, ১৯১৮ সালে গ্রীষ্মকালে জাপান পূর্ব সাইবেরিয়া আক্রমণ করে। এই অভিযানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৈন্য পাঠায়। কিন্তু এই অভিযান ব্যর্থ হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যায়। বলশেভিকদের শান্তি সম্মেলনে আহ্বান করা হয়নি।

প্যারিস থেকে উইলসন লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে যোগাযোগ করেন। কিন্তু লেনিন চেয়েছিলেন, এই সাক্ষাৎকারে শুধু বলশেভিকরা থাকবে, আর উইলসন রাশিয়ার সব পার্টির প্রতিনিধির সঙ্গেই মিলিত হতে চেয়েছিলেন। এই সাক্ষাৎকার বানচাল হয়ে যায়।

২৪ বছর পর গভীর সঙ্কটের সামনের দাঁড়িয়ে দুই পক্ষের প্রতিনিধি মিলিত হয়েছিলেন।

৪.২.১ উইলসনীয় আদর্শবাদ ও মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি

উইলসন যেভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য যেভাবে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন, তা পূর্বতন মার্কিন কূটনৈতিকদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। উইলসন মুখ্য শান্তিপ্রণেতার ভূমিকা পালন করতে চেয়েছিলেন, কারণ, তাঁর বিশ্বাস ছিল ইয়োরোপীয়রা তাদের কূটনৈতিক সমস্যা সমাধানে সক্ষম নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুদৃঢ় নেতৃত্ব ও পরিচালনা ছাড়া একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিকাশ পরস্পরের পরিপূরক আবার অভ্যন্তরীণ শান্তি ও আন্তর্জাতিক শান্তি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল।

উইলসনের আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের ভিত্তি ছিল আমেরিকার অর্থনৈতিক প্রাধান্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী বিজয়ী শক্তি ছিল আমেরিকা। ১৯১৪ সালে সে যুদ্ধে যোগদান করেনি, ১৯১৭ সালে সে যুদ্ধে যোগ দিল 'সহযোগী' (associated) শক্তি রূপে, 'মিত্র শক্তি' রূপে নয়। অধ্যাপক ক্রোজিয়ার দেখিয়েছেন, যুদ্ধের ফলে আমেরিকার উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় শতকরা ১৫% বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯১৪ সালেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি শক্তিশালী নৌবহর ছিল, ১৯১৮ সালে এই বাহিনী একটি পরিণত বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়। অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রাধান্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পুঁজিসংক্রান্ত প্রাধান্য। ১৯১৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বড় উত্তমর্ণ শক্তি আমেরিকার কাছে ইউরোপীয় শক্তিগুলির ঋণের পরিমাণ ছিল ২,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং তার মধ্যে ১০,৩৫০ মিলিয়ন ছিল মিত্রপক্ষীয় ঋণ।

১৯১৬ সালে খুব অল্প ভোটের ব্যবধানে ডেমক্র্যাট উড্রো উইলসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদে নিযুক্ত হন। দুই বছরের মধ্যেই উইলসনের অভ্যন্তরীণ নীতি এবং যুদ্ধের সময় অতিরিক্ত সরকারী নিয়ন্ত্রণ মার্কিন জনমতকে আহত করে। ১৯১৮ সালে দুটি কক্ষেই রিপাবলিকানরা সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে।

এছাড়া, বহু নাগরিকই প্যারিসের শান্তি সম্মেলনকে মেনে নিতে পারেনি। কেউ কেউ মনে করেছিলেন জার্মানির প্রতি অত্যন্ত কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কারও মতে ইংলন্ডই সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় নাগরিকরা তাদের নিজ নিজ জাতি স্বার্থসংক্রান্ত সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হতে পারেনি।

কাজেই ১৯১৯ সালে উইলসন যখন সেনেটের সামনে ভার্সাই চুক্তি ক্রান্ত বিল পেশ করলেন, এই বিল দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন অর্জন করতে পারেনি। হেনরি ক্যবট লজ (Henry Cabot Lodge) ফরেন রিলেশন্স কমিটির সেক্রেটারি, এই বিল সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। আর রিপাবলিকান উইলিয়াম ই. বোরা (William E. Borah) কোনও আকারেই লীগে যোগদানের বিরোধী ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি উইলসন প্রাণপণে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন লীগের প্রতি দায়িত্ব আইনগত, নয় নৈতিক। কিন্তু যুক্তি কেউই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

৪.২.২ বিচ্ছিন্নতাবাদের যুগে বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : ১৯১৯—১৯৩২

সাধারণত বলা হয়ে থাকে যুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি মনরো-নীতির প্রভাবে ক্রমশ বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। এই বিচ্ছিন্নতাবাদকে সরলীকরণ করা উচিত নয়। রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট ঃ উভয়েই আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী ছিল। যদিও আন্তর্জাতিকতায় কিছু পরিমাণে জাতীয়তাবাদী প্রবণতা মিশে ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা খর্বকারী যে কোনো শক্তিকে প্রতিহত করার ঐকান্তিক আগ্রহ মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির মূল আগ্রহ হয়ে ওঠে। ইংলন্ড পশ্চিম এশিয়ায় তৈল খনিগুলি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে আমেরিকা তার বিরোধিতা করে লাতিন আমেরিকায় ইংলন্ডের হস্তক্ষেপে বাধা দেয়, এবং ইঙ্গ-জাপান নৌ-চুক্তি ও ইংলন্ডের সামুদ্রিক প্রাধান্যকে বাধা দেয়। ডেমোক্রাটদের সঙ্গে রিপাবলিকানদের মত পার্থক্যের মূল ক্ষেত্র ছিল—লীগ সনদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগুলির অনুমোদন। ১৯১৮ সালে কংগ্রেস নির্বাচনে রিপাবলিকানরা জয়যুক্ত হয়, তার ফলে সেনেটে ডেমোক্রাটদের প্রাধান্যের অবসান ঘটে। ১৯২০ সালের নির্বাচনে (Warren Hardinge) রিপাবলিকান হার্ডিঞ্জ প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। ১৯১৯ সালের পরবর্তী যুগে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির প্রধান সমস্যা, কংগ্রেস বা নির্বাচকরা বিশ্বরাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণকে সমর্থন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তার ফলে, ভার্সাই চুক্তি অনুমোদন ও লীগ অফ নেশনের সদস্য পদ গ্রহণের প্রশ্ন দুটি মার্কিন সেনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করেনি। অথচ নিরস্ত্রীকরণ এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুক্তদ্বার নীতি প্রতিষ্ঠা : এই দুটি ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী উভয়পক্ষের সমান সমর্থন ছিল। দুই পক্ষই মনে করতো দুটি লক্ষ্যপূরণ হলে বিশ্ববাজারে মার্কিন বাণিজ্যের একাধিপত্য বিনা বাধায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

বাস্তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে পুরোপুরি বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি অনুসরণ করা সম্ভবও ছিল না। সাগরপারে যে বিপুল পরিমাণ মার্কিন পুঁজি লগ্নি ছিল, সেই পুঁজি রক্ষার দায়িত্ব ছিল। ১৯২৯ সালে ইয়োরোপে প্রত্যক্ষভাবে ১,৩৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পরোক্ষভাবে ৩,০৩০ মিলিয়ান মার্কিন ডলার লগ্নি ছিল। এছাড়া, 'মুক্তদ্বার নীতি'র প্রবক্তারূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব বাণিজ্যে ব্যাপকতর অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিল। পরোক্ষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় রাষ্ট্রকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কূটনীতির মাধ্যমে বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে চেয়েছিল। তবে, একথা অনস্বীকার্য যে, সচেতনভাবে ভার্সাই চুক্তির শর্তগুলি অস্বীকার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক

ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নেতৃত্ব ত্যাগ করেছিল। এই দায়িত্ব পুনরায় ইংলন্ডের হাতে এবং কিছুটা ফ্রান্সের হাতে চলে যায়।

ইয়োরোপ তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেসরকারীভাবে তিনটি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছিল। ওয়ার্ল্ড কোর্ট প্রটোকল, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং যৌথনিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণ ক্ষেত্র।

হার্ডিঞ্জের কার্যকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ জনিত সমস্যাসমূহের নিষ্পত্তিতে অতিবাহিত হয়। ১৯২৩ সালে কুলিজ (১৮৭২-১৯৩৩) হার্ডিঞ্জের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, সেনেটের কাছে World Court Protocol অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। তিন বছর ব্যাপী টানাপোড়েনের পর, ১৯২৬ সালে সেনেট পাঁচটি আপত্তিসহ এই প্রটোকল অনুমোদন করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আপত্তিটি ছিল এইরূপ 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ অথবা দাবি জড়িত কোনো বিষয়ে বিশ্ব আদালতে কোনো উপদেশমূলক মত প্রকাশ করা যাবে না। আদালতের সদস্যরা এই আপত্তিটি ছাড়া অন্য আপত্তিটি মেনে নেয়। কারণ, এই আপত্তিটি মেনে নিলে আদালতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবিসম্বাদিত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হত। ১৯২৯ সালে লীগ কাউন্সিল বিচারকদের একটি কমিটিকে কোর্টের নিয়মবিধি সংশোধন করতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যপদ গ্রহণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পর্যালোচনা করতে বলা হয়। এই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন (Elihu Root) এলিহু রুট। রুট-পরিকল্পনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিচারালয় উভয় পক্ষেরই গ্রহণযোগ্য হয়। এই পরিকল্পনায় বলা হয়, যদি কখনও বিচারালয়ে মার্কিন যুক্তিরাষ্ট্রের স্বার্থসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপদেশ চাওয়া হয় তবে সে সদস্যপদ ত্যাগ করতে পারবে। এই মর্মে একটি সিদ্ধান্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ ৫৪টি দেশ স্বাক্ষর করে, কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি শেষ পর্যন্ত বিধিবব্ধ হয়নি।

আন্তর্জাতিক আদালত ছাড়াও, অন্যান্য বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। সাধারণ বেসরকারী পরিদর্শকের বিভিন্ন সভায় তাদের পরামর্শ জানানোর জন্য প্রেরণ করা হত। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনোমতেই সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেনি।

[৩ এককে আলোচনা করা হয়েছে, কীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে জার্মানির ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হয়।] ১৯২৪ সালের চার্লস ডয়েসের নেতৃত্বে গঠিত ডয়েস পরিকল্পনা ১৯২৯ সালে আওয়েন ইয়ং (Owen Young)-এর নেতৃত্বে গঠিত ইয়ং পরিকল্পনা জার্মানির ক্ষতিপূরণ সমস্যার সামরিক সমাধান করতে পেরেছিল।

কিন্তু মিত্র রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধকালীন ঋণের সঙ্গে ক্ষতিপূরণকে যুক্ত করতে চাইলে যুক্তরাষ্ট্র আপত্তি জানিয়েছিল। ১৯২৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহামন্দার ফলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হুভার এক বছরের জন্য সব লেনদেন বন্ধ করে দেন। এইভাবে অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলা করার সাময়িক চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু এই চেষ্টাগুলি ব্যর্থ হওয়ায় পরবর্তী প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সাময়িকভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিন আন্তর্জাতিকতার অবসান ঘটে।

যৌথ নিরাপত্তারক্ষা এবং নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৯২২ সালে মার্কিন উদ্যোগে সম্পাদিত ওয়াশিংটন সম্মেলন দূরপ্রাচ্যে এবং অন্যত্র সামুদ্রিক ক্ষেত্রে নিবস্ত্রীকরণের জন্য কতকগুলি চুক্তি সম্পাদিত করে। (৪.২.৪ অংশে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) মার্কিন রাষ্ট্রপতি কুলিজের পরামর্শে ১৯২৭ সালে নৌ-শক্তি সীমিত করার জন্য জেনেভা সম্মেলন আহুত হয়। তবে নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মত পার্থক্যের জন্য এই অধিবেশন মুলতুবি রাখা হয়। ১৯২৮ সালে কেলগ-ব্রিঁয়া চুক্তি যৌথ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। ১৯৩০ সালে লন্ডনে আহুত নৌ-সম্মেলনে লীগের বাইরে নৌ-শক্তি হ্রাসের একটি চেষ্টা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতে যোগ দেয়। ১৯৩২ সালে ২ ফেব্রুয়ারি

জেনেভা শহরে আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। কিন্তু, বিভিন্ন নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ব্যর্থতা, জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের ফলে আন্তর্জাতিক অবস্থার অবনিত ঘটে। ১৯৩৩ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব নিবস্ত্রীকরণের দ্বিতীয় অধিবেশনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগদান করলেও এই সম্মেলন কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। ইঙ্গ-মার্কিন নৌ-চুক্তি, জাপান মার্কিন নৌ-চুক্তিগুলি অকার্যকর হয়ে পড়ে।

তা সত্ত্বেও, এই দশকের মার্কিন কূটনীতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ইয়োরোপ থেকে সরে আসা। টমাস এন বনারের মতে, "২০-এর দশকে মার্কিনীরা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি বিশিষ্ট লক্ষ্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছিল : কাজের স্বাধীনতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা এবং স্থায়ী মৈত্রী এড়ানোর চেষ্টা ("Americans in the twenties insisted on the unique mission of the United States, the need to maintain independence of action and avoid permanent alliance.") কিন্তু এই নয়া বিচ্ছিন্নতাবাদ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। নতুন প্রযুক্তি, নতুন রাজনীতি এবং পৃথিবীতে ক্রিয়াশীল নতুন সামাজিক ধারা এমন কতকগুলি শক্তিশালী প্রবণতার জন্ম দিয়েছিল যেগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বরাজনীতির আঙিনায় ফিরিয়ে আনে।

৪.২.৩ মনরো-নীতি ও পশ্চিম গোলার্ধে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি

উনিশ শতকের শেষ থেকে লাতিন আমেরিকায় ইংলন্ডের কূটনৈতিক ও নৌ-শক্তিগত প্রাধান্য দূর করে ১৯১৪ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান বাণিজ্যিক ও পুঁজিবাদী শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। কিউবা, পানামা, হাইতি, ডোমিনিকান রিপাবলিক, নিকারাগুয়া এবং ডেনমার্ক থেকে পাওয়া ভার্জিন দ্বীপে প্রত্যক্ষ মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়েছিল প্রথম বিস্বযুদ্ধের আগেই। ইয়োরোপীয় শক্তিগুলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে পড়ায় লাতিন আমেরিকায় তাদের অর্থনৈতিক প্রভাব হ্রাস পায়। ২০-র দশকে তারা তাদের হৃত গৌরব উদ্ধার করতে পারেনি।

লাতিন আমেরিকায় ইয়োরোপীয়দের পরাস্ত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য বিস্তার মনরো-নীতির ফল— এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ১৮২৩ সালের ২ ডিসেম্বর কংগ্রেসের উপস্থাপিত প্রেসিডেন্ট জেম্‌শ্‌ মনরোর নীতি ইয়োরোপীয় উপনিবেশিক শক্তিগুলিকে, বিশেযত ফ্রান্সকে দক্ষিণ আমেরিকায় ক্ষমতা বিস্তার করতে নিষেধ করে। সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য ছিল 'আমেরিকা আমেরিকাবাসীর জন্য' (America is for the Americans) উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত মনরো-নীতি ছিল একটি মৃত নির্দেশ মাত্র (dead letter)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এমন কিছু শক্তিশালী নৌবহর বা কূটনৈতিক প্রভাব ছিল না, যাতে সে এই নীতিকে কার্যকর করতে পারে। তাছাড়া, পশ্চিমি শক্তিগুলির হস্তক্ষেপ না করার নীতি কখনই চূড়ান্ত ছিল না। ইংলন্ড যখনই সম্ভব হত লাতিন আমেরিকায় সামরিক হস্তক্ষেপ করত। অন্তত চারবার ইংলন্ড লাতিন আমেরিকায় সামরিক হস্তক্ষেপ করেছিল। ফ্রান্স ও স্পেনও পিছিয়ে ছিল না। এই প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ বাদ দিলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংলন্ড, ফ্রান্স ও জার্মানি এই অঞ্চলের অর্থনীতিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

১৮৯০-এর পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রথম শ্রেণীর শিল্পভিত্তিক শক্তি হিসেবে পশ্চিম গোলার্ধের উত্তরে নিজের রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। মার্কিন কূটনৈতিকরা প্রধানত দুটি নৈতিকতার দাবীতে পশ্চিম গোলার্ধে মার্কিন প্রভাব বিস্তার করেছিল : গোলার্ধের সংহতি ও নিখিল মার্কিনবাদ (hemispheric solidarity, Pan Americanism)।

নিখিল মার্কিনবাদের ভিত্তি ছিল দুটি ভুল ধারণা : (১) দুই আমেরিকা ভৌগোলিকভাবে একই এককের অন্তর্গত। একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ডের দ্বারা যুক্ত হলেও দুই আমেরিকার যোগাযোগ হ'ত জলপথে বা বায়ুপথে। রিওডিজ্যানিয়েরো থেকে আফ্রিকা নিকটতর আর ওয়াশিংটন থেকে বুয়েনস এরসের তুলনায় মস্কো অনেক কাছে। (২) ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলিকে 'ভগ্নী প্রজাতন্ত্র' বলে অভিহিত করা হলেও, কার্যত প্রজাতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রাচীন বিশ্বে (Old World) কখনই দৃঢ়মূল হতে পারেনি। তুচ্ছ বাধায় প্রজাতন্ত্রগুলি কোনো না কোনো রকমের একনায়কতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল।

তা সত্ত্বেও, ১৮৮৯ সালে International Conference of American States নামক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রবল পরাক্রান্ত উত্তরের আমেরিকার সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার দুর্বল রাষ্ট্রগুলির নয়া উপনিবেশবাদী সম্পর্ককে নিখিল মার্কিনবাদের মোড়কে উপস্থাপিত করা হয়েছিল, (১৯০৪ সালে প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট বলেন "Chronic wrongdoing, or an impotence which results in a general loosening of the ties of civilized societies" may in America, as elsewhere, ultimately require intervention by some civilized nation, and in the western hemisphere where the adherence of the United States to the Monroe Doctrine may force the United States, however, reluctantly, in flagrant cases of such wrongdoing or impotence to the exercise of an international police power"। তাঁর বিখ্যাত সংযোজনে ল্যাটিন আমেরিকায় ইয়োরোপীয় হস্তক্ষেপের ওপর নিষেধাজ্ঞাকে নতুনভাবে আরোপ করা হয় এবং আলোচ্য অঞ্চলে পুলিশিনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক কেলরের মতে ল্যাটিন আমেরিকায় মার্কিন নীতির দুটি পর্যায় লক্ষনীয় : (১৯১৪-৩২) প্রত্যক্ষ আধিপত্যের পর্যায় এবং (১৯৩৩-৪৫) পরোক্ষ আধিপত্যের পর্যায়।

১৯১৪ সালের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'ডলার কূটনীতির' সাহায্যে দক্ষিণ আমেরিকার সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবলভাবে হস্তক্ষেপ করে। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা উড্রো উইলসন ক্যারিবিয়ান প্রজাতন্ত্রগুলিতে ব্যাপক অসাধুতা, অযোগ্যতা, স্বৈরতন্ত্র এবং সামাজিক অস্থিরতা দূর করে শৃঙ্খলা, সততা এবং যোগ্যতা প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন। এই আদর্শ ঘোষণার আড়ালে ইতিহাসের অমোঘ পরিহাসে তিনি পূর্বতন রুজভেল্ট টাফ্ট নীতি পুনপ্রবর্তিত করেন।

ল্যাটিন আমেরিকায় বিপুল পরিমাণ মার্কিন পুঁজি বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করার জন্য ১৯১৯ সালে Edge Act পাস হয়। মার্কিন ব্যাঙ্কগুলি বিদেশে শাখা খোলার অনুমতি লাভ করে। ফলে, ল্যাটিন আমেরিকার বিশাল পুঁজির বাজারের দরজা মার্কিন বিনিয়োগকারীদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়। ২০-র দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ল্যাটিন আমেরিকায় মোট মার্কিন পুঁজির প্রায় ২৪% লগ্নি হয়. অনতিবিলম্বে লগ্নির পরিমাণ তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। রেলপথ, বিদ্যুৎ, খনি, পেট্রোলিয়াম শিল্প ও বাগিচা শিল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশী বিনিয়োগের শতকরা ৪৪% বিনিয়োজিত হয়।

দুই আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্যিক বিনিময় এক নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের জন্ম দেয়। চিলির তামাখনির ৯২% পুঁজির মালিক ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভেনেজুয়েলার পেট্রোলিয়াম পণ্যের অর্ধেক মার্কিনীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আমেরিকার United Fruit Company ও Standard Fruit Company গুয়াতেমালা, হণ্ডুরাস, নিকারাগুয়া ও পানামার কলা চাষের একচেটিয়া মালিকানা ভোগ করত। দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি দেশে একটি পণ্যকেই পৃষ্ঠপোষকতা দান করত। দ্রুত মূল্যহার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের উৎপাদকেরা

তীব্র আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। তৃতীয়ত, ১৯৩৭ সালের পর থেকে আমেরিকা কিউবার ৮০% রপ্তানিজাত দ্রব্য, হন্ডুরাসের ৮৮%, পানামার ৮১% পণ্য ক্রয় করত। মার্কিন বাজারের ওপর চূড়ান্ত নির্ভরতার ফলে এই দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি পুরোপুরি মার্কিন নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

মার্কিন আধিপত্যকে প্রতিহত করতে গেলে ল্যাটিন আমেরিকাকে সংঘবদ্ধ হতে হত। ল্যাটিন আমেরিকার প্রায় অর্ধেক ভূখণ্ড এবং এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত ব্রাজিল নেতৃত্বের যোগ্য ছিল। কিন্তু ব্রাজিল ল্যাটিন আমেরিকার প্রাশিয়া হয়ে উঠতে পারেনি। সে বরং আমেরিকার প্রধান তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল, কারণ আমেরিকাই ছিল ব্রাজিলের কফির প্রধান খরিদ্দার।

আর্জেন্টিনার স্বাধীন সত্তা তাকে ক্রমশ ওয়াশিংটনের প্রধান শত্রু করে তোলে। দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থান হওয়ায় আর্জেন্টিনা সহজে মার্কিন সামরিক ও নৌশক্তিকে ভয় পায়নি। দ্বিতীয়ত, গরুর মাংস ও শস্য ব্যবসায় সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। তৃতীয়ত, ১৯৩৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মাত্র ১৬.১% পণ্য আমদানি করেছিল, অথচ ইয়োরোপ থেকে তার আমদানির পরিমাণ ছিল ৫৯.১%। চতুর্থত, আর্জেন্টিনায় বসবাসকারী জার্মান ও ইতালীয়রা তাদের মাতৃভূমির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখত। আর্জেন্টিনা নিখিল মার্কিনবাদের বিপরীতে নিখিল স্পেনবাদ তুলে ধরে। এবং কালভো নীতির মাধ্যমে কোনো রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করে দেয়।

অধিকাংশ ল্যাটিন আমেরিকান প্রজাতন্ত্র জাতিসংঘে যোগদান করে। ২০-র দশকে এদের অস্থায়ী সদস্য সংখ্যা এক থেকে বেড়ে হয় তিন। কিন্তু তারা লীগকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগের সদস্য না হয়েও আমেরিকা মহাদেশের ক্ষেত্রে ২১ নম্বর ধারা প্রয়োগের নির্দেশ দেয়— এই ধারা অনুসারে মনরো নীতির অধীনস্থ দেশগুলির ওপর লীগের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। ল্যাটিন দেশগুলি এই ধারাটি বাতিল করার চেষ্টা করলেও ইয়োরোপীয় সদস্যরা মার্কন যুক্তরাষ্ট্রকে আহত করতে পারেনি।

বিশের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ল্যাটিন আমেরিকায় কোনো বৈদেশিক শক্তির প্রভাব বিস্তার নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃহৎ যষ্ঠি (Big Stick Policy) নীতির পরিবর্তে অর্থনৈতিক আধিপত্যের নীতি অনুসরণ করেছিল। তা সত্ত্বেও ১৯২৮ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের ষষ্ঠ সম্মেলনে মার্কিন প্রতিনিধি চার্লস ইভান্‌শ্‌ ইউজেস ল্যাটিন আমেরিকায় অভ্যন্তরীণ শাসন ভেঙে পড়লে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অধিকার দাবি করেন।

দ্বিতীয় পর্ব : ১৯৩১ সালে জাপানের মঞ্চুরিয়া আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ল্যাটিন আমেরিকায় মার্কিনি সামরিক হস্তক্ষেপনীতি যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলেছিল। হুভারের কার্যকালে আন্ডার সেক্রেটারি অফ স্টেট রিউবেন ক্লার্ক মনরো নীতির সঙ্গে যুক্ত রুজভেল্ট করোলারি বাতিল করে দেন।

১৯৩৩ সালের ৪ঠা মার্চ ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট সৎ প্রতিবেশী নীতি (Good Neighbour policy) ঘোষণা করেন। ১৯৩৩ সালে মন্টিভিডিওতে আহুত সপ্তম সম্মেলনে 'সৎ প্রতিবেশী নীতি' গৃহীত হয়। কর্ডেল হাল কালভোনীতি স্বীকার করে নেন। একের পর এক রাষ্ট্র থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাত উঠিয়ে নেয়। নিকারগুয়া ও হাইতি থেকে মার্কিন সৈন্য অপসারিত হয়। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপও প্রত্যাহৃত হয়।

কিন্তু মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির এই পরিবর্তন নিতান্তই বাহ্যিক। স্থানীয় রাজনৈতিক, সামরিক ও বাণিজ্যিক এলিটদের সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে তার প্রাধান্য বজায় রাখে। ব্যাঙ্ক ও স্বৈরতান্ত্রিক সরকারগুলি মার্কিন সরকারের অর্থ সাহায্য লাভ করে।

মহামন্দার পরিপ্রেক্ষিতে ল্যাটিন আমেরিকার কাঁচামাল ও বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শান্তি ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রাধান্য প্রবক্তা হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, অনুগত ল্যাটিন আমেরিকার রাজ্যগুলির সমর্থন সে পশ্চিম গোলার্ধের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে. ১৯৩৬ সালের ৩০ জানুয়ারি রুজভেল্ট এই উদ্দেশ্যে দুই আমেরিকার রাজ্যগুলির একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। কিন্তু আর্জেন্টিনী প্রতিনিধিরা ইয়োরোপীয় নিরাপত্তার প্রশ্নের সঙ্গে পশ্চিম গোলার্ধের নিরাপত্তাকে যুক্ত করেন। মিউনিখ সম্মেলনের পরবর্তী যুগে আহূত ল্যাটিন আমেরিকার সম্মেলনগুলিতে অক্ষশক্তির হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে দুই মহাদেশের নিরাপত্তা রক্ষা এবং সংহতি বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়—পাশাপাশি ল্যাটিন আমেরিকার ওপর মার্কিন অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ দৃঢ়তর হয়ে ওঠে।

৪.২.৪ দূর প্রাচ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। জাপান বুঝতে পারে চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে গেলে মার্কিন প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হবে। তাই জাপান জানিয়ে দেয় আত্মরক্ষা ছাড়া চীনে তার অন্য কোনো স্বার্থ নেই। চীন আমেরিকাকে উইলসনীয় মুক্ত রাজনীতির প্রতিনিধি রূপে দেখতে চেয়েছিল। মার্কিন কূটনৈতিক মহলে পূর্ব এশিয়ায় জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য ছিল রুজভেল্টের মতে, জাপান এশিয়া ও প্রশান্তসাগর অঞ্চলে মার্কিন নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে, তার বিরুদ্ধে দুর্বলচীনকে সমর্থন করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। অন্যপক্ষের মতে মার্কিন আদর্শবাদ অনুসারে চীনকে সাহায্য করা উচিত। ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর স্বাক্ষরিত 'Lansing Ishi' চুক্তি অনুসারে চীনের সীমানাভুক্ত মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের স্বার্থ স্বীকার করে নেওয়া হয়। তবে জাপান চীনের সংহতি নষ্ট করলে অথবা মুক্তদ্বার নীতির প্রয়োগে বিঘ্ন ঘটালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

চীনে চাপানের বিশেষ স্বার্থের তাৎপর্য মনরো-নীতির অনুরূপ একটি নীতি। ইতিমধ্যে বলশেভিক বিপ্লবের ফলে পূর্ব এশিয়ায় জাপান অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। প্যারিসের শান্তিচুক্তিতে জাপান চীনের শান্টুং প্রদেশে অর্থনৈতিক প্রাধান্য লাভ করে। শান্তিচুক্তিতে জাপানের ভৌমিক ও অর্থনৈতিক লাভ এবং সামরিকখাতে ব্যয় বৃদ্ধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষুব্ধ করে তোলে।

জার্মানির নিরস্ত্রীকরণের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব এশিয়ায় শক্তিবিস্তারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তবে প্রথম দিকে জাপান ও আমেরিকা উভয়পক্ষই সামরিক সংঘর্ষের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ উপায়ে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী ছিল।

১৯২১ থেকে '২২ সালের শীতকালে নৌশক্তি হ্রাস করার জন্য ইয়োরোপীয় প্রতিনিধিরা ওয়াশিংটনে মিলিত হয়। '২২ সালে স্বাক্ষরিত পাঁচ শক্তি চুক্তিতে ইংলন্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্স ও ইতালির নৌশক্তির অনুপাত স্থির হয় যথাক্রমে ৫ : ৫ : ৩ : ১.৭৫ : ১.৭৫ (১০,০০০ টন ভারী কামানবহনকারী জাহাজ)। দ্বিতীয়ত, তিনটি প্রধান নৌশক্তি প্রশান্ত সাগর অঞ্চলে দুর্গ না গড়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। জাপান শান্টং প্রদেশে চীনা সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ও ১৯২৩ সালের ১৭ আগস্ট যথাক্রমে নয়শক্তি ও চতুঃশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই দুটি চুক্তিতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারসাম্য বজায় রাখার এবং চীনের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

তবে ওয়াশিংটন ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। জাপানের অনুমান, ওয়াশিংটন ব্যবস্থায় নিকট প্রাচ্যে জাপানের অগ্রগতি খর্ব করে পাশ্চাত্য ইয়োরোপীয় শক্তিগুলির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে। অবিলম্বে, জাপান-ওয়াশিংটন চুক্তি

প্রবর্তিত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করতে প্রস্তুত হয়। ১৯৩১ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করলে জাতিসংঘ যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে জাপানকে প্রতিহত করতে পারেনি।

অধ্যাপক কেলরের মতে ওয়াশিংটন সম্মেলনের পর থেকে জাপানের ব্যাপারে মার্কিন ভীতি দূর হয়। সে জাপানের তুলনায় বেশি যুদ্ধজাহাজের অধিকারী হয়ে ওঠে। পূর্ব সাইবেরিয়া থেকে জাপানি প্রাধান্য দূর হয়। এছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমেই জাপানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ় করে তুলতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। '২০-র দশকে জাপানের মোটরগাড়ি, যন্ত্রপাতি, বাড়ি তৈরির সরঞ্জাম এবং তেলের চাহিদা সবটাই মেটাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। জাপানের মোট রপ্তানির শতকরা ৪০ ভাগই যেত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাছাড়া, জাপানে নিয়োজিত বিদেশী পুঁজির শতকরা ৪০% সরবরাহ করত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন কংগ্রেস পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ সেনা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় অর্থ অনুমোদনে রাজি ছিল না। এই সকল কারণে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি হুভার জাপানের বিরুদ্ধে কোনোরকম অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চাইলেন না। তবে, পররাষ্ট্র সচিব হেনরি স্টিমসন (১৯২৩ সালের ৭ জানুয়ারি) একটি বার্তার মাধ্যমে জাপান সরকারকে জানান যে কেলগ-ব্রিঁয়া চুক্তি বিরোধী কোনো পদক্ষেপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মেনে নেবে না।

পরবর্তী রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট নিউডিল নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তাঁর পক্ষে বিদেশ নীতির দিকে নজর দেওয়া সম্ভব ছিল না। ইতিমধ্যে ১৯৩৫ সালের নিরপেক্ষতা আইন (Neutrality Act.) বিবাদমান পক্ষগুলিকে অস্ত্র বিক্রয় নিষিদ্ধ করে এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অর্থদান বাধ্যতামূলক করে দেয়। এর ফলে, ১৯৩৯ সালে জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর পশ্চিমি শক্তিগুলি মার্কিন ঋণ লাভে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে, তাদের ক্ষীয়মান স্বর্ণ ও ডলার ভাণ্ডার অটুট রাখার জন্য ইংলন্ড ও ফ্রান্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানির পরিমাণ হ্রাস করতে বাধ্য হয়। মার্কিন জনমত ক্রমে ইঙ্গ-ফরাসি স্বার্থের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠায় অস্ত্র রপ্তানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকে বেরিয়ে আসে। ১৯৩৭ সালে চীন জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় রুজভেল্ট 'শান্তি সংরক্ষণে ইতিবাচক পদক্ষেপ' গ্রহণের সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে নানা মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। অবশেষে ১৯৩৯ সালের ২৬ জুলাই জাপান-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি (১৯১১) বাতিল করার জন্য জাপানকে ছয় মাসের নোটিশ জারি করা হল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণ-দামামা বেজে উঠল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইয়োরোপের দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

নয়া-বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি ত্যাগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুগপৎ ইয়োরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা এবং দূর প্রাচ্যে আগ্রাসী একনায়কতান্ত্রিক শক্তিগুলির অগ্রগতি রোধ করার জন্য একদিকে পশ্চিম গোলার্ধ ও প্রশান্ত সাগর অঞ্চলে নিজের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করল এবং অন্যদিকে পশ্চিমের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানায়।

৪.৩.১ সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতিতে আদর্শবাদের পর্ব

জারতান্ত্রিক পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য, জারতান্ত্রিক পররাষ্ট্রনীতি আক্রমণাত্মক এবং সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি মূলত রক্ষণাত্মক। সোভিয়েত রাষ্ট্রের দুটি দায়িত্ব : নবজাত বিপ্লবকে রক্ষা এবং গৃহযুদ্ধে জয়লাভের পর হাঁফছাড়ার অবকাশকে (breathing space) দীর্ঘায়িত করা।

১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লব রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ইতিহাসে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে এক প্রবল অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। এর কারণ দুটি : এক, পাশ্চাত্য শক্তিগুলির বিরুদ্ধে বলশেভিকদের তীব্র মতাদর্শগত ঘৃণা এবং দুই, পাশ্চাত্য শক্তিগুলির পতন সম্পর্কে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার পতন প্রকারান্তরে

বলশেভিক শাসনকে দীর্ঘায়িত করবে। ১৯১৮ সালে লেনিন বলেছিলেন, "এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যদি আমাদের বিপ্লবকে একা হয়ে থাকতে হয়, যদি অন্যান্য দেশে বিপ্লবী আন্দোলন ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আমাদের বিপ্লবের চূড়ান্ত জয়ের সম্ভাবনা আশাহত হয়ে পড়বে। ("There can be no doubt that the prospects for final victory of our Revolution would be hopeless if it were to remain alone and if it were not for the revolutionary movement in other countries. উৎস : G. F. Kennan—Soviet Foreign Policy 1917-41")। অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের সামনে দুটি বিকল্প ছিল, হয় ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিপ্লব ঘটানো, অথবা, সম্ভাব্য ধনতান্ত্রিক অভিঘাতের নীরব সাক্ষী হওয়া। ট্রটস্কির ভাষায় 'হয় রুশ বিপ্লব ইয়োরোপে বিপ্লবী আন্দোলন ঘটাবে, নয় ইয়োরোপীয় শক্তিগুলি রুশ বিপ্লবকে ধ্বংস করবে।' ("Either the Russian Revolution will create a revolutionary movement in Europe, or the European powers will destroy the Russian Revolution." উৎস : *A Fortaine : A History of the cold war from the October Revolution to the Korean War 1917-1950.)*

অধ্যাপক কারের মতে, এই বিরোধিতা দূর করে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার স্বীকৃতি অর্জনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি সোভিয়েত নেতৃবন্দ। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসের পর থেকে বলশেভিক শিবিরে বলা বা না-বলা ধারণা হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিল। রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব, গণতান্ত্রিক শান্তিচুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি এবং ইয়োরোপের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই রাশিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ায়। এই পদক্ষেপের ফলে জার্মানির বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের রণনীতি গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লেনিন রুশ জনগণকে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার পারস্পরিক বিরোধে রক্ত ঝরাতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি অভিলেখ্যাগার থেকে সমস্ত গোপন চুক্তির নথি প্রকাশ করে দিলেন, এবং কোনো ক্ষতিপূরণ ছাড়া, কোনো ভূখণ্ড দখল না করেই জার্মানির সঙ্গে ব্রেস্ট লিটভস্কের সন্ধি স্বাক্ষর করেছিলেন। লেনিনের মতে, সাময়িক নতিস্বীকারের বিনিময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এমন এক স্বাধীনতা অর্জন করবে, যে, সকল কূটনৈতিক আদান-প্রদান অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে।

জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের পৃথক চুক্তি মিত্রপক্ষ ভালো চোখে দেখেনি। তারা ১৯১৮ সালের ২১ মার্চ বলপূর্বক রাশিয়াকে যুদ্ধে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল। রাশিয়ার অভ্যন্তরে কলচাকও দেনিকিনের নেতৃত্বে শ্বেতরুশ বাহিনী ঘোষণা করে। চারিদিক থেকে ব্রিটিশ, ফরাসি, জাপানি এবং মার্কিন বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেন। লাল ফৌজ এই ব্যূহ ভেদ করে নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রকে রক্ষা করে, কারণ তাদের হাতেই ছিল রেলপথের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ।

প্রথম কমিশনার ট্রটস্কি ভেবেছিলেন, তাঁর দায়িত্ব কয়েকটি বিপ্লবী ঘোষণা পাঠানো, তারপর দোকানের ঝাঁপ ফেলে দেওয়া। ট্রটস্কির উত্তরাধিকারী চিচেরিনের ভাষায় "১৯১৯ সালে আমাদের সরকার সরকারি স্তরে খুব অল্প নির্দেশই পাঠিয়েছিল, মেহনতি জনতার উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ আবেদন পাঠানো হয়েছিল।" মস্কোতে আহুত (মার্চ ১৯১৯) থার্ড ইন্টারন্যাশান্যাল অথবা কমিনটার্ন এক ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং গ্রেগরী জিনোভিভকে প্রথম সভাপতি নির্বাচিত করে। এই সংগঠনের সভায় ধনতন্ত্রবিরোধী কার্যকলাপের বিস্তারিত পরিকল্পনা রচিত হয় এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক সংগঠনগুলিকে সাহায্য দেবার চেষ্টা করা হয়। আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে উৎসাহিত করার জন্য ছড়িয়ে পড়ে। ধনতান্ত্রিক সরকারগুলি কমিনটার্নের ক্রমবর্ধমান কাজে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। বহু সরকার শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কমিউনিস্টদের বাক্ স্বাধীনতা,

মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা, সভাসমিতির স্বাধীনতা দেয়। পূর্ব ও দক্ষিণ ইয়োরোপে এবং আফ্রো-এশীয়া দেশগুলিতে কমিউনিস্টরা চিহ্নিত হলেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতেন।

১৯২০ সাল নাগাদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বিশ্ববিপ্লবের সম্ভাবনা নিতান্ত ক্ষীণ, অন্তত বর্তমানে ক্ষীণ। হাঙ্গেরি ও বেসারাবিয়াতে প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী এবং গোটা ইয়োরোপ জুড়ে সাম্যবাদী আন্দোলনের গতি স্তব্ধ। বার্লিনে স্পার্টাকিস্ট অভ্যুত্থান জানুয়ারি (১৯১৯) মাসে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে লেনিন স্বীকার করে নিলেন, যে বিশ্ববিপ্লবের সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর অনুমান সঠিক নয়।

৪.৩.২. ধনতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে সমঝোতাপর্ব

বিশ্ববিপ্লবের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় লেনিন আভ্যন্তরীণ সংহতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষত, গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি প্রমাণ করে দিয়েছিল যথেষ্ট অস্ত্রসম্ভার উৎপাদন করা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা আশু প্রয়োজন। দুটি লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলেই প্রচুর পরিমাণে পাশ্চাত্য পুঁজির প্রয়োজন। ১৯২১ সালে ১৫ মার্চ কামেনেভ বলেছিলেন, "শ্রমিক জনতার বীরত্বব্যঞ্জক প্রয়াসে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে সক্ষম হব। কিন্তু বিদেশি পুঁজির সাহায্য না নিলে, আমরা ততটা দ্রুত বিকাশ লাভ করতে পারব না যাতে ধনতান্ত্রিক দুনিয়া আমাদের ছাড়িয়ে যেতে না পারে।" ("We, of course, restore our economy by the heroic effort of the working masses. But we cannot develop it fast enough to prevent the capitalist countries from overtaking us, unless we call in foreign capital" উৎস : X. J. Eudin & H. Fisher, Soviet Russia and the West—1920-27.) লেনিন নিজেও ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কো পার্টির সদস্যদের সামনে বলেন, 'রাশিয়ার স্বার্থে আমাদের ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার মৌলিক বিরোধকে কাজে লাগাতে হবে।' প্রধানত, তিনটি বিরোধের ক্ষেত্রকে তিনি চিহ্নিত করেন প্রশান্ত সাগর অঞ্চলে জাপ-মার্কিন বিরোধ, ইয়োরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ এবং সর্বোপরি মিত্রশক্তির সঙ্গে পরাজিত জার্মানির বিরোধ।

১৯২১ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন একই সঙ্গে পাশ্চাত্যের আর্থিক সাহায্য লাভ করার এবং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিরোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এই সময় থেকে নাৎসি-জার্মানির উত্থান পর্যন্ত সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি ছিল, ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার স্ববিরোধকে কাজে লাগানো।

রাশিয়া নিম্নলিখিত কারণে জার্মানি ও মিত্রশক্তির বিরোধকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। প্রথমত, লেনিন বলেছেন, "জার্মান বুর্জোয়া সরকার বলশেভিকদের প্রচণ্ড ঘৃণা করে, কিন্তু এই সরকারের আন্তর্জাতিক অবস্থান, জার্মানিকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে বাধ্য করবে"। ("The German bourgeois government madly hates the Bolsheviks, but the interest of its international position impels it towards peace with Soviet Russia against its own will.") এছাড়া, জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কতকগুলি স্বার্থের মিল ছিল। যুদ্ধোত্তর জার্মানির প্রতিটি রাষ্ট্রনীতিবিদই চেষ্টা করেছিলেন, হয় রাশিয়া নয় পশ্চিমি ধনতন্ত্রগুলিকে নিরপেক্ষ রেখে জার্মানির পুনরুত্থান ঘটাতে। বিশেষত, ফ্রান্সের তীব্র শত্রুতা জার্মানিকে ক্রমশ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তৃতীয়ত, দুই দেশের মধ্যস্থলে পুনরুত্থিত পোলাণ্ড পূর্ব ইয়োরোপে ফরাসি মৈত্রী ব্যবস্থার প্রধান ভরসাস্থল রূপে দুটি দেশে নিরাপত্তার পক্ষেই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। সম্ভাব্য ফ্রাঙ্কো-পোল বিপদের সামনে রাশিয়া ক্রমশ জার্মানির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। জার্মানিও, স্বাভাবিকভাবেই ফ্রান্স ও তার পোলমিত্র সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিল। চতুর্থত, দুটি দেশের আর্থিক

সহযোগিতার ফলে জার্মানির এমন কতকগুলি সামাজিক গোষ্ঠীর সমর্থন সোভিয়েত ইউনিয়ন লাভ করেছিল, যারা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় শত্রু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয় এবং ভার্সাই চুক্তির কঠোর ধারাগুলি জার্মানিকে পশ্চিমি কূটনৈতিক জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিচেরিন গোপনে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী র‍্যাথেনাই-এর সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করেন।

ধনতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে সোভিয়েত নৈকট্যের প্রথম পরিচায়ক (১৯২১) ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্যচুক্তি। এর পরেই রুশ-জার্মান বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

রুশ জার্মান মৈত্রীর চূড়ান্ত পর্যায় সূচিত হয় র‍্যাপালো চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে। এই চুক্তি দুই সরকারের মধ্যে পূর্ণকূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। রাপালো চুক্তি লেনিনের তত্ত্বের সাফল্যের পরিচায়ক। দ্বিতীয়ত, দুই দেশ পারস্পরিক বাণিজ্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জার্মানি রাশিয়াকে বাণিজ্য ঋণ দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। তৃতীয়ত, লালফৌজ পাশ্চাত্যের প্রাগ্যসর সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করে। চতুর্থত, একটি গোপন সামরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে জার্মানি ভবিষ্যতে ভার্সাই চুক্তির নিরস্ত্রীকরণ ধারা অস্বীকার করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। ইয়োরোপের দুই অন্তজ রাষ্ট্রের মৈত্রী স্বাভাবিকভাবেই ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে আহত করে। জেনোয়া সম্মেলনে এই চুক্তির সংবাদ যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তা থেকেই এই চুক্তির আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অনুভব করা যায়। এর আগে পর্যন্ত মিত্রশক্তিতে পৃথকভাবে রাশিয়া ও জার্মানির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হত। রাপালো-উত্তর পর্বে মিত্রশক্তিকে সম্মিলিত রুশ-জার্মান শক্তির মোকাবিলা করতে হল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ধনতান্ত্রিক বিশ্বে পা রাখার জায়গা পেল। জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসে রাপালো একটি যুগবিভাজিকা সূচিত করে। বিশ্ব রাজনীতিতে ভার্সাই চুক্তি ও লোকার্নো চুক্তি মধ্যবর্তী পর্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল রাপালো চুক্তি।

অর্থাৎ ট্রটস্কির বিশ্ববিপ্লবের স্বপ্নের অবসান ঘটে। আবার উল্টোদিকে, কমিনটার্ন তখনও পর্যন্ত কমিউনিস্ট বিপ্লবকে উৎসাহিত করছিল। যেমন ১৯২১ এবং ১৯২৩ সালে জার্মানিতে বিপ্লব প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা হয়েছিল। এমনকি, পাশ্চাত্য পুঁজি কাজে লাগাতে গিয়েও মতাদর্শ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল। কামেনেভের ভাষায়, 'মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে রাশিয়ার উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি পুঁজি নিজের নিজের কবর নিজেই খুঁড়বে।' ("While Strengthtenings Soviet Russia, developing her productive forces, foreign capital will fulfil the role Marx predicted for it when he said the capital was digging its own grave."*)।

স্টালিন পর্ব : ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর স্টালিন তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালের আগে কূটনীতির জগতের সঙ্গে স্টালিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। তিনি প্রথম থেকেই সমাজতন্ত্রবাদের আভ্যন্তরীণ দিকটিতেই বেশী আগ্রহী ছিলেন। বিশ্ববিপ্লবের তত্ত্বকে কেন্দ্র করে তাঁর ও ট্রটস্কির বিতর্ক একটি সার্বজনবিদিত ঘটনা। একজন কট্টর মার্কসবাদীরূপে স্টালিন বিশ্বাস করতেন, কমিউনিজমের আন্তর্জাতিক প্রসার ও জয়যাত্রা অবশ্যম্ভাবী। 'একদেশে সমাজতন্ত্র' (Socialising in one country) প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে দুটি উপায়ে : এক, ভারি শিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে অস্ত্র উৎপাদনে রাশিয়াকে স্বনির্ভর করে তোলা এবং দুই, রাশিয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এড়িয়ে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার পারস্পরিক বিরোধকে কাজে লাগানোর জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে। ১৯২৫ সালে স্টালিন পার্টি কমিটিকে বলেন, "যদি যুদ্ধ শুরু হয় ... আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে, কিন্তু আমাদের সব শেষে বেরনো উচিত। এবং দাঁড়িপাল্লার ভর পরিবর্তনে চূড়ান্ত ভূমিকা পালনের

* [উৎস : X. J. Eudin and H. H. Fisher-Soviet Russia and the West-1920-27.]

জন্যই আমরা বেরিয়ে আসব।" ("If war begins ... we shall have to come out in order to throw the decisive weight on the scales.**)

১৯২৭ সালের আগে পর্যন্ত, ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার দৃষ্টিতে স্টালিন ছিলেন নরমপন্থার প্রতীক। ট্রটস্কির বিপ্লবপন্থার পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক বিশ্ব স্বাভাবিকভাবেই স্টালিনের বিচক্ষণতাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিল। ১৯২৪ সালে সোভিয়েত সরকার ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী এবং গ্রীসের স্বীকৃত অর্জন করে। স্টালিন আশা করেছিলেন, বিদেশি, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির মাধ্যমে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে মতামত তৈরি করতে পারবেন। চীনে তিনি মধ্যপন্থা অনুসরণের পথে চলেছিলেন। ট্রটস্কির বিশ্বাস ছিল, চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রাক্‌বিপ্লব রুশ পরিস্থিতির অনুরূপ অর্থাৎ-বিপ্লবাত্মক। স্টালিনের মতে একটি সংকীর্ণ গোষ্ঠীর সমর্থনে গঠিত কমিউনিস্ট সরকারের তুলনায় বিভিন্ন বিপ্লব অনুরাগী পার্টির সমন্বয়ে গঠিত রাজনৈতিক ফ্রন্টের সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বেশি। তাই তিনি মাও সে তুংকে চিয়াং-কাই শেকের কুয়োমিনতাং পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন। অধ্যাপক আইশ্যাক ডয়েশ্চার (I. Deutscher) মনে করেন, ১৯২৩ সালের শেষে যে পশ্চিমি দুনিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিপ্লবী বলে পরিত্যাগ করেছিল, সেই পশ্চিমি দুনিয়াই ১৯২৭ সালে আপোষকারি রূপে সোভিয়েত ইউনিয়নকে মেনে নেয়।

কিন্তু ১৯২৭ সালের পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে নানা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছিল। প্রথমত, ইতালি বেসারাবিয়া কনভেনসন অনুসারে বেসারাবিয়া অধিগ্রহণকে বৈধতা দান করে। দ্বিতীয়ত, জার্মান ছাড়া উল্লেখযোগ্য পাশ্চাত্য শক্তিগুলি সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে ক্রমশ শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। লন্ডনের সোভিয়েত দূতাবাস আক্রান্ত হয়। ১৯২৭ সালে ইংলন্ডের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। তৃতীয়ত, চিয়াং-কাই শেক কমিউনিস্ট বিরোধি হয়ে ওঠেন। স্বাভাবিকাবেই রুশ চীন সম্পর্কের অবনতি হয়। জার্মানির সমর্থন ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে কূটনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়ত।

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও স্টালিনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ১৯৭২ সাল নাগাদ স্টালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান নিয়ন্তা হয়ে ওঠেন। তিনি বুখারিন, কামেনেভ ও জিনোভিভের মতো দক্ষিণপন্থী নেতা এবং ট্রটস্কির মতো বামপন্থী নেতাদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করেন। কামেনেভের নীতি অনুসারে বৈদেশিক ঋণ সংগ্রহের চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। তিনি প্রিওব্রাঝেনস্কির (Preobrazhenskey) বিকল্প নীতি অনুসারে বৈপ্লবিক পথে সোভিয়েত অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করেন। কৃষিক্ষেত্রকে পুরোপুরি সামগ্রিকীকরণ (Collectivization) করা হয় এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারি শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। স্টালিনের লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটি সামরিক শক্তিরূপে গড়ে তোলা। সামরিক শক্তিতে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠতে পারলে ধনতান্ত্রিক বিশ্বের সমর্থন বা অসহযোগিতায় সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হত না।

পশ্চিমি দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেও, সোভিয়েত ইউনিয়ন যৌথ নিরাপত্তা, নিরস্ত্রীকরণ প্রভৃতি সমস্যার সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯২৭ সালে লিটভিনভ নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। রাশিয়া লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্তান এবং পরে ফ্রান্স ও পোলান্ডের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯২৮ সালে রাশিয়া অন্যান্য দেশের সঙ্গে কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে—এই চুক্তিতে লক্ষ্যপূরণের উপায়রূপে যুদ্ধকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

**[উৎস : I Deutscher, *Stalin a political Biography Source*.]

১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত স্টালিন বিজয়ী মিত্রশক্তির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে অগ্রসর হন। রুশ জার্মান মৈত্রীর সাময়িক অবসান ঘটে। নিম্নলিখিত কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রমশ জার্মান বন্ধুত্ব সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। প্রথমত, জার্মান রাষ্ট্রের চ্যান্সেলর পদে ক্রমশ অধিকতর দক্ষিণপন্থী ব্যক্তি নিযুক্ত হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়। নাৎসি নেতাদের সোভিয়েত বিরোধী কুৎসা সোভিয়েত—জার্মান সম্পর্ককে শীতল করে তোলে। এ্যালফ্রেড রোসেনবার্গের চারপাশের লোকজনেরা ছিলেন নির্দিষ্টভাবে সোভিয়েত বিরোধী। সোভিয়েত বিরোধী প্রচারের মাধ্যমেই নাৎসিবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইয়োরোপের গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের মন জয় করতে পেরেছিল।

দ্বিতীয়ত, জার্মানির সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠার প্রমাণগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নব নিযুক্ত জাপানী রাষ্ট্রদূতকে হিটলার উষ্ম অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এছাড়া, জার্মানি পূর্ব ইউরোপীয় মৈত্রীগুলির চূড়ান্ত বিরোধিতা করেছিলেন। জাপ-জার্মান মৈত্রীচুক্তির সম্ভাবনা সোভিয়েত সরকারকে সদা সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল।

রুশ পররাষ্ট্রনীতির দিক পরিবর্তনের প্রধান ঘটনা পোল-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি (জানুয়ারি, ১৯৩৪) স্বাক্ষর। সোভিয়েত ইউনিয়ন এতদিন পর্যন্ত পোলাণ্ডের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, সে ক্ষেত্রে গভীর বাধার সৃষ্টি হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় সোভিয়েত সীমান্তে জার্মান আক্রমণের ভীতি এসে পৌঁছয়। মিত্রপক্ষের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন গত্যন্তর ছিল না। তবে, এক্ষেত্রেও সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি লেনিন নির্ধারিত পথেই অবিচল ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এক ধনতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে অপর ধনতান্ত্রিক পক্ষকে সমর্থন করেছিল।

১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়া লীগে যোগদান করে এবং লীগের কার্যাবলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। ১৯৩৫ সালের মে মাসে সোভিয়েত রাশিয়া ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু উল্লেখ করা দরকার, এই পরবর্তী মৈত্রী—চুক্তিগুলি সোভিয়েত-জার্মান মৈত্রীর মতো উষ্মতা কখনই অর্জন করতে পারেনি।

ফ্রান্স ও স্পেনে পপুলার ফ্রন্ট সরকার কায়েম হওয়ায় এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে সাম্যবাদের পুনরাবির্ভাবের ফলে, এই দেশগুলির গণতান্ত্রিক গোষ্ঠী সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, সোভিয়েত ইউনিয়ন নীরব দর্শক হয়ে দেখে কীভাবে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলির প্রতি তোষণ নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। যখনই সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিবাদী প্রতিহত করার জন্য পশ্চিমি শক্তিগুলিকে অনুরোধ জানিয়েছিল তখনই তা প্রত্যাখ্যাত হয়। এছাড়া, স্তালিন তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন, কেবলমাত্র ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একজোট হলেও হিটলারের আগ্রাসনকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

৪.৩.৩ হিটলারের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি

১৯২৭ সালের পর থেকে নানান আন্তর্জাতিক প্রতিঘাত স্টালিনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। তিনি মূলত রাশিয়ার সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই সোভিয়েত রাশিয়া নিজের নিরাপত্তারক্ষার জন্য একটি নিরাপদ ও নিষ্ক্রিয় পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে সচেষ্ট হয়। এই আপেক্ষা করার রাজনীতি অনুসরণ করতে গিয়ে স্টালিন হিটলারের ও নাৎসিবাদের অভ্যুত্থানের প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন নি।

১৯৩০ থেকে ৩৩ সালের মধ্যে হিটলার বহুবার ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। স্টালিনের চোখে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট এবং নাৎসি উভয় দলই ছিল বিপ্লববিরোধী। এবং দুটি দলের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। সেই কারণেই, জার্মান কমিউনিস্টদের হিটলারের বিরুদ্ধে সোশাল ডেমোক্র্যাট বা অন্যান্য মধ্যপন্থার

পার্টিগুলিকে সাহায্য করতে নিষেধ করা হয়। ট্রটস্কি তাঁর সুদূর নির্বাসন থেকে এই নীতির বিপদ সম্পর্কে বারে বারে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে সোশাল ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে কার্যকার সমঝোতার মধ্যে দিয়েই জয়লাভ করা সম্ভব। তিনি বলেছিলেন "ত্বরা কর! তোমার হাতে সময় খুব অল্প!" "Make haste, you have very little time left !" ট্রটস্কির ভবিষ্যৎবাণী সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

স্টালিন ক্রমশ তাঁর ভ্রান্তি বুঝতে পারেন। নাৎসিপন্থা যে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের তুলনায় অনেক বেশি বিপজ্জনক তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার ফলে ১৯৩৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন লীগে প্রবেশ করেছিল। ১৯৩৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করলেও, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক কখনই হার্দিক হয়ে ওঠে নি। জেনেভা সম্মেলনে লিটভিনভ যৌথ নিরাপত্তার জয়গান গাইলেও মিউনিখ সম্মেলনে রাশিয়াকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। সোভিয়েত সরকার সত্যিই-চেকোশ্লোভাকিয়াকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করতে চায় কিনা তা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া, বিভিন্ন দেশ তাদের জমির উপর দিয়ে সোভিয়েত বাহিনীকে যাতায়াত করতে দেবে কিনা, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। পোলাণ্ড ও রুমানিয়ার আশঙ্কা ছিল তাদের সীমানার ভিতর দিয়ে সোভিয়েত সেনা গেলে তারা থেকেই যাবে। রুমানিয়া একটি মাত্র ছাড় দিয়েছিল, ৩০০০ মিটারে ওপর দিয়ে সোভিয়েত বিমান ওড়ার অনুমতি দিয়েছিল।

১৯৩৯ সালে এপ্রিল থেকে আগস্টের মধ্যে ব্রিটিশ, ফরাসি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে নাৎসি আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে একটি মৈত্রী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছিল। ১৪ এপ্রিল ইংলন্ড সোভিয়েত ইউনিয়নকে জানায় কোনো আক্রমণ ঘটলে সে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। এর উত্তরে ১৮ এপ্রিল সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্ভাব্য আক্রমণের সামনে পোলাণ্ড ও রুমানিয়াকে রক্ষা করার জন্য ইংলন্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার এক মৈত্রী চুক্তির প্রস্তাব করে। এই মৈত্রীর পাশাপাশি সামরিক প্রস্তুতির কথাও বলা হয়েছিল। ফরাসিরা সোভিয়েত প্রস্তাবে রাজী ছিল কিন্তু ইংলন্ড মনস্থির করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত, ইংরেজ সরকার সোভিয়েত প্রস্তাব মেনে নেয়। ঠিক হয় প্রথমে রাজনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে তারপর ২৩ জুলাই সামরিক কথাবার্তা শুরু হবে। কিন্তু এই আলাপ আলোচনার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবার আগে পরোক্ষ আক্রমণের সমস্যার সমাধান হয়নি। ব্রিটিশ সরকার কোনো মতেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে দিতে প্রস্তুত ছিল না। বিশেষত, বাল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলি সহজেই রুশ আগ্রাসনের শিকার হতে পারত। ইংরেজরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক দৌত্য প্রেরণে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। তাদের ইচ্ছে ছিল সামরিক আলাপ আলোচনার সম্পন্ন হবে। অথচ সোভিয়েত ইউনিয়ন যুগপৎ রাজনৈতিক চুক্তি এবং সামরিক আলোচনা সম্পন্ন করতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত, একটি ইঙ্গ ফরাসি দৌত্য ১১ আগস্ট মস্কো এসে পৌঁছায়। যানবাহনের বিলম্বিত গতি ও বিমানের পরিবর্তে জাহাজ ব্যবহার রুশরা ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি। Admiral Sir Reginald Plunkett-Krule Drax যথেষ্ট রাজনৈতিক বিচক্ষণ সম্পন্ন ব্যক্তি হলেও, নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক কারণে দ্রুতগামী বিমানের পরিবর্তে ধীরগামী জলপোত বেছে নেওয়া হলেও এই দৌত্যের তাৎক্ষণিক চুক্তি সম্পাদনের কোন অধিকার ছিল না।

কাজেই যখন ১২ আগস্ট দ্বিপাক্ষিক আলোচনা আরম্ভ হল, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ইংলন্ডের উৎসাহের অভাব অনুভব করেছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, ইংলন্ড ও ফ্রান্স পোলাণ্ডকে তার সীমানার ভিতর দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাহিনী নিয়ে যাবার প্রশ্নে রাজি করাতে পারে নি। ইংলন্ডের সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল, তারা ইঙ্গ-ফরাসি সোভিয়েত চুক্তি সম্পাদনে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেনি। সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল, তারা মনে করেছিল তাদের ইংলন্ডকে যত প্রয়োজন, ইংলন্ডের তাদের আরও

বেশি প্রয়োজন। স্টালিন মেইন ক্যাম্ফ (Mein Kampf)-এর কেন্দ্রীয় যুক্তি বুঝতে পারেননি, তাহলে তিনি কখনই অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করতেন না।

১৯৩৮ সালের শীতকালে কয়েকজন সোভিয়েত পদাধিকারী জার্মানির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। অনেকে এই প্রচেষ্টাকে সোভিয়েতের অশুভ শক্তির পরিচায়ক বলে বোধ করেন। কার্যত মিউনিখের পর যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার ফলে তারা একটি বিকল্প পথ খোলা রাখার চেষ্টা করেছিল। মাত্র ১৯৩৯ সালের ১০ মার্চ স্টালিনের বক্তৃতায় এই দোলাচলের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ঘোষণা করেন সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি মতাদর্শগত নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন শান্তি চায় এবং বিদেশি রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। তোষণ নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়। কিন্তু ইংরেজ কূটনীতিজ্ঞরা বুঝতে পারেননি সোভিয়েত ইউনিয়ন কীভাবে এই ঘোষণাকে কাজে লাগাবে।

এপ্রিলের গোড়ায় Karl Schnurre নামক বার্লিনের কে মাঝারি ধরনের জার্মান কূটনীতিকে সোভিয়েত জার্মান সম্পর্কের উন্নতির উল্লেখ করলেন। ১৯৩৯ সালের মার্চের শেষ থেকেই জার্মান ও সোভিয়েত প্রতিনিধিদের মধ্যে মতবিনিময় আরম্ভ হয়েছিল। ৩ মে, ইহুদি লিটভিনভকে পদচ্যুত করা হয়। তাঁর জায়গায় আসেন Mootov। মে মাসের শেষে সোভিয়েত জার্মান অর্থনৈতিক আলোচনা আরম্ভ হয়। ১৯ আগস্ট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৩ আগস্ট নাৎসি সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

খোলাখুলিভাবে বলা হয় উভয়পক্ষ একে অন্যকে আক্রমণ করবে না বা কোনো আক্রমণকারি তৃতীয় পক্ষকে সমর্থন করবে না। এটি দশ বছর স্থায়ী ছিল। এই চুক্তির গোপন ধারাগুলিই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। জার্মান ও সোভিয়েত প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলিকে বিভাজন করে নেওয়া হয়। পিসা, নারেভ, ভিশ্চুলা এবং সান নদী ধরে পোলন্ড বিভাজন করা হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিনলান্ড, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া এবং রুমানিয়া বেসারাবিয়া প্রদেশে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। তখনকার মতো লিথুয়ানিয়াতে জার্মান প্রভাব স্বীকার করে নিলেও শেষ পর্যন্ত লিথুয়ানিয়াও সোভিয়েত প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে।

যেহেতু ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের সঙ্গে এক অঘোষিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তার পক্ষে দুই সীমান্তে আক্রমণ সহ্য করা সম্ভব ছিল না। এছাড়া জার্মান প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে খুবই চিত্তাকর্ষক ছিল। এই চুক্তির মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিরোধকে কাজে লাগিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন শক্তি অর্জন করতে পারত। এবং পূর্ব ইউরোপ ও বাল্টিক অঞ্চলে তার সীমানা বিস্তার হত। ইংলন্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে বন্ধুত্বের অনিশ্চিতির পরিবর্তে স্টালিন হিটলারের সঙ্গে নিশ্চিত সম্পর্ককে বেছে নিলেন ("Stalin opted for certainties of an accomodation with Hitler, rather than the uncertainties of a tie with Britain and France.")

পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির দুই দিক থেকে সমালোচনা করেছে। এস. মরিস প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে, পাশ্চাত্য শক্তি গুলি যখন নাৎসিবাদকে ঠেকানোর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল সেই সময় সহসা হিটলারের সঙ্গে আক্রমণচুক্তি স্বাক্ষর করে স্তালিন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।

নীতির দিক থেকে সাম্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একনায়কতান্ত্রিক জার্মানির বন্ধুত্বস্থাপন ছিল নিতান্ত অযৌক্তিক।

উপরোক্ত সমালোচনার বিরুদ্ধে অধ্যাপক টেলর দেখিয়েছেন মিউনিখ চুক্তির কর্মকর্তাদের মুখে সমালোচনা শোভা পায় না। আক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত পশ্চিমি গণতন্ত্রগুলি সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে

চুক্তি সম্পাদনে উদাসীনতা দেখিয়েছিল। বিভিন্ন নথিপত্র থেকে প্রমাণ করা যায় পাশ্চাত্য গণতন্ত্রগুলিই Grand Alliance-র ব্যর্থতার জন্য দায়ী ছিল। রাশিয়ার পক্ষেও কার্যত কোনো বিকল্প পথ খোলা ছিল না।

আপাতদৃষ্টিতে অনাক্রমণ চুক্তিকে বিশ্বাসঘাতকতা মনে হলেও, রুশ-জার্মান মৈত্রীর এক দীর্ঘ ইতিহাস ছিল। বিংশ শতকের গোড়ায় ১৯১৪ সালে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম একবার রুশ মৈত্রীকে অস্বীকার করেছিলেন। আর ১৯৪১ সালে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেছিলেন। দুটি ক্ষেত্রেই জার্মানির ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘোষিত নীতি অনুসারে সে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার মৌলিক বিরোধকে কাজে লাগিয়ে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। ১৯২১ থেকে' ২৭ সালের মধ্যে সোভিয়েত-জার্মান বন্ধুত্ব ঘনীভূত হয়। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৯ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন মিত্রপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে। ১৯৩৯ সালের আগস্ট থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত-জার্মান মিত্রতার যুগ চলেছিল।

অধ্যাপক এ.জে.পি টেলরের মতে, হিটলার ও স্টালিন দুজনেরই ধারণা হয়েছিল যে তাঁরা এই চুক্তির সুবাদে আগত যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রতিহত করতে পারবেন। হিটলার ভেবেছিলেন এই চুক্তির মাধ্যমে তিনি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারবেন। স্টালিনও ভেবেছিলেন রাশিয়া সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু বাস্তবে হিটলার-স্টালিন অনাক্রমণ চুক্তি যুদ্ধকে প্রতিহত না করে যুদ্ধের আগমনকে ত্বরান্বিত করেছিল। ১ সেপ্টেম্বর জার্মানি পোলাণ্ড আক্রমণ করে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স পোলাণ্ডের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য জার্মানির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে ৩ সেপ্টেম্বর।

এই অনাক্রমণ চুক্তির মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের একাকীত্বের অবসান ঘটে। এই চুক্তি একদিকে পশ্চিমি গণতন্ত্রের ভ্রান্ত পররাষ্ট্রনীতির অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করে। জার্মানি সাময়িকভাবে পশ্চিমি গণতান্ত্রিক বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এল। সব মিলিয়ে নীতিগতভাবে কমিউনিস্ট বিরোধী জোটেও ফাটল ধরেছিল।

৪.৩.৪ গ্রান্ড আলায়েন্স

রুশ-জার্মান অনাক্রমণচুক্তি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। ১৯৪১ সালের ২২ জুন জার্মানি এই অনাক্রমণ চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করে।

বাস্তবিক রুশ আক্রমণের পরিকল্পনা (Operation Barbarossa) নেওয়া হয়েছিল। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর। আক্রমণ কার্যকর করতে ছয় মাস কেটে যায়। '৪০ থেকে '৪১ সালের মধ্যে রুশ-জার্মান সম্পর্কে দ্রুত অবনতি ঘটে। জার্মানরা বিশ্বাস করত ফিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা স্টালিনের উচিত হয় নি। তারা খোলাখুলি ফিনল্যান্ডের প্রতি তাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছিল। স্টালিন পূর্ব ইয়োরোপের রাজ্যাংশ পেয়ে সন্তুষ্ট হননি। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানি, জাপান এবং ইতালি ত্রিশক্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে। রুশ দাবি মানা না হলে মলোটভ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন। অধ্যাপক আই. গ্রে-র মতে, এই আলোচনার পরেই হিটলার ১৯৪১ সালে রুশ আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

স্টালিন বহু সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করেছিলেন। যখন আক্রমণের সংবাদ এল তখন রুশবাহিনী সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। স্টালিন একদিকে এই আক্রমণের উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শক্তিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ১৯৪১ সালে ইঙ্গ-সোভিয়েত পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি (Mutual Assistance Pact.) স্বাক্ষরিত হল। ১৯৪২ সালে সম্পাদিত হল ২০ বছর স্থায়ী ইঙ্গ-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তি। যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান করল তখন ইংলন্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিয়ে গ্র্যান্ড আলায়েন্স স্থাপিত হল। এই মৈত্রীর মূল উদ্দেশ্য ছিল নাৎসিবাদের পতন ঘটানো।

এই মৈত্রী শেষ পর্যন্ত পৃথিবী থেকে একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটালেও এই মৈত্রী কখনই দৃঢ়ভিত্তিক ছিল না। রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তির পতনের পরেই এই মৈত্রীব্যবস্থার ফাটলগুলি বড় হয়ে ওঠে।

উষ্ম যুদ্ধের অবসানে পৃথিবী জড়িয়ে পড়ে ঠান্ডা লড়াইতে। ইউরোপীয় প্রাধান্যের অবসানে রুশ-মার্কিন বিরোধ পৃথিবীকে ভাগ করে দ্বিপাক্ষিক দুনিয়ার।

৪.৫ সারাংশ

১৮২৩ সালের মনরো ঘোষণার পর থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন ইউরোপীয় শক্তিগুলিকে পশ্চিম গোলার্ধে হস্তক্ষেপ করতে দিতে চায়নি, তেমনি, ইউরোপীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তেও চায়নি।

কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য হয়। উড্রো উইলসন প্রবর্তিত চৌদ্দ দফা নীতি ও লীগ চুক্তিপত্রই রচনা করে ভবিষ্যৎ শান্তির ভিত্তি।

শেষপর্যন্ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নতাবাদী মতবাদ শক্তিগুলি হয়ে ওঠে এবং মার্কিন সেনেট ভার্সাই চুক্তি ও লীগ চুক্তিপত্র অনুমোদনে অস্বীকার করেন।

কিন্তু ইয়োরোপীয় ক্ষতিপূরণ সমস্যা ও নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল, হয়ে উঠেছিল অর্থনৈতিক নিয়ন্তা।

১৯২৯ সালে শেয়ার বাজারে ধ্বস্ মার্কিন অর্থনীতি তথা বিশ্ব অর্থনীতিকে ধ্বংসের সম্মুখীন করে। নব নিযুক্ত রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট 'নিউডীল' নীতির মাধ্যমে অর্থনীতিকে বাঁচানোর চেষ্টায় ব্রতী হন।

ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও লাতিন আমেরিকায় 'নিখিল মার্কিনবাদ' (Pan Americanism) এবং পশ্চিম গোলার্ধের সংহতির (hermispheric solidarity) নামে মার্কিন পুঁজি ও সামরিক প্রভাব বিস্তার চলতেই থাকে।

অবশেষে ১৯৩৩ সালে 'সৎ প্রতিবেশী' নীতি (good neighbour policy) গৃহীত হয়। অক্ষশক্তির হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে দুই মহাদেশের নিরাপত্তা রক্ষা করা হয় এবং অর্থনৈতিকভাবে লাতিন আমেরিকাকে পুরোপুরি মার্কিন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দূর প্রাচ্যে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। রুজভেল্ট চীনকে সমর্থন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। আবার উদারনৈতিক মার্কিন কূটনৈতিকরা চীনকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। অবশেষে ১৯২৭ সালে লানসিং-ইশি চুক্তি অনুসারে চীনের সংহতি স্বীকার করে নেওয়া হয়, আবার মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে জাপানের প্রভাব স্বীকার করে নেওয়া হয়। (১৯২১-২২) ওয়াশিংটন সম্মেলনে জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা প্রশান্ত সাগর অঞ্চলে নৌ-অস্ত্র হ্রাসের জন্য মিলিত হন।

১৯৩১ সালে জাপান যৌথ নিরাপত্তার বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে। চীনের শত অভিযোগ সত্ত্বেও লীগ জাপানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের চেয়ে অধিক পরিমাণ নৌ-শক্তির অধিকারী হওয়ায় সে জাপানের শক্তিবৃদ্ধি সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল। তাছাড়া, জাপানের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক সম্পর্কের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা নিতে প্রস্তুত ছিল না। এর ফলে সামগ্রিকভাবে যৌথ নিরাপত্তাব্যবস্থার অবনতি ঘটে। একনায়কতান্ত্রিক শক্তিগুলির ক্ষমতাবৃদ্ধি ঘটে।

১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর লেনিন ১৯১৮ সালে জার্মান সরকারের সঙ্গে ব্রেস্টলিটভস্কের চুক্তির মাধ্যমে বিশাল অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে শান্তিস্থাপন করেন। বিপ্লবী আদর্শবাদই, ছিল লেনিনীয় পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র।

সোভিয়েত সরকারের আশা ছিল দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আহ্বান জানালেই বিপ্লব আরম্ভ হয়ে যাবে। ধনতন্ত্রের অবসান ঘটবে।

কিন্তু ১৯২০ সালের পর প্রমাণ হয় বিশ্ববিপ্লবের স্বপ্নপূরণ হবে না। তখন সোভিয়েত সরকার ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার বিরোধকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়ে ওঠে। প্রথমেই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জার্মানি। প্রথমে বাণিজ্য চুক্তি তারপর কূটনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এর পাশাপাশি মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলিও সোভিয়েত ইউনিয়নকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়। ১৯২৭ সালে লিটভিনভ নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এরপর রাশিয়া লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯২৮ সালে কেলগ-ব্রিঁয়া চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীরূপে সোভিয়েত ইউনিয়ন কূটনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে যুদ্ধকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯৩৩ সালে নাৎসি বিপ্লবের পর ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত স্টালিন বিজয়ী ত্রিশক্তির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে অগ্রসর হয়। ১৯৩৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়া লীগে যোগদান করে এবং লীগের কাজে যোগদান করে। ১৯৩৫ সালের মে মাসে সোভিয়েত রাশিয়া ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

কিন্তু ফ্রান্স ও স্পেনে পপুলার ফ্রন্ট সরকার স্থাপন ও সাম্যবাদের প্রসারের ফলে মিত্রশক্তি রাশিয়া সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন তোষণ নীতির নীরব দর্শক রূপে দেখে কীভাবে ইংলন্ড ফ্রান্স ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলিকে তোষণ করে যাচ্ছে।

১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে মিত্রপক্ষের সঙ্গে কূটনৈতিক ও সামরিক চুক্তিস্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় দুই সীমান্তে আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ১৯৩৯ সালের আগস্টে স্টালিন সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ হয়।

কিন্তু ১৯৪১ সালে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করে। অবশেষে সাম্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলির জোট গড়ে ওঠে (Grand Alliance)। হিটলারের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। কিন্তু এর পরেই মহান মৈত্রী ভেঙে যায়। পৃথিবী ভাগ হয়ে যায় ঠান্ডা লড়াইয়ের দুই নেতার নেতৃত্বে।

৪.৬ অনুশীলনী ঃ প্রশ্নাবলি ও উত্তর-সংকেত

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। মনরো-নীতির সঙ্গে ল্যাতিন আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর পররাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক কি?
উত্তর ঃ ৪.২.৩

২। ওয়াশিংটন সম্মেলন দূরপ্রাচ্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কতটা সফল হয়েছিল?
উত্তর ঃ ৪.২.৪

৩। সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির আদর্শবাদের পর্ব সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?
উত্তর ঃ ৪.৩.১

৪। ১৯২২ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যবর্তী পর্বে রুশ-জার্মান সম্পর্কের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
উত্তর ঃ ৪.৩.২ ও ৪.৩.৩

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। আইশাখ ডয়শ্চার *'স্টালিন এ পলিটিক্যাল বায়োগ্রাফি'* (১৯৩৯)।

২। এইচ. বি. পার্কস *'দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা'* (১৯৬৭)।

৩। আকিরা ইরি (Akira Iriye) *'দ্য কেমব্রিজ হিস্টরি অফ আমেরিকান ফরেন রিলেশনস'*, তৃতীয় খণ্ড, *'দ্য গ্লোবালাইজিং অফ আমেরিকা'*, (১৯৩৩)।

৪। অ্যান্ড্রু জে. ক্রোজিয়ার *'দ্য কসেস অফ দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার'* (১৯৯৭)।

৫। উইলিয়াম আর কেইলর, *'দ্য টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ওয়ার্ল্ড'* (২০০১)।

একক ৫ ❑ জাতিসঙ্ঘ বা লীগ অফ নেশনস : শান্তির প্রয়াস ও ব্যর্থতা

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য

৫.১ প্রস্তাবনা

৫.২ জাতিসঙ্ঘ—'একটি শক্তিশালী হাতিয়ার'

৫.৩ জাতিসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক পটভূমিকা

৫.৪ ব্রিটেন ও আমেরিকার ভূমিকা

৫.৫ জাতিসঙ্ঘের চুক্তিপত্র ও তার উদ্দেশ্য এবং আদর্শ

৫.৫.১ যৌথ নিরাপত্তা

৫.৫.২ জাতিসঙ্ঘের কর্মপ্রয়াস

৫.৫.৩ জাতিসঙ্ঘের সভ্যপদ

৫.৫.৪ জাতিসঙ্ঘের গঠন

৫.৫.৫ জাতিসঙ্ঘের প্রকৃতি

৫.৬ জাতিসঙ্ঘের কার্যকলাপ

৫.৬.১ জাতিসঙ্ঘের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা

৫.৬.২ ইউপেন ও মামেডি

৫.৬.৩ অল্যান্ড দ্বীপ সমস্যা

৫.৬.৪ পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়া বিরোধ

৫.৬.৫ কর্ফু বিরোধ

৫.৬.৬ সাইলেশিয়ার সমস্যা

৫.৬.৭ তুরস্ক-ইরাক বিবাদ

৫.৬.৮ আর্মেনিয়া-তুরস্ক বিবাদ

৫.৬.৯ যুগোশ্লাভিয়ার আক্রমণ

৫.৬.১০ গ্রীস-বুলগেরিয়া সংঘর্ষ

৫.৬.১১ কলম্বিয়া-পেরু বিবাদ

৫.৬.১২ ইঙ্গ-ফরাসি বিবাদ

৫.৬.১৩ মাঞ্চুরিয়া সমস্যা

৫.৬.১৪ ইটালির ইথিওপিয়া অভিযান
৫.৭ লীগ অফ নেশনসের অন্যান্য কার্যাবলী
৫.৭.১ জাতিসঙ্ঘ ও বিশ্বশান্তি
৫.৭.২ অর্থনৈতিক পুনর্গঠন
৫.৭.৩ সামাজিক ও মানসিক উন্নয়ন
৫.৮ জাতিসঙ্ঘের কৃতিত্ব
৫.৯ জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতার কারণ
৫.১০ জাতিসঙ্ঘের কার্যাবলীর মূল্যায়ন
৫.১১ সারাংশ
৫.১২ অনুশীলনী
৫.১৩ গ্রন্থাবলী

৫.০ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককটিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন পরিস্থিতিতে শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনের প্রয়াস আলোচিত হয়েছে। এই কর্মপ্রচেষ্টার দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছিল জাতিসঙ্ঘ বা লীগ অফ নেশনসের উপর। এই এককটি পাঠ করে আপনারা যে বিষয়গুলি জানতে পারবেন তা নিম্নে বর্ণিত হল।

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বৃহৎ শক্তিবর্গের নেতৃত্বে জাতিসংঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা।
- জাতিসংঙ্ঘের শান্তি-নিরাপত্তা ও সহযোগিতা স্থাপনের উদ্দেশ্য বিভিন্ন সংস্থার স্থাপন।
- রাজনৈতিক সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা।
- যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন।
- জনকল্যাণ মুখী পরিকল্পনা।
- লীগের কার্যাবলীর মূল্যায়ন।
- লীগের ব্যর্থতা।

৫.১ প্রস্তাবনা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল এক সর্বাত্মক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। এমন ব্যাপক যুদ্ধ ইতিপূর্বে সংঘটিত হতে দেখা যায়নি। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত চার বছরের সময়কালে অসংখ্য মানুষের জীবনহানি ঘটেছিল, ধ্বংস হয়েছিল বিশ্বের অর্থনৈতিক সম্পদ এবং পরিবর্তিত হয়েছিল বিশ্ব রাজনীতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মধ্য ইউরোপ ও পূর্ব ইউরোপের রাজনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে এখানে দেখা দিল রাজনৈতিক শূন্যতা। জার্মানির পরাজয়ের পর শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে রাজনৈতিক অস্থিরতা নিরসনের জন্য, পৃথিবীকে আগামী যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিবদমান সব রাষ্ট্রগুলি নিজ প্রয়োজনের তাগিদে সম্মিলিত হ'ল।

প্রকৃতপক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আন্তর্জাতিকতাবাদের সূচনা করেছিল। ১৯১৮ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের বিখ্যাত চৌদ্দ দফা শর্তে উল্লিখিত হয়েছিল যে ছোট বড় রাষ্ট্রগুলির আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একটি সাধারণ সমিতি স্থাপিত হবে। এরই ফলস্বরূপ আত্মপ্রকাশ করে জাতিসঙ্ঘ বা লীগ অফ নেশনস। স্বভাবতই এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল শান্তিরক্ষা, আলোচনা ও আপোসের দ্বারা আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করা এবং পৃথিবীতে পুনরায় যুদ্ধের পরিস্থিতির যাতে সৃষ্টি না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৫.২ জাতিসঙ্ঘ— 'একটি শক্তিশালী হাতিয়ার'

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নেপোলিয়ানের পতনের পর পবিত্র সংঘ ও ইউরোপীয় রাষ্ট্র সমবায় গঠনের মধ্যে দিয়ে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভের প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে কোন বিবাদ শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য এক বিশ্ব সংস্থার প্রয়োজন, তা সকল রাষ্ট্রনীতিবিদই উপলব্ধি করেছিলেন। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে তাই জাতিসঙ্ঘ ছিল একটি "milestone"। যুদ্ধক্ষত, হতাশাগ্রস্ত মানুষের মন থেকে যুদ্ধ ভীতি দূর করে নিরাপত্তাবোধ জাগিয়ে তুলতে, আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করতে এবং শান্তির বাতাবরণ রক্ষার্থে জাতিসঙ্ঘ হয়ে উঠেছিল এক শক্তিশালী হাতিয়ার (Potent instrument)।

৫.৩ জাতিসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক পটভূমি

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই সমগ্র ইউরোপ দুটি সশস্ত্র শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এই সময়কালে সাধারণ মানুষ এবং রাষ্ট্রনীতিবিদ সকলেরই মনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থায়ী শান্তি সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছিল, এরই ফলে ১৮৯৯ ও ১৯০৭ সালের হেগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (The Hague Peace Conference)। হল্যাণ্ডের হেগ শহরে অনুষ্ঠিত দুটি সান্তি সম্মেলনে স্থায়ীরূপে একটি জাতিসঙ্ঘ স্থাপনের প্রস্তাব আলোচিত হয়। তবে আলোচনা ফলপ্রসূ হবার পূর্বেই সংঘটিত হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। তাই যুদ্ধ সমাপ্তির জন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতি যে চৌদ্দ দফা প্রস্তাব এনেছিলেন তার চতুর্দশ দফাটি ছিল একটি বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানরূপে জাতিসঙ্ঘ স্থাপনের প্রস্তাব। রণক্লান্ত পৃথিবী এই সময়ে শান্তির আকাঙ্ক্ষায় এই প্রস্তাব সমর্থন করে। ১৯১৯ সালে ভার্সাই সন্ধিতে জাতিসঙ্ঘ স্থাপনের প্রস্তাব বিধিবব্ধ করা হয়। যে দলিলটিতে জাতিসংঘের উদ্দেশ্য, গঠনবিধি বিধৃত করা হলো তা চুক্তিপত্র বা কভেনান্ট (League Covenant) নামে পরিচিত হ'ল। ভার্সাই সন্ধির ভিতর লীগ অফ নেশনসের চুক্তিপত্র জাতিসঙ্ঘের ভার্সাই সন্ধির অন্তর্ভূক্ত ছিল।

৫.৪ ব্রিটেন ও আমেরিকার ভূমিকা

জাতিসঙ্ঘ বা লীগ অফ নেশনসের চুক্তিপত্রে প্রাধান্য পেয়েছিল আমেরিকা ও ব্রিটেনের মতবাদ। (আমেরিকার নীতি ও ইংল্যাণ্ডের আইনগুলি লীগ কভেন্যান্টে সংকলিত হয়) "America supplied the principle, British the leagal frame work" প্রকৃতপক্ষে লীগ চুক্তি পত্রে ইঙ্গ-মার্কিন মতের সমন্বয় সাধিত হয়েছিল।

৫.৫ জাতিসঙ্ঘের চুক্তিপত্র ও তার উদ্দেশ্য এবং আদর্শ

১নং অনুচ্ছেদ

সংযোজনে উল্লেখিত হয়নি এমন যে কোন পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র, অধিরাজ্য অথবা উপনিবেশ যদি লীগের সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি পায় তাহ'লে সেই রাষ্ট্র লীগের সদস্য হ'তে পারে ; তবে শর্ত থাকবে যে ঐ রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালনে আন্তরিক সদিচ্ছা প্রকাশ করতে হবে এবং লীগ যদি ঐ রাষ্ট্রের সামরিক, নৌ ও বিমানবাহিনী এবং সমরাস্ত্রের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রয়োগ করে তাহ'লে তা মেনে নিতে হবে।

৪নং অনুচ্ছেদ

কাউন্সিল প্রতিনিধিত্ব করে না এমন কোনো লীগের সদস্যরাষ্ট্রের স্বার্থবিষয়ক কোন বিষয় আলোচনার সময়ে লীগের ঐ সদস্যরাষ্ট্রকে কাউন্সিলে সদস্য হিসাবে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

৫নং অনুচ্ছেদ

এই চুক্তিপত্রে অথবা বর্তমান চুক্তির শর্তাবলীর মধ্যে অন্যত্র যা পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে তা বাদে সাধারণ সভা অথবা কাউন্সিলের যে কোন সভায় লীগের সকল সদস্য, যারা ওই সভায় প্রতিনিধিত্ব করছে, তাদের ঐক্যমত প্রয়োজন।

কোন বিশেষ ব্যাপারে অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগসহ সাধারণ সভা অথবা কাউন্সিলের সভার যাবতীয় কার্যপ্রণালী সাধারণ সভা অথবা কাউন্সিলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা গৃহীত হবে।

৮নং অনুচ্ছেদ

শান্তি রক্ষার ব্যাপারে সমরাস্ত্রের পরিমাণ জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রেখে নিম্নতম পর্যায়ে কমিয়ে আনার এবং আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পালনে যৌথকর্মসূচী বলবৎকরণের প্রয়োজনীয়তা লীগের সকল সদস্য স্বীকার করে নিচ্ছে।

১০নং অনুচ্ছেদ

বহিঃআক্রমণের বিরুদ্ধে লীগের সকল সদস্য রাষ্ট্রের বর্তমান রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার ব্যাপারটি সকল সদস্য মান্য করবে ও সংরক্ষিত করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এরকম কোন আক্রমণ ঘটলে অথবা এই জাতীয় আক্রমণের কোন আশঙ্কা দেখা দিলে কিভাবে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পালন করা হবে কাউন্সিল সে ব্যাপারে পরামর্শ দেবে।

১১নং অনুচ্ছেদ

লীগের কোন সদস্য রাষ্ট্র তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করুক বা না করুক, সমস্ত লীগ সদস্য এই মর্মে ঘোষণা করবে যে কোন যুদ্ধ বা যুদ্ধের আশঙ্কাকে তারা গভীর উদ্বেগের কারণ হিসাবে দেখবে এবং ঐ রাষ্ট্রগুলির শান্তি রক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা লীগ যুক্তিপূর্ণ ও কার্যকরী বলে মনে করবে তা গ্রহণ করবে। যদি এমন ঘটনা দেখা দেয় তাহ'লে লীগের সদস্যদের অনুরোধে সেক্রেটারী জেনারেল অবিলম্বে কাউন্সিলের সভা ডাকবে।

এটাও ঘোষণা করা হ'ল যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করছে এমন কোন পরিস্থিতি যা শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে অথবা দুই রাষ্ট্রের মধ্যেকার সু-সম্পর্ক, যার ওপর শান্তি বজায় রাখা নির্ভর করে তার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, সেই সব বিষয়ে সাধারণ সভা অথবা কাউন্সিলের দৃষ্টি আকর্ষণে লীগের প্রত্যেক সদস্যের যুক্তিসংগত অধিকার আছে।

১২নং অনুচ্ছেদ

লীগের সদস্যরা এই বিষয়ে একমত যে যদি সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে এমন কোন বিরোধ দেখা দেয় যা ভাঙনের পথে নিয়ে যেতে পারে, তাহ'লে তারা বিরোধের বিষয়টি হয় সালিসির মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য, নয় বিচারবিভাগীয় নিষ্পত্তির জন্য অথবা কাউন্সিলের কাছে বিষয়টি অনুসন্ধান করার জন্য পেশ করবে। এবং তারা এ বিষয়েও একমত যে, সালিসি ব্যবস্থা অথবা বিচারবিভাগীয় রায় অথবা কাউন্সিলের রিপোর্ট বেরোনোর আগে কোনভাবেই যুদ্ধের পথ অবলম্বন করবে না।

১৪নং অনুচ্ছেদ

আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের জন্য স্থায়ী বিচারালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা কাউন্সিল গঠন করবে এবং তা লীগের সদস্যদের কাছে পেশ করবে। বিচারালয়ের কাছে সদস্য রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক চরিত্রের যে কোন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পেশ করবে, তা শোনার এবং সে বিষয়ে রায়দানের যোগ্যতা বিচারালয়ের থাকবে।

কাউন্সিল বা সাধারণ সভা বিচারালয়ে কোন বিরোধ অথবা সমস্যা উপস্থিত করলে সেই বিষয়ে বিচারালয়ে পরামর্শ দানও করতে পারে।

১৫নং অনুচ্ছেদ

পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাঙন সৃষ্টি করতে পারে এমন বিরোধ যদি লীগের সদস্যদের মধ্যে দেখা দেয় যা ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সালিসি বিচার অথবা বিচারবিভাগীয় নিষ্পত্তির জন্য পেশ করা যায় নি, তাহ'লে লীগের সদস্যরা বিরোধের বিষয়টি কাউন্সিলে প্রেরণ করতে রাজী থাকবে। যে কোন বিরোধী পক্ষ বিরোধের বিষয়টি সেক্রেটারী জেনারেলের কাছে পেশ করতে পারে ; এমতাবস্থায় সেক্রেটারী জেনারেল পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান এবং বিচার-বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করবেন।

কাউন্সিল বিরোধটি নিষ্পত্তি করার জন্য প্রয়াস চালাবে এবং যদি সেই প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হয় তবে কাউন্সিল বিরোধের কারণ ও বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাখ্যা ক'রে এই ব্যাপারে যে সকল শর্ত আরোপ উপযুক্ত মনে করেছে এই সব বিষয়ে একটা প্রকাশ্য বিবৃতি কাউন্সিল দেবে।

যদি বিরোধটির নিষ্পত্তি এইভাবে না হয়, তাহ'লে কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে বিরোধের কারণগুলি দর্শিয়েও এই নিষ্পত্তির ব্যাপারে যে সুপারিশ দেওয়া ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছে এ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রকাশ করবে।

কাউন্সিলের রিপোর্টটি যদি বিরোধের সঙ্গে যুক্ত এক বা একাধিক গোষ্ঠী বাদে কাউন্সিলের অন্যান্য সকল সদস্য সর্বসম্মতভাবে স্বীকার করে নেয়, তাহলে লীগের সদস্যরা রিপোর্টের সুপারিশ মেনে বিরোধের সঙ্গে যুক্ত এমন কোন গোষ্ঠীর পক্ষে যুদ্ধে যোগ না দিতে রাজী থাকবে।

বিরোধের সঙ্গে যুক্ত এক বা একাধিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা বাদে সকল সদস্যদের দ্বারা সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হ'তে পারে এমন রিপোর্ট তৈরি করতে কাউন্সিল যদি ব্যর্থ হয়, তাহ'লে লীগের সদস্যদের সত্য ও ন্যায় রক্ষার জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করবে তা গ্রহণ করতে পারবে।

বিবাদমান দুই গোষ্ঠীর মধ্যে একপক্ষ যদি দাবী করে যে এটা তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং যদি কাউন্সিল দেখে, যে কারণে বিরোধের উৎপত্তি তা আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে উক্ত পক্ষের অভ্যন্তরীণ এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ছে তাহ'লে কাউন্সিল সেরূপ রিপোর্ট দেবে এবং নিষ্পত্তির ব্যাপারে কোন সুপারিশ করবে না।

এই অনুচ্ছেদ অনুসারে কাউন্সিল যে কোন অবস্থায় বিরোধের বিষয়টি সাধারণ সভার কাছে পাঠাতে পারে। বিবদমান কোন একটি পক্ষের অনুরাধে বিষয়টি সাধারণ সভার কাছে প্রেরণ করা যাবে যদি কাউন্সিলে বিষয়টি পেশ করার ১৪ দিনের মধ্যে এই অনুরোধ করা হয়।

১৬নং অনুচ্ছেদ

চুক্তিপত্রের ১২, ১৩ অথবা ১৫নং অনুচ্ছেদ অগ্রাহ্য করে লীগের কোন সদস্য যদি যুদ্ধের পথ অবলম্বন করে তাহ'লে প্রকৃত অর্থে যে লীগের সকল সদস্য রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অপরাধ করেছে বলে বিবেচনা করা হবে। এর ফলস্বরূপ তার সঙ্গে সব রকম বাণিজ্যিক ও আথিচ্ছুক সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে, লীগের সদস্য রাষ্ট্রগুলির চুক্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের সব রকম আদান-প্রদান নিষিদ্ধ করা হবে এবং সদস্যরষ্ট্র এবং চুক্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের মধ্যে আর্থিক, বাণিজ্যিক অথবা ব্যক্তিগত আদান-প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হবে। লীগের সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও লীগের সদস্যরাষ্ট্রগুলি অনুরূপ ব্যবস্থা নেবে।

এক্ষেত্রে কাউন্সিলের কর্তব্য হবে লীগের চুক্তিপত্রের মর্যাদা রক্ষার জন্য লীগের সদস্যকে কতটা কার্যকরী সামরিক, নৌ অথবা বিমান বাহিনী দিয়ে সাহায্য করতে পারবে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির কাছে সুপারিশ করা।

১৭নং অনুচ্ছেদ

লীগের সদস্যরাষ্ট্র এবং লীগের সদস্য নয় এমন একটা রাষ্ট্রর মধ্যে বিরোধ বাধলে অথবা লীগের সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ বাধলে, লীগ সদস্য নয় এমন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগুলিকে পরিষদ যা ন্যায্য মনে করবে তার ভিত্তিতে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য লীগের সদস্যপদের দায়বদ্ধতা মেনে নিতে আহ্বান জানাবে।

১৯নং অনুচ্ছেদ

যে চুক্তিগুলির আর কার্যকারিতা নেই সেই চুক্তিগুলি সম্পর্কে লীগের সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে বিচার-বিবেচনা করার জন্য সাধারণ সভা মাঝে মাঝে উপদেশ দিতে পারে এবং বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করতে পারে এমন আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্পর্কেও সাধারণ সভা সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে পরামর্শ দিতে পারে।

২১নং অনুচ্ছেদ

শান্তি রক্ষার জন্য সালিসির (মধ্যস্থতা) মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন অথবা মনরো নীতির সমতুল্য আঞ্চলিক বোঝাপড়া ইত্যাদির মত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৈধতার ব্যাপারটিকে এই চুক্তিপত্রের কোন কিছুই প্রভাবিত করতে পারে বলে বিবেচিত হবে না।

২২নং অনুচ্ছেদ

বিগত যুদ্ধের ফলে যে সমস্ত উপনিবেশ এবং ভূখণ্ডগুলি পূর্বে যে সব রাষ্ট্রর শাসনাধীনে ছিল, তাদের সার্বভৌম ক্ষমতার অধীনে যদি আর না থাকে এবং যে সকল উপনিবেশ ও ভূখণ্ডগুলির জনসাধারণ বর্তমান বিশ্বের কঠিন অবস্থার চাপে এখনও পর্যন্ত নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি ; এই ধরনের দেশগুলির জনসাধারণের ক্ষেত্রে সুখ এবং সমৃদ্ধির বিকাশ সভ্য সমাজের একটি পবিত্রকর্তব্য এবং এই কর্তব্য কার্যকরী করা সুরক্ষিত করতে চুক্তিপত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

এই নীতি বাস্তবসম্মতভাবে কার্যকর করে তুলতে যে পদ্ধতি সর্বোত্তম, তাহ'লে এই সব দেশের জনগণের অভিভাবকত্ব সেই সমস্ত অগ্রসর জাতিগুলির হাতে ন্যস্ত করা ; যারা সম্পদশালী হওয়ার কারণে এবং অভিজ্ঞতা অথবা ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এই দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা ভালভাবে পালন করতে পারবে। যে সমস্ত অগ্রসর রাষ্ট্র এই দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক তাদেরই এই অধিকার দেওয়া উচিত এবং এই রাষ্ট্রগুলিকে লীগের তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসাবেই অভিভাবকত্বের কাজ চালাতে হবে।

জনগণের বিকাশের স্তর, আঞ্চলিক ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং অনুরূপ অন্যান্য অবস্থা অনুসারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চরিত্র আলাদা হবে।

কিছু কিছু জনগোষ্ঠী যারা আগে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল, তারা এখন এমন এক বিকাশের স্তরে এসে পৌঁছেছে যে, তাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশাসনিক উপদেশ এবং সাহায্যের প্রতি দায়বদ্ধ রেখে সাময়িকভাবে তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। যতদিন পর্যন্ত এই জনগোষ্ঠীগুলি নিজেরা স্বশাসনের উপযোগী না হবে ততদিন এই দায়বদ্ধতা থাকবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে এই জনগোষ্ঠীগুলির ইচ্ছাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবে।

অন্যান্য জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে মধ্য আফ্রিকার জনগোষ্ঠীগুলি এমন একটা পর্যায়ে রয়েছে যে, সেখানকার প্রশাসনের দায়িত্বভার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে এই শর্তসাপেক্ষে দিতে হবে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইনশৃঙ্খলা ও নৈতিক দিকটা বজায় রেখে জনসাধারণকে বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতা এবং ধর্মাচরণের স্বাধীনতা দেবে। এছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাস ব্যবসা, অস্ত্র ব্যবসা এবং মদ্য ব্যবসার মত দুর্নীতি বন্ধ করবে ; কোন দুর্গ বা সামরিক ঘাঁটি ও নৌ-বাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন করতে দেবে না এবং স্থানীয় জনসাধারণকে পুলিশের কাজে ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া ছাড়া কোন সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে পারবে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার অঞ্চলগুলির নিরাপত্তা রক্ষা করবে এবং লীগের অন্যান্য সদস্যদের ব্যবসা-বাণিজ্য করার সমান সুযোগ দেবে।

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের মত কিছু ভূখণ্ড আছে যেগুলিতে জনসংখ্যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার দরুন অথবা সেগুলি আকারে ছোট হওয়ার দরুন অথবা সভ্য দুনিয়ার কেন্দ্রগুলি থেকে দূরবর্তী হওয়ার দরুন অথবা লীগের কোন সদস্য রাষ্ট্রের শাসনাধীনে ভূখণ্ডের কাছাকাছি অবস্থানের দরুন এবং অন্যান্য কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন মোতাবেক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে শাসিত হওয়াই সবচেয়ে ভাল। অবশ্য স্থানীয় জনসাধারণের স্বার্থে উল্লিখিত অধিকারগুলি সুরক্ষিত করার সাপেক্ষে শাসনাধীন থাকবে।

প্রতিটি তত্ত্বাবধায়ক রাষ্ট্রকে তার শাসনাধীন অঞ্চল সম্পর্কে কাউন্সিলের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন দিতে হবে।

তত্ত্বাবধায়ক রাষ্ট্রগুলি কতটা পরিমাণ কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ অথবা আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখবে সে সম্পর্কে আগে থেকে যদি জাতিসঙ্ঘের সদস্যরা একমত না হন, তাহ'লে সেই সব ক্ষেত্রে কাউন্সিলকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

তত্ত্বাবধায়ক রাষ্ট্রগুলি প্রদত্ত বার্ষিক রিপোর্ট গ্রহণ ও তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য এবং শাসনাধীন অঞ্চলগুলিতে জাতিসঙ্ঘের আদেশ পালিত হচ্ছে কিনা সে সব সম্পর্কে কাউন্সিলকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি স্থায়ী কমিশন গঠন করা হবে।

জাতিসঙ্ঘের চুক্তিপত্রে বিশদ ভাবে বর্ণিত হয়েছিল এর আদর্শ ও উদ্দেশ্যগুলি। বিশ্বের জনমানসে নিরাপত্তার মনোভাব জাগ্রত করা, আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, আন্তর্জাতিক আইনকে মান্যতা প্রদান করা, বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা ও সম্মান বৃদ্ধি করা প্রভৃতি লীগের আদর্শ রূপে গৃহীত হয়।

জাতিসঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধকে পরিহার করে যে কোন আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে আপোষ ও মীমাংসা দ্বারা নিষ্পত্তি করা। এছাড়া লীগ চুক্তিপত্রের প্রস্তাবনায় বলা হয় জাতিসঙ্ঘে যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধে লিপ্ত হবে না ; কোন সভ্য রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হলে, আক্রান্ত সভ্য রাষ্ট্রকে লীগ অফ নেশনস্ যৌথ নিরাপত্তা (Collective Security) দানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে ; সভ্য রাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক সম্মানজনক সম্বন্ধ বজায় রাখবে ; এছাড়া আর্ন্তজাতিক নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করা ও বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫.৫.১ যৌথ নিরাপত্তা

লীগ চুক্তিপত্রের ১০-১৬নং ধারায় যৌথ নিরাপত্তার নীতি গৃহীত হয়েছে। ১০নং ধারায় বলা হয়েছিল জাতিসঙ্ঘের সভ্যগণ পারস্পরিক রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতাকে সম্মান করবে ও বহিঃআক্রমণ থেকে রক্ষা করবে।

লীগ চুক্তিপত্রের ১৬নং ধারায় বলা হয়েছিল আক্রমণকারী রাষ্ট্রকে শাস্তি প্রদানের জন্য আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে লীগ সভ্যগণ যৌথভাবে অর্থনৈতিক অবরোধ ও প্রয়োজনে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এইভাবে জাতিসঙ্ঘ পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিল। তাই জাতিসঙ্ঘের সদস্যরা এক সুনির্দিষ্ট পন্থা তথা যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রয়াসী হলেন। প্রকৃতপক্ষে যৌথ নিরাপত্তার অর্থ হলো শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রগুলি সহযোগিতামূলক বলপ্রয়োগ দ্বারা পৃথিবীর শান্তি রক্ষার্থে শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রকে শান্তি রক্ষা করতে বাধ্য করবে। ("Peace in the world can be maintained through the co-operative coercion of the peacebreaking states by peace loving states". Prof. Schuman).

৫.৫.২ জাতিসঙ্ঘের কর্মপ্রয়াস

জাতিসঙ্ঘ শুধুমাত্র যুদ্ধ নিরসন ও যুদ্ধ সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে যে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল তা নয়, বিভিন্ন রাষ্ট্রর মধ্যে সহযোগিতা ও মিত্রতার ভাব সৃষ্টিও করেছিল। জাতিসঙ্ঘ সাধারণ সভা, জাতিসঙ্ঘ পরিষদ (council), লীগ সচিবালয় প্রভৃতি দপ্তর গঠন করে সখ্যতার পরিমণ্ডল রচনা করেছিল। গুপ্ত সন্ধি সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টি করে। তাই লীগ চুক্তিপত্রে বলা হয়েছিল সন্ধিপত্র লীগ সচিবালয়ে পেশ করা বাধ্যতামূলক হবে। এছাড়া অস্ত্রের ব্যাপক হারে উৎপাদন বৃদ্ধি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই জাতিসঙ্ঘ অস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস তথা সীমাবদ্ধ করতে সক্রিয় হয়। রাজনৈতিক সমস্যা ছাড়াও কিছু জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী যেমন আফিম প্রভৃতি মাদকের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, দাস ব্যবসা রহিত করা, শ্রমিক সঙ্ঘ স্থাপন প্রভৃতি জাতিসঙ্ঘের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৫.৫.৩ জাতিসঙ্ঘের সভ্যপদ

পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি জাতিসঙ্ঘের সভ্য ছিল। স্থায়ী সভ্য ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইটালী ও জাপান। ১৯১৯ সালের ২৮ শে এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হল এবং তার প্রথম অধিবেশন হলো ১৯২০ সালের ১০ই জানুয়ারি। রাষ্ট্রপতি উইলসন লীগের অন্যতম স্থপতি হলেও আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে জাতিসঙ্ঘের সভ্য পদ থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরে আসে। ১৯২০ সালে সাধারণ নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি উইলসন ও তাঁর ডেমোক্রেটিক পার্টি পরাজিত হয় এবং বিজয়ী রিপাবলিকান পার্টি পরিচালিত মার্কিন সরকার জাতিসঙ্ঘে যোগ দিতে স্বীকৃত হয়নি। আমেরিকার সিনেট (Senate) ভার্সাই সন্ধি অনুমোদন করে পুনরায় ইউরোপীয় গোলযোগে আমেরিকাকে জড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছুক ছিল না। তাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে লীগ সূচনাকাল থেকেই দূর্বল হয়ে পড়েছিল। ১৯২৬ সালে জার্মানিকে লীগের সদস্যপদ দেওয়া হয় এবং ১৯৩৪ সালে রাশিয়া জাতিসঙ্ঘে যোগ দেয় তবে অল্প সময়ের মধ্যেই জাপান, জার্মানি, ইটালি, রাশিয়া লীগ পরিত্যাগ করে। ১৯৪০ সালে বৃহৎ শক্তির মধ্যে কেবলমাত্র ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স জাতিসঙ্ঘে সভ্য হিসাবে রয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পুনরায় পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং লীগের পতন হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ১৯৪৫ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়।

৫.৫.৪ লীগের গঠন

একটি সাধারণ সভা, লীগ কাউন্সিল ও লীগ সচিবালয় এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রভৃতি সংস্থাকে জাতিসঙ্ঘের কার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সাধারণ সভা—জাতিসঙ্ঘের সকল সদস্যই এর সভ্য হলেও প্রতি সদস্য-রাষ্ট্রের তিনজন করে প্রতিনিধি নিয়ে এই সভা গঠিত হলো। তবে প্রতি রাষ্ট্রেরই মাত্র একটি করে ভোট দানের অধিকার ছিল। লীগের এক্তিয়ারভুক্ত যাবতীয় বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সাধারণ সভার ছিল। আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা, সংখ্যালঘু সমস্যা, ম্যান্ডেট অঞ্চলের শাসন, লীগের বার্ষিক বাজেট প্রভৃতি কার্য সাধারণ সভা সম্পাদন করতো।

লীগ কাউন্সিল—জাতিসঙ্ঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রধান দায়িত্ব ছিল লীগ পরিষদের উপর। লীগ চুক্তিপত্র অনুযায়ী পাঁচ জন স্থায়ী ও চার জন অস্থায়ী সভ্য নিয়ে লীগ পরিষদ বা লীগ কাউন্সিল গঠিত হবে বলে স্থির ছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগে যোগ না দেওয়ায় স্থায়ী সভ্য সংখ্যা কমে যায়। লীগ চুক্তিপত্র অনুযায়ী পরিষদ আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা, বিবাদমান রাষ্ট্রের মধ্যে মীমাংসা করা, সাধারণ সভার কাছে রিপোর্ট প্রদান করা, বিদেশী আক্রমণের হাত থেকে কোন সদস্য-রাষ্ট্রকে রক্ষা করা, চুক্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি লীগ পরিষদের কার্যভুক্ত ছিল।

লীগ সচিবালয়—জেনেভা শহরে জাতিসঙ্ঘের মহাসচিবের যে দপ্তরটি কার্য পরিচালনা করতো তাকে লীগ সচিবালয় বলা হতো। এই দপ্তর সাধারণ সভা ও লীগ পরিষদের নির্দেশগুলি কার্যকর করতো।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা—শ্রমিকদের উন্নতির জন্য ন্যায়, নীতি ও সুবিচারের ভিত্তিতে সকল দেশের শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন করা ছিল এই সংস্থার উদ্দেশ্য। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার তিনটি প্রধান অঙ্গ ছিল। সাধারণ সভা (General Conference), কর্মপরিষদ (Governing Body), আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তর (International Labour Office)। শ্রম সংস্থার মালিকপক্ষের প্রতিনিধি, শ্রমিকগণের প্রতিনিধি এবং সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা থাকতেন। প্রতি বছর এই সংস্থার একবার অধিবেশন বসত এবং সদস্যরা নির্বাচনের

দ্বারা আন্তর্জাতিক শ্রমিক নীতি নির্ধারণ করত। জাতিসঙ্ঘের সকল সংস্থার মধ্যে এই শ্রমিক সংস্থার সাফল্য ও সার্থকতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সংস্থা আজও বর্তমান যা শ্রমিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য জীবনযাত্রার এক নূন্যতম মান নির্ধারণ করে দেয়।

স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত—পনেরো জন বিচারক নিয়ে স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত হয়েছিল। এই বিচারকদের কার্যকাল ছিল নয় বছর। সর্ব প্রকার আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করা, বিভিন্ন চুক্তির ব্যাখ্য জনিত বিরোধ নিষ্পত্তি করা, আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গজনিত অপরাধের বিচার এই আদালতের উপর ন্যস্ত ছিল।

৫.৫.৫ জাতিসঙ্ঘের প্রকৃতি

লীগ অফ নেশনস ছিল কয়েকটি রাষ্ট্রের সংঘ। এটির গঠন যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতির ছিল না। লীগ কোন আইন রচনার ক্ষমতার অধিকারী ছিল না, লীগের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করার বিষয়টি সদস্যদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করতো। বাস্তবিক পক্ষে লীগের অস্তিত্বও নির্ভর করতো সদস্যরাষ্ট্রগুলির সহযোগিতার উপর। সদস্যরাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে স্বীকৃত হয়ে জাতিসংঘ গড়ে তুলেছিল, তাই লীগ কোন রাষ্ট্র ছিল না ; লীগের কোন সমর বাহিনী ছিল না। লীগ ছিল যেন ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের একটি পারিবারিক সংস্থা। আবার এই সংস্থাটির ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের পররাষ্ট্র নীতি নিয়ন্ত্রণের কোন অধিকার ছিল না।

৫.৬ লীগের কার্যকলাপ

১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সময়কালে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার কাজে লীগ প্রশংসনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। লীগের কার্যাবলীর মধ্যে রাজনৈতিক সমস্যা, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, সমরাস্ত্র হ্রাস, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা, শিল্প, কৃষি এবং বিশ্বস্বাস্থ্য উন্নয়ন, ব্যাধি নিবারণ প্রভৃতি কর্তব্য সম্পাদন অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

৫.৬.১ লীগের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা

লীগ অফ নেশনস তার স্থায়িত্বকালের মধ্যে অনেকগুলি রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করেছিল। প্রায় চল্লিশটি ছোট বড় রাজনৈতিক বিবাদ লীগের সামনে উপস্থাপিত হলে লীগ তার সুষ্ঠ মীমাংসা করেছিল। তবে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক বিবাদ নিরসনের ক্ষেত্রে লীগ সর্ব ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। আন্তর্জাতিক সমস্যার মধ্যে যে সব ক্ষেত্রে লীগের প্রয়াস সফল হলো সেগুলি হ'ল :

৫.৬.২ ইউপেন ও মামেডি

ইউপেন (Eupen) ও মামেডি (Malmedy) নামক প্রদেশ দুটি ছিল প্রাশিয়া ও বেলজিয়ামের সীমান্তবর্তী। ভার্সাই সন্ধিতে বেলজিয়াম এই দুটি প্রদেশ লাভ করেছিল। ১৯২০ সালে লীগের নেতৃত্বে গণভোটের মাধ্যমে প্রদেশদুটির হস্তান্তরকরণ আইনত স্বীকৃতি লাভ করে।

৫.৬.৩ অল্যান্ড দ্বীপ সমস্যা

একই বছর সুইডিশ জাতি অধ্যুষিত অল্যান্ড (Aaland Islands) দ্বীপপুঞ্জের উপর অধিকার নিয়ে ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। এই দুটি রাষ্ট্র লীগের সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও ইংল্যান্ডের মধ্যস্থতায় লীগ কাউন্সিলের শরণাপন্ন হলে লীগ এই দ্বীপপুঞ্জের অধিকার ফিনল্যান্ডকে দান করে এবং দ্বীপবাসী সুইডিশ জনতার দায় লীগ গ্রহণ করে। এছাড়া অল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ নিরপেক্ষ অঞ্চল রূপে ঘোষিত হয়।

৫.৬.৪ পোল্যান্ড লিথুয়ানিয়া বিরোধ

লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিলনা ১৯২০ সালে পোল্যান্ড কর্তৃক অধিকৃত হয়। লীগ কাউন্সিল আলাপ আলোচনা করে মীমাংসা করতে অসফল হলে ১৯২২ সালে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং ভোটের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভিলনাকে পোল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। একই সঙ্গে লীগ পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়ার সীমান্ত অঞ্চল নির্ধারিত করে দেয়।

৫.৬.৫ কর্ফু বিরোধ

পরের বছর ইটালি ও গ্রীসের মধ্যে কর্ফু দ্বীপ নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়। ইটালি সামরিক বলপ্রয়োগ করে দ্বীপটি বিধ্বস্ত করে এবং গ্রীস এই বিষয়টিকে লীগ কাউন্সিলের কাছে উপস্থিত করে। ইটালি কর্ফু ঘটনাকে ইটালির বিষয় বলে গণ্য করে লীগের হস্তক্ষেপ অস্বীকার করে, পরে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতগণ প্যারিসে মিলিত হন ও কর্ফু বিরোধের মীমাংসা করেন। পরে ইটালি কর্ফু পরিত্যাগ করে ও গ্রীস ক্ষতিপূরণ প্রদান করলে এই বিবাদের মীমাংসা হয়।

৫.৬.৬ সাইলেশিয়ার সমস্যা

জার্মানি ও পোল্যান্ডের মধ্যে উচ্চ সাইলেশিয় (Upper Silesia) প্রশ্নে বিবাদের সূচনা হয়। ভার্সাই সন্ধিতে উচ্চ সাইলেশিয়ার কিছু অংশ চেকোশ্লোভাকিয়া লাভ করেছিল। বাকি অংশ ১৯২১ সালে গণভোটের মাধ্যমে জার্মানির সঙ্গে সংযুক্তি দাবী করলে জার্মানি এই দাবীর বিরোধিতা করে। লীগেরকাউন্সিল এই সংঘাতময় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য চীন, স্পেন, বেলজিয়াম ও ব্রাজিল প্রভৃতি রাষ্ট্রর প্রতিনিধিদের এক কমিশন গঠন করে। এই কমিশন সাইলেশিয়ার অবশিষ্ট অবিভক্ত অঞ্চল পোল্যান্ড ও জার্মানির মধ্যে বণ্টন করে শান্তি স্থাপন করে।

৫.৬.৭ তুরস্ক-ইরাক বিবাদ

১৯২৪ সালে তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যে সীমান্তবর্তী অঞ্চল নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়। বিশ্বযুদ্ধের অবসানে তুরস্ক ও ইরাকের তদারকি অঞ্চলের সীমান্ত নির্দিষ্ট করার দায়িত্ব ছিল লীগ পরিষদের। এজন্য নিযুক্ত হয় একটি নিরপেক্ষ সীমান্ত কমিশন, এই কমিশনের কর্মপ্রয়াস চলাকালীন তুরস্ক-ইরাক সীমান্ত প্রদেশে গোলোযোগের সূত্রপাত হয়। এই সময়ে তুরস্কের অধিকারভুক্ত কুর্দ জাতি তুর্কী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তুরস্ক সরকার নৃশংসভাবে বিদ্রোহ দমন করে। ক্ষুব্ধ কুর্দ জাতি তুরস্ক-ইরাক সীমান্তে গোলমাল সৃষ্টি করলে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করে লীগের দ্বিতীয় কমিশন যে প্রতিবেদন পেশ করে তাতে তুর্কী প্রশাসনিক ব্যবস্থা সমালোচিত হয়। শেষ পর্যন্ত লীগ কমিশনের সিদ্ধান্ত তুরস্ক ও ইরাক উভয়েই মেনে নেয় ও ১৯২৬ সালে একটি সন্ধি দ্বারা দুটি রাষ্ট্র তুরস্ক-ইরাক সীমান্ত অনুমোদিত হয়।

৫.৬.৮ আর্মেনিয়া-তুরস্ক বিবাদ

১৯২০ সালে প্রজাতন্ত্রী আর্মেনিয়া ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল এবং লীগের নেতৃত্বে তা মীমাংসার চেষ্টা হয়। তবে লীগের সিদ্ধান্তের পূর্বেই তুরস্ক আর্মেনিয়া দখল করে নেয়।

৫.৬.৯ যুগোশ্লাভিয়ার আক্রমণ

লীগ ১৯২১ সালে যুগোশ্লাভিয়ার আক্রমণ থেকে আলবানিয়াকে সুরক্ষিত করেছিল।

৫.৬.১০ গ্রীস-বুলগেরিয়া সংঘর্ষ

গ্রীস ও বুলগেরিয়ার মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ১৯২৫ সালে এই সংঘর্ষে গ্রীসের একজন সীমান্ত সেনাপতি ও রক্ষীর মৃত্যু হলে গ্রীস সসৈন্যে বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করে। জাতি সংঘের হস্তক্ষেপের পর গ্রীস সৈন্য প্রত্যাবর্তন করে নেয় ও বুলগেরিয়াকে ক্ষতিপূরণ দান করে।

৫.৬.১১ কলম্বিয়া-পেরু বিবাদ

এছাড়া দক্ষিণ আমেরিকায় কলম্বিয়া ও পেরুর মধ্যে বিবাদ, ইংল্যান্ড ও তুরস্কের মাবুলের তৈলখনি সম্পর্কিত বিবাদ প্রভৃতি জাতিসঙ্ঘের প্রয়াসে শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসিত হয়।

৫.৬.১২ ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধ

ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে টিউনিসিয়ার অধিবাসী নিয়ে বিবাদ দেখা দেয় ১৯২১ সালে উভয় রাষ্ট্রই এই অধিবাসীদের নিজ নাগরিক বলে গণ্য করত। ফ্রান্স এদের ফরাসী নাগরিক দাবী করে সেনা বাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করে এবং ব্রিটেন এর তীব্র প্রতিবাদ করলে বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু তার পূর্বেই বিবাদের নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

৫.৬.১৩ মাঞ্চুরিয়া সমস্যা

তবে জাতিসঙ্ঘ সর্বক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। বিশেষত শক্তিশালী সদস্যরাষ্ট্রগুলির দ্বারা উদ্ভূত রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে লীগ তার নিরপেক্ষ চরিত্র বজায় রাখতে পারেনি। চীন, জাপান, ইটালি প্রমুখ ছিল লীগের সভ্য রাষ্ট্র। ১৯৩১ সালে জাপান চীনের মঞ্চুরিয়া অঞ্চলটি দখল করে নেয় এবং এখানে মঞ্চুকুয়ো নামে তাঁবেদার সরকারও গঠন করে। জাপানের এই কার্যের বিরুদ্ধে চীন জাতিসঙ্ঘে অভিযোগ নিয়ে আসে এবং জাতিসঙ্ঘ জাপানকে মাঞ্চুরিয়া থেকে সৈন্য অপসারণের নির্দেশ দেয়। কিন্তু জাপান লীগের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে মাঞ্চুকুয়োর আয়তন বৃদ্ধি করার জন্য চীনের যে জেহোল অঞ্চল দখল করে তা মঞ্চুকুয়োর সঙ্গে সংযুক্ত করে, এমনকি চীনা প্রাচীরের দক্ষিণ ভাগেও সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে থাকে। জাতিসঙ্ঘের চুক্তিপত্রে ১১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাপানকে প্রতিহত করতে লীগ অপারগ হয়। লর্ড লিটনের (Lord Lytton) সভাপতিত্বে লীগের পাঁচটি বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের (ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালি, জার্মানি) নিয়ে একটি কমিশন গঠিত হল। ১৯৩২ সালে লিটন কমিশন এক দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ১৯৩৩ সালে লীগের সাধারণ সভায় লিটন কমিশনের প্রতিবেদন গৃহীত হলেও লীগ চুক্তির ১৬নং ধারা অনুযায়ী জাপানের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা লীগ গ্রহণ করতে পারেনি এবং জাপান ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে লীগের সদস্য পদ ত্যাগ করে।

৫.৬.১৪ ইটালির ইথিওপিয়া অভিযান

ইটালি কর্তৃক ইথিওপিয়া আক্রান্ত হলে লীগ তার সভ্যরাষ্ট্র ইটালির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও সফল হতে পারেনি। ইটালির ইথিওপিয়া রাজ্য-দখল লীগের দুর্বলতা প্রমাণ করেছিল। ইটালির অধীনস্থ সামালিল্যান্ড ও ইথিওপিয়ার সীমান্তবর্তী ওয়ালওয়ান (Walwal) নামক স্থানে ইথিওপিয়ার সৈন্যদের সঙ্গে সোমালিল্যান্ডের সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ হয় এবং যুদ্ধে কিছু ইটালি সৈন্য হতাহত হয়। এই ঘটনায় ইটালি ইথিওপিয়া আক্রমণ করে ১৯৩৬ সালে এবং আক্রান্ত ইথিওপিয়া লীগের কাছে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। লীগ

পরিষদ কর্তৃক এই অভিযোগ সমর্থিত হলে জাতিসঙ্ঘের চুক্তিপত্রের ১৬নং ধারা অনুযায়ী ইটালির বিরুধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে অর্থনৈতিক অবরোধ মঞ্জুর হয় তবে কোনো সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে জাতিসঙ্ঘ বিরত থাকে।

৫.৭ লীগ অফ নেশনসের অন্যান্য কার্যাবলী

একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতিসঙ্ঘের বা লীগ অফ নেশনসের দায়িত্ব ছিল অনেক বেশি প্রসারিত। বিশ্ব শান্তিরক্ষা ও বিবাদের মীমাংসা করা ব্যতীত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করে পৃথিবীতে নিরাপত্তার মানসিকতা সৃষ্টি করাও ছিল লীগের দায়িত্ব। জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে যৌথ নিরাপত্তার (Collective Security) প্রচেষ্টা খুবই উল্লেখযোগ্য।

৫.৭.১ জাতিসঙ্ঘ ও বিশ্বশান্তি

প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ বর্জন করার মহান উদ্দেশ্য নিয়েই জাতিসংঘ নামক বিশ্বপ্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লীগ চুক্তিপত্র (Covenant) কয়েকটি শর্ত সন্নিবিষ্ট করে। লীগ চুক্তিপত্রের অষ্টম শর্তটি ছিল প্রতিটি রাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যে পরিমাণ অস্ত্রেবপ্রয়োজন তার অতিরিক্ত অস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করবে। কারণ অস্ত্রের প্রাচুর্যে বিশ্বে যুদ্ধের আবহাওয়া ঘনীভূত হয় যা নিরাপত্তা ও বিশ্বশান্তির পরিপন্থী। তাই অস্ত্রশস্ত্র হ্রাসের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করার দায়িত্ব ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই দায়িত্ব ছিল লীগ কাউন্সিলের। দশম শর্তটি ছিল এই যে সদস্য রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। চতুর্দশ শর্তটি ছিল আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপনের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি। এজন্য একটি স্থায়ী আদালত Permanent Court of International Justice (P.C.I.J.) কাজ করত। আন্তর্জাতিক আইনগত বিরোধ ও অন্যান্য বিরোধ এই আদালতে নিষ্পত্তি হতো।

৫.৭.২ অর্থনৈতিক পুনর্গঠন

পৃথিবীর যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য জাতিসঙ্ঘ একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল আর্থিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতার জন্য নতুন পরিকাঠামো প্রস্তুত করা হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত আর্থিক কমিটিগুলি জেনেভায় বার্ষিক সম্মেলনে মিলিত হতো ও জাতিসঙ্ঘের আর্থিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করতো। ১৯২০ সালে ব্রাসেলসে একটি অর্থনৈতিক সম্মেলন আহূত হয়। জাতিসঙ্ঘের এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল মুদ্রাস্ফীতি রোধ, স্বর্ণমান নিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বাধা দূরীকরণ, আন্তর্জাতিক পরিবহন উন্নয়ন প্রভৃতি। এছাড়া ১৯২৭ সালে জেনেভায় আহুত অর্থনৈতিক সম্মেলনে জাতিসঙ্ঘ কয়েকটি সুপারিশ পেশ করে যেমন সব দেশের মধ্যে শ্রমিক, পণ্যও মূলধন প্রভৃতির চলাচল উন্মুক্ত রাখা, বাণিজ্য শুল্কের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা, শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে কৃষি উন্নয়ন। বিশ্বের অর্থনৈতিক সঙ্কট, যুদ্ধকালীন ঋণ ও ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি আলোচনার জন্য ১৯৩২ সালের জুন মাসে জাতিসঙ্ঘের সম্মেলন আহুত হয় যা লসান বৈঠক (Lausanne Conference) নামে পরিচিত। এই বৈঠকে যোগ দিলেন ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালি, জাপান ও জার্মানির প্রতিনিধিগণ। এই সম্মেলনে এককালীন একটি কিস্তিতে মোট ১৫ কোটি পাউন্ড ক্ষতিপূরণ প্রদান করার সুযোগ পেয়েছিল জার্মানি। যুদ্ধক্ষত পৃথিবীর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে লীগ যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিল।

৫.৭.৩ সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন

জাতিসংঙ্ঘ নারী, শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন, পুনর্বাসন, সংক্রামক ব্যধি নিবারণ প্রভৃতি কাজে খুব তৎপর থাকতো। ১৯২৩ সালে স্থায়ী সংস্থা ও ম্যালেরিয়া কমিশন গঠিত হয়। এই সংস্থাগুলি পূর্ব গোলার্ধে কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি রোগের প্রতিরোধে সফল হয়েছিল। এছাড়া দাস ব্যবসা ও বিপদজনক মাদক দ্রব্য ব্যবসা বন্ধ করার ব্যাপারে জাতিসঙ্ঘ সফল হয়।

৫.৮ জাতিসঙ্ঘের কৃতিত্ব

১৯২৫ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে জাতিসঙ্ঘের কর্মপ্রয়াস সর্বাধিক সাফল্য লাভ করেছিল। লীগের মর্যাদাও এই সময়ে বৃদ্ধি পায়। লীগ সাফল্যের সঙ্গে অনেকগুলি আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছিল। এই সাফল্যের সময়কালকে E. H> Carr (১৯২৫ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত) লীগের ইতিহাসে গৌরবজনক অধ্যায় বলে বর্ণনা করেছেন (“League at its Zenith”)। কিছু ক্ষেত্রে লীগ অসফল হলেও লীগের কর্মপ্রচেষ্টাকে অবহেলা করা যায় না। জাতিসঙ্ঘ মানবিক ও সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভুতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিল। যুদ্ধ বিধ্বস্ত পৃথিবীর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, বিশ্বস্বাস্থ্য উন্নয়ন, শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার, পরিবহনের উন্নতি ইত্যাদি কর্মকান্ডের দ্বারা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত হয়েছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। বিশ্বপ্রতিষ্ঠান হিসাবে জনগণের সামনে সৌহার্দ্য, সমবায়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল লীগ অফ নেশনস। বাস্তবিক পক্ষে সমবায়ের আদর্শপ্রাচীন হলেও লীগের উদ্দেশ্য, কর্মপ্রচেষ্টা ছিল অভিনব এবং এর পদ্ধতি ছিল নতুন। লীগ কয়েকটি লক্ষ্য ও শর্তকে সম্মুখে রেখে জয়যাত্রা শুরু করেছিল এবং যেভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে বিবাদ মীমাংসার প্রয়াস চালিয়েছিল তা ইতিপূর্বে পরিলক্ষিত হয়নি। শেষ পর্যন্ত লীগের ব্যর্থতারদায়িত্ব ছিল প্রধানত তার সদস্য রাষ্ট্রগুলির। “The League failed in the end to preserve peace because it could be only what the nations made of it—nothing less and nothing more”—Langsam.

৫.৯ জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতার কারণ

পৃথিবীতে গণতন্ত্রকে নিরাপদ করা, মানব সভ্যতাকে যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করা, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি মহান আদর্শকে সামনে রেখে লীগ তার জয়যাত্রা শুরু করেছিল। বস্তুতপক্ষে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্য রক্ষার ক্ষেত্রে জাতিসঙ্ঘ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ লীগ স্থাপনের কুড়ি বছরের মধ্যেই লীগ অফ নেশনস নামক বিশ্ব প্রতিষ্ঠানটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯১৯-১৯৩৯ এই কুড়ি বছরের ব্যবধানেই বিশ্ববাসী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। লীগ অফ নেশনসের ব্যর্থতার জন্য অনেকগুলি কারণকে চিহ্নিত করা যায়।

প্রথমত, লীগ অফ নেশনস বা জাতিসঙ্ঘের গঠন তন্ত্রের মধ্যে এর পতনের কারণ লুকিয়ে ছিল। ভার্সাই সন্ধি চুক্তির শর্ত হিসাবে লীগ চুক্তিপত্রের অন্তর্ভুক্তি ছিল দুর্ভাগ্যজনক। জার্মানি, রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র ভার্সাই সন্ধির চুক্তির বিরোধী। জার্মানি প্রথম থেকে এই সন্ধি পরিবর্তনের পক্ষে ছিল। কারণ জার্মানির ধারণা হয়েছিল বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই ভার্সাই সন্ধি রচিত হয়েছে এবং জাতিসঙ্ঘ গঠিত হয়েছে। তাই জার্মানি

লীগ অফ নেশনসের বিরোধী ছিল। বলা হয়ে থাকে ভার্সাই সন্ধি ছিল এক বৈষম্যপূর্ণ দলিল (ill-balanced document) যাতে ছিল ঘৃণা, প্রতিশোধস্পৃহা এবং উইলসনের আদর্শবাদ, লয়েড জর্জের সাম্রাজ্যবাদ ও ক্লিমেনশ বা ক্লেমেসোঁর বাস্তববুদ্ধি (materialism)। এই সব মিশ্র অনুভূতি সম্বলিত ভার্সাই চুক্তি প্রথম থেকেই জটিল ছিল। এই পরিস্থিতিতে ভার্সাই সন্ধি চুক্তিতে লীগ চুক্তিপত্রের অন্তর্ভূক্তি জাতিসঙ্ঘকে দুর্ভাগ্য পীড়িত করেছিল প্রথম থেকেই।

দ্বিতীয়ত, জাতিসঙ্ঘে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব স্বীকত হয়নি। উপরন্তু বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে আমেরিকা প্রথম থেকে জাতিসঙ্ঘের সদস্য পদ গ্রহণ না করায় লীগ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে জার্মানি, ইটালি, রাশিয়া, জাপান লীগের সভ্যপদ ত্যাগ করেছিল। বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গ ব্যতিরেকে কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সাফল্য লাভ করতে পারে না। লীগ চুক্তিপত্রের ১০ থেকে ১৬ নং ধারায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে যে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছিল লীগ বহির্ভূত রাষ্ট্রগুলির উপর লীগের এইসব ব্যবস্থা গ্রহণের কোন এক্তিয়ার ছিল না।

তৃতীয়ত, লীগ চুক্তিপত্রের কোথাও আগ্রাসন বা যুদ্ধকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হয়নি। চুক্তিপত্র অনুসারে যুদ্ধে লিপ্ত হতে সভ্যরাষ্ট্রদের নিষেধ করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার ও রাজনৈতিক বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব লীগের উপর থাকলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভ্যদের একমত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। তাই কোন রাষ্ট্র তার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কায় একমত না হতে পারলে লীগের পক্ষে কোন কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হত না। জাতিসঙ্ঘ আক্রমণ প্রতিরোধে প্রস্তাব গ্রহণ করলেও প্রস্তাব কার্য্যকর করার জন্য কোন সামরিক বাহিনী লীগের ছিল না। তাই কোন আগ্রাসী বা আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতিসঙ্ঘ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত না। সামরিক অক্ষমতার কারণে আক্রমণকারী রাষ্ট্রগুলি লীগকে উপেক্ষা করতে থাকে। যেমন জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখল ও ইটালির আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া দখল প্রভৃতি কাজের বিরুদ্ধে লীগ জাপান ও ইটালি কারোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। এটা লীগের পক্ষপাতিত্ব ও দুর্বলতার প্রমাণ ছিল। তাই জাপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ইটালিও লীগ ত্যাগ করতে সাহসী হয়েছিল।

চতুর্থত, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ছিল জাতিসঙ্ঘের প্রধান স্তম্ভ। এই সদস্যরাষ্ট্র দুটি লীগের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে যথোচিত মর্যাদা দানের পরিবর্তে নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থ সিদ্ধিতে ব্যস্ত ছিল। স্থায়ী সভ্য রাষ্ট্রগুলি লীগের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হবার কারণে লীগের ভিত্তি দুর্বল হতে থাকে। ১৯৩১ সালে জাপান মঞ্চুরিয়া দখল করলে লীগের ১১নং ধারা অনুসারে জাপানকে প্রতিহত করতে লীগ ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড লিটনের তত্ত্বাবধানে যে কমিশন গঠিত হয় সেই প্রতিবেদনে জাপানকে আক্রমণকারী বলে চিহ্নিত করা হয়নি এবং ১৬নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাপানের বিরুদ্ধে লীগ কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেনি। অন্য দিকে ইতালি আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া আক্রমণ করে ১৯৩৫ সালে এবং লীগের ১৬নং ধারা অনুযায়ী ইতালির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ইতালিকে আক্রমণকারী রাষ্ট্ররূপে চিহ্নিত করে ইতালির সঙ্গে সর্বপ্রকার আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হ'ল অর্থাৎ ইতালির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (economic sanctions) গৃহীত হয়।

কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স এই নির্দেশ পালনে আন্তরিকভাবে আগ্রহী ছিল না। রাষ্ট্র দুটি লীগের নির্দেশ পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করতে থাকে। কারণ একদিকে রাষ্ট্র দুটি ইতালির বিরাগ ভাজন হতে চায়নি একই সঙ্গে জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাবের বিরোধিতাও করেনি। ইটালীর সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখার জন্য ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স জাতিসঙ্ঘকে ইতালির সঙ্গে মীমাংসার পরামর্শ দিয়েছিল। এমনকি ইংল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার স্যামুয়েল হোর ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিয়ের লাভাল ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এক গোপন চুক্তিতে ইতালির সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হন। চুক্তি অনুযায়ী আবিসিনিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড ইতালিকে দেবার অঙ্গীকার করা হয়। তবে আবিসিনিয়ার স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। হোর-লাভাল চুক্তি অবশ্য বাস্তবায়িত

হয়নি। কারণ এই গোপন চুক্তির তথ্য প্রকাশিত হয়ে যায় এবং ব্রিটিশ জনমত এই চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করে। এই চুক্তি নাকচ হয়ে গেলেও আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা রক্ষিত হয়নি। আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ইতালির অধিকারে আসে। অন্যদিকে সদস্যরাষ্ট্রগুলি লীগের প্রতি অনুগত ছিল না। লীগের দ্বারা যখন ইটালীকে আক্রমণকারী রাষ্ট্ররূপে চিহ্নিত করে অর্থনৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হল তখন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলি ইতালিতে তেল তথা পেট্রোলিয়াম সরবরাহ অব্যাহত রাখল। এই পরিস্থিতিতে একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি উৎসাহিত হয়ে ওঠে ও লীগকে অগ্রাহ্য করতে সাহসী হয়। আক্রমণকারী ইতালির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ কার্যকরী করার কোন উপায় লীগের ছিল না কারণ প্রধান দুটি সভ্য রাষ্ট্রই লীগের অনুমোদিত ব্যবস্থা ইতালির বিরুদ্ধে কার্যকর হতে দিতে চায়নি। তাই লীগের দুর্বলতা এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

পঞ্চমত, জাতিসঙ্ঘ ছিল স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির এক সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠান। এই রাষ্ট্রগুলি তাদের জাতীয় স্বার্থের উর্দ্ধে উঠতে পারেনি তাই স্বাভাবিকভাবে যৌথ নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। বৃহত্তর আন্তর্জাতিক স্বার্থের খাতিরে লীগের কোন সভ্য রাষ্ট্র তার জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে প্রস্তুত ছিল না এবং এই জন্য লীগের শর্ত ভঙ্গ করতে তারা দ্বিধা করেনি। সদস্য রাষ্ট্রগুলির আনুগত্যের অভাব লীগের দুর্বলতা প্রকট করেছিল। ত্রিশের দশকে বিশ্বে প্রতিবিপ্লবী তৎপরতা শাস্ত ও যৌথ নিরাপত্তা বিপন্ন করে তোলে। জার্মানি, ইতালি, জাপানে গণতন্ত্র বিরোধী একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। তাদের অনুসৃত আগ্রাসী পররাষ্ট্র নীতি প্রতিরোধের লীগের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়ে। ব্রিটেন, ফ্রান্স লীগের ভিতর কিংবা বাইরে থেকে কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির সম্প্রসারণশীল নীতির ফলে অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়া, আবিসিনিয়া, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের স্বাধীনতা বিপন্ন হয় এবং যৌথ নিরাপত্তা বব্যস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। লীগের সভ্য রাষ্ট্রগুলি আগ্রাসী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে কোন ঝুঁকি না নিয়ে যৌথ নিরাপত্তাকে বিপদগ্রস্ত করে ফেলেছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে লীগের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রচেষ্টা হতাশায় রূপান্তরিত হয়।

ষষ্ঠত, জাতিসঙ্ঘকে তার সদস্যরাষ্ট্ররা একটি সুবিধাজনক হাতিয়ারে পরিণত করতে চেয়েছিল। সভ্যরাষ্ট্রগুলি লীগের মাধ্যমে নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফ্রান্সের একমাত্র উদ্দেশ্য জার্মানির পুনরায় আক্রমণকে প্রতিরোধ করা। তাই ফ্রান্স জাতিসঙ্ঘকে জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ মূলক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। জার্মানি লীগের সভ্যপদ লাভ করে ভার্সাই সন্ধির অপমানজনক শর্তগুলিকে নাকচ করাতে চেয়েছিল। ব্রিটেনের উদ্দেশ্য ছিল জাতিসঙ্ঘকে শক্তিসাম্য রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত করা। উদ্দেশ্যে ও স্বার্থের এই বিভিন্নতা জাতিসঙ্ঘের স্থায়িত্বের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠেছিল। জাতিসঙ্ঘের লক্ষ্য এবং সদস্যরাষ্ট্রগুলির জাতীয় স্বার্থের মধ্যে কোন অভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়নি।

সপ্তমত, ভার্সাই চুক্তি অনুসারে যে শান্তি বিশ্বে স্থাপিত হয় তাকে চিরস্থায়ী করার দায়িত্ব ছিল জাতিসঙ্ঘের। প্রকৃতপক্ষে এই শান্তি ছিল একটি রাজনৈতিক শান্তি। ১৯৩০ সালের পর থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সংকট কালের সূচনা হয়। সংকটকালীন অস্থির, অনিশ্চিত রাজনীতির আঘাতে জাতিসঙ্ঘ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পূর্বের মর্যাদাও হারিয়ে ফেলে। ১৯১৯ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত লীগ তার অস্তিত্ব বর্তমান রেখেছিল। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে জাতিসঙ্ঘের অস্তিত্ব আইনসিদ্ধভাবে বিলুপ্ত হয়।

৫.১০ জাতিসঙ্ঘের কার্যাবলীর মূল্যায়ন

জাতিসঙ্ঘ বিভিন্ন কারণের ফলে সাফল্য লাভ করতে পারেনি সত্য কিন্তু ভবিষ্যত কালের জন্য জাতিসঙ্ঘ যে প্রভাব রেখে যায় তা পরবর্তীকালে বিশ্বের রাজনীতিবিদদের 'জাতিপুঞ্জ' গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। বিশ্বের রাজনীতিজ্ঞরা লীগের পতন হলেও একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনের আশা পরিত্যাগ করেননি। বরঞ্চ দেখা যায় জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতার কারণগুলিকে যতটা সম্ভব দূর করে একটি নতুন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ছিল এই প্রয়োজনীয়তার পরিণতি। প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে জাতিসঙ্ঘ এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। লীগ ব্যর্থ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সে সংস্থাগুলির উদ্ভাবন করেছিল যেমন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা, স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত প্রভৃতি বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিল। উপরন্তু লীগের জনকল্যাণমুখী কার্যাবলী ছিল যথেষ্ট প্রশংসনীয়। জাতিসঙ্ঘের অবদান সময় ও রাষ্ট্রসীমা অতিক্রম করে মানব সমাজে বর্তমান।

৫.১১ সারাংশ

ভার্সাই সন্ধির প্রথম অধ্যায়ে বলা হয় যে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য জাতিসঙ্ঘ স্থাপিত হবে, যার উদ্দেশ্য হবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপন করা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কুড়ি বছরে আন্তর্জাতিক বিরোধ ও সংঘর্ষ রোধ করা, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব বৃদ্ধি করার জন্য জাতিসঙ্ঘ যথেষ্ট চেষ্টা করে। এছাড়া মানবিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নেও জাতিসঙ্ঘ উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে।

তবে জাতিসঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ রোধ করার ব্যাপারে জাতিসঙ্ঘের সাফল্য ছিল যথেষ্টই সীমিত। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির স্বার্থপর মনোভাব সংযত করতে জাতিসঙ্ঘ ব্যর্থ হয়েছিল। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার চেয়ে নিজ স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রগুলি অতিআগ্রহী ছিল। এদের সংযত করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা জাতিসঙ্ঘকে কখনোই দেওয়া হয়নি। তাই বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির আগ্রাসী মনোভাব প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে লীগ অফ নেশনস নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল এবং ধীরে ধীরে তা বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়। লীগের এই বিলুপ্তির পিছনে ছিল তার সভ্য রাষ্ট্রগুলির অসহযোগিতা। লীগ একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যর্থ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু আন্তর্জাতিক যুদ্ধ যে মানবজাতির প্রতি এক অপরাধ এবং অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হিসাবে জাতিসঙেঘর কর্মপ্রয়াস যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে।

৫.১২ অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কত বছরব্যাপী চলেছিল?

২। জাতিসঙ্ঘ কবে স্থাপিত হয়?

৩। লীগ কভেন্যান্ট কী?
৪। ১০-১৬ নং ধারায় লীগের কোন নীতি গৃহীত হয়?
৫। লিথুয়ানিয়ার রাজধানীর নাম লিখুন।
৬। 'Wal Wal' অঞ্চল কোথায় অবস্থিত?
৭। জাপান মাঞ্চুরিয়া কত সালে আক্রমণ করে?
৮। লীগের জনকল্যাণমুখী কার্যগুলি কী?
৯। হোর-লাভাল চুক্তি কত সালে সম্পাদিত হয়?
১০। আনুষ্ঠানিকভাবে লীগের বিলুপ্তি কত সালে ঘোষিত হয়?
১১। কোন প্রতিষ্ঠান লীগের স্থান অধিকার করেছে?

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। জাতিসঙ্ঘের প্রকৃতি কীরূপ ছিল?
২। লীগ অফ নেশনসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
৩। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে লীগের কর্মপ্রচেষ্টা কীরূপ ছিল?
৪। লীগ কর্তৃক মানবিক ও সামাজিক উন্নয়ন বর্ণনা করুন।

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। আক্রমণকারী রাষ্ট্র রূপে চিহ্নিত জাপান ও ইটালির প্রতি লীগের কার্যকলাপ কী ছিল?
২। লীগের ব্যর্থতার পশ্চাতে সদস্য রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা কী ছিল?
৩। যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কাকে বলে? যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা লীগের দ্বারা কখন রচিত হয়েছিল?
৪। আপনি কি মনে করেন যে লীগ তার সদস্যরাষ্ট্রগুলির স্বার্থ সাধনের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল?—আলোচনা করুন।

৫.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

১। Robert Gilpin—War and Change in World Politics. Pub : Princeton Cambridge University Press.
২। R.P. Dutt—World Politics 1918-1936. Pub : Adhar Prakashan.
৩। W. Lipson— Europe in the Twentieth Century.
৪। প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়—আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস। প্রকাশ—মৌলিক লাইব্রেরী।
৫। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী এবং সিদ্ধার্থ গুহরায়—আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস। প্রকাশক ঃ প্রগেসিভ পাবলিশার্স।
৬। ডঃ অতুলচন্দ্র রায়—আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস। প্রকাশক ঃ মৌলিক লাইব্রেরী।

একক ৬ ❑ নিরস্ত্রীকরণ : সমস্যা ও সমাধানের প্রচেষ্টা

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য

৬.১ প্রস্তাবনা

৬.২ লয়েড জর্জের মেমোরান্ডাম বা স্মারকলিপি

৬.৩ নিরস্ত্রীকরণ ও প্রয়োজনীয়তা

৬.৪ নিরস্ত্রীকরণের প্রয়াস

৬.৫ জেনেভা প্রটোকল

- ৬.৫.১ জেনেভা প্রটোকলের উদ্দেশ্য
- ৬.৫.২ জেনেভা প্রটোকলের প্রচেষ্টা
- ৬.৫.৩ জেনেভা প্রটোকলের ব্যর্থতার কারণ
- ৬.৫.৪ জেনেভা প্রটোকলের তাৎপর্য

৬.৬ দূরপ্রাচ্যে ভারসাম্য বিঘ্নকারী রূপে জাপান

- ৬.৬.১ ওয়াশিংটন সম্মেলন (১৯২১-২২)
- ৬.৬.২ ওয়াশিংটন সম্মেলনের সীমাবদ্ধতা
- ৬.৬.৩ সম্মেলনের গুরুত্ব

৬.৭ প্রস্তুতি কমিশন : সমস্যা

- ৬.৭.১ নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা, সাফল্য ও মূল্যায়ন

৬.৮ লোকার্নো অধিবেশন (১৯২৫)

- ৬.৮.১ লোকার্নো অধিবেশনের পটভূমি
- ৬.৮.২ লোকার্নো চুক্তির শর্তাবলী
- ৬.৮.৩ লোকার্নো চুক্তির সমস্যা
- ৬.৮.৪ ত্রিস্তরীয় চুক্তি
- ৬.৮.৫ চুক্তির উদ্দেশ্য
- ৬.৮.৬ লোকার্নো চুক্তির অবদান
- ৬.৮.৭ লোকার্নো চুক্তির ত্রুটি
- ৬.৮.৮ লোকার্নো চুক্তির সমালোচনা
- ৬.৮.৯ লোকার্নো চুক্তির তাৎপর্য

৬.৯ সারাংশ

৬.১০ অনুশীলনী

৬.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৬.০ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককটিতে আলোচিত হয়েছে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা। এককটি পাঠ করে সমকালীন ইউরোপীয় রাজনীতির যে বৈশিষ্ট্যগুলি আপনারা চিহ্নিত করতে পারবেন তা হ'ল :

- যুদ্ধক্ষত পৃথিবীতে শান্তি স্থায়ী করতে যুদ্ধের সম্ভাবনা বিনাশের প্রয়োজনীয়তা ;
- এই প্রয়োজনীয়তার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা ;
- বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে মতভেদ ;
- নিরস্ত্রীকরণের সাফল্য ও ব্যর্থতা।
- লোকার্নো চুক্তি ও উদ্দেশ্য।

৬.১ প্রস্তাবনা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ, ধ্বংসলীলা বিশ্বের সমগ্র মানুষকে যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল। রাষ্ট্রনায়কগণ উপলব্ধি করেছিলেন যে একই দেশের হাতে প্রভূত পরিমাণ সমরাস্ত্র পুঞ্জীভূত হলে সেই রাষ্ট্র আগ্রাসী নীতি অনুসরণের পথে ধাবমান হবে এবং শান্তির কথায় কর্ণপাত করবে না। এই জন্য নিরস্ত্রীকরণের দাবী উঠতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়কাল শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্নটি বিশেষ ভাবে গুরুত্ব লাভ করেছিল। যুদ্ধাবসানে অনেকেই এই মত পোষণ করেছিলেন যে অস্ত্র প্রস্তুতি আন্তর্জাতিক সন্দেহের বাতাবরণ প্রস্তুত করে এবং এই পরিস্থিতিতে বৃদ্ধি পায় অবিশ্বাস ও ভীতি, যার অনিবার্য পরিণত হচ্ছে যুদ্ধ। তাই যুদ্ধ পরবর্তীকালে যে নতুন ব্যবস্থা রচিত হয়েছিল, মুখ্য রাষ্ট্রনায়করা চেয়েছিলেন সেই ব্যবস্থায় যুদ্ধভীতি চিরতরে মুছে যাক। অবশ্য গ্যার্থন হার্ডির মত অনুসরণ করে বলা যায় এই সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জনতার পছন্দসই সরকার। তাই আশা করা হয়েছিল এই নতুন সময়কালে (new era) রাষ্ট্রগুলি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যুদ্ধোপকরণগুলিকে হ্রাস করে ফেলবেন। কাজেই এই সময় নিরস্ত্রীকরণ খুব বড় সমস্যা বা অসুবিধা ছিল না। কিন্তু কিছু রাষ্ট্রনায়ক বুঝেছিলেন বিপদ আসন্ন কারণ শান্তি চুক্তিতে যে ভাবে ভৌমিক বন্দোবস্ত (Territorial Settlement) করা হয়েছে তাতেই নিহিত রয়েছে ভবিষ্যতে বিপদের বীজ। তাই লীগ চুক্তিপত্রে নিরস্ত্রীকরণের নীতি গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতৃবর্গ অস্ত্র হ্রাসের ব্যাপারে চিন্তা করতে থাকেন। এই ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে লীগ অফ নেশনসে একটি মেমোরান্ডাম পেশ করেছিলেন।

৬.২ লয়েড জর্জের মেমোরান্ডাম বা স্মারকলিপি

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ লীগ অফ নেশনসে একটি মেমোরান্ডাম পেশ করলেন ১৯১৯ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে। এতে তিনি নিরস্ত্রীকরণ তথা সমরসজ্জা হ্রাস ও লীগ অফ নেশনসের উদ্দেশ্য ও আদর্শের সাফল্যের শর্তগুলি উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর মতে মুখ্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে (ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি) নৌবহর, অস্ত্র প্রভৃতি সমরসজ্জা প্রসারণের জন্য যে কোন প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রগুলি সহমত পোষণ করবে। সমর উপকরণ হ্রাস না করলে লীগ অর্থহীন হয়ে উঠবে। লীগের পৃষ্ঠপোষক

রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সহযোগিতাই লীগের দক্ষতাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে, সদস্য রাষ্ট্রগুলির সুরক্ষা বৃদ্ধি করতে পারে এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ বৃদ্ধি করবে, তাই রাষ্ট্রগুলি যদি নিরস্ত্রীকরণে সহমত হয় তবেই যুদ্ধভীতি দূরীভূত হবে। এজন্য শুধু জার্মানি নয় ইউরোপের সব রাষ্ট্রগুলিকেই সমর উপকরণ হ্রাস বা বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা রদ করতে হবে। তা না হলে সীমান্ত যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে এবং সমগ্র ইউরোপ তার ফলে পুনরায় জড়িয়ে পড়বে। তাত্ত্বিক ভাবে বলা যায় যে নিরস্ত্রীকরণ হ'ল সমরাস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসান। নিরস্ত্রীকরণের অর্থ হচ্ছে যাবতীয় সমরাস্ত্র উৎপাদন হ্রাস করা কিংবা বন্ধ করে দেওয়া। প্রচলিত ধারণানুসারে রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গ মনে করতেন ক্ষমতার লড়াই নিশ্চিহ্ন করতে পারলে আন্তর্জাতিক নৈরাজ্য বা যুদ্ধ এড়ানো যাবে। এই ধারণা থেকেই ভার্সাই শান্তি চুক্ততে নিরস্ত্রীকরণ নীতি সংযুক্ত করা হয়েছিল। কারণ ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমরসজ্জা বৃদ্ধি করে। এই বর্ধিত সমরাস্ত্র হ্রাস করার বা নিশ্চিহ্ন করণের নীতিই হলো নিরস্ত্রীকরণ নীতি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরই নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে কোন গম্ভীর সমস্যা উপলব্ধি করা যায়নি। কিন্তু ভার্সাই চুক্তির মধ্যেই নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে 'সমস্যা' দেখা যায়। ভার্সাই চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে জার্মানির সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি তাদের সমরসজ্জা কমিয়ে আনবে এবং জাতিসঙ্ঘের চুক্তিপত্রের আট নম্বর ধারায় একথা স্বীকৃত হয়েছিল যে, "শান্তি রক্ষার্থে প্রয়োজন জাতীয় অস্ত্র হ্রাসের পরিমাণ একেবারে ন্যূনতম করে ফেলা এবং তা নিয়োজিত হবে সুরক্ষায়" ["that the maintainence of peace required the reduction of National armament to the lowest point consistent with National safety"]।

নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে একপক্ষে একটি সর্বসম্মতিক্রমে অস্ত্র হ্রাসের আশ্বাস (general promise) দেওয়া হয়েছিল এবং অন্য পক্ষে ছিল জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি যা বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির নেতৃবর্গের কাছে সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছিল। তাই নিরস্ত্রীকরণের আশ্বাস ও জাতীয় নিরাপত্তা স্থাপনের বিষয়টির অগ্রাধিকার—এই দুটি শর্ত নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে ছিল।

৬.৩ নিরস্ত্রীকরণ : প্রয়োজনীয়তা

মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের বিখ্যাত চৌদ্দ দফা শর্তের চতুর্থ শর্তটিতে নিরস্ত্রীকরণ নীতি গৃহীত হয়েছিল। বলা হয়েছিল রাষ্ট্রের সমরসজ্জা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে এবং তা হবে ন্যূনতম অর্থাৎ রাষ্ট্রগুলি তাদের সমরাস্ত্র নিম্নতম পর্যায়ে (Lowest Point) কমিয়ে নিয়ে আসবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে এবং তা পালন করবে।

এছাড়া লীগ চুক্তিপত্রের অষ্টম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল "শান্তি রক্ষার ব্যাপারে সমরাস্ত্রের পরিমাণ জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রেখে নিম্নতম পর্যায়ে কমিয়ে আনার এবং আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পালনে যৌথ কর্মসূচী বলবৎকরণের প্রয়োজনীয়তা লীগের সকল সদস্য স্বীকার করে নিচ্ছে।"

(বি. দ্র. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস, প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়)

এই বক্তব্য ভার্সাই সন্ধি চুক্তির পঞ্চম খন্ডে (Part V)-ও জার্মানির নিরস্ত্রীকরণ বা সামরিক শক্তি হ্রাসের নীতি গৃহীত হয়েছিল এবং সন্ধি রচয়িতা সদস্যরাষ্ট্রগুলি বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সমরাস্ত্র হ্রাসের নীতি স্বীকার করলেও, গ্যার্থন হার্ডির মতে মিত্রশক্তিবর্গ কখনোই বলে নি "If you will disarm, we will".

তাই বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে জার্মানির নিরস্ত্রীকরণ সম্পূর্ণ হবার পর মিত্রপক্ষ জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ন্যূনতম সমরসজ্জা বজায় রাখার নীতি গ্রহণ করে। এই দুই পরস্পর বিরোধী নীতির সংঘাত নিরস্ত্রীকরণে সমস্যা সৃষ্টি করে। তবে এটি ছিল নিরস্ত্রীকরণের প্রত্যক্ষ পদ্ধতি। যার অর্থ হল অস্ত্র হ্রাস করলে নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে। যা স্বীকার করেছিল ব্রিটেন ও তার সহযোগী রাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইটালী। কিন্তু ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড ইত্যাদি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির দাবী ছিল প্রথমে নিরাপত্তা পরে নিরস্ত্রীকরণ।

৬.৪ নিরস্ত্রীকরণের প্রয়াস

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানের জন্য লীগের পক্ষ থেকে প্রথম দিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে (statistical and mathematical basis) নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস চালান হয়। তবে এই প্রচেষ্টা সমরসজ্জার প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। প্রথমে স্থল, নৌ ও বায়ু সেনাদের মধ্যে থেকে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি স্থায়ী উপদেষ্টা কমিশন গঠিত হয় (Permanent Advisory Commission)। লীগ চুক্তিপত্রের নবম অনুচ্ছেদ অনুসারে স্থায়ী উপদেষ্টা কমিশন গঠনের ন'মাস পরে গঠিত হয় অস্থায়ী মিশ্র কমিশন, মে, ১৯২০। এই কমিশন বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করতে থাকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমরাস্ত্রের পরিমাণ সম্পর্কে এবং এই ক্ষেত্রে অনেকটা সময় ব্যয় করার পর সুপারিশ করে যে প্রাথমিক নিরস্ত্রীকরণের শর্ত প্রতিটি রষ্ট্রই পূরণ করবে এবং তা সেই রাষ্ট্রের জাতীয় বাজেটের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। নিরাপত্তার প্রয়োজনে যে ন্যূনতম অস্ত্র রাখা হবে তা রাষ্ট্রের জাতীয় আয় ব্যয়ের হিসাবের উর্ধ্বে যেন না হয়। অস্থায়ী মিশ্র কমিশনের ব্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড এশার (Lord Esher) একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। গ্যার্থেন হার্ডির মতে এটিও ছিল গাণিতিক ধরনের অর্থাৎ mathematical type-এর। লর্ড এশার প্রস্তাব দেন প্রতিটি রাষ্ট্র নির্দিষ্ট (৩০,০০০) সৈন্য রাখতে পারবে। ত্রিশ হাজার সেনা নিয়ে একটি ইউনিট গঠন করার প্রস্তাবানুসারে স্থির হয় যে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও ইটালী যথাক্রমে ছয়, তিন ও চার ইউনিট সেনাবাহিনী রাখতে পারবে। তবে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে এবং সমরবাহিনী হ্রাসের প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়।

৬.৫ জেনেভা প্রটোকল

নিরস্ত্রীকরণের প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে লীগ কাউন্সিল গঠন করেছিল Temporary Mixed Commission for Disarmament। ১৯২৩ সালে এই অস্থায়ী মিশ্র কমিশন একটি পারস্পরিক সহায়তা সন্ধি'র (Draft Treaty of Mutual Assistance) খসড়া উপস্থিত করে, যাতে ভবিষ্যতে নিরস্ত্রীকরণের উল্লেখ করা হয়। তবে নিরস্ত্রীকরণের বিষয়টি খুব স্পষ্ট করে বলা ছিল না। তবে নিরাপত্তা সম্পর্কে নির্দিষ্ট গ্যারান্টির কথা বলা হয়েছিল। ফ্রান্স উৎসাহের সঙ্গে এই খসড়া চুক্তি মেনে নিয়েছিল। অন্যদিকে গ্রেট ব্রিটেন, হল্যান্ড, ব্রিটিশ ডোমিনিয়নস্থ রাজ্যগুলি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। দেখা গেল লীগ অফ নেশনসের প্রধান সদস্যদের মধ্যে দুটি পৃথক মনোভাব বিরাজমান। ফ্রান্স ও তার সমর্থক রাষ্ট্রবর্গ লীগকে নিরাপত্তা বৃদ্ধির উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে আগ্রহী ছিল, অপরপক্ষে ব্রিটেন ও ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন রাষ্ট্রগুলি লীগকে আলাপ-আলোচনাও পরামর্শের জন্য একটি ব্যবহারযোগ্য সংস্থা হিসাবে গণ্য করতো। প্রকৃতপক্ষে নীতির সংঘাত নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সৃষ্টি করে—মত পার্থক্যের কারণে 'পারস্পরিক সহায়তা সন্ধি' কার্যকরী হতে পারেনি। ১৯২৪ সালে ব্রিটিশ

প্রধানমন্ত্রী র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী হেরিয়ট লীগের সভায় উপস্থিত হয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে মীমাংসার জন্য একটি দলিল বা প্রটোকল প্রস্তুত করার জন্য লীগ সদস্যদের অনুপ্রাণিত করেন এবং এর ফলে লীগের সাধারণ সভার পঞ্চম অধিবেশনে "Protocol for the pacific settlement of international disputes" নামে একটি দলিল পেশ করা হয়। তবে এই দলিলটি জেনেভা প্রটোকল নামেই পরিচিত।

৬.৫.১ জেনেভা প্রটোকলের উদ্দেশ্য

জেনেভা প্রটোকল সালিসি (arbitration), নিরস্ত্রীকরণ (disarmament) ও নিরাপত্তা (security) এই তিনটি নীতি বা উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রেখে লীগের দুর্বলতাগুলিকে দূর করতে প্রয়াসী হয়েছিল। লীগের প্রধান দুর্বলতাই ছিল যুদ্ধ প্রতিরোধের ব্যাপারে। লীগ অফ নেশনসের কভেন্যান্ট বা চুক্তিপত্র যুদ্ধের পথ নিষিদ্ধ করতে পারেনি। রাষ্ট্রসঙ্ঘ কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিবাদে হস্তক্ষেপ করতে অপারগ ছিল এবং কোন প্রস্তাব পাশ করানোর ক্ষেত্রে সদস্যদের ঐক্যমত স্থাপনেও সক্ষম ছিল না। জেনেভা প্রটোকল লীগের এই শূন্যস্থান দুটি পূরণ করতে প্রয়াসী হয়েছিল। ঐতিহাসিক E. H. Carr লিখেছেন "The covenant left the door open for war, not only in cases when the Council voting without the parties failed to pronounce a unanimous judgement on a dispute, but also in cases where the subject of the dispute was ruled to be a matter within the domestic jurisdiction of one of the partiers. The protocol sought to close these two "gaps". প্রটোকলের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুসারে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি কোন অবস্থাতেই যুদ্ধে লিপ্ত হবে না বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। সবরকম বিবাদে রাষ্ট্রবর্গ আন্তর্জাতিক আদালতের সাহায্য নিতে বাধ্য থাকবে। লীগ কাউন্সিল কোন বিষয়ে ঐক্যমত স্থাপন করতে না পারলে একটি সালিসি কমিটি নিযুক্ত করে বিবাদের বিষয়টিকে কমিটিতে পাঠাতে হবে এবং কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাধ্যতামূলক হবে। রাষ্ট্র বিরোধের ক্ষেত্রে লীগ কাউন্সিলের বাধ্যতামূলক সালিসি, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ পন্থা গ্রহণে যে রাষ্ট্র অসম্মত হবে তাকে আক্রমণকারী দেশ বলে অভিহিত করা হবে।

লীগের দ্বিতীয় শূন্যস্থানটি পুরণের জন্য প্রটোকলের বিধান ছিল যে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিবাদের যুক্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য প্রটোকলের এগারো নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র সঙ্ঘের যে কার্যপ্রণালী তা মেনে নিতে হবে। জেনেভা প্রটোকলের অন্যতম বিশেষত্ব হ'ল যে এরপর থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিবাদে লীগ পরিষদ প্রয়োজনবোধে হস্তক্ষেপ করতে পারবে।

সুতরাং জেনেভা প্রটোকল দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছিল—**প্রথমত,** আক্রমণকারী রাষ্ট্রকে চিহ্নিত করতে পেরেছিল ও **দ্বিতীয়ত,** ভবিষ্যত আক্রমণ বোধ করতে প্রয়াসী হয়েছিল। জেনেভা প্রটোকলের অন্যতম শর্তটি ছিল নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করা। কারণ, নিরাপত্তা ও সমরাস্ত্র হ্রাসের পরস্পর বিরোধী নীতি নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। তাই প্রটোকল প্রস্তাব করে যদি ১৯২৫ সালের ১৫ই জুনের পূর্বে অধিকাংশ রাষ্ট্র জেনেভা প্রটোকল আইন সিদ্ধ করে নেয় তবে ১৫ই জুন নিরস্ত্রীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অধিবেশন আহুত হবে।

৬.৫.২ জেনেভা প্রটোকলের প্রচেষ্টা

বস্তুতপক্ষে জেনেভা প্রটোকলে লীগ কভেনান্টের কয়েকটি আইনসংগত ত্রুটি দূর করার প্রয়াস দেখা যায়। আক্রমণের সম্ভাবনা যথাসম্ভব দূর করে স্থায়ী শান্তির ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতি করার

প্রচেষ্টা জেনেভা প্রটোকলে পরিলক্ষিত হয়। লীগ পরিষদকে ত্রুটি মুক্ত করা ও লীগকে শক্তিশালী করে তোলার এটাই ছিল প্রচেষ্টা। জেনেভা প্রটোকল নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের আহ্বানের ব্যবস্থা করেছিল। এই ব্যবস্থা লীগ চুক্তিপত্রে ছিল না। জেনেভা প্রটোকল ১৯১৯ সালের রাষ্ট্রীয় পুনর্বিন্যাস অক্ষুন্ন রাখার ওপর জোর দিয়েছিল। এছাড়া শান্তি ব্যবস্থার সঙ্গে নিরাপত্তার প্রশ্নটিও যুক্ত রাখার প্রবনতা এই প্রটোকলে পরিলক্ষিত হয়েছিল।

৬.৫.৩ জেনেভা প্রটোকলের ব্যর্থতার কারণ

আইন সংগত ভাবে পৃথিবীতে শান্তির আদর্শ প্রতিষ্ঠায় জেনেভা প্রটোকল ছিল সত্যিই এক সাহসী ও সুচিন্তিত প্রয়াস। তবে অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও সাফল্য লাভ করতে পারেনি। ঐতিহাসিক কার (E. H. Carr)-এর মন্তব্য অনুসরণ করে বলা যায় লীগ কভেনান্টে সন্নিবিষ্ট ১৬নং ধারা অনুযায়ী লীগ কাউন্সিলের যে ক্ষমতা ছিল তাকে সুদৃঢ় করার কিংবা আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে জেনেভা প্রটোকল সফল হতে পারেনি। ফলে লীগের ষোড়শ ধারাটি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং সর্বশেষে বলা যায় যে জেনেভা প্রটোকলে কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিপদে হস্তক্ষেপের উল্লেখ ছিল, তাই অনেক রাষ্ট্র এটিকে তাদের সার্বভৌমত্বের ওপর হস্তক্ষেপ রূপে গণ্য করতে থাকে। তবে ত্রুটিগুলি সংশোধনের সম্ভাবনা থাকলেও ব্রিটেন ও ব্রিটিশ ডোমিনিয়ানগুলিতে জেনেভা প্রটোকলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সৃষ্টি হয়। ১৯২৪ সালের নভেম্বর মাসের নির্বাচনে ব্রিটেনে ম্যাকডোনাল্ড শ্রমিক সরকারের স্থলে ক্ষমতা লাভ করে বলডুইনের রক্ষণশীল দল। ১৯২৫ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী অস্টিন চেম্বারলেন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে এই প্রটোকল গ্রহণ করা ব্রিটেনের পক্ষে সম্ভব নয়। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির বিরোধিতার ফলে এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

৬.৫.৪ জেনেভা প্রটোকলের তাৎপর্য

জেনেভা প্রটোকল ব্যর্থ হলেও ইউরোপের যে কোন স্থানের শান্তি বিঘ্নিত হলে তার প্রতিরোধ করাও সেজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন অনিবার্য হয়ে ওঠে। গ্যাথর্ন হার্ডি তাই যথার্থই বলেছেন যে পৃথিবীর শান্তি ভঙ্গাকারী বিপদগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সর্বসম্মতিক্রমে অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল ("It remained evident and universally agreed that some form of guarantees against the main dangers threatening European peace was indispensible")। লীগ চুক্তিপত্রের অষ্টম ও নবম ধারায় নিরস্ত্রীকরণের নীতি সন্নিবিষ্ট ছিল এবং এর দায়িত্ব লীগের ওপর বর্তায়। তবে নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা লীগের বাইরেও গৃহীত হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে নিরস্ত্রীকরণের লীগ বহির্ভূত প্রচেষ্টা হিসাবে ওয়াশিংটন সম্মেলনের কথা উল্লেখ করা যায়। নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানের একটি উল্লেখনীয় পদক্ষেপ ছিল এই ওয়াশিংটন সম্মেলন, এটি পূর্ব এশিয়ার রাজনীতির জটিলতা নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। বস্তুতপক্ষে জাতিসংঘ কর্তৃক নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা ও পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য কোন সম্মেলন আহ্বান করার পূর্বেই ১৯২১ সালের ১১ই আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হার্ডিঞ্জ নৌ-শক্তি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিশ্বের প্রধান প্রধান নৌ-শক্তির অধিকারী রাষ্ট্রগুলিকে এক সম্মেলনে আহ্বান করেন। এই সম্মেলন চলেছিল ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে নৌ-শক্তি হ্রাস করার জন্য ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান চুক্তি স্বাক্ষর করে।

৬.৬ পূর্ব এশিয়ার ভারসাম্য বিঘ্নকারী রূপে জাপান

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই জাপান দূর-প্রাচ্যের রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ১৯০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ, জাপানকে এক অপ্রতিহত গতি দান করেছিল। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়কালে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দুর্বার নৌ-শক্তি রূপে জাপান আত্মপ্রকাশ করে। চীনের কিয়াও-চাও, শানটুং প্রদেশ, তাছাড়া ফরমোজা, শাখা লিন, কোরিয়া অঞ্চল জাপানের পদানত ছিল। এইভাবে জাপানের অগ্রগতি দূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করছিল। অন্যদিকে ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে আমেরিকা দূর প্রাচ্যে বিশেষ স্বার্থ সাধনে তৎপর হয়ে উঠেছিল। হাওয়াই ও ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের অধিকার আমেরিকাকে চীন সাম্রাজ্যে ভালোভাবে প্রবেশের সুযোগ দিয়েছিল। প্রাচ্য রাষ্ট্র জাপান চীনে নিজ স্বার্থ সিদ্ধিতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল। চীনের সমৃদ্ধ মাঞ্চুরিয়া অধিকার করার চেষ্টা জাপান ও আমেরিকা উভয়েই চালিয়ে যাচ্ছিল। এই অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ে সক্ষম হয় জাপান। এছাড়া জাপানের সামরিক তথা নৌ-শক্তি বৃদ্ধি আমেরিকা ভীত ও ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। প্রাচ্যে চীন থেকে ফুকেন (Fukien) পর্যন্ত সর্বপ্রকার নৌ-তৎপরতা জাপান নিয়ন্ত্রণ করতো। ঐতিহাসিক Vinacke বলেছেন "By 1921 Japan was in a position strategically, to dominate the East. All of the sea approaches from north to south were controlled by her"। জাপানের এই প্রাচ্য অভিযান স্বভাবতই আমেরিকার মনঃপুত ছিল না। তাই প্রাচ্যের উভয় শক্তির সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে নৌ-শক্তি দমনের জন্য তাই ওয়াশিংটন সম্মেলন আহুত হয়। 'The Washington Conference originated out of a desire, in the interest of economy, to reduce naval armament"।

৬.৬.১ ওয়াশিংটন সম্মেলন (১৯২১-২২)

পূর্ব এশিয়ায় যে সব রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ জড়িয়ে ছিল সেই দেশগুলির প্রতিনিধিরাই ওয়াশিংটন সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। এই রাষ্ট্রগুলি হল আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, চীন, ইতালি, বেলজিয়াম, হল্যান্ড এবং পর্তুগাল। এখানে সম্পাদিত হ'ল তিন প্রকার চুক্তি। চতুর্শক্তি চুক্তি, পঞ্চশক্তি চুক্তি এবং নয়শক্তি চুক্তি। চতুর্শক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে। চুক্তিতে স্থির হয় যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে রাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক অধিকার মেনে চলবে ও অধিকার সম্পর্কিত মতবিরোধ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে।

পঞ্চশক্তি চুক্তিটি ছিল নৌ-নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান ও ইতালির মধ্যে। দূর প্রাচ্যে জাপানের নৌ-বল হ্রাস করার জন্য বলা হয় ভারী যুদ্ধ-জাহাজের ক্ষেত্রে জাপানের নৌ-শক্তি, ব্রিটিশ ও মার্কিন নৌ-শক্তির শতকরা ষাটভাগ হবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ব্রিটিশ ও মার্কিন নৌ-শক্তির হার সমান হবে বলে স্থির হয়।

তৃতীয় চুক্তি অর্থাৎ নয়শক্তি চুক্তিটি ছিল চীন সম্পর্কিত নয়টি রাষ্ট্র—ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ড, পর্তুগাল, বেলজিয়াম ও জাপানের মধ্যে এই নয়শক্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি চীনের অখন্ডতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চীনে কোন বিদেশী শক্তি হস্তক্ষেপ করবে না স্থির হয় এবং চীনের সর্বত্র শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রে সুবিধা দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়। বস্তুতপক্ষে এই চুক্তি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনের সম্মান বৃদ্ধি করেছিল। ঐতিহাসিক গ্যাথর্ন হার্ডি তাই বলেছেন "In these circumstances, while the achievement was substantial, it is obvious

that the problem was one of far greater simplicity than that confronting the League of Nations in relation to the land forces of Europe."

৬.৬.২ ওয়াশিংটন সম্মেলনের সীমাবদ্ধতা

ওয়াশিংটন সম্মেলনে জাপানের নৌ-শক্তির আয়তন ও সংখ্যা সীমিত করা হয়। জাপান একপ্রকার বাধ্য হয়ে তা মেনে নিয়েছিল। এই সময়কার অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি জাপানকে সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য করে। ব্রিটেন, আমেরিকা ছিল তৎকালীন বিশ্বরাজনীতির কেন্দ্র। তাই দুটি রাষ্ট্রের যৌথ প্রয়াসের বিরুদ্ধাচারণ জাপানের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে উঠত। কিন্তু পরবর্তীকালে জাপান ব্রিটেন ও আমেরিকার নৌ-বাহিনীর সঙ্গে সমতা দাবী করে প্রত্যাখ্যাত হয় এবং ১৯৩৬ সালে জাপান এই চুক্তি নাকচ করে। ওয়াশিংটন সম্মেলনের মাধ্যমে নৌ-শক্তিতে বলীয়ান জাপানকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টা তৎকালীন পরিস্থিতিতে সাফল্য লাভ করেছিল ঠিকই কিন্তু এই সাফল্য জাপানের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। জাপানের আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণের সময়কালে এই চুক্তি পরিত্যক্ত হয়।

৬.৬.৩ সম্মেলনের গুরুত্ব

তাই এই সম্মেলনের সাফল্য ছিল তাৎক্ষণিক এবং সাময়িক সাফল্য সত্ত্বেও এর গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দূর প্রাচ্যের রাজনীতিতে জাপান অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলে যে ভারসাম্য হীনতার সৃষ্টি হয়েছিল তা প্রশমনের ক্ষেত্রে ওয়াশিংটন সম্মেলন কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল। পরবর্তী এক দশক কাল সুদূর প্রাচ্যে শান্তি ও ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছিল।

৬.৭ প্রস্তুতি কমিশন : সমস্যা

ওয়াশিংটন সম্মেলনে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ তাদের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতেই আগ্রহী ছিল বেশি এবং জাপানের সাম্রাজ্যবাদী প্রসার প্রতিহত করাতে উৎসাহী ছিল। ফলে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে অযথা কালক্ষেপ শুরু হয়। এই সময়ে লীগ অফ নেশনের ভিতর থেকে লীগ কাউন্সিল সদস্য রাষ্ট্রগুলির অস্ত্রশস্ত্র সীমিত করার জন্য একটি প্রস্তুতি কমিশন গঠন (Preparatory Commission) করে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং এই কমিশনের প্রথম বৈঠক বসে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে। এই বছর সোভিয়েত রাশিয়া, জার্মানি এবং আমেরিকা প্রস্তুতি কমিশনে যোগ দেয়।

প্রস্তুতি কমিশন প্রাথমিক পর্বে তিনটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। এই প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মতৈক্যের অভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনটি প্রশ্ন ছিল **প্রথমত,** সৈন্যদের সংজ্ঞা নির্ধারণ নিয়ে; **দ্বিতীয়ত,** নৌ-বাহিনীর বহন ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ নিয়ে ; **তৃতীয়ত,** আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী গঠন করার বিষয়ে মতভেদ প্রকট হয়ে উঠল। প্রথম জটিলতা ছিল রাষ্ট্রের প্রকৃত সেনাবাহিনী কারা সেই প্রশ্নে অর্থাৎ ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্র কর্মরত সৈন্যদের 'সৈন্য' সংজ্ঞার আওতাভুক্তিতে আগ্রহী ছিল এবং ইংল্যান্ড, জার্মানি প্রভৃতি রাষ্ট্র প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সৈন্যদেরও হিসাবের মধ্যে নিয়ে আসার দাবি করে। সুতরাং 'সৈন্য' সংজ্ঞা ভুক্ত করা হবেন?—এই নিয়ে মতানৈক্য শুরু হয়। দ্বিতীয় জটিলতা ছিল বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির নৌ-বাহিনীর বহন ক্ষমতা বিষয়ক। ব্রিটেন ও আমেরিকা পৃথকভাবে বহন ক্ষমতা স্থির করার পক্ষে এবং ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি নৌ-বহরের মোট

বহন ক্ষমতা নির্ধারণের পক্ষে মত প্রকাশ করে। সুতরাং নৌ-বহরের বহন ক্ষমতার ব্যাপারে সহমত হওয়া সম্ভব হ'ল না। তৃতীয় মতপার্থক্য দেখা দিল আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে। কারণ ফ্রান্স এই বিষয়ে অতি উৎসাহী হলেও অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেনি।

উপরিউক্ত জটিলতা ব্যতিরেকে আরো বহুবিধ মতভেদ ছিল বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে। প্রস্তুতি কমিশনের অধিবেশনে সদস্য রাষ্ট্রগুলির মতভেদ ছিল সার্বিক। নিরস্ত্রীকরণ, সামরিক ব্যয় হ্রাস ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদের নিরসন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

সুতরাং E. H. Carr-কে অনুসরণ করে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত আলোচনা প্রস্তুতি কমিশন নিয়োগের মাধ্যমে সম্পাদনের যে প্রয়াস শুরু হলো তার বাস্তব প্রয়োগ নানাবিধ সংকটের কারণে অসম্ভব হবে উঠল। বস্তুতপক্ষে এই সমস্ত প্রয়াসই যেমন আলোচনার মাধ্যমে বিবাদের নিষ্পত্তি, যুদ্ধ প্রতিরোধ কল্পে নব নব পদ্ধতির উদ্ভাবন—ছিল তাত্ত্বিক প্রচেষ্টা, কারণ ইতিপূর্বেই সম্পাদিত হয়ে গিয়েছে লোকার্নো চুক্তি। এই চুক্তি রচনা করেছিল শান্তি ও সৌহার্দ্যের পরিমণ্ডল।

৬.৭.১ নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা, সাফল্য ও মূল্যায়ন

১৯৩০ সালের পঞ্চশক্তি নৌ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর জাতিসঙ্ঘ নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থাকে কার্যকরী করতে আরো বেশি প্রয়াসী হয়। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি খসড়া সম্মেলন প্রস্তুত করা হয় যাতে সংযুক্ত হয় নানাবিধ সংরক্ষিত বিষয়। এই খসড়া সম্মেলনে বলা হয় যে বহু প্রতীক্ষিত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে জেনেভায় ১৯৩২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি।

সম্মেলনে তিনটি বিষয় রাষ্ট্রনেতৃবর্গের যাবতীয় আশা আকাঙ্খাকে অসম্ভব ও অবাস্তব করে তোলে। **প্রথমত,** জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ ; **দ্বিতীয়ত,** জার্মানিতে নাৎসীবাদের উত্থান ; **তৃতীয়ত,** পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক দুর্দশা।

প্রস্তুতি কমিশনের সম্মুখে সমস্যাগুলির কোন সমাধান সম্ভব ছিল না। কারণ জার্মানির দাবী ছিল সমতার নীতি প্রতিষ্ঠা করা হোক অন্যদিকে ফ্রান্স নিরাপত্তার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী ছিল। তাই ফরাসী সমরমন্ত্রী Tardieu একটি নতুন পরিকল্পনা পেশ করেন। এই পরিকল্পনায় বলা হ'ল—

প্রথমত, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও বিপজ্জনক অস্ত্রশস্ত্র যেমন বোমারু বিমান, ভারী বন্দুক, রণতরী প্রভৃতিকে একবারে বাদ দিতে হবে ;

দ্বিতীয়ত, জাতি সঙ্ঘের অধীনে আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রাখতে হবে ;

তৃতীয়ত, সালিসি ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে ;

চতুর্থত, নিরস্ত্রীকরণনীতি ভঙ্গাকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি কার্যকরী সংস্থা গঠন করা।

ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ফরাসী পরিকল্পনাটি প্রত্যাখ্যান করে, এই কারণে যে এই পরিকল্পনা যে কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উপর হস্তক্ষেপ করবে। তাছাড়া এই পরিকল্পনায় জার্মানির দাবী (সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য জার্মানি দাবী জানিয়ে আসছিল) তার উপরও কোন আলোকপাত করা হয়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন এরপর নিরস্ত্রীকরণের গুণগত (Qualitative Disarmament) দিকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে। গুণগত নিরস্ত্রীকরণ হ'লো সেই সব অস্ত্রশস্ত্র নিশ্চিহ্ন করা যা আক্রমণাত্মক প্রকৃতির। তবে এখানে আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে কোনরূপ করা হয়নি।

এই সম্মেলনে নিরস্ত্রীকরণের কৌশলগত বিষয়গুলির উপর বিতর্ক শুরু হয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি হুভার প্রস্তাব করেন বিশেষ আক্রমণাত্মক অস্ত্রগুলি নিশ্চিহ্ন করা হবে এবং বাকি অস্ত্রের এক তৃতীয়াংশ হ্রাস করা হবে।

কামান, বোমারু বিমান, ট্যাঙ্ক এবং রাসায়নিক অস্ত্র (পরমাণু বোমা) বিলুপ্ত করা হবে। ভারী ও বৃহতের পরিবর্তে ক্ষুদ্র ও হালকা অস্ত্র রাখা স্বীকৃত হয়। এই প্রস্তাবে ছোট রাষ্ট্রগুলি সম্মত হয়। ব্রিটেন এই প্রস্তাবে রাজী হয়নি। এবং ফ্রান্স পুনরায় নিরাপত্তার প্রশ্নটি উত্থাপন করে। সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে কোন প্রস্তাব গৃহীত হয়নি এবং ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে স্থগিত হয়ে যায়। পুনরায় যখন ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনেক বেশি জটিল ও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। প্রথমত, জাপান জার্মানি জাতিসঙ্ঘ বিরোধী হয়ে উঠেছিল। জার্মানি নাৎসী অধিনায়কত্বে পুনরায় সামরিকীরণ শুরু করেছিল। এই পরিস্থিতি ফ্রান্সের নিরাপত্তা হীনতার মনোভাবকে আরও বর্ধিত করে।

ফ্রান্স উপলব্ধি করে যে শুধুমাত্র জার্মানির বিপরীতে তার সামরিক শক্তির সঙ্গে যদি শিল্প ও মানব সম্পদ বৃদ্ধি হয় তবে তার আধিপত্য বজায় থাকবে।

ব্রিটেন এই সময়ে একটি সম্মেলন আহ্বানের খসড়া প্রস্তুত করে। তাতে প্রস্তাব করা হয় সৈন্য (effectives), বিমান প্রভৃতির সংখ্যা হ্রাস করার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাম্যমান কামান (mobile guns by caliber 4) এবং দশ টন ওজনের বেশি ভারী ট্যাঙ্ক প্রভৃতির সংখ্যা কমিয়ে ফেলা হবে।

জার্মানিকে সন্তুষ্ট করতে বলা হয় ভার্সাই সম্মেলনে গৃহীত নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা বিষয়ে এই সম্মেলনে আলোচনা করা হবে। এছাড়া জার্মানিকে সৈন্য রাখার অনুমতিও দেওয়া হয়। বলা হয় অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির দেশের ভিতর যা সৈন্য থাকবে তার সমপরিমাণ সৈন্য জার্মানিও রাষ্ট্রের ভিতর রাখার অনুমতি পাবে। এই ব্যবস্থা দেখাশুনার জন্য একটি স্থায়ী নিরস্ত্রীকরণ কমিশনও গঠিত হয়। এই প্রস্তাবে ফ্রান্সের জন্য অতিরিক্ত গ্যারান্টিও দেওয়া হয়। এতদসত্ত্বেও প্রকৃত নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব হয়নি। এই সম্মেলন জুন মাসে স্থগিত হয়ে অক্টোবর মাসে পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়।

অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ফ্রান্স, ব্রিটিশ পরিকল্পনায় কিছু সংশোধনের প্রস্তাব দেয়। ফরাসী পরিকল্পনাতে বলা হয় প্রথম চার বছর একটি আন্তর্জাতিক পরিদর্শক সংস্থা বিভিন্ন দেশের সামরিক সরঞ্জাম পরিদর্শন করবে। এই চার বছর কেউ অস্ত্র বৃদ্ধি করবে না। যদি চার বছরের এই সময় কাল সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রান্ত হয় তখন প্রকৃত নিরস্ত্রীকরণ শুরু হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ফরাসী প্রস্তাব জার্মানির মূল দাবীকে এড়িয়ে গিয়েছিল।

ফ্রান্সের এই প্রস্তাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ইটালী সমর্থন করে। ব্রিটিশ প্রতিনিধি সাইমন ১৯৩৩ সালের ১৪ই অক্টোবর সম্মেলন একটি নতুন প্রস্তাব পেশ করার কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি টেলিগ্রাম মারফত বার্লিন থেকে জানানো হয় জার্মানি এই সম্মেলন পরিত্যাগ করেছে। ওই একই দিনে আরও কিছু পরে জার্মানি জাতিসংঘ থেকে নিজ সদস্য পদ প্রত্যাহার করে নেয়। যদিও সঙ্গে সঙ্গে এই নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন সমাপ্ত হলো না কিন্তু এর যাবতীয় প্রস্তাব, পরিকল্পনা যে বাস্তবায়িত হবে তার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৩৪ সালের মধ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা খাতে রাষ্ট্রীয় বাজেট বৃদ্ধি পায়।

এইভাবে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন যে সাফল্য লাভ করতে পারে না তা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এই প্রসঙ্গে Walter বলেছেন "While all agreed that the Conference must adjourne, no body proposed that it should close for ever. It was characteristics of League of Nations that it was never ready of confess defeat in any important purpose."

তাই উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে প্রকৃত প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে উদ্দেশ্যের এতটাই স্ববিরোধীতা ছিল

যে নিরস্ত্রীকরণের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছিল বার বার। অন্যপক্ষে জাতিসঙ্ঘকে প্রকৃত কার্যকরী করে তুলতে সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এত কুণ্ঠা ছিল যে নিরস্ত্রীকরণকে বাস্তবায়িত করা যায়নি।

৬.৮ লোকার্নো অধিবেশন (১৯২৫)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তি, স্থায়িত্ব, নিরস্ত্রীকরণ এবং নিরাপত্তার বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। তাই দেখা যায় শান্তি ও স্থায়িত্ব রক্ষার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হল। বস্তুতপক্ষে নিরাপত্তার প্রশ্নে সর্বাপেক্ষা বেশি আশঙ্কিত ও আগ্রহী ছিল ফ্রান্স। ই. এইচ. কার-এর মতানুসারে বলা যেতে পারে দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপীয় বিষয় ছিল ফ্রান্সের নিরাপত্তার জন্য দাবী। ১৯২৫ সালে স্বাক্ষরিত লোকার্নো চুক্তি ছিল নিরাপত্তা নিরস্ত্রীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে গৃহীত প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস।

৬.৮.১ লোকার্নো অধিবেশনের পটভূমি

জেনেভা প্রটোকলের ব্যর্থতা কিয়দংশে লোকার্নো চুক্তির ভিত্তি রচনা করেছিল বলা যেতে পারে। এছাড়া ছিল নিরাপত্তার জন্য ফ্রান্সের ঐকান্তিক আগ্রহ। কারণ পরাজিত জার্মানির প্রতিশোধমূলক কার্যকলাপের আশঙ্কায় ফ্রান্স সর্বদাই ভীতিগ্রস্ত ছিল। এই ভীতি থেকে এসেছিল নিরাপত্তাহীনতা। ফরাসী নিরাপত্তাহীনতার প্রতি ব্রিটেনের উদাসীনতা ও আমেরিকার নিষ্ক্রিয়তা ফ্রান্সকে চিন্তান্বিত করে তুলছিল। অপর দিকে জার্মানির কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন লোকবল, অর্থবল, ঐতিহ্য প্রভৃতি ফ্রান্সের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। মনে করা হত যে জার্মানির শক্তির ভিত্তি অটুট ছিল। তাই পরাজিত জার্মানিকে ফ্রান্স কখনোই শক্তিহীন বলে মনে করতে পারেনি। তাই ফ্রান্স কখনোও একক প্রয়াস চালিয়েছে, কখনোও বা সমঝোতার ভিত্তিতে নিজের নিরাপত্তার প্রশ্নটির সমাধানে ব্রতী হয়েছে। একক প্রয়াসের ক্ষেত্রে ফ্রান্স, যুগোশ্লোভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও রুমানিয়া কর্তৃক নির্দিষ্ট লিটল আঁতাতের বা ক্ষুদ্র আঁতাতে যোগদানের কথা বলা যায়। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পোল্যান্ড, রোমানিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এইভাবে ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যেন এক নিরাপত্তার বৃত্ত বা বলয় সৃষ্টি করেছিল। ডেভিড টমসনের উক্তি উদ্ধৃত করে বলা যায় "Thus it was she who linked the western settlement with eastern by making network of alliances with Poland and of agreements with 'Little Entente' powers of Yugoslavia, Czechoslovakia and Rumania"। এই ক্ষুদ্র মৈত্রী চুক্তি ফরাসী নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে পারেনি। উপরন্তু মৈত্রীবদ্ধ রাষ্ট্রগুলিতে অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা ছিল। ফ্রান্স চুক্তিবদ্ধ থাকার কারণে এই সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লে ফ্রান্সের সমস্যার ব্যাপকতা ও গভীরতা যুগপৎ বৃদ্ধি পায়। সমকালীন ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয়। কট্টর জার্মান বিরোধী পঁয়েকার মন্ত্রীসভা ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং হেরিয় (Heerioe) প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হন। তিনি ছিলেন অনেক উদার মনোভাবাপন্ন। ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রিয়াঁ (Briond) জার্মানির প্রতি সমঝোতাপূর্ণ নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। অন্যদিকে জার্মান চান্সেলার স্ট্রেসিমান জার্মানির পররাষ্ট্র নীতিতে সংঘাতের পথ পরিত্যাগ করেন এবং সহাবস্থান ও স্থিতাবস্থা হয়ে উঠে সমকালীন জার্মানির পররাষ্ট্র নীতির বৈশিষ্ট্য। তাই উভয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন নিরাপত্তা সমস্যা সমাধানে এক অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ফ্রান্স তার প্রধান প্রতিপক্ষের সঙ্গে সমঝোতা ও সহাবস্থান নীতি অনুসরণ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতি লোকার্নো চুক্তির পটভূমি প্রস্তুত করেছিল।

ইতিপূর্বে ১৯২২ সালে জার্মানি একটি প্রস্তাব পাঠিয়ে ছিল ফ্রান্সের পঁয়েকার মন্ত্রীসভার কাছে যাতে বলা হয়েছিল ব্রিটেন, বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং জার্মানি আগামী এক প্রজন্মের মতো সময়কালে পারস্পরিক যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু কট্টর পঁয়েকার মন্ত্রীসভা এই প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছিল। কিন্তু জেনেভা প্রটোকলের ব্যর্থতা ফ্রন্সের নিরাপত্তা সন্ধানের প্রয়াসকে অনেকখানি ব্যাহত করেছিল। লীগের অন্যতম সদস্য ব্রিটেনের অস্বীকৃতি এই জেনেভা প্রটোকলকে ব্যর্থ করে দেয়। ফ্রান্সও উপলব্ধি করেছিল লীগের মাধ্যমে নিরাপত্তার সন্ধান করা বৃথা হবে। গ্যাথর্ন হার্ডি বলেছেন "এটা স্পষ্ট যে যুদ্ধের পর পৃথিবীর শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক অবস্থার বিরুদ্ধে গ্যারান্টির আবশ্যকতা ছিল। লীগ ছোট ছোট বিবাদের মীমাংসা করলেও সংকট নিরসনের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হচ্ছিল।" জার্মানির আক্রমণের বিরুদ্ধে রাইনল্যাণ্ড অঞ্চলে গ্যারান্টির প্রয়োজনীয়তা ছিল ফ্রান্সের। এই গ্যারান্টি বা নিশ্চিন্ততা দিতে পারত ব্রিটেন কিন্তু ব্রিটেন জেনেভা প্রটোকল গ্রহণে অসম্মতি জানালে ফরাসী নিরাপত্তার বিষয়টি ব্যাহত হয়। জেনেভা প্রটোকল ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে জার্মানির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক নিরাপত্তার সহায়ক হতে পারে। তাই ফ্রান্স ১৯২২ সালের জার্মান প্রস্তাবটি অর্থাৎ রাইনল্যাণ্ড অঞ্চলকে আগ্রাসন মুক্ত রাখার প্রস্তাবটিতে পুনর্বার বিবেচনায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। যাদিও ১৯২৩ সালে এই প্রস্তাব জার্মান পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বার রাখা হয় কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি। তবে ১৯২৪ সালের শেষ ভাগে বার্লিনে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত জানালেন উক্ত জার্মান প্রস্তাবটির পুনর্নবীকরণ প্রয়োজন। ব্রিটেনেও এই সময়ে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে ব্রিটেনে ক্ষমতাসীন হয়েছিল শ্রমিক দল এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী অসিট চেম্বারলেন নিরাপত্তা বিষয়ক সমস্যার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জার্মানির পশ্চিম সীমান্তের রাইন অঞ্চল অতিক্রম করে জার্মানি যাতে ফরাসী নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করে সেই ব্যাপারে ব্রিটেন ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি বা গ্যারান্টি দেয়। ডেভিড টমসন বলেছেন যে ফ্রাঙ্কো-জার্মানি বা ফ্রান্সের কারে আক্রমণ যাতে না হয় সেই ব্যাপারে গ্যারান্টি ব্রিটেন দিতে প্রস্তুত হয় ("Britain was prepared to guaranteo to France-German frontier against aggression by either Germany or France")।

৬.৮.২ লোকার্নো চুক্তির শর্তাবলী

এই ভাবে লোকার্নো চুক্তির ভিত্তিভূমি রচিত হয়। ১৯২৫ সালের প্রথমভাগে ইউরোপের রাষ্ট্রনায়ক ও কূটনীতিকরা বিস্তারিত আলোচনার পর এক স্পষ্ট পরিকল্পনায় উপনীত হলেন। ফ্রাঙ্কো-জার্মান এবং বেলজিয়াম-জার্মান সীমান্ত আগ্রাসনের ব্যাপারে গ্যারান্টি লাভ করলো। জার্মানির যে সব অঞ্চলগুলির বে-সামরিকীকরণ করা হয়েছিল, যেখানে সৈন্য মোতায়েন ও দূর্গ নির্মাণ নিষিদ্ধ হয়েছিল সেখানেও গ্যারান্টি বা নিশ্চিন্ততা প্রদান করা হয়। এই ব্যাপারে অতিরিক্ত রাষ্ট্র হিসাবে ইতালিও গ্যারান্টি বা নিশ্চিন্ততা প্রদান করা হয়। আরো স্থির হয় লীগ অফ নেশনসে স্থায়ী সদস্য রূপে জার্মানি যোগ দেবে। তবে জার্মানির পূর্ব সীমান্ত সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয়নি।

৬.৮.৩ লোকার্নো চুক্তির সমস্যা

তবে এর ফলে কিছু অসুবিধা বা সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমত, ভার্সাই সন্ধি অনুযায়ী পশ্চিম সীমান্ত মানতে জার্মানি রাজী হলেও, পূর্ব সীমান্ত মানতে সে স্বীকৃত ছিল না। অর্থাৎ জার্মানির সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ড সীমান্ত নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সালিসি চুক্তির মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হয়।

জার্মানি-পোল্যাণ্ড, জার্মানি- চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে সালিসি চুক্তি এবং পোল্যান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের পৃথক প্রতিশ্রুতি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

দ্বিতীয়ত, ১৯২২ সালের ১৬ই এপ্রিল র‍্যাপালোতে (Rapallo) স্বাক্ষরিত হয়েছিল রুশ-জার্মান মৈত্রী চুক্তি যাতে রুশ-জার্মান বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি ছিল। লোকার্নো চুক্তির সময়কালে জার্মানির আশঙ্কা হয়েছিল পশ্চিমী জাতিসঙ্ঘ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে লীগের যোল নম্বর ধারা অনুযায়ী জার্মানির সহায়তা চাইতে পারে। যাতে তার (জার্মানীর) ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। তখন ইউরোপীয় শক্তিগুলি লীগ চুক্তিপত্রে যোল নম্বর ধারাটি ব্যাখ্যা করে বলেন যে লীগ সদস্য হিসাবে তাঁরা ওই ধারা সমর্থন করলেও যে কোন রাষ্ট্রে সহায়তা দান তার (রাষ্ট্রটির) সামরিক ক্ষমতা ও ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। তাই জার্মানিকে আশ্বস্ত করে বলা হয় যে তার স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কোন সহায়তা দান করতে হবে না। অর্থাৎ নিরস্ত্রীকৃত রাষ্ট্র হিসাবে জার্মামির কাছ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কোনরূপ সামরিক সহায়তা চাওয়া হবে না। এইরূপ ব্যাপক আলোচনার পর ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধিরা সুইজারল্যাণ্ডের লোকার্নো শহরে সমবেত হন এবং স্বাক্ষরিত হয় লোকার্নো চুক্তি (১৯২৫)।

৬.৮.৪ ত্রিস্তরীয় চুক্তি

লোকার্নো অধিবেশনে মোট তিন ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। (১) ফ্রাঙ্কো-জার্মান ও বেলজিয়াম-জার্মান সীমান্তের গ্যারাণ্টি চুক্তি। প্রধানত এটিই ছিল লোকার্নো চুক্তি। এই চুক্তি ব্রিটেন ও ইটালী কর্তৃক সমর্থিত হয়েছিল। (২) একাধারে জার্মানি ও অন্যদিকে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সালিশি চুক্তি। (৩) ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে পারস্পরিক গ্যারাণ্টি চুক্তি।

এই ত্রিস্তরীয় চুক্তি ১৯২৫ সালের ১লা ডিসেম্বর লণ্ডনে আনুষ্ঠানিক ভাবেস্বাক্ষরিত হয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে লোকার্নো চুক্তির প্রকৃতি ছিল পারস্পরিক অঙ্গীকারমূলক ও সালিসিমূলক।

৬.৮.৫ চুক্তির উদ্দেশ্য

লোকার্নো চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল সীমান্ত সমস্যার সমাধান ও বিজয়ী এবং বিজিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ভীতি দূর করে মৈত্রী বন্ধন দৃঢ় করা। যুদ্ধোত্তর ইউরোপের ইতিহাসে এ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল এই লোকার্নো চুক্তি। কারণ এই প্রথম জার্মানি ও ফ্রান্সের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণই ছিল এই চুক্তির উদ্দেশ্য।

৬.৮.৬ লোকার্নো চুক্তির অবদান

লোকার্নো সম্মেলনে জার্মানির প্রতি এই প্রথম মিত্রজনোচিত ও সমমর্যাদা সম্পন্ন মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছিল। সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের মধ্যেও একটি অভূতপূর্ব সৌহার্দ্যের মনোভাব লক্ষিত হয়। পরিবর্তিত এই মনোভাব 'Locarno Spirit' নামে অভিহিত হয়েছিল। যা ইউরোপে সাময়িকভাবে হলেও শান্তির পরিবেশ রচনা করেছিল। ঐতিহাসিক A.J.P.Taylor-এর মতানুসারে বলা যায় লোকার্নো চুক্তিফ্রান্স, জার্মানি উভয় রাষ্ট্রকেই সন্তুষ্ট করেছিল। তাই এই চুক্তি ছিল কার্যতঃই একটি ভালো চুক্তি। লোকার্নো চুক্তিসমূহ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থের সমন্বয় সাধন করে। ফরাসী নিরাপত্তার বিষয়টি বহুল পরিমাণে সমাধানের পথে অগ্রসর হয়। জার্মানি জাতিসঙ্ঘের সদস্য পদ লাভ করে তার পরের বছর (১৯২৬)। ডেভিড টমসন এই

সময়কালীন জার্মানির অবস্থা প্রসঙ্গে বলেছেন, “Germany was brought back into the magic circle of great powers, and seemed likely to take her place in international relations as a conciliatory and unaggressive power”.। প্রকৃতপক্ষে এক সৌহার্দ্যমূলক পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ ভাবে ফ্রান্স ও জার্মানি উভয়ের মধ্যেকার বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস ছিল লোকার্নো সম্মেলনের। শুধু ফ্রাঙ্কো-জার্মান সম্পর্কেই নয় সমগ্র ইউরোপেই এক শান্তির পরিমণ্ডল রচনা করে লোকার্নো চুক্তিগুলি, বলা হয়ে থাকে। বলা যেতে পারে অনুকুল পরিস্থিতিতে ১৯২৫ সালে সম্পাদিত চুক্তিগুলি নিঃসন্দেহে ইউরোপে শান্তি স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে লোকার্নো চুক্তি এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। এটি ছিল যুদ্ধ ও শান্তির যুগের মধ্যে প্রকৃত বিভাজন রেখা। সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে চুক্তির দ্বারা উত্তেজনা হ্রাস (Pacification by pact) করার ক্ষেত্রে লোকার্নো চুক্তির অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৬.৮.৭ লোকার্নো চুক্তির ত্রুটি

তবে লোকার্নো চুক্তিটি ত্রুটিহীন ছিল না। এই চুক্তি সমকালীন পরিস্থিতিতে ফ্রাঙ্কো-জার্মান সীমান্ত সম্পর্কে ফ্রান্সের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধানের ব্যবস্থা করলেও জার্মানির পূর্ব সীমান্তের রাষ্ট্রগুলি যেমন পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া তাদের জার্মানির সঙ্গে সীমান্ত সম্পর্কে কোন প্রকার নিরাপত্তার আশ্বাস পায় নি। ফলে এইসব রাষ্ট্রগুলি লোকার্নো চুক্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে। ফ্রান্সের পূর্ব ইউরোপের মিত্ররাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তার প্রশ্নটি তাই অমীমাংসিত রয়ে যায়।

এই চুক্তি আলোচনায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে আহ্বান জানানো হয়নি। রাশিয়ায় তাই এই চুক্তির সম্পর্কে বিরূপব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কারণ রুশ-জার্মান মিত্রতায় এইভাবে ফাটল সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। রাশিয়াকে ইউরোপের কূটনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানিকে র‍্যাপলো চুক্তির মৈত্রী বন্ধন থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তাই সোভিয়েত রাশিয়া এই চুক্তিকে সোভিয়েত বিরোধী বলে অভিহিত করেছিল।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রনায়করা তাঁদের কর্মপদ্ধতির মধ্যে দিয়ে এই ধারণার সৃষ্টি করেছিলেন যে ভার্সাই চুক্তির শর্তগুলি নৈতিকভাবে সমর্থনীয় নয় এবং এই শর্তগুলি পরবর্তীকালে অন্য কোন চুক্তি দ্বারা সমর্থিত না হলে তা ভঙ্গ করা যাবে। তাই এরপর থেকে ভার্সাই চুক্তি লঙ্ঘন করার এক তীব্র প্রবণতা দেখা যায়।

লোকার্নো চুক্তি জার্মানির পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তের মধ্যে এক অসঙ্গত পার্থক্য রেখা টেনেছিল। ব্রিটেন এবং ইতালি জার্মানির পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কে গ্যারান্টি দিলেও পূর্ব সীমান্ত ক্ষেত্রে কোন আশ্বাস দেয়নি। বস্তুতপক্ষে জার্মানির এই দুই সীমান্তের ব্যাপারে ব্রিটেনের এই পার্থক্য লীগ চুক্তি পত্রে বিধৃত যৌথ নিরাপত্তার উপর আঘাত হেনেছিল এবং তা ছিল ‘Locarno Spirit’-এর উপর বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। জার্মানির পশ্চিম সীমান্ত বিষয়ে ব্রিটেনের অনায়াস স্বীকৃতি এবং পূর্ব সীমন্তের ক্ষেত্রে অনিচ্ছা দুটি সীমান্তের মর্যাদার শ্রেণীবিভাগ করেছিল। নিরাপত্তার দৃষ্টিভঙ্গিতে পশ্চিম সীমান্ত প্রথম শ্রেণীর ও পূর্ব সীমান্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্য্যাদা লাভ করেছিল। এই সীমাবদ্ধতার সুযোগ নিয়ে নাৎসী জার্মানি পূর্ব দিকে সম্প্রসারণশীল নীতি অনুসরণ করে। তাই নাৎসী জার্মানির East Ward Policy বা Drang Nach Osten নীতি অনুসারে দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব ইউরোপ জার্মান বিস্তারনীতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। কারণ এখানে সম্প্রাসারণ নীতি ব্রিটেন কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হবে না এটা জার্মানি উপলব্ধি করেছিল। A.J.P.Taylor —এর মত অনুসরণ করে বলা যায় লোকার্নোর পর থেকে ব্রিটেনের জার্মান তোষণ নীতি শুরু হয়। এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে ব্রিটেন জার্মানিকে তোষণ (appease) করতে শুরু করে।

৬.৮.৮ লোকার্নো চুক্তির সমালোচনা

বস্তুতপক্ষে লোকার্নো চুক্তি আঞ্চলিক নিরাপত্তা সাধন করলেও স্থায়ী শান্তি আনতে পারেনি। নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে কোন সুরাহা হয়নি। তাই সমরাস্ত্র বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ পর্যন্ত অন্য এক বিশ্বযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার নিরাপত্তা সমস্যার সমাধানে চুক্তিগুলি গুরুত্বপূর্ণ হলেও নিরাপত্তাকে কিন্তু কার্যকর বা বাস্তবায়িত করতে পারেনি। যে সহযোগিতা, সমঝোতা দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে হ'ল তা ছিল ক্ষণস্থায়ী।

আবার এই চুক্তির দ্বারা ফ্রান্স একাকী পূর্ব ইউরোপের নিরাপত্তা ভারে জর্জরিত হয়ে পড়ে যদিও ব্রিটেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের চুক্তিপত্র অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের ঘোষণা করেছিল তবু ব্রিটেন যে পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির সীমান্ত রক্ষার জন্য সমর ব্যবস্থা গ্রহণে অনিচ্ছুক তা বোঝা গিয়েছিল। তাই ক্ষুদ্র আঁতাতভুক্ত হবার কারণে ফ্রান্সের উপর পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অতিরিক্ত দায় এসে পড়েছিল।

এই চুক্তির কিছু বাস্তব সমস্যা (realistic problem) দেখা গিয়েছিল, যেটা সেই সময়ে তেমনভাবে উপলব্ধি করা হয়নি। এখানে একটি অবাস্তব ব্যাপার ঘটেছিল যার পরস্পর বিরোধী প্রকৃতিকে একটি সাধারণ ক্ষেত্রে মেলাতে পারা যায়নি। সম্ভাব্য জার্মান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের মিলিত সামরিক সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি ছিল। একই সঙ্গে ফরাসী আক্রমণ প্রতিরোধের ইঙ্গ-জার্মান যৌথ সামরিক সহযোগিতার আশ্বাস ছিল। এই পরস্পরবিরোধী অবাস্তব ব্যাপারটি কারো সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। পরবর্তীকালে এই অবাস্তব ও স্ববিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী (absurdities) নিরাপত্তা সমস্যাকে জটিল করে তোলে।

৬.৮.৯ লোকার্নো চুক্তির তাৎপর্য

এই সময়ে যে আশা, সদিচ্ছা সর্বত্র বিরাজ করছিল তার পরিমণ্ডলে ভবিষ্যতে লোকার্নো চুক্তির এই তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়নি। এই ত্রুটিগুলি পরবর্তীকালে প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু সমকালীন ইউরোপে লোকার্নো চুক্তি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার এক নব দিগন্ত উণ্মুক্ত করেছিল "Locarno gave to Europe a period of peace and hope". বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে নতুন সম্পর্কের সূচনা যে মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল সেই পরিবেশে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, বলেছিলেন "এটি যুদ্ধের বৎসর এবং শান্তির বৎসরের মধ্যে প্রকৃত বিভাজন রেখা।" সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিরাও তাঁর উক্তিকে যথার্থ বলে মেনে নিয়েছিল। পরবর্তী কয়েক বছর ইউরোপীয় রাজনীতির ও ঘটনাবলীর গতিধারা লোকার্নো নির্ধারিত পথে প্রবাহিত হয়েছিল। স্বল্পকালের জন্য হলেও শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে লোকার্নোর চুক্তি সক্ষম হয়েছিল।

৬.৯ সারাংশ

ভার্সাই সন্ধিতে মিত্রশক্তি জার্মানির নিরস্ত্রীকরণ সম্পূর্ণ করেছিল এবং লীগ চুক্তিপত্রের আট নম্বর ধারা অনুযায়ী জাতিসঙ্ঘের সদস্যরা স্থির করেছিল তাঁরা শান্তি ও জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে নিজ রাষ্ট্রের সমরসজ্জা হ্রাস করবে। তাই জার্মানির সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে মিত্রপক্ষে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে অস্ত্র সীমিতকরণ বিষয়টি পরস্পরবিরোধী প্রকৃতি লাভ করেছিল। মিত্র রাষ্ট্রবর্গ জাতীয় নিরাপত্তাকে সর্বাগ্রে স্থান দেয় অথচ জার্মানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম অস্ত্ররক্ষা স্বীকৃত হ'ল না। এই পরস্পরবিরোধী নীতির সংঘাতই নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সৃষ্টি করে। আরো বিষদভাবে বলা যায় নিরস্ত্রীকরণ অধ্যায়টি এই পরস্পরবিরোধী নীতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল।

৬.১০ অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১. লীগ চুক্তিপত্রের কত নম্বর অনুচ্ছেদে নিরস্ত্রীকরণ বিধৃত রয়েছে?

২. অস্থায়ী মিশ্র কমিশন কবে গঠিত হয়?

৩. জেনেভা প্রটোকল কবে গৃহীত হয়?

৪. ওয়াশিংটন সম্মেলন কখন, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

৫. এর উদ্দেশ্য কি ছিল?

৬. প্রস্তুতি কমিশন কত সালে গঠিত হয়?

৭. জেনেভা প্রটোকলের ব্যর্থতার জন্য কোন রাষ্ট্র দায়ী ছিল?

৮. লোকার্নো সম্মেলন কোথায়, কখন অনুষ্ঠিত হয়?

৯. ক্ষুদ্র আঁতাত কী?

১০. লোকর্নো সম্মেলনে জার্মানির কোন সীমান্তটি গ্যারাণ্টি পায়নি?

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন

১. লয়েড জর্জের স্মারকলিপিটি কী ছিল?

২. জেনেভা প্রটোকলের উদ্দেশ্য, কার্যাবলী ও ব্যর্থতা বর্ণনা করুন।

৩. লোকার্নো সম্মেলনের বাস্তব সমস্যাটি আলোচনা করুন।

৪. এই সম্মেলনে পরস্পরবিরোধী সমস্যার উদ্ভব হ'ল কেন?

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন

১. ওয়াশিংটন সম্মেলন কেন আহুত হয়? এই সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।

২. প্রস্তুতি কমিশনের উদ্দেশ্য কী ছিল? এর সমস্যাগুলি বর্ণনা করুন।

৩. লোকার্নো চুক্তির পটভূমিকা কী ছিল?

৪. লোকার্নো চুক্তির একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখুন।

৫. নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণের মূলে কী ভাবনা কাজ করেছিল? এই জন্য লীগ বর্হিভূত কী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল?

৬. নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে লীগের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৬.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১. E.H.Carr—International Relations between the two World Wars. ঐ (বাংলা ভাষান্তর) ডঃ প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

২. David Thomson—Europe since Napoleon.

৩. A.J.P. Taylor— The Origins of the Second World War.

৪. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়— আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।

৫. অতুল রায়— আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।

৬. Garthorne Hardy— A short history of International Relations.

একক ৭ ❑ নাৎসি উত্থান এবং ফ্যাসিবাদের উত্থান

গঠন
৭.০ উদ্দেশ্য
৭.১ প্রস্তাবনা
৭.২ জার্মানি (১৯১৯-৩৩)
৭.২.১ জার্মান প্রজাতন্ত্র
৭.২.১ নাৎসি উত্থান
৭.৩ ইতালি (১৯১৯-২৫)
৭.৩.১ যুদ্ধোত্তর ইতালি ও সমাজবাদী শাসন
৭.৩.২ ফ্যাসিবাদের উত্থান
৭.৪ সারাংশ
৭.৫ অনুশীলনী

৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন :

- প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানির রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি।
- জার্মানিতে প্রজাতান্ত্রিক শাসনের সূত্রপাত ও তার সমস্যা, উনিশশো বিশের দশকের জার্মানির অর্থনৈতিক সংকট।
- যুদ্ধোত্তর সমাজব্যবস্থার নানা টানাপোড়েনে উগ্র জাতীয়তাবাদী আদর্শের বিস্তার।
- উগ্র জার্মান জাতীয়তাবাদের প্রতিভূ নাৎসি দলের উত্থান এবং অ্যাডলফ হিটলারর ভূমিকা।
- নির্বাচনের মাধ্যমে নাৎসিদের ক্ষমতা দখল এবং নাৎসি সংগঠনে হিটলারের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য স্থাপন।
- প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালির রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি।
- ইতালিতে সামজবাদী শাসনের সূত্রপাত ও তার সমস্যা
- ইত্যালতে ফ্যাসিবাদের উত্থান
- ফ্যাসিবাদী উত্থানে বেনিতো মুসোলিনির ভূমিকা এবং তার রোম অভিযান।
- ফ্যাসিবাদী আদর্শ।
- ফ্যাসিবাদীদের ক্ষমতা দখল এবং একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপনের প্রক্রিয়া।

৭.২ প্রস্তাবনা

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় ভূখণ্ডে একনায়কতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের উত্থান বর্তমান এককের আলোচ্য বিষয়। নাৎসি জার্মানি ও ফ্যাসিস্ত ইতালির যে অবয়ব এই শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে

দেখা গেল তার সূত্রপাত ঘটেছিল সমকালীন বিশিষ্ট রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে। প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) মধ্যবর্তী পর্যায়ে সংঘটিত ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থানের নেপথ্যের কারণ সমূহ এই পর্বে বুঝতে চাওয়া হবে। আলোচ্য এককে দেখান হবে যে কিভাবে ঘটনা পরম্পরার জটিল বিন্যাস ও সমকালীন বাস্তব রাজনীতির ক্রমবিকাশ জার্মানি ইতালিসহ সমগ্র ইউরোপের যুদ্ধের পথে পুনর্যাত্রাকে প্রায় অনিবার্য করে তুলেছিল।

৭.২ জার্মানি (১৯১৯-৩৩)

মহাযুদ্ধের পর ভাইমারে (Weimar) অনুষ্ঠিত সংবিধান সভা থেকে জন্ম নিল জার্মান প্রজাতন্ত্র। ১৯১৯ সালে এর সৃষ্টি, এবং ১৯৩৩ সলে নাৎসিরা ক্ষমতা দখলের পূর্ব পর্যন্ত ভাইমার প্রজাতন্ত্রই জার্মানির সমাজ ও রাষ্ট্রকে প্রধানত নিয়ন্ত্রণ করেছে। তবে মহাযুদ্ধের পরবর্তী চার বছরের বিপর্যস্ত সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক চাপের কারণে প্রজাতান্ত্রিক শাসন বারংবার বিপদগ্রস্ত হয়েছিল। অন্যদিকে, ১৯৩০-৩৩ এই কালপর্বে একনায়কতান্ত্রিক শাসনের বিপদ এর জীবনীশক্তিকে বহুলাংশে হরণ করেছিল।

৭.২.১ জার্মান প্রজাতন্ত্র

মহাযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের এক বিশেষ ধরনের ব্যাখ্যা তৎকালীন জার্মান জনমানসকে অনেককাংশে আচ্ছান্ন করে রেখেছিল। সে সময়ে এমন একটি ধারণা জার্মানিতে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল যে প্রকৃত অর্থে যুদ্ধে জার্মানির কোন প্রকার সামরিক পরাজয় ঘটেনি। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনে করা হত যে, উদারপন্থী ও সমাজবাদী নেতৃবর্গের বিশ্বাসঘাতকতা ও ‘পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত’ (Dolchstoss) এযাবৎ অপরাজেয় জার্মান বাহিনীর পরাজয় ঘটিয়েছে। এই ধরনের কল্পনাশ্রয়ী ধারণার প্রেক্ষিতে ভার্সাই সন্ধির শর্ত জার্মান সমাজে আরও বেশি অপমানজনক হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল। এরই প্রতিক্রিয়ায় ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে সমাজবাদ ও উদারপন্থার বিরোধী তথা সেনাবাহিনীর সর্বময় ক্ষমতার সমর্থক জাতীয় সমাজতন্ত্রী হিসাবে পরিচিত নাৎসি দল। জার্মানির অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং যুদ্ধে পরাজয়জনিত আর্থিক বিপর্যয় ছাপিয়ে একধরনের স্বৈরতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা কায়েম করার ও যেনতেন প্রকারেণ ভার্সাই ব্যবস্থার ধ্বংস-সাধনের আকাঙ্খা জার্মানিতে মুখ্য হয়ে ওঠে। এও ভাবা হয়েছিল যে যুদ্ধোত্তর ইউরোপে জার্মান অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করতে বিজয়ী শক্তিগুলো সদয় ও সক্রিয় হবে। এই ধরনের কল্পনা এক প্রকারের বাস্তববোধ-বিবর্জিত, রক্ষণশীল, প্রতিক্রিয়াধর্মী জাতীয় মানসিকতার সাক্ষ্য বহন করে।

বিশ শতকের তৃতীয় দসকে জার্মানি অতি দ্রুত অতীতের পরাজয়কে নাকচ করে অগ্রসর হতে চায়। সেনাবাহিনীর ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব, জার্মান আমলাতন্ত্র, বৃহৎ পুঁজির মালিক, বৃহৎ ভূম্যধিকারী শ্রেণীর স্বার্থের এক উল্লেখযোগ্য সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে প্রাক্তন চ্যান্সেলর কাপের ক্ষমতা দখলের প্রয়াস (Kapp Putech) এই লক্ষ্যপূরণে সচেষ্ট হলেও শেষাবধি সফল হয়নি। বাইরের পৃথিবীর কাছে এই অসাফল্য জার্মান গণতন্ত্রের শক্তির প্রমাণ বলে মনে হলেও জার্মানির অভ্যন্তরে এর মাধ্যমে প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়। এর অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে রাইখস্টাগে প্রজাতন্ত্রীদের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। বস্তুত তৎকালীন জার্মান প্রতিনিধিসভায় সাবেক দলগুলোই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামবদল করে অবতীর্ণ হয়েছিল। সাবেক প্রগ্রেসিভরা গণতন্ত্রী নাম নিয়ে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেও বিশেষ জনসমর্থম লাভ করেনি। সামাজিক গণতন্ত্রীরাও নতুন কিছু করে দেখাতে পারেনি। সর্বাধিক জনসমর্থন সত্ত্বেও কিছু ট্রেড ইউনিয়ন ভিত্তিক

আন্দোলন করা ছাড়া তাদের কিছু করার ছিল না। ক্যাথলিক সেন্টার পার্টি চিরাচরিত ভাবে ক্যাথলিক চার্চের জন্য সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। তারা সর্বদা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সাথে আপোষ করে চলতে গিয়ে প্রতিবাদের ভাষাই হারিয়ে ফেলেছিল। সাম্যবাদী দল রোজা লুক্সেমবার্গের মৃত্যুর পর নেতৃত্বহীনতায় 'জাতীয় ভাবাবেগ'কে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে, এবং কমিনটার্নের বাধ্যবাধ্যকায় চলতে গিয়ে কার্যত শ্রমিক শ্রেণি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। একমাত্র জোতদার শিল্পপতি রক্ষণশীলদের স্বার্থবাহী 'জাতীয়' দলই এই কালপর্বে জনসমর্থনের নিরিখে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখিয়েছিল।

১৯২০-র দশতের মধ্যেভাগে জার্মান অর্থনীতি এক বৈপরীত্যময় অবস্থানে পৌঁছেছিল। তীব্র মুদ্রাস্ফীত ছিল এ সময়ের লক্ষণ। একদিকে, জার্মানি যেমন ১৯২৪ সাল নাগাদ সব ধরনের ঋণমুক্ত হয়, পাশাপাশি ধনী অংশকে অক্ষত রেখে মধ্যবত্তি ও দরিদ্রতর শ্রেণীর ওপর চাপান করের বোঝা সমাজে আর্থিক বৈষম্যকে তীব্রতর করে। জার্মান ধনী শিল্পপতি শ্রেণী হয়ে ওঠে অর্থনীতির নিয়ন্তা আগামী দিনে এরাই হয়ে উঠবে নাৎসি দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এ. জে. পি. টেলরের মতে, মুদ্রস্ফীতিই এককভাবে প্রজাতন্ত্রের পতনের জন্য দায়ী। মিত্রশক্তির নীতির কারণে নয়, বরং ধনিক শ্রেণীর ওপর প্রত্যক্ষ কর চাপাতে না পারার ব্যর্থতাই প্রজাতন্ত্রের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। মুদ্রাস্ফীতির বিরোধিতা করাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল এসময়ের দেশপ্রেমের মাপকাঠি অন্যকে জার্মানিতে নাগরিক জীবনবিমুখী ও ইহুদীদের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন আদর্শের বিস্তার চলতে থাকে। জার্মান জাতির সর্বোৎকৃষ্টতার ধারণা উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং ইহুদী বিদ্বেষে জারিত এই মতাদর্শের (Volkisch folk) প্রভাবে জার্মানির নানা স্থানে সংগঠন তৈরি হয়। বাভেরিয়া ছিল এর প্রাণকেন্দ্র। আর্থিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতার প্রকোপ সর্বত্র লক্ষ করা যায়। এইরকম বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতিতে ১৯২৩ সালের অক্টোবরে সাম্যবাদীদের নেতৃত্বে স্যাক্সনি, থুরিঞ্জিইয়ার অভ্যুত্থান অবশ্য সফল হতে পারেনি।

১৯২৩-২৯ কালপর্বটিকে জার্মান প্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে সফলকাম অধ্যায় বলা যেতে পারে। যুদ্ধনীতি পরিত্যাগ করা হয়েছিল, তবে তার মধ্যেও সামরিক খাতে জার্মানির ব্যয় ব্রিটেনের তুলনায় বেশি ছিল। ১৯২৯ সাল নাগাদ জার্মান জীবনযাত্রার মান ছিল পূর্বের তুলনায় উন্নততর। কয়লা ও লোহা উৎপাদন প্রাক্ মহাযুদ্ধ সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি হয়েছিল। সাহিত্যিক টমাস মান, বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বা ঐতিহাসিক ফ্রিডরিশ মাইনকে প্রমুখের সৃষ্টিধর্মিতা এযুগেই দেখা গিয়েছিল।

তবে শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধ জীবনযাত্রার এই কাঠামোর মধ্যেই নিহিত ছিল অনাগত ধ্বংসের বীজ। জার্মান অর্থনীতি ছিল অতিরিক্তভাবে ভারী শিল্পনির্ভর। পূর্বের কার্টেলগুলোর (Kartel) স্থান নিয়েছিল বৃহত্তর একচেটিয়ী উদ্যোগ। অতিমাত্রায় সামরিকীকরণের ঝোঁক বিকল্প অর্থনীতির বিকাশের সম্ভাবনাকে নষ্ট করেদেয়। এই পর্বে জার্মান রাষ্ট্রবিদ গুস্তাভ স্ট্রেসিমান ছিলেন প্রজাতান্ত্রিক সরকারের মধ্যমণি। তাঁর নীতি 'Policy of fulfilment' নামে পরিচিত। এর দ্বারা জার্মানি অন্তত কয়েক বছরের জন্য যুদ্ধের হাত রেহাই পেয়েছিল। মুদ্রা স্থিতিশীল হল এবং রাজস্ব ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য এল। রাইনল্যান্ড অঞ্চলে ফরাসী অধিকারের বিরুদ্ধে 'পরোক্ষ প্রতিরোধ' রদ করে তিনি জার্মান অর্থনীতিকে তখনকারমত কিছুটা রক্ষা করলেন। স্বল্পকাল চ্যান্সেলর হিসাবে এবং বিদেশমন্ত্রী হিসাবে দীর্ঘকাল স্ট্রেসিমান উদারপন্থী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনীতির প্রবক্তা ছিলেন। পুঁজিবাদ ও উদারবাদের প্রতি তার অনুরাগ তাকে যথাক্রমে শ্রমিক শ্রেণীর ও মধ্যবর্গের আস্থা অর্জনে বাধা দিয়েছিল। বিদেশনীতিতে স্ট্রেসিমানের ভূমিকা সাময়িকভাবে প্রজাতন্ত্রের সাফল্য বলে বিবেচিত হলেও কালক্রমে সেই বিদেশনীতিই কার্যত

প্রজাতন্ত্রের পতন ও ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থানের পথ প্রশস্ত করেছিল। ১৯২৯ সালে স্ট্রেসিমানের মৃত্যুর পর থেকে জার্মানি প্রজাতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে অবসানের পথে এগিয়ে চলে।

১৯৩০ সালের মার্চ মাসে চ্যান্সেলর হিসাবে ব্রুনিংয়ের মনোনয়নকে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের অবসান ধরা যেতে পারে। সামরিক নেতৃত্ব, বিশেষত জেনারেল কুর্ট ফন শ্লাইখারের কৌশলে জার্মানিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান ঘটে। সমসাময়িককালের বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা (১৯২৯-'৩৩) প্রজাতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিয়েছিল। সেনাবাহিনী এরপর থেকে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। এরই রেশ ধরে পরবর্তী অল্প কয়েক বছরের মধ্যে প্রথমে সাময়িকভাবে ও পরে পূর্ণাঙ্গ অর্থে একনায়কতন্ত্র কায়েম হল।

৭.২.২ নাৎসি উত্থান

জার্মানিতে নাসিদের উত্থানের ঘটনা চমকপ্রদ। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয় জার্মান জনসাধারণকে বেদনাহত করেছিল। পূর্ববর্তী চার বছর ধরে লালিত স্বপ্ন চুরমার হয়ে গিয়েছিল। জার্মান সমাজের হতাশা ও দুর্দশার দিনে এক ধরনের পশ্চাৎমুখী সুখাশ্রয়ী অতীতকল্পনা-বিভোর গণমানসিকতা জার্মানির সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। জার্মানির 'হৃতগৌরব' পুনরূদ্ধারের আবেগকে সম্বল করে যে সমস্ত সংগঠনের বাড়বৃদ্ধি ঘটে তার অন্যতম ছিল আন্তন ড্রেক্সলার পরিচালিত জার্মান শ্রমিক দল (DAP)। এই দলের সদস্য হিসাবে অ্যাডলফ হিটলার দক্ষিণের বাভেরিয়া অঞ্চলে প্রভাব বৃদ্ধি করতে থাকেন। ইতিপূর্বে মিউনিখ ও ভিয়েনার থাকার সময় হিটলার যে ধরনের আদর্শের সাথে পরিচিত হচ্ছিলেন তা পূর্ণতা পেল DAP দলে এসে। ড্রেক্সলার ও হিটলারের সম্মিলিত প্রয়াসে ২৫ দফা কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে DAP নব কলেবর ধারণ করল জাতীয় সমাজবাদী জার্মান শ্রমিক দল (NSDAP) বা নাৎসি (Nazi) দল হিসাবে। শীঘ্রই মিউনিখ শহরকে কেন্দ্র করে হিটলারের নেতৃত্বে আবর্তিত হতে লাগল সমগ্র আন্দোলনটি। অন্যান্য সংগঠন কার্যত NSDAP-র উপগ্রহে পরিণত হল।

নাৎসিদের ক্ষমতারোহনের ভিত্তি ছিল বাভেরিয়া প্রদেশ তথা দক্ষিণ জার্মানি। ১৯২৩ সালে ক্ষমতা দখলের প্রবল প্রয়াস চালায় NSDAP। তদানীন্তন জার্মান প্রজাতান্ত্রিক সরকারের কার্যক্রম ও জার্মানির রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে নাৎসি দল ধারণা করে যে অদূর ভবিষ্যতে জার্মানিতেও সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটে যেতে পারে। ক্রমাগত হিটলার ও তার সহযোগী দক্ষিণপন্থী দলগুলির চাপে প্রথমে বাভেরিয়ায় ও পরে সমগ্র জার্মানিতে জরুরি অবস্থা জারী করা হয়। হিটলার ও সমধর্মীদের জোট কাম্ফবুন্ডের (Kampfbund) উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে হিটলার ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসে বাভেরিয়ার সামরিক ও অসামরিক কর্তৃকক্ষকে 'জাতীয় বিপ্লবে' অংশগ্রহম করতে বাধ্য করেন। শুরু হয় তথাকথিত 'মিউনিখ পুশ' (Munich Putsch)। তবে সেনাবাহিনীর সমর্থনের অভাবে তা ব্যর্থ হতে দেরী লাগেনি। হিটলার গ্রেফতার হন। সাময়িকভাবে তাঁর ক্ষমতাদখলের প্রয়াসের অবসান ঘটে। হিটলার বন্দী থাকাকালীন গুস্তাভ স্ট্রেসারের নেতৃত্বে পার্টি পরিচালিত হয় এবং ১৯২৪ সালের নির্বাচনে অন্যান্য জাতীয়তাবাদী সংগঠনের সাথে সমঝোতা করা হয়। কৃষক ও কারিগরদের মধ্যে দলীয় জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করতে স্ট্রেসারে ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়ে হিটলার দেশ জুড়ে NSDAP-র ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হন। একটানা প্রজাতান্ত্রিক সরকার, সাম্যবাদ ও ইহুদী জাতির বিরুদ্ধে তিনি বিদ্বেষমূলক প্রচার শুরু করেন Volkischer Beobachter পত্রিকায়। পরবর্তী দু'বছরের মধ্যে উত্তর জার্মানিতেও তার প্রভাব বৃদ্ধি পেল। বামবার্গ সম্মেলনে

(১৯২৬) হিটলার আহ্বান রাখলেন গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার। এই সম্মেলনে দলীয় সংগঠনে নিজের কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ করতে হিটলার স্ট্রেসার ভ্রাতৃদ্বয়ের সমর্থক উত্তর জার্মান শ্রমিক সংগঠনের আনীত প্রস্তাব বাতিল করে স্ট্রেসার ভ্রাতৃদ্বয়কে নিষ্ক্রিয় করে দিলেন। নাৎসি দলের এই মূল উদ্দেশ্যটিকে দেশজুড়ে প্রচার করা শুরু হল। কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে প্রভাব বৃদ্ধির প্রয়াস নেওয়া হল। প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করলেন পল জোসেফ গোয়েবলস। নাৎসি দল হয়ে উঠল নির্বাচিত সরকারের সমান্তরাল প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা। আর্নস্ট রমের নেতৃত্বে গড়ে উঠল দলীয় বাহিনী স্টুর্ম আবটেইলুঙ্গ (Sturm Abteilung) বা SA। হিটলারের দেহরক্ষী বাহিনী হিসাবে গড়ে ওঠা হাইনরিখ হিমলারের নেতৃত্বাধীন শুৎস্‌স্টাফেল (Schutzstaffel) বা SS কালক্রমে SA-র থেকেও প্রভাবশালী হয়ে উঠল। ১৯২০-র দশকের শেষে এসে নাৎসি দল প্রকৃত অর্থেই ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করল। দলীয় সদস্য সংখ্যা ২৭,০০০ (১৯২৫) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হল ১,৭৮,০০০ (১৯২৯)। জার্মানির ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পেতে লাগল নাৎসি বাহিনী। মার্কিনী ইয়ং পরিকল্পনার (Young Plan) বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে নাৎসিরা সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বেকার শ্রমিক, কৃষি মজুর ও ছোট কৃষক, শিল্পপতি প্রমুখ বিশেষ বিশেষ আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীর কাছে নাৎসিদের আবেদন তৈরি হল সর্বাধিক। এর ফল লক্ষ করা গেল ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের নির্বাচনে। রাইখস্টাগে নাৎসিদের আসন সংখ্যা ১২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হল ১০৭। ১৯৩৩ সালে এই আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৮৮। ১৯৩০ সালের নির্বাচনে সাম্যবাদীদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল, আসন সংখ্যার নিরিখে তা ৫৪ থেকে বেড়ে দাঁড়াল ৭৭। তবে ৬৫ লক্ষ ভোটাদাতাদের সমর্থন নিয়ে নাৎসিরা সোসাল ডেমোক্রাটদের পরেই রাইখস্টাগের দ্বিতীয় বৃহত্তম দলে পরিণত হল।

নাৎসিদের উত্থানের পথ ছিল দ্বিবিধ। আইনী পথে রাইখস্টাগে ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়াসের পাশাপাশি দেশজোড়া সন্ত্রাস ও হিংসার মাধ্যমে বেআইনী পথে ক্ষমতারোহন চলছিল। ১৯৩২ সালের গোড়ার দিকে একাধিক জার্মান প্রাদেশিক সরকার নাৎসি Brownshirts বাহিনীর কার্যকলাপে আশঙ্কিত হয়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কাছে আবেদন রাখে। এর মধ্যেই ১৯৩২ সালের বসন্তে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হিণ্ডেনবুর্গের (৫৩ শতাংশ ভোট) পিছনে দ্বিতীয় স্থান পেয়েই খুশি থাকতে হল হিটলারকে (৩৬.৮ শতাংশ)। সাম্যবাদীদের ক্রমহ্রাসমান জনপ্রিয়তার প্রমাণ রইল কমিউনিস্ট প্রার্থী থেলমান কর্তৃক প্রাপ্ত ১০.২ শতাংশ ভোটের মধ্য দিয়ে। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতার নজির রাখল নাৎসিরা। নির্বাচনের প্রাক্কালে SA বাহিনী সমগ্র বার্লিন শহরকে ঘিরে রইল। তাৎপর্যপূর্ণ হল, সেনাবাহিনীও এতদিনে নাৎসি মতাদর্শের শরিক হয়ে পড়তে শুরু করেছিল। ছোট ও মাঝারি অফিসারবর্গের মধ্যে তো বটেই, সেনা বাহিনীর বড় অফিসাররাও নাৎসি আদর্শ বিশেষত তার যুদ্ধোন্মাদনার দিকটির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল। সেনানায়ক এবং রাজনৈতিক পালাবদলের অন্যতম কুশীলব ফন শ্লেইকার নাৎসি-বিরোধিতা ত্যাগ করে নাৎসি সমর্থক হয়ে উঠছিলেন। একারণে, যথেষ্ট কারণসহ SA কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও সেই নিষেধাজ্ঞা তোলার উদ্যোগ শক্তিশালী হচ্ছিল। এসময়ে ফন শ্লেইখার, চ্যান্সেলর ফ্রানৎস্‌ ফন পাপের এবং হিটলার জার্মান রাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করছিলেন। হিটলারের মদতে ফন পাপেন জার্মান সমাজতন্ত্রী মতাদর্শের কেন্দ্রবিন্দু প্রাশিয়ার সোসাল ডেমোক্রাট সরকারের ওপর আঘাত হানেন। প্রশাসনিক স্তরে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ব্যবস্থার ওপর সরাসরি স্বৈরতন্ত্রী আঘাত এসে পড়ে। সমর্থকদের ওপর হিটলারের নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং তারই জেরে প্রশাসনিক যে কোন রদবদলে হিটলারের নির্দেশই ছিল চূড়ান্ত। তারই ইচ্ছায় একসময়ের দলীয় নেতা গুস্তাভ স্ট্রেসার ভাইস চ্যান্সেলর হতে পারেন নি, এমনকি স্ট্রেসারকে দল থেকে পদত্যাগ করতে হয়।

এসময়ে জার্মানি বিভিন্ন স্থানে নাৎসি বাহিনীর সাথে নাৎসি বিরোধী শক্তির মুখোমুখি সংঘর্ষ মুখ্য ঘটনা হয়ে ওঠে। ১৯৩২ সালের ১৭ জুলাই এমনই একটি ঘটনা ঘটে উত্তর জার্মানিতে, হামবুর্গ শহরের নিকটে আল্টোনা অঞ্চলে। রাজপথের রণক্ষেত্রে কমিউনিস্ট ও নাৎসিদের তীব্র লড়াই চলে। ঘটনাটির তাৎপর্য ছিল যথেষ্ট। চ্যান্সেলর ফন পাপেন এর পরেই রাষ্ট্রপতিকে রাজী করিয়ে প্রাশিয়ার জাতীয় কমিশনার নিযুক্ত হন এবং তার সুযোগ নিয়ে ২০ জুলাই প্রাশিয়ার সরকারকে ভেঙে দেন। দুর্বল শ্রমিক শ্রেণি এজাতীয় অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি, যেমনটি তারা করেছিল ১৯২০ সালে তথাকথিত 'কাপ পুশ'-এর সময়।

আইনী ও বেআইনী পথে যে নাৎসিরা সংগঠিত হচ্ছিল ও নিজেদের অনুকূলে জনমত টেনে আনতে সক্ষম হচ্ছিল তার প্রমাণ মিলল ১৯৩২ সালের জুলাইয়ের নির্বাচনে। ২৩২টি আসন নিয়ে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, কমিউনিষ্টদের সংগ্রহে মাত্র ১২টি আসন। পাপেনের পদচ্যুতি অনিবার্য হয়ে গেল, তার স্থলাভিষিক্ত হলেন ফন শ্লেইখার। এই সময়ের পরের কয়েকমাসের ঘটনাক্রম থেকে শ্লেইখার আশা করেছিলেন যে নাৎসিরা ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে, কারণ নভেম্বরের নির্বাচনে নাৎসিদের সংগ্রহে ছিল ১৯৬টি আসন এবং জুলাইয়ের তুলনায় ২০ লক্ষ ভোট কম পেয়েছিল তারা। তবু নাৎসি দল ভেঙে যায়নি কিছুটা হিটলারের ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে এবং কিছুটা নাৎসিবিরোধী সমাজবাদী ও সাম্যবাদীদের জোট না বাঁধতে পারার দরুন। যৌথ প্রয়াসে হয়ত তারা নাৎসি উত্থানকে প্রতিহত করতে পারতেন। তা ঘটল না, বরং রাইখস্টাগে নাৎসিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জেরে ফন শ্লেইখারকেও চ্যান্সেলর পদ থেকে সরে যেতে হল।

জার্মানির রাষ্ট্রজীবনের এই অনিশ্চয়তার কালে জার্মান পুঁজিপতিদের সমর্থনে ও সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষ অবস্থানের সুযোগে রাষ্ট্রপতি হিন্ডেনবুর্গ কর্তৃক ১৯৩৩ সালের ৩০ জনুয়ারি হিটলার চ্যান্সেলর নিযুক্ত হলেন। এর পর দ্রুত দল ও সরকারের হিটলার ও সহযোগীদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হল। কমিউনিস্ট ও অন্যান্য রাষ্ট্রদ্রোহীদের দমনপীড়ন চলল 'সমন্বয়ে'র (Gleichschaltung) নামে। নানাবিধ আইন করে স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হল। শ্রমিক সংগঠনগুলিকে নির্মূল করা হল। নাৎসি গেস্টাপো গুপ্ত পুলিশ বাহিনী, SS, SD (সুরক্ষা বাহিনী) রাষ্ট্ররক্ষার নামে হাজার হাজার নাগরিককে ধরপাকড়, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে প্রেরণ ও হত্যার মাধ্যমে বিরোধিতার শেষ চিহ্নটুকু মুছে দিতে চাইল। সমস্ত 'অনার্য' 'অবিশুদ্ধ' ব্যক্তিদের প্রশাসনিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হল। জনৈক এলন্দাজ কমিউনিস্ট মারিনাস ফান ডের লুব কর্তৃক রাইখস্টাগে অগ্নিসংযোগের বিতর্কিত ঘটনার (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩) সুযোগে সারা দেশে যে জরুরি অবস্থা জারী করা হল তা চলল তৃতীয় রাইখের অন্তিম দিন পর্যন্ত।

সেনাবাহিনীর আস্থা অর্জন এবং দলীয় সংগঠনে হিটলারের ক্ষমতা অপ্রতিহত করা প্রক্রিয়া থেকে বাদ গেল না SA বাহিনীও। গেস্টাপো ও SS বাহিনীর সহয়তায় SA নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করা হল 'দীর্ঘ ছুরিকার রাত্রি' (৩০ জুন-১ জুলাই, ১৯৩৪) নামে পরিচিত রাত্রিতে।

হিটলারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্জনের পথে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল ১৯৩৪ সালে। রাষ্ট্রপতি হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যুর পর ২ আগষ্ট হিটলার রাষ্ট্রপতি হলেন। একাধারে তিনি এখন ফুয়েরার ও রাইখ চ্যান্সেলর। এই ক্ষমতার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে হিটলার সেনাবাহিনীর পূর্ণ আনুগত্য লাভ করলেন। সেনাবাহিনীর আনুগত্য লাভের প্রশ্নটি জরুরি ছিল, কেননা আগ্রাসী বিদেশ নীতিকে বাস্তবায়িত করতে সামরিক আগ্রাসন অপরিহার্য ছিল। সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হলেন হিটলার। গঠিত হল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ কম্যান্ড (OKW)। OKW-র নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি হিটলারের হাতে রইল। সেনাবাহিনীতে হিটলারের ক্রিয়াকলাপে অসন্তুষ্ট সামরিক অফিসারদের

পদাবনতি ঘটান হল। রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর হওয়ার পাশাপাশি সেনাবাহিনীতেও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে হিটলার তার ইউরোপ জয়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে আরও কয়েক কদম অগ্রসর হলেন। সুযোগসন্ধানী অথচ সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই আকাঙ্ক্ষাপূরণের প্রয়াস জারি রইল।

৭.৩ ইতালি (১৯১৯-২৫)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালির পরিণতি জার্মানির মত হয়নি। ইতালি ছিল বিজয়ীর দলে। কিন্তু এর মাধ্যমে ইতালির দীর্ঘমেয়াদী সমস্যাগুলির সমাধান হয়নি। মূলত দুটি কারণে ইতালি যুদ্ধে যোগদান করেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল, ক্রমভঙ্গুর অস্ট্রোহাঙ্গোরি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ইতালীয় ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি হস্তগত করা এবং দেশের অভ্যন্তরে রক্ষণশীল রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সংহত করে একটি কর্তৃত্বকামী এককেন্দ্রিক শাসনকে শক্তিশালী করা।

যুদ্ধের অবসানে দেখা গেল যে, বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও ইতালির সমস্যা তীব্রতর হয়েছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটেরক্ষণে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে সমাজবাদীরা নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। তবে তাতে অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটেনি। অন্যদিকে, ইতালীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এই অভিযোগে ইতালির প্রধানমন্ত্রী অরলান্দো ও বিদেশমন্ত্রী সনিনো প্যারিস শান্তি সম্মেলন (১৯১৯) ত্যাগ করেন। ক্রমশ প্রথম মহাযুদ্ধে ইতালির বিজয় অসম্পূর্ণ, এমন একটি ধারণা বিস্তার লাভ করে। যুদ্ধ পরবর্তী ঘটনার গতিপ্রকৃতি আশানুরূপ না হওয়ায় এক গভীর হতাশা ও তিক্ততা জনমানসে প্রভাব বিস্তার করে। যুদ্ধে জয়ী হয়েও ইতালি পরাজিত দেশগুলির ন্যায় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটে আচ্ছন্ন হয়। এই পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে বিভিন্ন ধারার—এমনকি পরস্পরবিরোধী—রাজনৈতিক দলগুলির চিন্তায় ও কর্মে কিছুটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। জাতীয়তাবাদী, সমাজবাদী ও নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনগুলি হয়ে ওঠে পরস্পরের পরিপূরক। ক্রমশ, ইতালিতে দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। জার্মানির মত এখানেও বামপন্থী আন্দোলন দানা না বেঁধে ওঠায় দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদ ক্রমশ সংহত হয়। ১৯২০ সালের এপ্রিলে তুরিন শহরের ধাতুশিল্পের শ্রমিকদের ধর্মঘট ব্যর্থ হওয়ার পর থেকে বামপন্থী আন্দোলন দুর্বলতর ও আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ তীব্রতর হতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে বেনিতো মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদী দল ক্ষমতা দখল করে।

৭.৩.১ যুদ্ধোত্তর ইতালি ও সমাজবাদী শাসন

যুদ্ধোত্তর ইতালিতে তিনটি রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক মঞ্চে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করল। ১৯১৯ সালে ইতালির আইনসভার সর্ববৃহৎ তিনটি দল ছিল সমাজবাদী, পোপোলারি বা ক্যাথলিক পপুলার দল এবং উদারপন্থী। প্রধানমন্ত্রী হলেন জিওভানি জিওলিত্তি। সমাজবাদীরা বিচ্ছিন্ন ছিল এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় রাখছিল। পোপোলারি'র অভ্যন্তরীণ একতা ছিল না এবং একমাত্র ধর্মীয় প্রশ্নে তারা যাজক-বিরোধী মতবাদ ও আন্দোলনের (anticlericalism) বিরোধিতা করতে কিছুটা ঐক্যবদ্ধ হত। সমাজবাদী ও উদারপন্থী উভয়কেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে চলত পোপোলারি। অন্যদিকে, উদারপন্থীরা অর্থনৈতিক প্রশ্নে সরকারের বিরোধিতা করত। উদ্দেশ্য ও লক্ষের ক্ষেত্রে তারতম্য থাকলেও একটি ক্ষেত্রে এদের প্রকৃতি ছিল অভিন্ন। অনৈক্য ও দায়িত্বপালনে অক্ষমতা যুদ্ধোত্তর ইতালিতে এই দলগুলির কোনটিকেই শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে পারেনি। কোন প্রকার সংহত, দীর্ঘস্থায়ী ও সদর্থক কর্মসূচীর অভাব জনগণের কাছে এদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে।

ইতালি তৎকালীন আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, যুদ্ধে যোগদানের ফলে ইতালির আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার জন্য ইতালির ব্যয় হয়েছিল ১৮৬১ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত সরকারি ব্যয়ের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ। মিত্রপক্ষের আর্থিক সহায়তা যুদ্ধের অব্যবহিত পরে বন্ধ হয়ে গেলে প্রায় ৫০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি ঘটে ও বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রায় পাঁচগুণ। বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানির তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ ছিল অনেক কম। যুদ্ধ চলাকালীন কৃষকদের ভূমিসংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। শিল্প শ্রমিকদের সুবিধার্থেও একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধের পর প্রতিশ্রুতি পালনে সরকারি ব্যর্থতা শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক ধর্মঘট ও গ্রামাঞ্চলে কৃষক অভ্যুত্থানের জন্ম দিল। আর্থিক বিপর্যয়ের ধাক্কায় কারখানা লক-আউট হয়ে উঠল শ্রমিক জীবনের অঙ্গ। গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের বড় বড় জোত দখলের মধ্যে সম্পত্তিবান শ্রেণী বলশেভিক মতবাদের ছায়া দেখতে পেল। অন্যদিকে, যুদ্ধের পরে কর্মহীন হয়ে পড়া সেনাবাহিনী লুঠতরাজে অংশগ্রহণ করতে শুরু করল। এই পরিস্থিতিতে ধনী ভূম্যধিকারী ও শিল্পপতিরা তাদের শ্রেণীস্বার্থের রক্ষক কোন শক্তির আগমনের অপেক্ষায় রইল।

৭.৩.২ ফ্যাসিবাদের উত্থান

ফ্যাসিবাদ কথাটির উৎপত্তি প্রাচীন লাতিন শব্দ fascis থেকে, যার অর্থ শাসকের দণ্ডগুচ্ছ। কর্তৃত্বের এই প্রতীকটিকে ১৯২০-র দশকে ইতালিতে দক্ষিপন্থীরা আত্মপরিচিতি গঠনে কাজে লাগিয়েছিল। ইতালিতে ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থানের নেপথ্যে ছিল তদানীন্তন ইতালির রাজনৈতিক অস্থিরতা। প্রথম মহাযুদ্ধে ইতালির যোগদানের বিষয়ে রাজনৈতিক মহল দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। যুদ্ধের পরের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাতাবরণ অনিশ্চয়তাপূর্ণ ছিল। এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিল দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদ। প্রথম মহাযুদ্ধে ইতালির যোগদানের সমর্থক (Pro-interventionist) জাতীয়দাবাদীরা আশা করেছিল যুদ্ধোত্তর পর্বেও ইতালির আগ্রাসী ভূমিকা বজায় থাকবে। বিশেষত, আড্রিয়াটিক তীরবর্তী জালমাশিয়া তথা ফিউম অঞ্চলে ইতালির প্রাধান্য বজায় থাকবে। ভূমধ্যসাগরীয় ও বলকান অঞ্চলে ইতালির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সদাতৎপর ছিল জাতীয়তাবাদীরা। এজন্য আড্রিয়াটিক সাগরের তটবরাবর যুগোশ্লাভিয়া গঠনকে তারা ইতালির সম্প্রসারণের প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখতে শুরু করল। ক্রমশ এই মতবাদকে তারা সফলভাবে ইতালির জনতার সম্মুখে উপস্থাপিত করে তুলতে পেরেছিল। সমাজবাদী, পোপোলারি ও উদারবাদীরা আগেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল। বিকল্প হিসাবে উঠে আসে জাতীয়তাবাদীরা, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন জনৈক প্রাক্তন সমাজবাদী বেনিতো মুসোলিনি। ১৯১৯ সালের ২৩শে মার্চ মিলান শহরে, যা একদা শ্রমিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল, গঠিত হয় ফ্যাসিবাদি দল। সেনাবাহিনীর এলিট গোষ্ঠী আরদিতি (arditi) প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলি ছিল মুসোলিনির সহযোগী, সমর্থক। মহাযুদ্ধোত্তর বাঁটোয়ারার অঙ্গ হিসাবে অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের ভাঙনেই এরা খুশী ছিল না। আড্রিয়াটিকের অপর পাড়ে যুগোশ্লাভিয়া ও আলবানিয়াতে ইতালীয় উপনিবেশ গড়ে তোলা ছিল জাতীয়তাবাদীদের লক্ষ্য। এজন্য ১২ নভেম্বর ১৯২০ সালে স্বাক্ষরিত রাপালো চুক্তিতে ঐ অঞ্চলগুলি থেকে ইতালির পশ্চাদপসরণকে জাতীয়তাবাদীরা সমাজবাদী সরকারের কাপুরুষতা বলে মনে করেছিল।

প্রথমাবধি ফ্যাসিবাদীরা ছিল সমাজবাদের প্রতিপক্ষ। এজন্য খুব দ্রুত এরা সম্পত্তিবান শ্রেণীর আস্থাভাজন হয়ে ওঠে। ফ্যাসিবাহিনী স্কোয়াদ্রে ((Squadristi/squadre) কার্যত ধনিক শ্রেণীর রক্ষাকর্তা হয়ে ওঠে। ধর্মঘটী শ্রমিক ও বিদ্রোহী কৃষককে দমনের ভূমিকায় এদের অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। অন্যদিকে, আপন ক্ষমতা অর্জনের জন্য মুসোলিনির প্রয়োজন ছিল সম্পত্তিবান শ্রেণীর আর্থিক সহায়তা। এই অভীষ্ট পূরণে প্রয়োজনমত

মতাদর্শ বদল করে চলা ছিল মুসোলিনির কর্মপন্থার বৈশিষ্ট্য। ক্যাথলিক চার্চও মুসোলিনি ও ফ্যাসিবাহিনীর মধ্যে সমাজবাদকে প্রতিহত করার যোগ্যতম প্রতিভূকে খঁুজে পেয়েছিল। এই কারণে ক্যাথলিক চার্চ পোপোলারি'র বদলে পুরোপুরিভাবে ফ্যাসিবাদের সমর্থক হয়ে ওঠে। ইতিহাসের পরিহাস হল, যে মুসোলিনি একদা ঘোষিতভাবে রাজতন্ত্র, চার্চ ও পুঁজির বিরোধী ছিলেন তিনিই ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠলেন এগুলির সবচেয়ে বড় সমর্থক ও আশা-ভরসার কেন্দ্র।

ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উত্থানের পথ হয়ত সহজ হত না, যদি না তদানীন্তন উদারপন্থী শিবির দুর্বল হয়ে পড়ত। প্রধানমন্ত্রী জিওভানি জিওলিত্তি'র উদারপন্থী সরকার ১৯২০-২১ সালের শ্রমিক অসন্তোষ ও কৃষক বিক্ষোভকে প্রশমিত করতে পারে নি। বরং দেশের শান্তি শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের দাবী তুলেই এই সুযোগে মুসোলিনি জনমানসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯২১ সালের নভেম্বরে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় ফ্যাসিস্ত 'কালো কুর্তা' দলের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় তিন লক্ষ। অন্যদিকে, ইতালিতে ফ্যাসি-বিরোধীদের সংখ্যাও কম ছিল না। ফ্যাসিবাহিনীর সশস্ত্র হামলা এবং জনগণকে সন্ত্রস্ত করে রাখা সত্ত্বেও ১৯২১ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী জিওলিও ফাসিবাদীদের দেশের উন্নয়নে যুক্ত করতে চেয়ে কার্যত তাদেরই হাত শক্ত করেন এবং ভবিষ্যতে উত্থানের পথ প্রশস্ত করেন। এই নির্বাচনে মুসোলিনি সহ ৩৫ জন ফ্যাসিবাদী সরকার-সমর্থিত প্রার্থী হিসাবে বিজয়ী হন। এই ঘটনা ঘটছিল তখন, যখন স্কোয়াদ্রিস্তি নানা শহরে বলপূর্বক সমাজবাদী সরকারকে উৎখাত করছিল। 'বলশেভিক বিপদে'র কথা বলে এই উৎখাত চলে, যদিও ১৯২২ সালের ইতালিতে কোন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা ছিল সুদূরপরাহত।

১৯২২ সালে রোম অইভযানের মধ্য দিয়ে মুসোলিনি ক্ষমতায় আরোহণ করেন। যদিও এই অভিযানের সাফল্য সম্পর্কে প্রথমদিকে তিনি খুব আশাবাদী ছিলেন না। সাংবিধানিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে প্রতিবাদের শেষ স্বরটুকু স্তব্ধ করে দেওয়া তাঁর প্রয়োজন ছিল। বুর্জোয়া গণতন্ত্র, উদারপন্থার লেশমাত্র তার কাছে অনাকাঙিত ছিল। ক্ষমতা দখলের আট বছর পর Doctrine of Fascism গ্রন্থে (১৯৩০) মুসোলিনি লিখেছিলেন, 'ফ্যাসিবাদ চিরস্থায়ী শান্তির সম্ভাবনা বা উপযোগিতায় বিশ্বাস করে না। .... যুদ্ধই একমাত্র মানুষের ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারে ...... ফ্যাসিবাদের আক্রমণের লক্ষ্য গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং [ফ্যাসিবাদ] এর (গণতন্ত্রের) ধ্যানধারণা ও বাস্তব কার্যকারিতা ও পদ্ধতি উভয়কেই বর্জন করে।'

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জঠরেই ফ্যাসিবাদের জন্ম। আবার, তাকেই ধ্বংস করে শক্তিশালী কেন্দ্রীরভূত সাম্রাজ্য নির্মাণ এর লক্ষ্য। Doctrine of Fascism গ্রন্থের অন্যত্র মূসোলিনি লিখেছিলেন, 'ফ্যাসিবাদ . একমাত্র রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রভুক্ত মানুষের স্বাধীনতার পক্ষে। ফ্যাসিস্ত ধারণায় রাষ্ট্র সর্বব্যাপী, যার বাইরে কোন মানবিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ থাকতে পারে না ...... এই অর্থে ফ্যাসিবাদ টোটালিটারিয়ান ......।'

টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে ১৯২২ সালের ২৭ অক্টোবর মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিবাহিনীর 'রোম অভিযানের'র ফলস্বরূপ ২৯ অক্টোবর রাজা তৃতীয় ভিক্তর ইমানুয়েলের দ্বারা মুসোলিনি ইতালির প্রধানমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হন। ইতালির অভ্যন্তরে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের একটি পর্ব সমাপ্ত হয়। কিন্তু তখনও ইতালিতে ফ্যাসিবাদে-বিরোধী গণতান্ত্রিক চেতনার অবসান ঘটেনি। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই ধারাবাহিকভাবে আমলাতন্ত্র, সেনেট ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ ফ্যাসিবাদী মতবাদ ও সমর্থক দ্বারা পূর্ণ করার প্রক্রিয়া জারী থাকা সত্ত্বেও ১৯২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ফাসিস্ত নয় এমন দলগুলি সাত কোটির মধ্যে তিন কোটি নির্বাচকের সমর্থন লাভ করেছিল। এই নির্বাচন সংঘটিত হয়েছিল এমন সময়ে যখন ইতিমধ্যেই স্কোয়াদ্রিস্তি রাষ্ট্রের বেতনভোগী জাতীয় বাহিনীতে পরিণত হয়েছে এবং ফ্যাসিবাদের সমালোচকরা রাষ্ট্রীয় দমনপীড়নের

শিকার। সংবাদপত্রের উপর কঠোর সেন্সরশিপ চালু করা, গুপ্ত পুলিশ বাহিনীর (OVRA) প্রতিষ্ঠা ইতালিকে যথার্থই একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপ দিয়েছে। জনগণের কাছে বার্তা পৌঁছানো হয়েছে 'মুসোলিনি সর্বদা সঠিক' (Mussolini ha sampre ragione)। তিনিই জনতার নেতা (IL Duce) এবং সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধানকারী। প্রধানমন্ত্রী রূপে অভিষেকের পর একাদিক্রমে একুশ বছর মুসোলিনি ছিলেন ইতালির সর্বেসর্বা। দেশের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট বাছাই পদ্ধতিতে প্রশাসনকে ফাসিস্ত করে তোলা এবং ইউরোপের সামনে আগ্রাসী ভূমিকা রাখাই ছিল এই সময়ের ইতালীয় রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। ১৯২৫ সালে স্বল্পকালের জন্য গ্রীসের কর্ফু দ্বীপ দখল বা তার পরের বছর ভূমধ্যসাগরকে 'নিজস্ব সমুদ্র' (Mare Nostrum) হিসাবে বর্ণনা মুসোলিনি তথা ফাসিস্ত দলের আগ্রাসী ভূমিকা বহিঃপ্রকাশ। পূর্ব ইউরোপে বিভেদমূলক কূটদৌত্য এই ভূমিকাকে আরও জোরদার করেছিল। তাসত্ত্বেও ইউরোপে বহু প্রতিশ্রুত 'যৌথ নিরাপত্তা' তেমন বিঘ্নিত হয়নি, যদিও তার আশঙ্কা যথেষ্টই ছিল। বরং, ১৯২৪ সালের ইতালি-যুগোশ্লাভিয়া শান্তি চুক্তি সাময়িকভাবে উত্তেজনা প্রশমনে সহায়তা করেছিল।

১৯২০-র দশকের মধ্যভাগে ইতালি প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরের সময় থেকে বেশ কিছুটা ভিন্ন। দেশের অভ্যন্তরে ইতালির প্রথাগত মতৈক্যভিত্তিক সরকারের বদলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কেন্দ্রীভূত একনায়কতন্ত্র। সমাজবাদী, উদারবাদী পরীক্ষা নিরীক্ষর স্থান দখল করেছে উগ্রজাতীয়তাবাদী দক্ষিণপন্থা। শ্রমিক আন্দোলনের উপর জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা, পরিবর্তে এসেছে তথাকথিত কর্পোরেট সংস্কৃতি। শ্রমিক-কৃষকের সমস্যা সমাধানের বদলে দলীয় কর্মীদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। সর্বাধিক সুফল লাভ করেছে শিল্পপতি ও ভূম্যধিকারী শ্রেণী। ১৯১৮ সালের তুলনায় এই শেষোক্ত শ্রেণীর মানুষদের উন্নতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। অন্যদিকে, ইতালির পশ্চাদপদ দক্ষিণাঞ্চল অবহেলিত রয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরবর্তী আরও প্রায় দেড় দশক ইতালি কোন বৃহৎ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েনি, বা আগ্রাসনের শিকার হয়নি। বরং, ভূমধ্যসাগরকে একটি ইতালীয় হ্রদে পরিণত করার বাসনা দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে যথেষ্ট ভীতির জন্ম দিয়েছিল। 'সমগ্র ইতালি আবর্তিত হচ্ছে রোমকে ঘিরে এবং রোম আবর্তিত হচ্ছে সর্বাধিনায়ককে (মুসোলিনি) ঘিরে, এই জাতীয় ফ্যাসিস্ত ধারণা স্থান করে নিচ্ছিল ইতালির নাগরিক সংস্কৃতিতে। এই পরিবেশে আরও জোরালো আঘাত এল উনিশশো ত্রিশের দশকে যখন ইতালির ভবিষ্যৎ মিত্র নাৎসি জার্মানি'র হাতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা, জাতিসমস্যা এবং লিগ অফ নেশনসের প্রাসঙ্গিকতা বিরাট প্রশ্ন চিহ্নের সম্মুখীন হল। ততদিনে মুসোলিনি ও তার ফ্যাসিস্ত দল ইতালির সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেছে।

৭.৪ সারাংশ

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানিতে গঠিত হয়েছিল ভাইমার প্রজাতন্ত্র। প্রজাতান্ত্রিক শাসন চলে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত। যুদ্ধোত্তর জার্মানি পরাজিত পক্ষ হিসাবে তীব্র আর্থিক ও রাজনৈতিক সংকটে আচ্ছন্ন ছিল। প্রজাতান্ত্রিক জার্মানি সাংবিধানিক পথে অগ্রসর হতে চায়। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, অভ্যুত্থানের প্রয়াস এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তীব্র মুদ্রাস্ফীতি ও বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রকোপে দেশের অভ্যন্তরে ক্ষোভ ও হতাশা বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু, প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য জার্মানিকে এককভাবে দায়ী করে মিত্রপক্ষীয় দেশগুলো যে চাপ সৃষ্টি করে তার ভারবহন করার ক্ষেত্রে যে পারদর্শিতার প্রয়োজন ছিল ভাইমার প্রজাতন্ত্র তা প্রদর্শন করতে পারেনি। যদিও এই সময়েই, বিশেষত ১৯২৩-২৯ সময়কালে জার্মানিতে জীবনযাত্রার মান কিছুটা বৃদ্ধি পায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণপন্থী জাতীয়বাদ ক্রমাগত জোরদার হয়। জাতিবিদ্বেষী, সাম্যবাদ বিরোধী ও কঠোর

একনায়কতান্ত্রিক শাসনের সমর্থক নাৎসি দল অ্যাডলফ হিটলারের নেতৃত্বে নির্বাচনী সোপান বেয়েই ক্ষমতা দখল করে। ১৯৩০-দশক ধরেই বিরোধী দল, ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে নাৎসি একাধিপত্য কায়েম করা হয়। দলীয় সংগঠনের অভ্যন্তরে স্থাপিত হয় হিটলারের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব। জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হয় তৃতীয় রাইখের শাসন। ক্রমশ তা জার্মানিকে এগিয়ে নিয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে।

ইতালি প্রথম মহাযুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ হলেও পরাজিত দেশগুলোর তুলনায় তার অবস্থা বিশেষ উন্নততর ছিল না। যুদ্ধোত্তর সমাজবাদী শাসন ক্রমাগত অন্তর্কলহ, অযোগ্যতার কারণে জনগণের মনে হতাশার জন্ম দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালিতে কোন কোন গোষ্ঠী, ব্যক্তি সম্প্রসারণবাদী নীতি গ্রহণের জন্য ক্রমাগত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ভূমধ্যসাগর, আড্রিয়াটিক সাগর সন্নিহিত এলাকার সম্প্রসারণমূলক কাজ কর্ম লক্ষ্য করা যায়। এই পরিস্থিতিতে দেশের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার কথা বলে ফ্যাসিবাদীরা বেনিতো মুসোলিনির নেতৃত্বে রোম অভিযান করে। মুসোলিনি ইতালির প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হন। তিনিই ইতালির সর্বাধিকনায়ক এবং টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্র গঠনের প্রধান কারিগর। আগ্রাসী বিদেশনীতি এই সময়ের ইতালির রাষ্ট্রজীবনের বৈশিষ্ট্য। দেশের অভ্যন্তরে ফ্যাসিবাহিনীর সন্ত্রাস ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিরোধী পক্ষ, সংবাদপত্র ও জণগণকে সন্ত্রস্ত করা হতে থাকে। আবার জনতার একাংশ ক্রমাগত ফ্যাসিবাদী শাসনের সমর্থক হয়ে ওঠে। ১৯২০-র দশকের মধ্য-ভাগের ইতালিতে স্থাপিত হয়ে গেল ফ্যাসিবাদী শাসন, যা চলল পরবর্তী প্রায় দুই দশক ধরে।

৭.৫ অনুশীলনী

(পাঠ্যাংশটি ভালোভাবে পড়ে নিয়ে উত্তর দিন। প্রয়োজনে 'পরিশিষ্ট' অংশটি দেখুন।)
জার্মানি

১. প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে দিন।

(ক) প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয়ের কারণ হিসাবে জার্মানিতে কোন ধরণের ধারণার প্রচলন ঘটেছিল?

(খ) 'কাপ পুশ্' (Kapp Putsch) বলতে আপনি কী বোঝাবেন?

(গ) ১৯২০-রে দশকের জার্মানিতে কোন ধরণের মানসিকতার বিস্তার ঘটছিল? একে কি আপনি পশ্চৎপদ বলবেন?

(ঘ) কোন কালপর্বটিকে আপনি জার্মান প্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে সফল অধ্যায় বলবেন এবং কেন?

(ঙ) নাৎসি বলতে কাদের বোঝায়? এদের উত্থানের প্রাথমিক পর্যায় কী ছিল উল্লেখ করুন।

(চ) হিটলারের ক্ষমতারোহনের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সহায়ক ব্যক্তি/সংগঠন/কারা ছিলেন/কোনগুলো ছিল?

(ছ) নাৎসি প্রশাসনে 'সমন্বয়' বলতে কী বোঝান হয়?

২. আড়াইশো শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

(ক) ১৯১৯-২৯ কালপর্বের জার্মান প্রজাতন্ত্রের উপর একটি নিবন্ধ লিখুন।

(খ) হিটলারের ক্ষমতা দখলের বিভিন্ন পর্যায়গুলির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

ইতালি

১. প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে দিন।

(ক) প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালির প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা কী ছিল?

(খ) প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইতালির অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল?

(গ) ফ্যাসিবাদী কারা? যুদ্ধের পর তারা কী আশা করেছিল?

(ঘ) ফ্যাসিবাদের মূল আর্দশগুলো লিখুন।

(ঙ) টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে মুসোলিনির গৃহীত ব্যবস্থাগুলো কী কী ছিল?

২. দেড়শো শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

(ক) ফ্যাসিবাদী উত্থানের পদ্ধতি কী কী ছিল সংক্ষেপে আলোচনা করুন। এই এককের অন্যত্র কোথাও কী এর সঙ্গে তুলনীয় ঘটনার উল্লেখ পেয়েছেন?

(খ) মুসোলিনির ক্ষমতারোহনের পর ইতালির রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক জীবনে কী ধরনের পরিবর্তন আসে?

একক ৮ ❑ জাপানের আগ্রাসন — মাঞ্চুরিয়া সংকট — আবিসিনিয় যুদ্ধ — স্পেনের গৃহযুদ্ধ — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথে

গঠন

৮.০ উদ্দেশ্য
৮.১ প্রস্তাবনা
৮.২ সাম্রাজ্যবাদী জাপান ও মাঞ্চুরিয়া সংকট
 ৮.২.১ জাপানের আগ্রাসন
 ৮.২.২ মাঞ্চুরিয়া সংকট
 ৮.২.৩ জাতিসঙ্ঘের ভূমিকা
৮.৩ অবিসিনিয়া যুদ্ধ (১৯৩৫)
৮.৪ স্পেনের গৃহযুদ্ধ (১৯৩৬-৩৯)
৮.৫ রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষ
৮.৬ তোষণ নীতি
 ৮.৬.১ ব্রিটেনের তোষণ নীতি
 ৮.৬.২ তোষণ নীতি ও ফ্রান্স
৮.৭ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথে
৮.৮ জার্মান বিদেশ নীতি (১৯৩৩-৩৯) ইতিহাস বিদ্যার নানা ধারা,
৮.৯ সারাংশ
৮.১০ অনুশীলনী
 ৮.১১.১ পরিশিষ্ট ১ : জার্মান, ইতালি ও জাপানের রাষ্ট্রনায়কবৃন্দ (১৯১৯-৪১)
 ৮.১১.২ পরিশিষ্ট ২ : শব্দার্থ
 ৮.১১.৩ পরিশিষ্ট ৩ : সময়পঞ্জি
৮.১২ গ্রন্থপঞ্জি

৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন :

- প্রথম মহাযুদ্ধের পর মাঞ্চুরিয়া নিয়ে জাপানের আগ্রহের কারণ।
- জাপানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উগ্র জাতীয়তাবাদী আদর্শের বিস্তার এবং আন্তর্জাতিকতাবোধ ও উগ্র দেশপ্রেমের টানাপোড়েন।
- মাঞ্চুরিয়ায় রেলপথে অন্তর্ঘাত এবং মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী সামরিক আগ্রাসন ও তার ফলাফল।
- মাঞ্চুরিয়া সংকটে জাতিসঙ্ঘের ভূমিকা।

- ইতালির সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ এবং আবিসিনিয়াতে ইতালির ভূমিকা।
- ইতালির সামরিক আগ্রাসন ও আবিসিনিয়া যুদ্ধ।
- স্পেনের গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান।
- স্পেনের গৃহযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়।
- রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষ এবং তার প্রভাবে পরিবর্তনশীল বিশ্ব রাজনীতি।
- ইউরোপীয় তোষণ নীতিতে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ভূমিকা।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথে ইউরোপ এবং জার্মানির গ্রাসন।
- জার্মান বিদেশনীতির বিবর্তন প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদদের মতামত।

৮.১ প্রস্তাবনা

এই এককের প্রথম আলোচ্য বিষয় হল, উনিশশো ত্রিশের দশকে পূর্ব এশিয়ার মাঞ্চুরিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার আবিসিনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ইতিহাস। উনিশ শতকের চতুর্থ ভাগে এই অঞ্চলগুলিতে উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতায় নেমেছিল শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি। বিংশ শতকে সেই প্রয়াস বজায় থাকে। অন্যদিকে, ইউরোপে স্পেনের গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে গণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী শক্তির লড়াই ছিল সমকালের একটি বিশিষ্ট ঘটনা। ইউরোপে দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিবাদ যখন শক্তিশালী হচ্ছিল তখন অন্যান্য পশ্চিমী গণতন্ত্রী দেশগুলির দ্বিধাচিত্ততা ও ফ্যাসিবাদী শক্তির প্রতি তোষণমুখী মনোভাব ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে এক সংকটের জন্ম দিয়েছিল। এই সংকটের কালে সমাজ ও অর্থনীতি দীর্ঘমেয়াদী টানাপোড়েন জন্ম নেওয়া অস্থিরতার সঙ্গে যুক্ত ছিল বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর কার্যকলাপ। সেই প্রসঙ্গও এই এককে আলোচিত হবে। এসময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল জার্মান বিদেশনীতির বিবর্তন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসবিদদের বিভিন্ন মতামত এই এককের শেষভাগে আলোচিত হবে।

৮.২ সাম্রাজ্যবাদী জাপান ও মাঞ্চুরিয়া সংকট

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে জাপানের অবস্থা ছিল ইউরোপে ইতালি ও জার্মানির সাথে তুলনীয়। প্রথম মহাযুদ্ধে জাপান পরাজিত হয়নি। তবে বিজয়ী অন্য শক্তিগুলির সাথে তার সম্পর্ক ক্রমশই সংঘাতপূর্ণ পথে চালিত হচ্ছিল। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে এবং ওয়াশিংটন সম্মেলনে (১৯২১-২২) জাপান খুশী হয়নি। সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী এই দ্বীপরাষ্ট্রটি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করে চীনে তার প্রভাব বৃদ্ধি করতে। জাপানের এই আকাঙ্খা তাকে পশ্চিমী শক্তি বিশেষত ব্রিটেনের কাছে অপ্রিয় করে তোলে। বিশেষত চীনের অন্তর্গত মাঞ্চুরিয়া প্রদেশটিকে উপনিবেশে পরিণত করা ছিল জাপানের অন্যতম লক্ষ্য। অন্যদিকে, প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের ফলে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় জার্মানির হাতছাড়া হওয়া সাবেক উপনিবেশগুলিও জাপান করায়ত্ত করতে চায়। তার এই প্রচেষ্টাতে ব্রিটেন ও আমেরিকা উভয়েরই বিরোধিতা ছিল। উপরন্তু, ১৯২৪ সালে মার্কিন কংগ্রেসে যে অভিবাসন আইন পাশ হয়, তা জাপানের মনে আশঙ্কা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিল। পশ্চিমী শক্তি সমূহের কাছে ব্রাত্য হয়ে যাওয়ার ভাবনায় জাপানের জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলিতে বিশেষত সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপান অথবা ইঙ্গ-মার্কিন, কোন শক্তির প্রাধান্য থাকবে তা হয়ে উঠল আন্তর্জাতিক টানাপোড়েনের কেন্দ্রবিন্দু।

প্রথম মহাযুদ্ধে জাপানের জয় জাপানবাসীদের বিশেষ আশ্বস্ত করতে পারেনি। জাপানি জনগণের সম্মুখে জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলি সফলভাবে প্রচার করতে পেরেছিল যে পশ্চিমী বিশ্বের কাছে জাপান একঘরে হয়ে গেছে। অধিকতর জাতীয়তাবাদী প্রাবল্যে যে দ্বিগুণ জাতীয়তাবাদের (Double Patriotism) প্রচার ও প্রসার লক্ষ্য করা যায় তার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ জাপানি নাগরিককে আগ্রাসী বিদেশনীতির সমর্থক করে তোলা। বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ, মার্কিন অভিবাসন নীতিতে জাপানের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জাপান-আমেরিকা সম্পর্কের অবনতি, এ সবই জাপানি উগ্রজাতীয়তাকে পুষ্ট করেছিল। মহা-মন্দার কালে আমেরিকায় জাপানি পণ্য বয়কটের ঘটনা কিংবা ১৯৩০ সালের হিলস্মুট শুল্ক (Hawley-Smoot Traiff) জাপানি পণ্যের বৈদেশিক বাণিজ্যিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল। একইভাবে, ব্রিটেনও ভারত বা আফ্রিকায় তার উপনিবেশগুলিতে জাপানি বস্ত্রের আমদানীকে রদ করার চেষ্টা করে।

অন্যদিকে, বিবিধ প্রকার সরকারি উৎসাহ সত্ত্বেও জাপানের ফুলে ফেঁপে ওঠা জনসমষ্টির খুব ক্ষুদ্র অংশই এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে বসবাস করতে প্রণোদিত হয়েছিল। ১৯২০-র দশকের মধ্যভাগে মাঞ্চুরিয়ায় বাসা বাঁধা জাপানির সংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ। সাবেক জার্মান উপনিবেশ শানতুং বা সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকেও ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির অনুরোধে উপরোধ জাপানকে সরে আসতে হয়। এই সব ঘটনা জাপানে বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়। এই বিচ্ছিন্নতাই কালক্রমে উগ্র জাপ জাতীয়তাবাদের ভিত শক্ত করে। ১৯২০-র দশকের শেষে এসে দেখা গেল যে, জাপানের রাজনৈতিক পটচিত্রে বিদেশমন্ত্রী বিদেহারা'র আন্তর্জাতিকতাবাদের সাথে মিশে রয়েছে সেনাবাহিনীর জঙ্গী জাতীয়তাবাদ। ক্রমে দ্বিতীয়টিই জোরদার হল। সেনাবাহিনীর একাংশ ভীত ছিল এই ভেবে যে, শিদেহারার বিদেশনীতি কার্যত চীনের হাত শক্ত করবে এবং মাঞ্চুরিয়ায় জাপানি প্রভাব ক্ষুণ্ণ করবে। বহুমাত্রিক জাপানি জাতীয়তাবাদের এই প্রেক্ষাপটে এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে জাপ সম্প্রসারণ নীতিকে বিবেচনা করা যেতে পারে, যার ফলস্বরূপ ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাঞ্চুরিয়ায় জাপানি সামরিক আগ্রাসনের সূত্রপাত হল।

৮.২.১ জাপানের আগ্রাসন

মাঞ্চুরিয়াকে নিয়ে জাপানি আগ্রহের একটি পূর্ব-ইতিহাস রয়েছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে ১৯০৪-০৫ সালের যুদ্ধে জয়লাভের পর জামান মাঞ্চুরিয়ায় ১৫,০০০ সৈন্য রাখার অধিকার লাভ করেছিল। এই সৈন্য নিযুক্ত ছিল দক্ষিণ মাঞ্চু রিয়ায় রেলপথের সুরক্ষায়, মুকদেন শহর ছিল এদের প্রধান ঘাঁটি। ১৯১১ সালে চীনে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর মাঞ্চু রাজবংশের শাসন সমাপ্ত হলেও আঞ্চলিক সামন্তপ্রভুদের পারস্পরিক সংঘাত চীনের বিস্তীর্ণ এলাকাকে অশান্ত করে রেখেছিল মাঞ্চুরিয়া তার বাইরে ছিল না। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে চীনে চিয়াং কাই-শেক ও তার কুয়োমিনতাং (জাতীয়তাবাদী) দলের ক্রমোন্নতি ও পরিশেষে ১৯২৮ সালে পিকিং দখল জাপানি জাতীয়তাবাদীরা মেনে নিতে পারেনি। জাপানি পরিবার-ভিত্তিক পুঁজিনির্ভর বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা জাইবাৎসু ও অন্যান্য শিল্পোদ্যোগীদের কাছে মাঞ্চুরিয়াকে চীনা কবল থেকে মুক্ত করে জাপানের অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। চীন ও মাঞ্চুরিয়াকে অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত করার জন্য মাঞ্চুরিয়ায় জাপানি আগ্রাসন প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ১৯২৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর মাঞ্চুরিয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে চীনের অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় এই বাসনা আরও উদগ্র হয়ে উঠল।

জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখলের জোরাল আভাস মিলল ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে। সেইয়ুকাই দলের নেতা তানাকা গিইচি একাধারে প্রধানমন্ত্রী ও বিদেমন্ত্রী থাকার সুবাদে ঘোষিতভাবে আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করলেন। সেনাবাহিনীর পূর্ণ সমর্থনও ছিল তার পিছনে। পূর্বতন বিদেশমন্ত্রী শিদেহারা কিজুরো আন্তর্জাতিকতার নীতিতে

আস্থাশীল থেকে আপোসমুখী শান্তিকামী বিদেশনীতি প্রণয়ন করেছিলেন তানাকা'র বিদেশনীতি প্রাথমিকভাবে তার বিরোধী ছিল। তৎকালীন যুগের এক চাঞ্চল্যকর দলিল তথাকথিত 'তানাকা স্মারকে' বলা হল যে মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়া দখল করেই চীনে জাপানি স্বার্থ বজায় রাখতে হবে। পরবর্তী কালে মার্কিনী শক্তিকে পরাস্ত করে চীন বিজয়ের পথে জাপান অগ্রসর হবে। চীনই হবে ভবিষ্যতে জাপানের বিশ্বজয়ের সোপান।

তবে বাস্তবে এতখানি আগ্রাসী ভূমিকা রাখা জাপানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সমকালীন বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষিতটিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হত, এবং সেই অনুযায়ী বিদেশনীতিতে রদবদল ঘটাতে হত। চীনে কুয়োমিনতাঙের শক্তি বৃদ্ধিতে আশঙ্কিত জাপান শানতুংয়ে সেনা পাঠালে তার ফল হয় দ্বিবিধ। চীনে জাপানি দ্রব্যের বয়কট শুরু হয় ও কুয়োমিনতাং ও তার রাজনৈতিক বিরোধীরা পরস্পরের নিকটে চলে আসে। অন্যদিকে জাপ সৈন্যের অবিমৃষ্যকারিতার প্রতিবাদ করে ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। প্রায় অবধারিতভাবে এক্ষেত্রে জাপানকে আপোস করতে হল। মাঞ্চুরিয়া ও শানতুংয়ে জাপানি স্বার্থরক্ষার বিনিময়ে চীনের অন্যত্র কুয়োমিঙতাঙের কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া তানাকা'র উপায় ছিল না। কারণ এর বিকল্প ছিল সম্মুখ সমরে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির মহড়া নেওয়া। তানাকা'র বিদেশনীতি কার্যত পূর্বসূরী শিদেহারা'র আপোসমুখী শান্তির ধারাতেই প্রবাহিত হল। তানাকা পদচ্যুত হলেন ১৯২৮ সালের শেষ দিকে। সামরিক বাহিনীর চীন-বিরোধী ষড়যন্ত্রের অসাফল্য তাঁর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। অধ্যাপক ইয়ান নিশের ভাষায়, "বিপর্যয়করভাবে, চীনের মূল অঞ্চল থেকে মাঞ্চুরিয়াকে পৃথক করার জন্য তানাকা'র প্রয়াস ..... সেই মুহূর্তের জন্য ব্যর্থ হল।"

তানাকা'র পতনের পর নতুন প্রধান মন্ত্রী হামাগুচি ওসাচি'র নেতৃত্বে নতুন মিনসেইতো সরকারে শিদেহারা'র বিদেশমন্ত্রী রূপে প্রত্যাবর্তন ঘটল। চীন ও মাঞ্চুরিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে এক প্রকার মধ্যস্ততায় আসার চেষ্টা হল। এ অবস্থা উগ্রজাতীয়তাবাদী ও সেনাবাহিনীর পছন্দসই ছিল না। লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, যে সরকার বা ব্যক্তিই ক্ষমতায় আসুক না কেন উগ্রজাতীয়তাবাদীরা ও সেনাবাহিনী সমগ্র দশক জুড়ে লাগাতার আগ্রাসী রাষ্ট্রীয় নীতিকে কার্যকর করার স্বপক্ষে রায় দিয়েছে। এই 'hawkish' মনোভাবই হয়ত একদিন জাপানকে পুনরায় যুদ্ধের পথে ঠেলে দেবে।*

১৯২১-২২ সালের ওয়াশিংটন সম্মেলন বা ১৯৩০ সালের লন্ডনে নৌ-সম্মেলনে জাপান খুশি হয়নি। তার নৌবাহিনীর ক্ষমতাকে ব্রিটেন ও আমেরিকার তুলনায় সত্তর শতাংশ বেঁধে রাখা হয়েছিল। তাসত্ত্বেও লন্ডন নৌ-চুক্তিকে জাপানি সরকার স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে অসন্তোষ চেপে রাখা যায়নি। আততায়ীর হাতে প্রধানমন্ত্রী হামাগুচি'র মৃত্যু তার প্রমাণ। হত্যাকারীকে জাপানি সংবাদ মাধ্যমে বীর হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে শিদেহারার বিদেশনীতি ছিল তাদের রোষের শিকার।

আন্তর্জাতিকতাবোধের ওপর ভিত্তি করে শিদেহারা'র বিদেশনীতি পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ওকাৎসুকি রেইজুরো'র সময়েও বজায় থাকে। শিদেহারার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বাস্তবসম্মত এবং বিভিন্ন দেশের সহাবস্থানের প্রশ্নটিকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। এর ওপর ভিত্তি করেই তিনি চীন-জাপান দ্বন্দ্বের সমাধানসূত্র খুঁজছিলেন। মাঞ্চুরিয়াকে নিয়ে কোন একতরফা বা দ্বিপাক্ষিক সিদ্ধান্ত তিনি চাননি। তিনি চাইছিলেন বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যস্থতায় জাপানের সমস্যাগুলির সমাধান। দ্বিপাক্ষিক না হয়ে বহুপাক্ষিক আলোচনার মধ্য দিয়েই পূর্ব এশিয়ায় শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধি আনয়নের আকাঙ্খায় জাপানি বিদেশনীতি সে সময়ে পরিচালিত হচ্ছিল। ১৯৩১ সালের এক বক্তৃতায় শিদেহারা এক্ষেত্রে ব্রিটেন ও আমেরিকার ভূমিকার ওপর জোর দেন। একদিকে যেমন উনিশ শতক থেকেই

*Ian Nish, Japanese Foreign Policy 1869-1942, London, 1977,pp. 162-63.

চীনদেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যে অতিরাষ্ট্রিক অধিকার (Extra-territorial Rights) ভোগ করত এবং চীনের ওপর বৈষম্যমূলক চুক্তি (Unequal Treaties) চাপিয়ে দিয়েছিল, তার অবসান ঘটানোর কথা বলা হচ্ছিল; পাশাপাশি 'দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায়, বিশেষত দক্ষিণ মাঞ্চুরিয় রেল-পথের ক্ষেত্রে জাপানি অধিকারের একপ্রকার স্বীকৃতি দাবী করা হচ্ছিল।

তবে বাস্তবত এই আশাবাদ প্রতিহত হচ্ছিল জাপানি সম্পত্তির ওপর চীনা হামলার কারণে। বরং জাপানি সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্রমেই প্রত্যয় দৃঢ় হয় যে রাজনীতিবিদদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেই জাপানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। উনিশশো তিরিশের দশকের গোড়ায় এধরণের জঙ্গি উদ্দীপনা জাপানি সেনা বাহিনীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। জাপানি সেনাবাহিনীর এই উদ্দীপ্ত অংশটিই গড়ে তোলে সাকুরাকাই সংগঠন (Cherry Blossom Society)। মাঞ্চুরিয়াকে চীন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে জাপানি শাসনের আওতায় আনা ছিল এদের উদ্দেশ্য। তৎকালীন জাপানের অর্থনৈতিক মন্দা সমাজে যে প্রভাব রেখেছিল তারই ফলে জাপানে, বিশেষত সেনাবাহিনীতে, সমাজবাদ ও উদারপন্থা উভয়েরই বিরোধী চরম আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমী প্রভাব-মুক্ত জাপান গঠনের আর্দশ লক্ষ্য করা যায়। হতাশ, প্রতিক্রিয়াধর্মী সাকুরাকাই ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরেও ক্রমাগত সরকারি নীতিবদলের জন্য চাপ দিতে থাকে। এই নীতিবদলের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ছিল সরাসরি মাঞ্চুরিয়া অভিযান। উগ্র জাতীয়তাবাদী তাত্ত্বিক ওকাওয়া শুমেই ১৯৩০ সালের শরৎকালে দেশব্যাপী বক্তৃতামালায় বারংবার মাঞ্চুরিয়ায় জাপানি অধিকার স্থাপনের কথা বলেন। তার অভিমত ছিল, অনুন্নত মাঞ্চুরিয়ায় জাপানি কৃষকদের বসবাস শুরু করা উচিত। বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়ন যেমনভাবে পূর্ব চীনা রেলপথের ওপর নিজ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে দৃঢ়তা ও তৎপরতার পরিচয় দেয়, জাপানেরও সেই পথ অনুসরণ করা উচিত বলে তার প্রচারে জোর দেওয়া হয়। তাৎপর্যপূর্ণ হল ওকাওয়া'র এই প্রচারের পৃষ্ঠপোষক ছিল জাপানের যুদ্ধমন্ত্রক। উগ্রজাতীয়তাবাদী তাত্ত্বিক, সেনাবাহিনীর অফিসারবর্গ, যুদ্ধমন্ত্রক প্রমুখের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমন্বয় এ সময় লক্ষ্য করা যায়।

৮.২.২ মাঞ্চুরিয়া সংকট

তাৎক্ষণিকভাবে যে ঘটনার মধ্য দিয়ে জাপানের মাঞ্চুরিয়ায় আগ্রাসনের সূত্রপাত ঘটে, তা ঘটেছিল ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। জাপানের পক্ষ থেকে দাবী করা হয় যে, ১৮-১৯ সেপ্টেম্বরের রাত্রে মুকদেনের সন্নিকটে একটি জাপানি পাহারাদার বাহিনী কিছু সংখ্যক চীনা সৈনিককে রেলপথে নাশকতামূলক কাজ করতে দেখতে পায় এবং তাতে বাধাদান করে। এর ফলস্বরূপ মুকদেনে অবস্থানকারী ১০,০০০ চীনা সৈন্যকে নিরস্ত্র করে ফেলা হয়। পরবর্তী চারদিনে মুকদেনের ২০০ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে সমস্ত চীনা শহর জাপানিদের হাতে চলে আসে। এই শহরগুলির কোন কোনটি দক্ষিণ মাঞ্চুরিয় রেলপথ থেকে বহুদূরে অবস্থিত ছিল। মাঞ্চুরিয়াতে চীন প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থাকে উৎখাত করা হয় এবং পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে উত্তর মাঞ্চুরিয়া সম্পূর্ণভাবে জাপানিদের হস্তগত হয়। উত্তরাংশ দখলের পর আগ্রাসী বাহিনী দক্ষিণাভিমুখী হয়। দখলের এই পর্যায়ে বোমাবর্ষণকারী বিমান ব্যবহৃত হয়। ২৮ ডিসেম্বর চিন্চাও এবং ৪ জানুয়ারী, ১৯৩২ সালে শানহাইকাওয়ান হস্তগত হয়। মাঞ্চুরিয়া ও চীনের সীমান্তবর্তী শানহাইকাওয়ান দখলের মধ্যে দিয়ে জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখল সম্পূর্ণ হয়।

১৯৩১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের রাত ১০টা নাগাদ সংঘটিত ঘটনাটিতে যতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় বাস্তবত তার গুরুত্ব তাৎক্ষণিকভাবে অনেক কম ছিল। রেলপথে বিধ্বস্ত করা হয় নি, বরং রেল চলাচলের পক্ষে ক্ষতি খুবই সামান্য হয়েছিল। জনৈক জাপানি রেলকর্মীকে কাজটি করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তবে সুদূরপ্রসারী অর্থে

এর অভিঘাত হয়েছিল যথেষ্ট। দীর্ঘদিন ধরে স্তূপীকৃত বারুদে অগ্নি সংযোগ করেছিল ঘটনাটি। মাত্র চার মাসের মধ্যে জাপানী সেনাবাহিনী যেভাবে মাঞ্চুরিয়া দখল করেছিল তাতে বলা যায় যে, আক্রমণের যথেষ্ট পূর্ব প্রস্তুতি ছিল। প্রধানমন্ত্রী ওয়াকাৎসুকি বা বিদেসমন্ত্রী শিদেহারা কারও পক্ষে সৈন্যবাহিনীকে চাইলেও প্রশমন করার উপায় ছিল না। এবং তারা তা চানও নি।

মাঞ্চুরিয়া দখলের ঘটনা জাপানে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। এর অভিঘাতে মিনসেইতো সরকার এবং শিদেহারা'র বিদেশনীতি উভয়েরই অবসান ঘটে। তবে মাঞ্চুরিয়া দখল করেই জাপানি সেনাবাহিনী থেমে থাকেনি। চীনের অভ্যন্তরে সাংহাই শহরে জাপ বাহিনী প্রচন্ড আক্রমণ চালায়, চীনা বাহিনী পিছু হটে। ছয় সপ্তাহ পরে উভয়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে আপাতভাবে এই সংকটের অবসান ঘটে।

জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখল স্থানীয়ভাবে ও আন্তর্জার্তিক ক্ষেত্রে কয়েকটি পরিবর্তন সূচিত করল। এশিয়ায় চীন জাপানি আক্রমণের সামনে উন্মুক্ত হল, এবং মাঞ্চুরিয়াকে কার্যত উপনিবেশে পরিণত করার মধ্য দিয়ে পূর্ব এশিয়ায় জাপান নিজের সদম্ভ উপস্থিতি জাহির করল। এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নতুন করে শুরু হল শক্তিপরীক্ষা, যা ওয়াশিংটন সম্মেলনের ফলে সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মাঞ্চুরিয়া সংকট নতুন সমস্যার জন্ম দিল। কারণ, ১৯১৮ সালের পর এই প্রথম শান্তিসুরক্ষার অছিলায় যুদ্ধ শুরু হল, নতুন করে শুরু হল ক্ষমতার রাজনীতি। অস্ত্রসজ্জিত, আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতাও জাতিসঙ্ঘের ছিল না। ব্রিটেন ও আমেরিকার ওপর নির্ভর করা ছাড়া জাতিসঙ্ঘের উপায় ছিল না। কিন্তু এরা কেউই সামরিক বা আর্থিকভাবে জাপানের প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় রাজী ছিল না। অর্থনৈতিক মহামন্দার সময় জাপানের ওপর কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা চাপান পুঁজিবাদী দেশগুলো সমীচীন মনে করে নি। জাপান ও চীনে আমেরিকার অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে ছিল। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমেরিকা তা ক্ষুণ্ণ করতে চায়নি।

পূর্ব এশিয়ায় জাপানের শক্তিবৃদ্ধির বিশেষ একটি তাৎপর্য পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর কাছে। বলশেভিক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জাপানই হতে পারে সম্ভাব্য ভরসাস্থল, এমন আশাও পশ্চিমী দুনিয়ায় বিদ্যমান ছিল। সুতরাং, লিগ অফ নেশনসের সনদের দশম ধারায় সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে নিরাপত্তা দানের কথা বলা হলেও এক্ষেত্রে জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এ বিষয়টি পরবর্তীকালে লিগের অন্যতম দুর্বলতা বলে বিবেচিত হবে।

৮.২.৩ জাতিসঙ্ঘের ভূমিকা

জাপানের মাঞ্চুরিয়া অভিযান জাতিসঙ্ঘ বা লিগ অফ নেশনসের পক্ষে পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল। আক্রান্ত চীনা সরকার জাতিসঙ্ঘের একাদশ ধারা অনুযায়ী আবেদন করলে কিছুকালের মধ্যেই সমগ্র ঘটনাটির তদন্তের জন্য জাতিসঙ্ঘে একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। ১ অক্টোবর, ১৯৩২ থেকে লর্ড লিটনের নেতৃত্বে এই কমিশনের কাজ শুরু হয়। কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিঘ্নিত করছে এবং চীন ও জাপানের মধ্যে শান্তিভঙ্গ করছে এমন যেকোন পরিস্থিতির অকুস্থলেই তদন্ত করা। তবে কমিশনের সীমাবদ্ধতা ছিল গোড়া থেকেই ; কেননা 'দুপক্ষের সামরিক সাজসজ্জায় হস্তক্ষেপ' করার কোন লক্ষই কমিশনের ছিল না। ব্রিটেনের লর্ড লিটনের সভাপতিত্বে এর অন্তর্ভূক্ত হলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালির প্রতিনিধিবৃন্দ।

লিটন কমিশন কাজ শুরু করার পূর্বেই চীনে জাপানি পণ্য বয়কট শুরু হয়। বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষও জারি থাকে। জাপান চীনের ইয়াংসি নদীর মোহনাস্থিত গুরুত্বপূর্ণ সাংহাই বন্দর শহরটি দখল করল। অন্যদিকে লিটন কমিশন

চীনে এলে জাপানের সঙ্গে জাতিসঙ্ঘের এই প্রতিনিধি দল দীর্ঘ আলোচনা শুরু করল। অবশেষে জাপানি সৈন্য সাংহাই ত্যাগ করে। অন্যদিকে, মাঞ্চুরিয়ায় জাপানি মদতে তৈরি হল স্বাধীন 'মাঞ্চুকুয়ো' রাজ্য যার রাজা হলে হেনরি পু-য়ি। ব্রিটেন বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কেউই এই জাপানি পুতুল সম্রাটকে মানতে প্রস্তুত ছিল না।

লিটন কমিশন কাজ শুরু করার প্রায় এক বছর পর যে প্রতিবেদন পেশ করল তাতে শুধু মাঞ্চুরিয়া সংকট নয়, চীন-জাপান সম্পর্কের সবদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হল। লিটন প্রতিবেদনে জোর দিয়ে বলা হল যে চীনের বিরুদ্ধে জাপানের অভিযোগের আংশিক সত্যতা থাকলেও কোনভাবেই সেই অছিলায় জাপানের চীন আক্রমণ সমর্থনীয় নয়। উপরন্তু, মাঞ্চুকুয়ো রাজ্যের 'স্বাধীনতা'কে অস্বীকার করা হল। বলা হল, চীনের অভ্যন্তরে থেকেই মাঞ্চুরিয়া স্বশাসন পেলে সংকট মিটতে পারে। লিগ অফ নেশনসের সাধারণ পরিষদের সভায় লিটন প্রতিবেদন সাদরে গৃহীত হল। প্রতিবেদনে চীন-জাপান সুসম্পর্ক তৈরির ওপর জোর দেওয়া হল। সুসম্পর্ক তৈরির প্রমাণস্বরূপ চীনা ভূখণ্ড থেকে জাপানি সৈন্যাপসারণের কথাও বলা হয়। জাতিসঙ্ঘের কোন সদস্য-রাষ্ট্র যে মাঞ্চুকুয়োকে সমর্থ বা আশ্রয় দান করতে পারবে না এ কথা লিটন প্রতিবেদনে প্রস্তাব রাখা হল। মাঞ্চুরিয়ায় জাপানি আগ্রাসনকে লিগ যেমন 'জাপানি জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার' তাগিদে নিছকই এক 'পুলিশি অভিযান' বলে মানতে চাইল না, তেমনি এই ঘটনাকে একটি রাষ্ট্রের দ্বারা সমঝোতার প্রয়াস না করেই অন্য আরেকটি রাষ্ট্রের ওপর যুদ্ধ ঘোষণা বলেও চিহ্নিত করল না। জাপানের বিরুদ্ধে কোন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা চাপান হল না। কেবল মাঞ্চুকুয়োকে স্বীকৃতি না দেওয়া নিয়ে জাতিসঙ্ঘ অনড় রইল।

লিটন প্রতিবেদন জাতিসঙ্ঘের পরিষদে এক ভোটাভুটির মাধ্যমে ১৯৩৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি, গৃহীত হল। উপস্থিত ৪৪ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৪২ জনই এর স্বপক্ষে রায় দিলেন এবং জাপান এর বিরোধিতা করল। শ্যামদেশের (তাইল্যান্ড) প্রতিনিধি ভোটদানে বিরত ছিলেন। এই ঘটনার সূত্র ধরে একমাস পরে জাপান লিগের সদস্যপদ ত্যাগ করল।

মাঞ্চুরিয়ার ঘটনা প্রথম মহাযুদ্ধের প্রায় এক দশকের বেশি সময় পরে নতুন করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংঘাতের জন্ম দিল। জাতিসঙ্ঘ প্রয়াস নিল সংঘাতের কারণ অনুসন্ধান করে আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার। একাজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন জাতিসঙ্ঘকে অন্যত্র (যেমন দক্ষিণ আমেরিকায়) নিজস্ব ভূমিকা রাখতে সাহায্য করল। তবে মাঞ্চুরিয়া নিয়ে জাতিসঙ্ঘের ভূমিকা সব পক্ষের কাছে সন্তোষজনক হয়নি। আন্তর্জাতিক চুক্তি, সনদ, আইন এসবই মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তে এসে থমকে গিয়েছিল বলে জনৈক চীনা প্রতিনিধি সখেদে মন্তব্য করেছিলেন। জাতিসঙ্ঘের দুর্বলতা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ঘনায়মান সংকটকে আরও ঘনীভূত করল। শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দুর্বলতর দেশগুলিকে সুরক্ষা না দিতে পারার ব্যর্থতা লিগ অফ নেশনসের মূল অঙ্গীকারটিকে গুরুত্বহীন করে তুলল। মাঞ্চুরিয়ার পর এই ঘটনার পুনরাভিনয় হল এশিয়া থেকে দূরে পূর্ব আফ্রিকার আবিসিনিয়ায় ১৯৩৪ সালে।

৮.৩ আবিসিনিয়া যুদ্ধ (১৯৩৫)

১৯৩০-এর দশকে ইতালির আবিসিনিয়া অভিযান এবং আবিসিনিয়া যুদ্ধ সমগ্র বিশ্বকে একাধারে স্তম্ভিত ও আশঙ্কিত করে তুলেছিল। একে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা ভাবলে ভুল হবে। ইউরোপে নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের

উদ্ভব তথা জার্মানি ও ইতালির আগ্রাসী বিদেশনীতির ধারাতেই আবিসিনিয়া অভিযান ঘটে। এর ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্রমভঙ্গুর কাঠামোটি আরও একটি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

আবিসিনিয়া আক্রমণের প্রেক্ষাপট হিসাবে কাজ করছিল ইতালির ক্রমপরিবর্তনশীল বিদেশনীতি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালির বিপর্যস্ত আর্থ-সমাজিক পরিস্থিতিতে মহাযুদ্ধে বিজয়লাভকে সার্থক মনে হয়নি। এত প্রশ্রয় পেয়েছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপ। বাগ্মী হিসাবে সুপরিচিত উগ্রজাতীয়তাবাদী কবি গাবরিয়েল দি'আনুনজিও ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সহযোগীদের নিয়ে ডালমাশিয়া উপকূলের ফিউম বন্দরে অভিযান চালান এবং স্বাধীন একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল ঐ অঞ্চলের ইতালীয়দের ইতালির অন্তর্ভুক্ত করা। পরবর্তীকালে ইতালি ও যুগোশ্লাভিয়া সন্ধিস্থাপন করলে এই উগ্রজাতীয়তাবাদীরা ইতালির প্রজাতান্ত্রিক সরকারের উপর বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করে। কারণ আড্রিয়াটিক অঞ্চলে যুগোশ্লাভিয়া গঠনকে এরা ইতালিয় স্বার্থের পরিপন্থী মনে করতেন।

অন্যদিকে, ইতালি অস্ট্রিয়ার সাথে জার্মানির সংযুক্তিকরণের বিরোধিতা করছিল। ইউরোপে ইতালি জার্মান-বিরোধী শিবিরেই অবস্থান করছিল। অস্ট্রিয়াই ছিল জার্মানি ও ইতালির মধ্যে প্রধান বিরোধের কারণ। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ইতালির এই জার্মান-বিরোধী মনোভাব বজায় থাকে। ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে হিটলার ভার্সাই চুক্তির পঞ্চম ধারায় কথিত নিরস্ত্রীকরণের শর্তটি সম্পূর্ণ অমান্য করার সিন্ধান্ত নেন। যার আশু ফল হবে জার্মানিতে সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক যোগদান, জার্মান স্থলবাহিনীর বিস্তার এবং বিমানবাহিনীর গঠন প্রাথমিকভাবে ইতালি এই জার্মান সামরিক উদ্যোগের বিরোধী ছিল এবং ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সাথে যৌথভাবে জার্মানির কার্যকলাপের আনুষ্ঠানিক বিরোধিতা জানায়। উত্তর-পশ্চিম ইতালির পিয়েডমন্ট রাজ্যের স্ট্রেসা শহরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে (এপ্রিল, ১৯৩৫) ইতালি, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীত্রয় ও বিদেশ সচিবরা উপস্থিত ছিলেন। এর থেকে জন্ম নেয় জার্মানবিরোধী তথাকথিত 'স্ট্রেসা ফ্রন্ট'। এই ফ্রন্ট ছিল এক প্রাক্তন শত্রুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তিনটি প্রাক্তন মিত্ররাষ্ট্রের দ্বারা গৃহীত শেষ ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ। অবশ্য এর কয়েকমাস পরে মুসোলিনি নিজেই আবিসিনিয়া অভিযান চালালে স্ট্রেসা ফ্রন্ট অর্থহীন হয়ে পড়ে।

হিটলারের বিদেশনীতি ইতিমধ্যেই ইউরোপীয় শক্তি ভারসাম্যে রদবদল ঘটিয়েছিল। তার মধ্যে সাম্প্রতিকতম পরিবর্তন ঘটেছিল ইতালির বিদেশনীতিতে। ১৯৩৫-৩৬ সালের শীতকালে ইতালি মিত্রপক্ষ ত্যাগ করে নাৎসি শিবিরে যোগদান করে। তার প্রথম প্রভাব লক্ষ্য করা গেল আবিসিনিয়া আক্রমণের মধ্য দিয়ে। ইতালীয় সাম্রাজ্যের গৌরববর্ধনের জন্য এই অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানের বিরোধিতা করার জন্য যে শক্তি সমবায়ের প্রয়োজন ছিল তা তখনও ইউরোপে দানা বেঁধে ওঠেনি। নাৎসি বিরোধী 'স্ট্রেসা ফ্রন্ট' বিপন্ন। অসহায় লিগ অফ নেশনস। সম্মিলিত নিরাপত্তার আশ্বাস অলীক বলে প্রমাণিত হল।

আবিসিনিয়াকে নিয়ে উনিশ শতক থেকেই ইতালির আগ্রহ ছিল। আফ্রিকায় ইতালীয় স্বার্থের সে সময় ক্রমশ বৃদ্ধি ঘটছিল। ১৮৯১ সালের এক চুক্তিতে ব্রিটেনও আবিসিনিয়াকে ইতালীয় 'প্রভাবাধীন এলাকা' বলে মেনে নিয়েছিল। ১৮৯৬ সালের আদোয়া'র (Adowa) যুদ্ধে পরাস্ত হলেও ইতালির পক্ষে কখনোই আবিসিনিয়াকে বাদ রেখে আফ্রিকায় ক্ষমতা বিস্তারের কথা ভাবা সম্ভব ছিল না। ভৌগোলিকভাবে আবিসিনিয়া ছিল ইতালির দুটি উপনিবেশের (ইরিট্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ড) মধ্যবর্তীস্থানে। দেশটি পশ্চাৎপদ, তবে খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। ১৯০৬ সালের ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালি আবিসিনিয়ায় নিজ নিজ এলাকা মেনে চলতে সম্মত হয়। এটি ইতালির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক জয় ছিল। ১৯২০-এর দশকে ইতালির ভূমিকা কিছুটা ভিন্ন ধরণের। ১৯২৩ সালে ইতালীয় সমর্থনে আবিসিনিয়ার লিগ অফ নেশনসে অন্তর্ভুক্তি

বা ১৯২৮ সালের ইতালি আবিসিনিয়া 'বন্ধুত্ব ও সমঝোতা' চুক্তি পরবর্তীকালের ইতালীয় আগ্রাসী নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। কিন্তু ১৯৩০-এর দশকে নাৎসি বিদেশনীতির কল্যাণে ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে থাকে।

ইতালীয় আগ্রাসনের সময় আফ্রিকায় লাইবেরিয়া ব্যতীত একমাত্র আবিসিনিয়াই ছিল স্বাধীন দেশ। ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আবিসিনিয়া ও ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডের সীমান্তবর্তী ওয়ালওয়াল অঞ্চলে দুপক্ষের সেনাবাহিনীর সংঘর্ষে কয়েকজন ইতালীয় সৈন্য মারা গেলে মুসোলিনি আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা খর্ব করতে উদ্যোগী হন। প্রথমে ক্ষমাপ্রার্থনার দাবী ও পরে যুদ্ধের হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে আবিসিনিয়া লিগ অফ নেশনসের হস্তক্ষেপ দাবী করে। লিগ এই পরিস্থিতিতে অসহায়। ইউরোপে ফ্রান্স ইতালির বিরোধিতা করেনি এই ভরসায় যে ইতালির উত্থান ইউরোপকে এককেন্দ্রিক জার্মান অধিপত্য থেকে মুক্ত রাখবে। ব্রিটেন কোনও ভাবে ইতালির সাথে যুদ্ধে জড়াতে রাজী ছিল না। কার্যত আবিসিনিয়ায় ইতালির স্বেচ্ছাচারিতাকে ফ্রান্স স্বীকৃতি দেওয়ায় মুসোলিনির পক্ষে আবিসিনিয়াকে সম্পূর্ণ দখল করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা সহজ হয়ে যায়। বস্তুত, স্ট্রেসা সম্মেলনের পরে ইউরোপে কোন বাধার সম্মুখীন হতে হবে না জেনে মুসোলিনি তার আফ্রিকা নীতিকে কার্যকরী করতে উৎসাহিত বোধ করেন। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেন ১৯৩৫ সালের গ্রীষ্মে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় এগিয়ে আসে। ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ডের জেইলা বন্দরটি আবিসিনিয়াকে দিয়ে তার পরিবর্তে আবিসিনিয়ার ওগাদেন অঞ্চলটি ইতালিকে দেওয়ার প্রস্তাব দেয় ব্রিটেন। এই প্রকল্পটি মুসোলিনির পছন্দসই ছিল না, কারণ তা ইতালির পক্ষে যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন মুসোলিনি। অন্যদিকে জেইলা বন্দরের মাধ্যমে স্থলবেষ্টিত আবিসিনিয়াকে সমুদ্রসান্নিধ্য দিতে ইতালি নারাজ ছিল। শেষপর্যন্ত ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে ইতালির আবিসিনিয়া অভিযান শুরু হল।

ইতালির আগ্রাসন শুরু হলে লিগের সদস্য রাষ্ট্রগুলির সামনে এক দায় এসে পড়ে। লিগের সনদের ১৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছিল যে লিগের কোন একটি সদস্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার অর্থ সকল সদস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। বাধ্য হয়েই লিগকে ইতালির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ (১৮ নভেম্বর, ১৯৩৫) জারি করতে হল। তবে, ইতালির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ তৈলের আমদানীকে এর বাইরে রাখায় অবরোধের গুরুত্ব কমে গিয়েছিল। উপরন্তু, ফ্রান্স ইতালির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে নিমরাজি হওয়ায় অবরোধের কার্যকারিতা ছিল খুবই কম। লিগের এই দুর্বলতা আরও পরিস্ফুট হল হোর-লাভাল পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে।

ব্রিটিশ বিদেশ সচিব স্যর স্যামুয়েল হোর ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী পিয়ের লাভালের তথাকথিত হোর-লাভাল পরিকল্পনায় (৮ ডিসেম্বর, ১৯৩৫) ইতালিকে তুষ্ট করতে আবিসিনিয়াকে ভাগ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। এতে ব্রিটেন ও ফ্রান্সে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এবং প্রকল্পটির পরিসমাপ্তি হয়। এধরণের ভাবনা ক্ষুদ্র সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রতি দায়িত্ব পালনে লিগের ব্যর্থতাকে চিহ্নিত করল।

যুদ্ধের প্রথম তিন মাসে ইতালি আশানুরূপ অগ্রগতি ঘটাতে পারেনি। ইতালীয় বাহিনী বোমাবর্ষণকারী বিমানের সহায়তায় আবিসিনিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারলেও ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসের আগে ইতালীয় বাহিনীর তেমন অগ্রগতি ঘটেনি। পার্শ্ববর্তী ইরিট্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডে থেকে যৌথভাবে আক্রমণ চালিয়ে ইতালি এপ্রিল মাসের মধ্যে রাজধানী আদ্দিস আবাবা ও দেশের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ দখলের দিকে অগ্রসর হয়। পয়লা মে আবিসিনিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি দেশ ছেড়ে পালান, এই আবিসিনীয় প্রতিরোধের অন্ত ঘটে। কয়েকদিনের মধ্যে ইতালীয় বাহিনী আদ্দিস আবাবা'র দখল নেয়। ৯ মে ১৯৩৬ সালে ইতালির রাজা আবিসিনিয়ার সম্রাট বলে ঘোষিত হলে দেশটি ইতালির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

ইতালির বিজয় দুটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশক ছিল। একদিকে লিগ অফ নেশনসের ব্যর্থতা এবং ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের ইতালির সঙ্গে যুদ্ধ এড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা ভবিষ্যতে ইউরোপের তথা বিশ্বের দেশগুলির বিশেষত কম শক্তিধর দেশগুলির নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে প্রকট করে তুলল। তবে লিগের সমস্যা সংকুল পর্বেও সদস্যরাষ্ট্রগুলি এক বিশেষ সম্মেলনে (জুলাই, ১৯৩৬) লিগের সনদের আদর্শ মেনে চলতে প্রতিশ্রুত হয়েছিল, যদিও তা বাস্তব রাজনীতিতে কতদূর প্রভাব ফেলল তা বিতর্কের উর্ধ্বে নয়।

অন্যদিকে ইউরোপীয় মহাদেশে জার্মান বিদেশনীতি আরও একধাপ অগ্রসর হল আবিসিনিয়াকে কেন্দ্র করে কেবল যে ইতালি জার্মানির সুহৃদ হয়ে উঠল তাই নয়, জার্মানিও অস্ট্রিয়াকে নিজের সাথে 'সুংযুক্তিকরণ' করতে ইতালির কাছ থেকে ছাড়পত্র পেয়ে গেল। এতদিন ইউরোপে ইতালি ছিল স্বাধীন অস্ট্রিয়ায় সমর্থক। পরিস্থিতির সুযোগ নিতে জার্মানি রাইলন্যাণ্ড অধিকারের প্রয়াস নিল। গড়ে উঠল রোম-বার্লিন অক্ষ। ভার্সাই বা লোকার্নো, কোনও চুক্তিরই বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা রইল না। আন্তর্জাতিক শক্তিসাম্য টলে গেল। শেষ হল জার্মানির একাকিত্ব।

৮.৪ স্পেনের গৃহযুদ্ধ (১৯৩৬-৩৯)

উনিশশো ত্রিশের দশকের ইউরোপের আগ্রাসী নাৎসি ও ফাসিস্ত বিদেশনীতির একটি ক্ষেত্র যদি হয় আবিসিনিয়া, তবে অপর আর একটি ক্ষেত্র হিসাবে সহজেই স্পেনকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধ আন্তর্জাতিক রাজনীতির ময়দানে আদর্শ নৈতিকভাবে যুযুধান দুই পক্ষকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। নামে গৃহযুদ্ধ হলেও কার্যত এক্ষেত্রে বৈদেশিক শক্তির অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। সমকালের ইউরোপের রাজনৈতিক তৎপরতায় কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছিল গৃহযুদ্ধকালীন স্পেন।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে ১৯৩৬ সালের ১৮ জুলাই। ঐ বছরের ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আজানিয়া (Azana) ও তার পপুলার ফ্রন্ট প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কো (Franco) ও জেনারেল সানহুরহো'র (Sanhurho) নেতৃত্বে মরোক্কোয় সেনাবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পুর্ববর্তী পাঁচ বছর ধরে স্পেনের দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সূচনা থেকে বামপন্থীরা বিশেষত সমাজবাদী দল যে সব সংস্কার আরম্ভ করেছিল তাতে স্পেনের ধর্মীয় ও ভুমধ্যকারী স্বার্থগোষ্ঠীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। ১৯৩৩ সালের নির্বাচনে দক্ষিনপন্থী শক্তি জয়লাভ করলেও দ্রুত শ্রমিক বিপ্লব ঘটে ও বামপন্থীরা ক্ষমতায় ফিরে আসে। আইনী পথে সনাতনী সমাজকাঠামো তথা স্বার্থরক্ষা করা যাবে না বুঝতে পেরে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে উচ্ছেদের প্রয়াস চলতে থাকে। সমাজবাদী, নৈরাজ্যবাদী ও সাম্যবাদীদের নিয়ে গঠিত পপুলার ফ্রন্টের মুখোমুখি হয় ধর্মীয় রক্ষণশীল গোষ্ঠী, জাতীয়তাবাদী এবং ফালান্‌জে (Falange) নামে পরিচিত একটি ফাসিবাদী দল। বস্তুত এই সংঘাত সমকালীন ইউরোপীয় সমাজ ও রাজনীতির একটি ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব ছিল। শীঘ্রই স্পেনের গৃহযুদ্ধ ইউরোপীয় আদর্শগত লড়াইয়ের চেহারা নেয়।

স্পেনের পরিস্থিতি নিয়ে ইউরোপীয় শক্তিগুলির দৃষ্টিভঙ্গী অভিন্ন ছিল না। ব্রিটেন নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছিল, বরং উদগ্রীব ছিল ইতালির সাথে সম্পর্ক মজবুত করার জন্য। ব্রিটেন চায়নি জার্মানি ও ইতালির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়ে ব্রিটেনের স্বার্থ সিদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটাক। অন্যদিকে স্পেনের বামপন্থীদের পরাজয় ব্রিটেনের আকাঙ্খিত ছিল, কেননা তাহলে মহাদেশজোড়া সাম্যবাদের ভয়ের হাত থেকে রেহাই মিলবে। ফ্রান্সও নিরপেক্ষতাপন্থী ছিল এবং স্পেনের মত পরিস্থিতি যাতে দেশের অভ্যন্তরে সৃষ্টি না হয় তারজন্য ইউরোপীয়

শক্তিগুলির মধ্যে নিরপেক্ষতাধর্মী সমঝোতায় উদ্যোগী হয়। তবে জার্মানি ইতালি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশগ্রহন সত্ত্বেও নিরপেক্ষতাবাদী জোট কার্যত একটি কাগুজে সংগঠন ছিল। প্রতিটি দেশই স্পেনের গৃহযুদ্ধে সক্রিয় সমর্থন যোগায়। সৈন্য, যুদ্ধাস্ত্র, রসদ ও উপদেষ্টা প্রেরণের মাধ্যমে এই সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের চারটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ছয় মাসে বিদ্রোহীরা উন্নততর সামরিক শক্তির দ্বারা দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল দখল করে। এই পর্যায়ে ইতালি ও জার্মানির প্রত্যক্ষ মদতে ফ্রাঙ্কোবাহিনী মরোক্কো থেকে স্পেনে আসে। অক্টোবর মাসে ফ্রাঙ্কো নিজেকে স্পেনের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ঘোষণা করেন। সানহুরহো'র মৃত্যুর পর তিনিই ফ্যাসিবাদীদের অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠলেন। কাদিজ, সারাগোসা, সেভিয়া ও বুরগোস শহর বিদ্রোহীদের দখলে এল। দেশের উত্তর ও পূর্বভাগে শহুরে শ্রমিক ও খনি-মজুরদের অনমনীয় মনোভাব ও অদম্য লড়াই এবং কাতালোনিয়া ও বাস্কদের স্বায়ত্বশাসনের প্রবল ইচ্ছার জোরে প্রজাতান্ত্রিক সরকার ঐ অঞ্চলগুলিতে বিদ্রোহীদের ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল। মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, বিলবাও ও ভ্যালেন্‌সিয়া ছিল পপুলার ফ্রন্টের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু ফ্রাঙ্কো পর্তুগালের সঙ্গে সীমান্তবর্তী অঞ্চল দখল করায় রসদ সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ পথটি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন।

গৃহযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হল ১৯৩৭ সালে। মাদ্রিদকে বিচ্ছিন্ন করতে বিদ্রোহীদের প্রবল প্রয়াস এ সময় ব্যর্থ হয়। মাদ্রিদ-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গুয়াদালাহারা'র যুদ্ধে মুখ্যত ইতালীয় সৈন্যসম্পন্ন ফ্রাঙ্কো বাহিনীকে পরাস্ত করে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার ইতালীয় 'স্বেচ্ছাসেবক' এসময় ফ্রাঙ্কোর হয়ে লড়েছিল। বিদ্রোহীরা তেরুয়েল শহর দখল করেও ধরে রাখতে বার্থ হল। তবে, উত্তর স্পেনে বাস্ক প্রভাবিত গুরুত্বপূর্ণ বিলবাও বন্দরটি তারা জুন মাসে দখল করল।

গৃহযুদ্ধের তৃতীয় পর্যায়ে ১৯৩৮ সালে ইতালি ও জার্মানি অধিকতর হারে জাতীয়তাবাদী ফ্রাঙ্কোর বাহিনীকে সমর্থন করতে শুরু করল। অন্যদিকে পপুলার ফ্রন্টকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন ১৯৩৭ সালের বসন্তকাল থেকেই দ্রুতহারে কমে আসছিল। জার্মান বিমানবহরের ব্যাপক সহায়তায় ফাসিস্তরা একে একে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুলিকে নিজেদের দখলে আনতে শুরু করল। মাদ্রিদ প্রায় সমগ্র বৎসরব্যাপী অবরোধ আক্রান্ত হয়ে রইল। সে বছরের শীতে ফ্রাঙ্কোবাহিনী কাতালান প্রতিরোধেও ভাঙন ধরাতে সমর্থ হল।

গৃহযুদ্ধের অন্তিম পর্যায়ে ১৯৩৯ সালে পপুলার ফ্রন্ট দ্রুত অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়। ২৬ জানুয়ারি বার্সেলোনা এবং ২৮ মার্চ মাদ্রিদ ও ভ্যালেন্‌সিয়ার শেষ প্রজাতান্ত্রিক দুর্গগুলিও ফ্রাঙ্কোর কাছে আত্মসমর্পন করল। যুদ্ধ, অসুস্থতা ও রাজনৈতিক নিপীড়নে মারা গেলেন পাঁচ থেকে আট লক্ষ মানুষ। হাজার হাজার মানুষ হলেন নির্বাসিত। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে আধুনিক স্পেনের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার (১৯২৩-৩০ প্রথম একনায়কতান্ত্রিক শাসন চলেছিল) একনায়কতান্ত্রিক শাসন ফিরে এল।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে কেবল স্পেনের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সকরার উৎখাত হয়নি, আন্তর্জাতিক রাজনীতির মঞ্চে উল্লেখনীয় রদবদল ঘটল। গৃহযুদ্ধের পরেই স্পেন-জার্মানি-জাপান-ইতালি সমন্বিত কমিনর্টান-বিরোধী জোটে প্রবেশ করে আগামী দিনে তার ভূমিকার ইঙ্গিত দিল। ফ্রান্স এই গৃহযুদ্ধের ফলে অবস্থানগত ভাবে সবচেয়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে রইল, কেননা স্পেন-জার্মানি মৈত্রী ফ্রান্সকে উভয় দিকের বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে দিল। জার্মান সমরবাহিনীর বিশেষত বিমানবহরের যুদ্ধকৌশল আগামী বিশ্বযুদ্ধের রণকৌশলের ইঙ্গিত রাখল। স্পেনের গৃহযুদ্ধের একটি বৈশিষ্ট্য হল ব্যাপকহারে আন্তর্জাতিক জনমত গঠন। এই জনমত

গঠিত হয়েছিল পপুলার ফ্রন্টের পক্ষে। প্রজাতান্ত্রিক সরকারের স্বপক্ষে ইন্টারন্যাশানাল ব্রিগেডে লড়ছিল ইতালি ও জার্মানির ফাসি-বিরোধী ও নাৎসি বিরোধী জনগণ, সোভিয়েত জনগণ তথা বিশ্বের নানা প্রান্তের কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকরা। ই, এইচ্. কার মন্তব্য করেছেন, স্পেনীয় গৃহযুদ্ধ স্পেনের মাটিতে প্রায় এক ইউরোপীয় গৃহযুদ্ধের রূপ নিয়েছিল। অন্যদিকে ফাসিবাদী শক্তিও সংহত হচ্ছিল। জার্মানির শক্তি সামর্থে অভিভূত মুসোলিনি ১৯৩৬ সালের এক বক্তৃতায় মন্তব্য করেছিলেন যে রোম-বার্লিন অক্ষকে কেন্দ্র করেই আগামী দিনে সহযোগিতা ও শান্তির ভিত্তিতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতি আবর্তিত হবে। এই রোম-বার্লিন অক্ষই আগামী দিনে অক্ষশক্তির চেহারা নেবে। বস্তুত স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় থেকে জার্মানির প্রতি ইতালির সন্দেহপূর্ণ ও অবিশ্বাসী মনোভাবকে ছাপিয়ে উঠে এক সাধারণ একমুখী সম্প্রসারণবাদ উভয় দেশের বন্ধনকে দৃঢ় করে। ইতালি জার্মানির এবং মুসোলিনি হিটলারের অধস্তন সহযোগীতে পরিণত হতে থাকেন এবং ইতালি শীঘ্রই জার্মানি ও জাপানের মধ্যে গড়ে ওঠা কমিনটার্ন-বিরোধী জোটে যোগ দেয়। আবার, স্পেনের গৃহযুদ্ধের রেশ ধরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমী গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এককথায় উনিশশো ত্রিশের দশকের শেষের ইউরোপ দশকের সূচনার সময়কালের তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন।

৮.৫ রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষ

ইতালি, জার্মানি ও জাপানের মৈত্রী উনিশশো ত্রিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে থাকে। পরবর্তীকালে ইউরোপে তথা বিশ্ব যে দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাবে তার পূর্বসূচনা ছিল এধরনের ‘অক্ষের’ গঠন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই দেশগুলি একজাতিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে পরস্পরের সহযোগীতে পরিণত হয়।

ইতালি ও জার্মানি সম্পর্কের সূচনা হয় স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সময় থেকে। এর পূর্বে ইতালির আবিসিনিয়া অভিযানের সময় জার্মানি ও ইতালি নিকটতর হলেও ১৯৩৬ সালে থেকেই এই দুটি রাষ্ট্র পারস্পরিক মিত্রে পরিণত হয়। মহাদেশে অষ্ট্রিয়ার অবস্থান কী হবে—স্বায়ত্বশাসন না জার্মানির সাথে ‘সংযুক্তিকরণ’—তা নিয়ে দুটি দেশের যে বিরোধ ছিল তা দ্রুত জার্মানির সপক্ষে নিষ্পত্তি লাভ করছিল। ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই স্বাক্ষরিত অস্ট্রো-জার্মান ‘ভদ্রলোকের চুক্তি’কে মুসোলিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। একই সময়ে স্পেনে জার্মান সমরযন্ত্রের কুশলী কার্যক্রম মুসোলিনিকে সম্ভাব্য মিত্র খুঁজে নিতে সাহায্য করল। ১৯৩৬ সালের ১ নভেম্বর মিলান শহরে এক বক্তৃতায় মুসোলিনি বলেন, ‘একটি মহান দেশ সম্প্রতি ইতালির জনগণের প্রতি বিপুল সহমর্মিতা দেখিয়েছে। আমি জার্মনির কথা বলছি। ...... এই বার্লিন-রোম রেখাটি কোন বহিরাবরণ নয়, বরং এটি একটি অক্ষ যার চারপাশে সহযোগিতা ও শান্তির ওপর ভিত্তি করে চলতে ইচ্ছুক সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্র আবর্তিত হবে।’ ইতালি ও জার্মানির তৎকালীন দুই বিদেশমন্ত্রী যথাক্রমে কাউন্ট গ্যালিয়াজো চিয়ানো ও ব্যারন ফন নিউরাথ ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে এক সমঝোতার মধ্য দিয়ে ইতিপূর্বেই বিশ্বরাজনীতির সকল বিষয়ে সমধর্মী অবস্থান রাখতে সম্মত হয়েছিলেন। এই সমঝোতা তথাকথিত ‘অক্টোবর প্রোটোকল’ নামে পরিচিত। এই গোপন সমঝোতায় স্পেন ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের ক্ষেত্রে দুটি দেশের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তাছাড়া বার্লিন সমঝোতার আরও একটি গুরুত্ব ছিল এই যে, কাউন্ট চিয়ানোর মাধ্যমে একটি গোপন ব্রিটিশ নথি জার্মানির হস্তগত হয়। রোমের ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে সংগৃহীত ঐ নথিতে ‘জার্মান বিপদ’ সম্পর্কে আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়েছিল। চিয়ানোর ভাষায় ঐ নথিটির প্রচণ্ড অভিঘাত হয় ফুয়েরারের ওপর। ঐ সময় থেকেই হিটলার ব্রিটিশ-বিরোধী নীতি অনুসরণ করতে থাকেন। একে একে ব্রিটেনের নানাবিধ প্রস্তাব, যথা

লিগ অফ নেশনসে জার্মানির প্রত্যাবর্তন, ফ্রান্সের সাথে জার্মানির অনাক্রমণ চুক্তি, রাইনল্যান্ডকে অস্ত্রমুক্ত রাখা প্রভৃতি হিটলার প্রত্যখ্যান করেন। পাশাপাশি মুসোলিনি মিলান-বক্তৃতায় ইতালি ও জার্মানির স্বার্থের ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করায় রোম-বার্লিন সম্পর্ক নতুন মাত্রা পায়। ব্রিটেন এই নব্য অক্ষের বিস্তারে কূটনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চাইলেও তাতে বিশেষ ফল হয়নি।

রোম-বার্লিন অক্ষের ক্ষেত্রে বাড়তি উদ্যোগ দেখা যায় ১৯৩৭ সালের দ্বিতীয়ার্ধে। সেপ্টেম্বর মাসে মুসোলিনি বার্লিন সফর করেন। এই সফরের দুটি ফল লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, জার্মানির শক্তিমত্ততায় মুগ্ধ মুসোলিনি এই সময় থেকেই হিটলারের অধস্তন শক্তিতে পরিণত হন। অর্থাৎ আগামীদিনে অক্ষশক্তির অভ্যন্তরীণ শক্তিবিন্যাসে জার্মানির নিরিখে ইতালির স্থান হবে দ্বিতীয়। দ্বিতীয়ত, এই সফর ইতালি ও জার্মান সম্পর্ককে আরও মজবুত করে। ঐ বছরের ৬ নভেম্বর ইতালিও জার্মানি ও জাপান-সমন্বিত কমিনটার্ন-বিরোধী জোটে যোগ দিল এবং ১১ ডিসেম্বর লিগ অফ নেশনসের সদস্যপদ ত্যাগ করে জার্মানির সাথে একাসনে বসল। জার্মানির ইউরোপে মিত্রলাভ ক'রে আরও বলীয়ান হয়ে উঠতে শুরু করল। মিত্রতার নিদর্শনরূপে হিটলার রোম সফর করলেন ১৯৩৮ সালে এবং সেখানে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হলেন।

অক্ষশক্তির উত্থানের একটি অধ্যায় যদি ইউরোপে রচিত হয় তবে অন্য একটি পর্ব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল পূর্ব এশিয়ায় চীন ও জাপানকে কেন্দ্র করে। নাৎসি ক্ষমতাদখলের সময় ও তার পরেও জার্মানি চীনের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে চলছিল। উনিশ শতক থেকেই চীনের বিরাট বাজার জার্মান পণ্য দ্রব্যের জন্য আকর্ষণীয় ছিল। জার্মান শিল্পের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের উৎস ছিল চীন। এই পরিস্থিতির রদবদল হল ১৯৩৭ সালের শেষদিক থেকে। ঐ সময়ে চীনে জাপানি সম্প্রসারণ নীতিতে ব্রিটিশ-মার্কিন স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। ১৯৩৮ সালের শুরুতে জাপানি আগ্রাসনের বিরোধী শক্তিগুলো পরস্পরের নিকটতর হয়। অন্যদিকে জার্মানি তার চীন-পন্থী নীতি ত্যাগ করে জাপানকে মিত্র রূপে পেতে আগ্রহ প্রদর্শন করতে থাকে। এই রদবদলের কারণ ছিল তদানীন্তন জার্মান বিদেশ নীতি।

পূর্ব এশিয়ায় জার্মান বিদেশনীতির রদবদলের অন্তর্নিহিত কারণটি বোঝা যাবে তদানীন্তন ইউরোপে জার্মান স্বার্থের প্রসঙ্গাটি বিচার করলে। ১৯৩৭ সালের ৫ নভেম্বর হস্‌বাখ স্মারকলিপিতে হিটলারের বিদেশনীতির রূপরেখাটি পরিস্ফুট হয়েছিল। জার্মানির ধারণা ছিল চীনে জাপানের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। ঐ যুদ্ধে ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে চীনের মিত্রশক্তি হিসাবে ব্যস্ত রাখতে পারলে ইউরোপে জার্মানির লক্ষ্যপূরণ সহজ হবে। অর্থাৎ পূর্ব-এশিয়ায় জার্মান নীতির রদবদল ইউরোপে জার্মান স্বার্থের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। বিশেষত তৎকালীন জার্মান বিদেশমন্ত্রী জোয়াকিম ফন রিবেনট্রপ এই পরিকল্পনাটিকে জার্মানির উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে জরুরি মনে করেছিলেন। ১৯৩৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি জার্মান আইনসভা রাইখস্টাগে বক্তৃতাকালে হিটলার সাম্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জাপানকে অভিনন্দন জানান এবং ঘোষণা করেন যে জার্মানি সরকারিভাবে মাঞ্চুকুয়ো সরকারকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। এসময় থেকেই জাপান ও জার্মানি ক্রমশ নিকটতর হতে থাকে এবং কমিনটার্ন-বিরোধী জোটের (নভেম্বর, ১৯৩৬ সালে স্বাক্ষরিত) থেকে দৃঢ়তর ও ঘনিষ্ঠতর জোট গড়ে তুলতে চায়। জাপানের সেনা-বাহিনীর একাংশ ও অর্থতন্ত্রকও ইতালি ও জার্মানির মত 'সর্বহারা' শক্তিগুলোর সাথে জোট বাঁধার ওপর গুরুত্ব দেয়। এরই ফল রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষ। তবে তৎকালীন জাপানি প্রধানমন্ত্রী কোনো ফুমিমারো তখনও সর্বতোভাবে জার্মানির সাথে সহযোগিতা করে আমেরিকাকে অখুশী করতে চাইছিলেন না। সাধারণতভাবে অবশ্য পূর্ব এশিয়ায় জার্মান নীতিবদলকে জাপান স্বাগত জানাল। রোম-বার্লিন অক্ষের সাথে জাপান ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিল এবং তা ছিল ঘরে-বাইরে কঠোর জাপানি নীতির সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ। জার্মানি ও জাপান নিজ নিজ লক্ষ্যপূরণে পরিপূরক হয়ে উঠছিল। জার্মানি চাইছিল পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটেন ও

সোভিয়েত ইউনিয়নকে ব্যস্ত রেখে ইউরোপে তার সুযোগ নেওয়ার, জাপান অন্যদিকে চাইছিল ইউরোপে জার্মানভীতির সাহায্যে পূর্ব এশিয়াতে সোভিয়েত ও ব্রিটিশ প্রাধান্য খর্ব করতে। উপরন্তু, জার্মান প্রশাসনিক কাঠামোটি জাপানি স্থলসৈন্য বাহিনীর বিশেষ মনঃপুত ছিল। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে এই উদ্দেশ্যে জাপানে যে আইনটি (National General Mobilization Law) পাশ করা হয় তার লক্ষ্য ছিল জাপানের জাতীয় জীবনকে সর্বতোভাবে সামরিক নৈপুণ্য অর্জনের জন্য চালনা করা। জাপানি আইনসভা ডায়েট অবশ্য এই ধরণের আইনের ব্যবহার যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতেই একমাত্র ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু এই আইনটি জাপানকে টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রগঠনের পথে নিয়ে গেল। জাপানে অধিষ্ঠিত ব্রিটিশ রাজদূত মন্তব্য করেছিলেন যে, চিরকালের জন্য জাপানি সেনাবাহিনীর কাছে স্বাধীনতা হারাতে হল।

তবে এতেও জাপানের সমস্য মিটল না। জাপানি প্রশাসনের সর্বস্তরে অক্ষশক্তির প্রতি মনোভাব এক রকম ছিল না। বিদেশমন্ত্রী আরিতা হাচিরো ও জাপানি নৌবাহিনী যেখানে জার্মানি-জাপান মিত্রতাকে সোভিয়েত-বিরোধিতার স্তরেই সীমাবন্ধ রাখতে চাইছিলেন, জাপানি স্থলবাহিনীর প্রধানরা সেখানে ব্রিটেন ও ফ্রান্সকেও একইসাথে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করতে চাইছিলেন। লক্ষ্যণীয়, স্থলবাহিনীর এই আকাঙ্ক্ষা ইউরোপে জার্মান চাহিদার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল। এই দ্বন্দ্বের পলে ১৯৩৯ সালের জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী কোনো ফুমিমারো পদত্যাগ করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাপানের অবস্থা তখন বিশেষ সুবিধানজনক নয়। উগ্র চীন নীতি জাপানকে আমেরিকার বিরোধী করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে জার্মানির সাথে সৌহার্দ্য স্থাপন করে জাপানি রাষ্টশক্তি বাঁচার পথ অনুসন্ধান করছিল। জাপানি স্থলবাহিনী জার্মানির সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক রচনা করতে জাপান সরকারকে কার্যত বাধ্য করছিল। জাপানি বিদেশনীতি অবশ্য পুরোপুরি সফল হল না। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জার্মানিকে পাশে পাওয়ার আশা পুরোপুরি পূর্ণ হল না, কেননা ইউরোপে জার্মানি নিজ স্বার্থরক্ষার তাগিদেই নাৎসি-সোভিয়েত অনাক্রমণ সন্ধি (আগস্ট, ১৯৩৯) রচনা করে। জাপানের কাছে এটি একটি আঘাত ছিল। চীন নীতির জন্য পশ্চিমী দেশগুলির সাথে আগেই জাপানের দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, নাৎসি-সোভিয়েত সন্ধি তার সমস্যা আরও বৃদ্ধি করল।

৮.৬ তোষণনীতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে জার্মানির প্রতি ব্রিটেনের মনোভাবকে তোষণমুখী হিসাবে সাধারণত চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন হিটলারকে তোষণ করতে গিয়ে অন্যান্য দেশকে সংকটাপন্ন করেছেন এই জাতীয় একটি ধারণা প্রচলিত আছে। জার্মানির প্রতি ব্রিটেনের আপোসমুখী মনোভাব ব্রিটেনের তোষণনীতি হিসাবে পরিচিত। অন্যদিকে জার্মানির প্রতি ফ্রান্সের ভূমিকা বা মনোভঙ্গি কী ছিল তাও বিচার্য বিষয়। এ সময় ফ্রান্সের দুর্বলতা জার্মানিকে কতদূর সাহায্য করেছিল তা এক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়।

৮.৬.১ ব্রিটেনের তোষণনীতি

১৯৩৭ সালে চেম্বারলেন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে স্ট্যানলি বল্ডউইনের স্থলাভিষিক্ত হন। তার সাথে ব্রিটিশ বিদেশনীতিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। বিদেশনীতি প্রসঙ্গে চেম্বারলেনের মতামত তার পূর্বসূরীর তুলনায় অনেক বেশি সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ছিল। তিনি মনে করতে থাকেন যে, সঠিক বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন

দেশের একনায়কতান্ত্রিক শাসকদের অভাব অভিযোগ অনুধাবন করা উচিত এবং সেইমত তাদের তুষ্ট করতে একটি সাধারণ তোষণনীতি অনুসরণ করাই বিধেয়। চেম্বারলেনের এই ধারণা গড়ে ওঠার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মঞ্চে দুটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। প্রথমত, যৌথ নিরাপত্তা ও লিগ অফ নেশনসের প্রতিশ্রুতি কার্যত অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল এবং দ্বিতীয়ত, ফ্যাসিবাদী ও নাৎসি শক্তির হাতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশ বিপন্ন ও অধিকৃত হয়েছিল, চেম্বারলেনের নীতি সেই বিপন্নতাকে আরও বাড়িয়ে তুলত।

চেম্বারলেন তার তোষণনীতির সার্থক রূপায়নের জন্য মুসোলিনির সাথে সৌহার্দ্য গড়ে তুলতে চাইলেন। তার প্রস্তাব ছিল যে, ব্রিটেন আনুষ্ঠানিক ভাবে আবিসিনিয়ায় ইতালীয় উপনিবেশকে স্বীকৃতি দেবে, প্রত্যুত্তরে ইতালি ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় ব্রিটিশ স্বার্থকে সম্মান জানাবে এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধ অবসান হওয়ার পর স্পেন থেকে তার (ইতালির) 'স্বেচ্ছাসেবকদের' সরিয়ে নেবে। যদিও বিদেশদপ্তরের এতে সায় ছিল না, কেননা এ ধরনের উদ্যোগ যৌথ নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করবে এবং ফ্রাঙ্কো ও মুসোলিনিকে উৎসাহ ব্যঞ্জক পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে। ক্রমে জাপান, জার্মানি ও ইতালির কমিনটার্ন-বিরোধী জোট সক্রিয় হয়ে উঠলে চেম্বারলেন ঐ জোটের নেতা হিটলারের প্রতি নরম মনোভাব দেখাতে আরও আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং তদনুযায়ী তোষণনীতি অনুসরণ করতে থাকেন।

ইতিহাস চর্চায় এই তোষণনীতি সংক্রান্ত ধ্যানধারণার প্রভূত পরিবর্তন বিগত কয়েক দশক ধরে লক্ষ্য করা গেছে। মার্টিন গিলবার্ট ও রিচার্ড গট ১৯৬০-এর দশকে বিশ্বযুদ্ধের জন্য চেম্বারলেনের আপোসমুখী ও পরাজিত মনোভাবকেই দায়ী করেছিলেন। এর বিপরীতে অধ্যাপক ক্যামেরন ওয়াট সংশোধনবাদী (Revisionist) বক্তব্য পেশ করেন। তার মতে, নেভিল চেম্বারলেনকে আদ্যন্ত জার্মান তোষণকারী আখ্যা দেওয়া যায় না। অ্যান্ড্রুক্রোজিয়ের তার **দি কজেস অফ দি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার** গ্রন্থে (১৯৯৭) এই অভিমত পেশ করেছেন যে হিটলারের বিদেশনীতির স্বরূপ ব্রিটেনের অজানা ছিল ; অন্তত ১৯৩৯ সালের প্রথম দিকেও জার্মান নীতির মূল লক্ষ্য ও ধাপে ধাপে তা অর্জনের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপটি ব্রিটিশ সরকার অনুমান করতে পারেনি। ভার্সাই সন্ধির সময় থেকেই ব্রিটেন ঐ সন্ধির কয়েকটি শর্ত পরিবর্তনের ইচ্ছা পোষণ করত, বিশেষত যেগুলির জন্য ইউরোপের আর্থিক প্রগতি ব্যাহত হবে। ব্রিটেন চেয়েছিল ভার্সাই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে জার্মানিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে একাসনে বসাতে। এভাবেই ইউরোপে স্থিতিশীলতা আসতে পারে বলে ব্রিটিশ মহলে মনে করা হত। ক্রোজিয়েরের মতে, এই হল তোষণনীতি ; তোষণের অর্থ ইউরোপীয় পরিস্থিতির তোষণ তথা ইউরোপে শান্তিস্থাপন। তোষণের উদ্দেশ্য স্থিতিশীল জার্মানি গঠনের মাধ্যমে স্থিতিশীল ইউরোপ নির্মাণ। তার মতে, তোষণনীতি বলতে যেমন শান্তিরক্ষার্থে কোন দুষ্ট রাষ্ট্রে অন্যায় অযৌক্তিক দাবী পূরণ বোঝায় ব্রিটিশনীতি তার থেকে পৃথক ছিল। ১৯১৯ সাল থেকে সব ব্রিটিশ সরকারই তোষণনীতি অনুসরণ করেছে, চেম্বারলেন এই নীতির স্রষ্টা নন। তবে ১৯৩৩ সালে ব্রিটেনের চ্যান্সেলর অফ এক্সচেকার (অর্থমন্ত্রী) হওয়ার পর থেকে ব্রিটিশ নীতির চূড়ান্ত রূপদানে চেম্বারলেনের অবশ্যই ভূমিকা ছিল। বিগত তিন দশক ব্যাপী গবেষণার নিত্যনূতন ধারায় দেখা গেছে যে আলোচ্য সময়ের ব্রিটিশ বিদেশনীতিতে তোষণকারী ও তোষণ বিরোধী হিসাবে পরিচিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কার্যত একে অপরের পরিপূরক। নেভিল চেম্বারলেনের তোষণনীতির সহযোগী হিসাবে ব্রিটিশ দপ্তর তথা বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ইডেন ক্রিয়াশীল ছিলেন, তোষণ বিরোধী হিসাবে নন।

৮.৬.২ তোষণনীতি ও ফ্রান্স

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে পশ্চিমী দেশগুলোর মধ্যে কূটনৈতিক আসরে ব্রিটেনের নিরিখে ফ্রান্সের অবস্থান ছিল দ্বিতীয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় ঐ সময়ের ফরাসী বিদেশনীতির মৌল উপাদান সমূহ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। অধ্যাপক আর. জে. ইয়ং দেখিয়েছেন যে তৎকালীন ফরাসী সামরিক বাহিনীর সর্বস্তরে এক 'জার্মান ভীতি' কাজ করছিল। জার্মানি আক্রমণ করলে একমাত্র ব্রিটেনের সাথে সন্ধি করেই ফ্রান্স বাঁচতে পারে, এমন একটি ধারণা ছিল যথেষ্ট ক্রিয়াশীল। এজন্য তাৎক্ষণিক জার্মান ব্লিৎসক্রিগের থেকে 'দীর্ঘকালীন যুদ্ধ' চালানোর কৌশল ফরাসী সামরিক নেতাদের অধিকতর কাঙ্ক্ষিত ছিল। অর্থাৎ, সামরিকভাবে, ফ্রান্স ছিল সে সময় ব্রিটেনের ওপর নির্ভরশীল। অধ্যাপক জে. দুরোসেল ও রেনে জিরো'র মতে, নেতাদের সিদ্ধান্তগ্রহণে অপারগতা, আর্থিক অনিশ্চয়তা, সরকারি অস্থিরতা ফ্রান্সকে এক 'অবক্ষয়ের' দিকে ঠেলে দিয়েছিল। ফ্রান্সে নাৎসি-বিরোধী মনোভাবের যথেষ্ট উপস্থিতি সত্ত্বেও নাৎসি উত্থান রোধ করা এই জন্যই ফ্রান্সের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

উনিশশো ত্রিশের দশকের এই অস্থিরতার প্রেক্ষিতেই ফরাসী তোষণনীতির মূল দিকগুলো অনুধাবনযোগ্য।

অধ্যাপক অ্যান্টনি অ্যাডামথোয়াইট গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে ফ্রান্স কেবল বাধ্য হয়েই হিটলারের উত্থানকে মেনে নেয়নি ; কোন কোন ক্ষেত্রে ফ্রান্স ব্রিটেনের থেকেও বেশিমাত্রায় তোষণনীতি অনুরণ করেছে। তার গবেষণানুসারে, ১৯৩৯ সালে ফরাসী সেনাবাহিনী জার্মান বাহিনীর তুলনায় অধিকতর অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ছিল। সে সময় ব্রিটেনের সাথে যৌথ উদ্যোগে ফরাসী নেতারা সাহসী ভূমিকা রাখতে পারলে হিটলারকেও নিজস্ব পরিকল্পনা বদলাতে হত। অথচ, ফ্রান্সের দ্বারা গৃহীত আপোসমুখী মনোভাব তৃতীয় রাইখকে দুর্বল না করে তাকে শক্তিশালী করল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিজয়ী ফ্রান্স যে যে ভাবে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারত তার অভাব ফ্রান্সকে একের পর এক নেতৃত্বের সংকট, আর্থিক বিপর্যয় ও অভ্যন্তরীণ বিভেদের শিকার করছিল। তাই নাৎসি-বাহিনীর ফ্রান্স দখল (১৯৪০) একাধারে নাৎসি আগ্রাসন ও ফরাসী পশ্চাৎপদতার ফল। অ্যাডামথোয়াইটের মতে ১৯৩৩ সাল নাগাদও ফ্রান্স সঠিক নীতি অনুসরণ করতে পারলে ইউরোপে শান্তিপূর্ণ সমঝোতা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু শক্তিশালী ফ্রান্স গঠনের লক্ষ্যে না অগ্রসর হয়ে তৎকালীন ফরাসী নেতৃত্ব ফ্রান্সকে ব্রিটেনের উপর নির্ভরশীল করে তুললেন। তাদের আত্মবিশ্বাসের অভাবেই এই ধরনের পরিস্থিতির জন্ম দিল। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের দায়দায়িত্ব থেকে ফ্রান্স মুক্তি চাইছিল। এই ধরনের আপোসমুখী নীতি কার্যত নাৎসিদেরই সহায়তা করল। বিভিন্ন শক্তির সাথে কার্যকরী মিত্রতা গড়ে তুলে, সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে এবং কর্তব্যে অবিচলতা রেখে জার্মানিকে ঠেকান যেতে পারত ; তা না করে তোষণনীতি অনুসরণ করায় অদূর ভবিষ্যতে জার্মানির কাছে ফ্রান্সের পরাধীনতার (১৯৪০-৪৪) পথ প্রশস্থ হল।

৮.৭ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথে

উনিশশো ত্রিশের দশকের অন্তিমে প্রায় সমগ্র ইউরোপ আবার এক মহাসময়ের জড়িয়ে পড়ল। ঐ দশকের মধ্যভাগে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতি এই মহাযুদ্ধকে প্রায় অনিবার্য করে তুলল। স্পেনের গৃহযুদ্ধ ইউরোপকে দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হতে সাহায্য করেছিল, তার পরবর্তী ঘটনা পরম্পরা ইউরোপকে যুদ্ধের পথে এগিয়ে নিয়ে গেল।

১৯৩৭ সালের শেষভাগে নাৎসি বিদেশনীতির ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে জার্মানির অন্তর্গত করা। অস্ট্রিয়ায় নাৎসিদের ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতান অঞ্চলের সংখ্যালঘু জার্মানদের উদ্যোগকে জার্মানি সমর্থন ও সহায়তা করছিল। ফলে অস্ট্রিয়ার নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হল এবং বৈদেশিক ও অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অস্ট্রিয়া জার্মানিক মতাবলম্বী হতে স্বীকৃত হল। ক্রমশ নাৎসি চাপের কাছে নতিস্বীকার করে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর কুর্ট ফন শুশ্‌নিগ (Schuschnigg) পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন (১১ মার্চ ১৯৩৮) এবং অস্ট্রিয়ার নাৎসি নেতা সেসইনকোয়ার্ট (Seyss-Inquart) তার স্থলভিষিক্ত হলেন। নবনিযুক্ত চ্যান্সেলরের আমন্ত্রণে জার্মান বাহিনী অস্ট্রিয়া দখল করে (১২ মার্চ) এবং এভাবে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার সংযুক্তকরণ (Anschluss) সম্পন্ন হয়। এই ঘটনাটি শুধু প্রতিবেশী চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষেই বিপজ্জনক ছিল না, এটি সমগ্র ইউরোপকে নাৎসি আগ্রাসনের সামনে আরও বেশী উন্মুক্ত করেছিল।

চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতান ল্যান্ডের সংখ্যালঘু জার্মানরা নাৎসি ভাবধারায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চলের স্বশাসন ও নাৎসি মতবাদের বিজয় যাত্রা ছিল তাদের কাম্য। ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাস থেকেই হিটলার বলপূর্বক সুদেতান জার্মানদের সমস্যা সমাধানে উদগ্রীব হন। অন্যদিকে চোকোশ্লোভাক সরকারের প্রতি ফ্রান্স সমর্থন ব্যক্ত করায় পরিস্থিতি সঙ্কটনজক রূপ নিল। ব্রিটেন আলাপ আলোচনা মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হল। বিশেষত জার্মানির সাথে সামরিক সংঘাতে না জড়িয়ে পড়াই ছিল ব্রিটিশ বিদেশনীতির মূল লক্ষ্য। ঐ বছরের সেপ্টম্বর মাসে ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স ও ইতালি মিউনিখ শহরে এক চতুঃশক্তি সম্মেলনে মিলিত হল চেকোশ্লোবাকিয়ার ভবিষ্যত নির্ধারণে। লক্ষ্যণীয় যে চেকোশ্লোভাকিয়া এই সম্মেলনে অনুপস্থিত ; অনিমন্ত্রিত ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, যার সাথে ১৯৩৫ সাল থেকে চেকোশ্লোভাকিয়া মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। পূর্ব ইউরোপের ঘটনাবলীতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে হস্তক্ষেপ না করতে দেওয়ার পশ্চিমী দেশগুলির এই কৌশল কার্যত জার্মানির ইচ্ছাপুরণকে বাস্তবায়িত করল। এই সম্মেলন জার্মানিকে সুদেতানল্যান্ড দখলের ছাড়পত্র দিল। হিটলারের সাথে যৌথভাবে বিখ্যাত ইঙ্গ-জার্মান ঘোষণার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন ভাবলেন যে ইউরোপে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব হল। ইউরোপে শান্তি এল কিন্তু এই শান্তি ক্ষণস্থায়ী হল।

মিউনিখ সঙ্কট থেকে স্পষ্ট হল যে ইউরোপে ফ্রান্স ব্রিটিশ নীতির ইচ্ছাধীন হয়ে পড়েছে। এরপর থেকে জার্মানির সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন। মিউনিখে জার্মানির সাথে সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের অঙ্গীকার শীঘ্রই ব্রিটেনের কাছে অলীক বলে প্রতীয়মান হল। ঘরে-বাইরে জার্মানির আগ্রাসী আচরণ প্রমাণ করে দিচ্ছিল যে তাকে আর কোনভাবেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নিয়মনীতির বন্ধনে আবদ্ধ রাখা যাবে না। একদিকে ক্রিস্টাল নাখ্ট নামে কুখ্যাত ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে জার্মানির অভ্যন্তরে ইহুদীদের ওপর নাৎসী নারকীয়তা চলছিল ; অন্যদিকে সুদেতানল্যান্ড দখল করার পরে চেকোশ্লোভাকিয়ার বাকী অংশকেও করায়ত্ত করতে জার্মানি সচেষ্ট ছিল। নাৎসি বিদেশনীতির লক্ষ্য ছিল চেকোশ্লোভাকিয়াকে দ্বিখন্ডিত বা ত্রিখন্ডিত করে জার্মান আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। এসময়ে অত্যন্ত অপমানজনক পরিস্থিতিতে চেক রাষ্ট্রপতি এমিল হাচা এবং বিদেশীমন্ত্রী চ্‌ভালকোভ্‌স্কি বাধ্য হলেন বার্লিনে এসে জার্মানির সাথে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করতে (১৫ মার্চ ১৯৩৯), যার মর্মার্থ ছিল চেক জনগণ ও দেশের নিয়তি জার্মান রাইখের কর্ণধার ফুয়েরারের পদতলে সঁপে দেওয়া। ঐ দিনই জার্মান বাহিনী চোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ দখল করল। অন্যদিকে ২৩ মার্চ জার্মান বাহিনী লিথুয়ানির মেমেল বন্দর-শহরটি দখল করল। জার্মান আগ্রাসন থেকে স্পষ্ট হল যে নাৎসি রাষ্ট্র নিছক জার্মান এলাকা দখল করে সন্তুষ্ট নয়। মেমেল বন্দরটি জার্মান অধ্যুষিত

হলেও চেকোশ্লোভাকিয়ায় জার্মান অভিযান নিঃসন্দেহে সমগ্র ইউরোপের জার্মানির পদানত হওয়ার আশঙ্কা তৈরী করল।

এই আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে আরও এক বিশেষ মাত্রা সংযোজিত হল রুমানিয়ার প্রতি জার্মানির দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে ব্রিটিশ মনোভাবের কারণে। ব্রিটেন আশঙ্কা করল জার্মানি পূর্ব ইউরোপে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে শীঘ্রই রুমানিয়াকে উপনিবেশে পরিণত করবে। রুমানিয়ার খনিজ তেল (কৃষ্ণসাগর এলাকার) ও কৃষিজাত দ্রব্য আত্মসাৎ করে জার্মানির আর্থিক ও সামরিক বলে বলীয়ান হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রইল। এই আশঙ্কা অমূলক বলে প্রতিপন্ন হলেও সমসাময়িক কালে ইউরোপীয় প্রশ্নে ব্রিটিশ নীতিকে প্রভাবিত করতে এর গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। এভাবেই ১৯৩৯ সালের প্রথম ভাগে ব্রিটেন নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি (Policy of Guarantee) রূপায়ন শুরু করল। এর অর্থ হল এরপর থেকে জার্মানি কোন প্ররোচনা ব্যতিত আগ্রাসন করলে ব্রিটেন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করবে।

ব্রিটেনের এই নীতি রূপায়নের প্রথম ক্ষেত্র হল পোল্যান্ড। এর থেকেই জন্ম নিল এক ইউএরাপীয় যুদ্ধ, কালক্রমে যা এক বিশ্বযুদ্ধের চেহারা নিল। ১৯৩৮ সালের শেষভাগে থেকেই হিটলার পোল্যান্ডের ডানজিগ বন্দর ও পোলিশ করিডরের ওপর অতিরাষ্ট্রিক অধিকার ভোগ করে আসছিল। হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল অনাক্রমণ চুক্তির মাধ্যমে পোল্যান্ডকে-কমিনটার্ন-বিরোধী জোটে সামিল করে পূর্ব-ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিপর্যস্ত করা। অথচ স্বাধীন বিদেশনীতি সম্পন্ন পোল্যান্ড এ ধরনের অধীনতামূলক মিত্রতায় জার্মানির সঙ্গে আবদ্ধ হতে রাজী ছিল না। উপরন্তু, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের আশ্বাসবাণী পেয়ে পোল্যান্ড নিজের নিরাপত্তা বিষয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত ছিল।

১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটল। ৭ এপ্রিল মুসোলিনি আচমকা আলবানিয়া অভিযান করে দেশটি দখল করলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আগ্রাসনের আরও একটি নির্লজ্জ নিদর্শন হয়ে রইল ঘটনাটি। পরিস্থিতির ক্রমাবনতি দেখে ব্রিটেন ও ফ্রান্স গ্রীস ও রুমানিয়ার সাথে মিত্রতায় আবদ্ধ হল এবং যুদ্ধের প্রাক্-উদ্যোগ হিসাবে ব্রিটেনে সৈন্য বাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগ শুরু হল।

২৮ এপ্রিল হিটলার রাইখস্টাগে বক্তৃতাকালে জার্মানি-পোল্যান্ড অনাক্রমণ চুক্তি এবং ইঙ্গ-জার্মান নৌ-সমঝোতা বাতিল ঘোষণা করলেন। এরপর ২২ মে ইতালি ও জার্মানি 'ইস্পাতের চুক্তি' করে যুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্যদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল। অন্যদিকে, ডানজিগ বন্দরটি পোল্যান্ড জার্মানিকে হস্তান্তর করতে পুরোপুরি গররাজি থাকায় জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। ডানজিগের সংখ্যাগরিষ্ঠ জার্মান অধিবাসীরা ইতি পূর্বেই নাৎসি ভাবধারায় আক্রান্ত হয়েছিল এবং বারংবার সেখানে জার্মানির সাথে যুক্ত হওয়ার দাবি উঠছিল। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণের খসড়া তৈরী করে ফেলে। 'অপারেশন হোয়াইট' নামক এই অভিযান ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু করার কথা ভাবা হয়েছিল। ইতালির সাথে মিত্রতা করে জার্মানির ইতিমধ্যেই শক্তিশালি হয়ে উঠেছিল, উপরুন্ত অগাস্ট মাসে স্বাক্ষরিত নাৎসি-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি তাকে বাড়তি সুবিধা করে দিল। এই অনাক্রমণ সমঝোতার ফলে ইউরোপে নাৎসি-বিরোধী মহাজোট গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তাৎক্ষণিকভাবে অন্তর্হিত হল।

৮.৮ জার্মান বিদেশ নীতি (১৯৩৩-৩৯) — ইতিহাসবিদ্যার নানা ধারা

উনিশশো ত্রিশের দশকে ইউরোপের পট পরিবর্তনে জার্মান বিদেশনীতির নির্ণায়ক ভূমিকা অনস্বীকার্য। আবিসিনিয়ার পরাধীনতা, স্পেনের গৃহযুদ্ধ অথবা রাইনল্যান্ডের পুনঃসামরিকীকরণ হিটলারের বিদেশনীতির

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রয়োগক্ষেত্র হিসাবে দেখা যেতে পারে। আগ্রাসী জার্মান পররাষ্ট্রনীতির প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে একাধিক মতের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর ১৯৫০-এর দশকে জার্মান মহাফেজখানার গোপন নথিপত্র প্রকাশিত হতে থাকলে এ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও পরিমার্জন হতে থাকে। ঐতিহাসবিদের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে কোন ঐক্যমত্য গড়ে ওঠে না। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংঘটনে নাৎসি বিদেশনীতির ভূমিকা ও হিটলারের দায়িত্ব কোন ঐতিহাসিকই অস্বীকার করতে পারেন না। এ প্রসঙ্গে প্রচলিত মতগুলো এখানে আলোচনা করা হল।

উদ্দেশ্যবাদী ঘরানা

ইতিহাসবিদরে মধ্যে মতবিরোধের সূচনা জার্মান বিদেশনীতিতে হিটলারের ভূমিকা নিয়েই। একদল ঐতিহাসিক নাৎসি বিদেশনীতিতে হিটলারের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকেই কেন্দ্রীয় স্থান দিয়েছেন। এদের মতে জার্মান নীতি প্রণয়নে হিটলারের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। এই ঐতিহাসিকবৃন্দকে উদ্দেশ্যবাদী ঘরানার (Internationalist School) অন্তর্ভুক্ত বলা যেতে পারে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেলর, অ্যালান বুলক, হিউ ট্রেভর-রোপার, জিওফ্রে স্টোকস্ এবং জার্মান ঐতিহাসিক এবেরহার্ড য়াকেল, ডিয়েট্রিশ আইগ্‌নার, আন্ড্রিয়াস হিলগ্রুবার ও ক্লাউস হিলডেব্রান্ড প্রমুখ উদ্দেশ্যবাদী ঘরানাভুক্ত। অল্পবিস্তর মতপার্থক্য সত্ত্বেও উদ্দেশ্যবাদী ঘরানার ঐতিহাসিকদের মতে হিটলারের ইচ্ছাই তৃতীয় রাইখের সব কার্যক্রমকে পরিচালিত করেছে। ১৯২৮ সালে রচিত হিটলারের দ্বিতীয় গ্রন্থে দেখা যাবে যে ঐ সময় নাগাদ জার্মান বিদেশনীতির যা উদ্দেশ্য ছিল আমৃত্যু হিটলার তার বাস্তব রূপায়ণে বদ্ধপরিকর ছিলেন। হিটলারের মনোভাব তথা জার্মান বিদেশনীতির যে রূপটি গড়ে উঠছিল দুটি, প্রথমত ভার্সাই সন্ধির সমস্ত শর্ত বাতিল করা এবং পরবর্তী ধাপে সমগ্র ইউরোপে জার্মান প্রভুত্ব স্থাপন করা। এই পথকে নিষ্কন্টক করতে গেলে প্রথমে ফ্রান্স ও তারপর সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস হলে নাৎসি জার্মানির দ্বিবিধ লাভ হত। সাম্যবাদের হাত থেকে রেহাই মিলত এবং সোভিয়েত অঙ্গরাজ্য ইউক্রেনে বহুকাঙ্ক্ষিত জার্মান 'বাসভূমি' (Labensraum) গঠন করে ক্রমবর্ধমান জার্মান জনসংখ্যাকে সামাল দেওয়া যেত। উদ্দেশ্যবাদীরা কেউ কেউ আরও মনে করেন যে, হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার পর বিশ্বজয়ের প্রচেষ্টা করা। সে সংঘাত হত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে জার্মানির। হিটলারের মনোভাব বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, সেই অন্তিম সমরে জার্মানিই জিতত কেননা জাতিগতভাবে জার্মানরা মার্কিনীদের তুলনায় বিশুদ্ধতর।

অ্যালান বুলকের মত

উদ্দেস্যবাদী তত্ত্ব নির্মানের একটি প্রধান উপাদান হিটলারের স্বকীয় রচনা। হিটলারের আত্মজীবনী আমার সংগ্রাম (Mein Kampf) থেকে তার মানসিকতার যে চিত্র পাওয়া যায় তাকে অতিমাত্রায় সুযোগ সন্ধানী ও সম্প্রসারণবাদী বলা যায়। বস্তুত এর থেকে কোন সুস্পষ্ট বৈদেশিক নতি অন্বষণ দুরূহ হয়ে পড়ে। ঐতিহাসির অ্যালান বুলক তাঁর **হিটলার ঃ এ স্টাডি ইন টিরানি** গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ১৯৩৩ সাল নাগাদ হিটলারের পক্ষে কোন আগাম অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বিদেশনীতি প্রণয়ন করা সম্ভব ছিল না, তিনি কেবল উপযুক্ত মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলেন। জার্মান বিদেশনীতিকে সেই অর্থে হিটলার তথা নাৎসি দলের সুপ্ত বাসনার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে দেখা যেতে পারে। জার্মানিতে হিটলারের কর্তৃত্ব স্থাপনের পর ইউরোপের অন্যত্র আধিপত্য বিস্তার ঘটানই এ জাতীয় বিদেশনীতির উদ্দেশ্য ছিল। অধ্যাপক বুলকের মতে, ভার্সাই সন্ধি খারিজ করা ও ইউরোপে বিজয়ের পথে অগ্রসর হওয়াই ছিল নাৎসি নীতির লক্ষ্য।

এ. জে. পি. টেলরের মত

এ. জে. পি. টেলরে **দি অরিজিনস অফ দি সেকন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার** গ্রন্থে নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টিতে জার্মানির দায়িত্ব আলোচিত হয়েছে। তাঁর মতে, হিটলার তার বিদেশনীতি প্রণয়নে অসামান্য ধৈর্যের পরিচয় রেখেছিলেন। ১৯৩৭ বা ১৯৩৮ সালেও কোন সুনির্দিষ্ট জার্মান নীতি ছিল না। ঘটনার বহতা স্রোতকে নিজের অনুকূলে টেনে আনার জন্য সুযোগসন্ধানীর মত অপেক্ষা করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পন্থা হিটলারের ছিল না। সে সময় পূর্ব ইউরোপে জার্মান সম্প্রসারণই ছিল হিটলারের একমাত্র উদ্দেশ্য।

হিউ ট্রেভর রোপারের মত

অধ্যাপক হিউ ট্রেভর-রোপার জার্মান বিদেশনীতির কাঠামোগত রূপটি আলোচনা করতে গিয়ে হিটলারের উদ্দেশ্যকে মুখ্যস্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে ব্রিটেন ও ইতালির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে ফ্রান্সকে ধ্বংস করাই ছিল হিটলারের লক্ষ্য। এভাবে জার্মানি তার পশ্চিম সীমান্তকে সুরক্ষিত করে তারপর পূর্ব ইউরোপে সম্প্রসারণে মনোনিবেশ করতে পারত।

জার্মান ইতিহাসবিদদের মত

জার্মান ঐতিহাসিক এবেরহার্ড য়াকেল ও ডিয়োট্রিশ আইগ্‌নারের মতে তৃতীয় রাইখের কূটনৈতিক ও সামরিক কার্যকলাপ এক নজরে দেখেই বোঝা যায় যে জার্মান নীতির রূপরেখাটি স্বয়ং হিটলারের মস্তিষ্কপ্রসূত। বিদেশনীতির অনুপুঙ্খ রূপটি গড়ে না উঠলেও উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও প্রাধান্য মোটামুটি ভাবে সুনির্দিষ্ট আকার লাভ করেছিল ত্রিশের দশকের সূত্রপাতেই।

দুজন জার্মান গবেষক, অ্যান্ড্রিয়াস হিলগ্রুবার ও ক্লাউস হিলডেব্রান্ড, জার্মান বিদেশনীতির উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে কেবল ইউরোপে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তাদের মতে হিটলারের অন্তিম লক্ষ্য ছিল বিশ্বজয়, সুতরাং শেষ পর্যন্ত ইউরোপজয়ী জার্মানি ও আমেরিকার দ্বৈরথই বিশ্বের কর্তৃত্ব কার হাতে যাবে সে প্রশ্নটির সমাধান করে দিত। তবে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জিওফ্রে স্টোকসে'র মতে হিটলারের আদৌ ইউরোপের বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সম্ভবত, হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর প্রধান শক্তি হিসাবে ব্রিটেনের স্থলাভিষিক্ত হবে জার্মানি। এই লক্ষে 'লেবেনস্রাউম' সৃষ্টি তথ্য ইউরোপ-বিজয় সম্পূর্ণ করাই ছিল হিটলারের ইচ্ছা। তবে অন্য মতবিরোধ যাই থাক একটি ক্ষেত্রে এই ঐতিহাসিকগণ একমত যে হিটলারের একনায়কতান্ত্রিক মনোভাব ছিল জার্মান রাষ্ট্রনীতির উৎসমূল।

গঠনবাদী ঘরানা

জার্মান নীতির একটি ভিন্নতর ব্যাখ্যা জোরদার হয় ১৯৬০-এর দশক থেকে। কোন ব্যক্তি-বিশেষের ইচ্ছা নয়, বরং জার্মান রাষ্ট্র কাঠামোর গঠন উপাদানগুলির কার্যকরণ সম্পর্কই জার্মান বিদেশনীতিকে অবয়ব দান করেছে, এ ধরনের একটি মত ক্রমশ জোরদার হয়ে ওঠে। এই তত্ত্বের প্রবক্তাদের গঠনবাদী ঘরানার (Structuralist/Functionalist School) অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। গঠনবাদীরা মনে করেন যে, জার্মান বিদেশনীতির কোন সুনির্দিষ্ট রূপ কখনই ছিলনা। নাৎসি জার্মানিকে একশৈলিক, কেন্দ্রীভূত একনায়কতন্ত্র বলা চলে না, বরং তা ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থাগুলোর দ্বারা সৃষ্ট ও চালিত এক প্রশাসনিক নৈরাজ্যের উদাহরণ। জার্মান রাষ্ট্রনায়ক হিটলার কোন নীতি প্রণয়নে সক্ষম ছিলেন না, বরং রাষ্ট্রকাঠামোর অভ্যন্তরে যে টানাপোড়েন চলত

তারই দ্বারা হিটলার চালিত হতেন। ঐতিহাসিক ইয়ান কারশ, হান্স মমসেন, মার্টিন ব্রৎসাট, টিমোথি ম্যাসন প্রমুখকে গঠনবাদী ঘরানাভূক্ত ধরা যেতে পারে।

হান্স মমসেনের মত

হান্স মমসেনের মতে তৃতীয় রাখের বিদেশনীতি কোন 'প্রতিষ্ঠিত অগ্রাধিকার'-কে—বাস্তবায়িত করার জন্য প্রণীত হয়নি। অর্থাৎ, মমসেনের মতানুসারে, ইতিপূর্বেই স্থির হয়ে থাকা কোনো লক্ষ্যপূরণের জন্য, যথা লেবেনস্রাউম সৃষ্টি, তার জন্য নাৎসি নীতি তৈরী হয়নি। নাৎসি বিদেশনীতি আগ্রাসী হলেও তার কোন চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল না। একে উদ্দেশ্যবিহীন সম্প্রসারণে'র নীতি বলা হয়।

মার্টিন ব্রৎসাটের মত

মার্টিন ব্রৎসাট গবেষণাতে মমসেনের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে। 'লেবেনস্রাউমে'র ধারণাকে ব্রৎসাট অল্পই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে হিটলার ও নাৎসি আন্দোলন যে শক্তির মুক্তি ঘটিয়েছিল তাকে ধারণা করার ক্ষেত্রে লেবেনস্রাউমের ধারণাটি স্রেফ একটি রূপক আদর্শ হিসাবে রয়ে গিয়েছিল, তার কোন কেন্দ্রীয় ভূমিকা নেই। ব্রৎসাটের এই বক্তব্য উদ্দেশ্যবাদী ঐতিহাসিকদের বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ উদ্দেশ্যবাদীরা লেবেনস্রাউমকে নাৎসি বিদেশনীতির কেন্দ্রবিন্দু মনে করে থাকেন। এই রূপকটিকে ব্যবহার করে নিরবিচ্ছিন্ন, আগ্রাসী, বিদেশনীতির যুক্তিকাঠামোকে গড়ে তোলা হয়েছিল, যতক্ষণ না নাৎসি বিদেশনীতিটি স্বয়ং নিয়ন্ত্রনহীন হয়ে পড়ে, এবং 'আত্মবিধ্বংসী উন্মাদনা'য় পরিণত না হয়। ব্রৎসাটের মতে, পোল্যান্ড তথাকথিত লেবেনস্রাউমের ধারণার অন্তর্ভূক্ত না করার মধ্যে হিটলারের বিদেশনীতির অপূর্ণতা লক্ষ্য করা যায়।

টিমোথি ম্যাসনের মত

অধ্যাপক টিমোথি ম্যাসন মত প্রকাশ করেছেন যে, ১৯৩৯ সালে যে যুদ্ধ শুরু হল তার বীজ নিহিত ছিল ১৯৩০-এর দশকের শেষভাগের জার্মানির অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে। তাঁর মতে, হিটলারের সম্প্রসারণবাদী যুদ্ধের সময়কাল, কৌশল এমনকি কৌশলগত বিমূঢ়তা সবকিছুই নির্ধারিত হয়েছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে লুণ্ঠনের প্রয়োজনীয়তা দ্বারা। যুদ্ধই লুণ্ঠনকে একাধারে ত্বরান্বিত করেছিল ও রসদ যুগিয়েছিল। ম্যাসন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করতে গিয়ে যুদ্ধের পূর্ববর্তী দশকগুলিতে জার্মানির অপূর্ণ বিপ্লব, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে জার্মানির বেহাল রাষ্ট্রকাঠামো কিংবা 'পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত' তত্ত্বের গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করে দিয়ে ও বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে তুলে নাৎসিরা তাদের আরব্ধ কর্ম সম্পূর্ণ করতে পারত। হিটলার হয়ত ১৯৩৯ সালেই কোন বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চাননি যেখানে ব্রিটেন হয়ে উঠবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ; বরং ১৯৪৩ সাল, নাগাদ, অর্থাৎ হিটলারে ক্ষমতা দখলের দশ বছর পরে, সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই জার্মানি ইউরোপীয় শক্তিদ্বন্দের আসরে নামতে চেয়েছিল বলে অধ্যাপক ম্যাসনের অভিমত। তা সত্ত্বেও যে জার্মানিকে আংশিক প্রস্তুত নিয়েই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হল তার কারণ ১৯৩৬ সালের পর থেকেই নানা কারণে সমস্যা পেকে উঠতে থাকল। বিশেষত জার্মানি রাইনল্যান্ডে পুনঃ-সামরিকীকরণ শুরু করায় অন্যদেশ থেকে সম্পদ সংগ্রহ করা অনিবার্য হয়ে পড়ল। শ্রমের চাহিদা, মুদ্রাস্ফীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য হ্রাস ও সেই কারণে কাঁচামালের আমদানি হ্রাস, কৃষির বিকাশ হ্রাস ১৯৩০-এর দশকের শেষভাগে জার্মান আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বৃহৎ সমস্যার জন্ম দিল। ম্যাসেনের মতে, এই অবস্থায় পুনঃসামরিকীকরণের চাপ জার্মানির ঘরোয়া সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে গেল। বস্তুত, নতুন নতুন এলাকা দখল করে কাঁচামাল,

খাদ্যদ্রব্য, যুদ্ধ সামগ্রী দখল না করতে পারলে বা যুদ্ধের প্রথমদিকে রুশ-জার্মান মৈত্রী চুক্তির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য না পেলে জার্মান যুদ্ধ-অর্থনীতি ১৯৩৯-৪০ সালেই ভেঙে পড়ত।

গঠনবাদী ঐতিহাসিকদের বক্তব্য—বিশেষত টিমোথি ম্যাসনের গবেষণা—জার্মান বিদেশনীতি ও বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টিতে জার্মানিতে ভূমিকার বিশদ আলোচনা করলেও তা সব সময় উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত নয়। পাশাপাশি, আন্যান্য গবেষণাতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ের জার্মান রাষ্ট্রনীতির মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্যগত মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। সব মিলিয়ে ইতিহাসবিদদের নানা ধরনের ব্যাখ্যা একটি জটিল কালপর্বকে বুঝতে সাহায্য করে।

৮.৯ সারাংশ

উনিশশো ত্রিশের দশকে পূর্ব এশিয়ায় চীন ও মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের আগ্রাসন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। জাপানের অভ্যন্তরে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল সম্প্রসারণবাদী দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদ। পশ্চিমী দেশগুলোর সাথে সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত আগ্রাসী জাপান প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় নিজস্ব প্রভাবাধীন এলাকা বৃদ্ধি করতে উদ্যোগী ছিল। মাঞ্চুরিয়ার মুকদেনে চীনা অন্তর্ঘাতের দাবী করে জাপান মাঞ্চুরিয়া আকার করে এবং মাঞ্চুকুয়ো শাসনের বকলমে কার্যত নিজস্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই প্রথম এধরনের আগ্রাসনে জাতিসঙ্ঘ বিচলিত হয় এবং লিটন কমিশন প্রেরণ করে। লিটন কমিশনের প্রতিবেদনে অখুশী জাপান জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ করে।

জাপানের ক্ষেত্রে যেমন মাঞ্চুরিয়া, ইতালির ক্ষেত্রে তা ছিল আফ্রিকায় আবিসিনিয়া। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশটি দখল করে ইতালীয় সাম্রাজ্যের গৌরব বর্ধন করতে মুসোলিনি দেশটিতে অভিযান চালান। জাতিসঙ্ঘের মূল অঙ্গীকারকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এবং সম্মিলিত নিরাপত্তার আশ্বাসকে উপেক্ষা করে আবিসিনিয়া দখল করা হয়। আবার, এরই সূত্র ধরে জার্মানি ও ইতালি আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ক্ষেত্রে পরস্পরের সন্নিকটে এল। জার্মানি ও ইতালি হয়ে উঠল পরস্পরের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের সমর্থক। স্পেনের গৃহযুদ্ধে এর পরিণত রূপ দেখা গেল।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে প্রজাতন্ত্রী সরকারকে উৎখাত করতে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে অভ্যুত্থান ঘটে। নামে গৃহযুদ্ধ হলেও এটি কার্যত ইউরোপীয় যুদ্ধের চেহারা নেয়। প্রজাতন্ত্রী সরকারের স্বপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ দেশ বিদেশের গণতন্ত্রী, বামপন্থীরা লড়াই করে ; অপরপক্ষে জার্মানি ও ইতালির সমর্থন ছিল ফ্রাঙ্কোর পক্ষে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া চলে যুদ্ধক্ষেত্রে। এই গৃহযুদ্ধ ইতালি ও জার্মানির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ছিল। এরপর থেকেই জার্মানির নিরিখে ইতালি দ্বিতীয় সারির সহযোগীতে পরিণত হয়। যার ফল হয় রোম-বার্লিন টোকিও অক্ষশক্তি।

জার্মানি, জাপান ও ইতালিকে নিয়ে গড়ে ওঠা অক্ষশক্তি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভারসাম্যে রদবদল করেছিল। ইউরোপে জার্মান-নীতির পরিবর্তন এশিয়ায় জাপানের নীতিকেও প্রভাবিত করেছিল। মাঞ্চুরিয়াকে কেন্দ্র করে জাপান আন্তর্জাতিক মহলে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লে তার সমর্থনে এগিয়ে আসে জার্মানি। অন্যদিকে, মুসোলিনি ও হিটলারের যথাক্রমে জার্মানি ও ইতালি সফর দুটি একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে পরস্পরের নিকটবর্তী করল। অক্ষশক্তির সাম্যবাদ-বিরোধী কর্মসূচী অঙ্গ হিসাবে গড়ে উঠল কমিনটার্ন-বিরোধী জোট। অবশ্য জার্মানি ইউরোপে নিজস্বার্থ রক্ষার্থেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে অনাক্রমন চুক্তিতে আবদ্ধ হল। এই ঘটনা পক্ষান্তরে জাপানের সমস্যা আরও বৃদ্ধি করল।

১৯৩৯ সালে ইউরোপ স্পষ্টতই দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। জার্মানির ক্রমবর্ধমান দাবীর সামনে ইতিপূর্বে অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া নত হয়েছিল। কিন্তু তাতেই জার্মান আগ্রাসন থেকে থাকেনি। পোল্যান্ড দখল করে এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপকে পদানত করে নাৎসিরা ইউরোপের একচ্ছত্র শাসক হতে চাইছিল। পোল্যান্ডের প্রতি বিট্রেন ও ফ্রান্সের নিরাপত্তার আশ্বাস ছিল নাৎসি আগ্রাসনের প্রতিবন্ধক। এই পরিস্থিতিতে জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করলে বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

উনিশশো ত্রিশের দশকের ইউরোপীয় শক্তিসাম্যের পরিবর্তন এবং বিশ্ব রাজনীতির আলোড়নে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছিল জার্মান বিদেশনীতি। আবিসিনিয়া, স্পেন, মাঞ্চুরিয়া, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়ার মত নানা স্থানে নাৎসি বিদেশনীতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। নাৎসি বিদেশনীতি সাবেক মিত্রদের শত্রুতে পরিণত করেছে, আবার একসময়ের বিরোধীকে জার্মানির বন্ধু শক্তিতে পরিণত করেছে। এই বিদেশনীতির না পর্যায় সেই জন্য বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। উদ্দেশ্যবাদী ও গঠনবাদী ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণ নাৎসি বিদেশনীতির একপর্ব থেকে অন্যপর্বে উত্তরণের নানা দিক বুঝতে আমাদের বিশেষ ভাবে সহায়তা করে।

৮.১০ অনুশীলনী

জাপানের আগ্রাসন ও মাঞ্চুরিয়া সংকট

১। অনধিক পঞ্চাশটি প্রশ্নের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন (প্রয়োজনে 'পরিশিষ্ট' দেখুন) :

(ক) জাপানের 'দ্বিগুণ জাতীয়তাবাদ' বলতে কী বোঝান হয়?

(খ) মাঞ্চুরিয়ায় জাপানি আগ্রহের কী কারণ ছিল বলে আপনি মনে করেন?

(গ) 'তানাকা স্মারক'-এ ঘোষিত বিদেশনীতি ইতিপূর্বের জাপানি বিদেশনীতির তুলনায় কিভাবে ভিন্ন ছিল?

(ঘ) জাপান শানতুং উপদ্বীপে সৈন্য পাঠালে তার ফল কী হয়েছিল?

(ঙ) 'অতিরাষ্ট্রিক অধিকার' বিষয়ে আপনার ধারণা লিখুন। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ কী দিতে পারেন?

(চ) 'সাকুরাকাই' কী? এর উদ্দেশ্য কী ছিল?

(ছ) মাঞ্চুরিয়ায় রেলপথে চীনের নাশকতা মূলক কাজটি কি ছিল বলে জাপান দাবী করে?

(জ) লিটন কমিশন কী? এর ঘোষিত উদ্দেশ্য কী ছিল?

২। অনধিক দুটো পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন :

(ক) জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখলের আন্তর্জাতিক প্রভাব কী হয়েছিল?

(খ) মাঞ্চুরিয়ায় জাপানি আগ্রাসন নিয়ে জাতিসঙ্ঘের ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

আবিসিনিয়া যুদ্ধ

১। অনধিক পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন :

(ক) স্ট্রেসাফ্রন্ট' কি? কাদের নিয়ে কী উদ্দেশ্য এটি গঠিত হয়েছিল? এটির পরিণতি কি সার্থক হয়েছিল বলে আপনি মনে করেন?

(খ) আবিসিনিয়া আক্রমণের প্রেক্ষাপট হিসাবে ইতালির পরিবর্তনশীল বিদেশনীতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। প্রসঙ্গত 'দি আনুনজিও-র কার্যকলাপের উল্লেখ করুন।

(গ) আবিসিনিয়াকে নিয়ে ইতালির আগ্রহের কারণ কী ছিল বলে আপনি মনে করেন?

(ঘ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইতালির আবিসিনিয়া অভিযানের প্রভাব কী কী হয়েছিল বলে আপনি মনে করেন?

২। অনধিক দুশো পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন :

(ক) ইতালির আবিসিনিয়া অভিযানের বিভিন্ন পর্যায়গুলো আলোচনা করুন।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ

১। অনধিক পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন :

(ক) স্পেনের গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষাপট কী ছিল?

(খ) স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে নিরপেক্ষতাবাদী পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোর নিরপেক্ষ থাকতে চাওয়ার কারণ কী ছিল বলে আপনি মনে করেন?

(গ) আপনি কি মনে করেন যে স্পেনের গৃহযুদ্ধ কার্যত স্পেনের মাটিতে এক ইউরোপীয় যুদ্ধের চেহারা নিয়েছিল? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

২। অনধিক দুশো পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন :

(ক) স্পেনের গৃহযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়গুলো আলোচনা করুন।

রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষ

১। অনধিক পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন :

(ক) রোম-বার্লিন শক্তি গঠনকালে জার্মানির প্রতি ইতালির পরিবর্তনশীল দৃষ্টি-ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

(খ) কমিনটার্ন-বিরোধী জোট কাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল? এর উদ্দেশ্য কী ছিল?

(গ) বার্লিন-টোকিও সম্পর্কের বিবর্তন সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। অনধিক দুশো পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন :

(ক) ১৯৩০-এর দশকের শেষভাগে কিভাবে জাপান ক্রমশ অক্ষশক্তির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠল তা বিশ্লেষণ করুন।

তোষণনীতি

১। অনধিক পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন :

(ক) তোষণনীতি বলতে কী বোঝান হয়?

(খ) ব্রিটেনের তোষণনীতি কী ছিল সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

(গ) ফ্রান্সের রাষ্ট্রনায়ক ও সামরিক নায়কদের জার্মানির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল?

২। অনধিক দুশো পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন :

(ক) ব্রিটেনের তোষণনীতি সংক্রান্ত আধুনিক গবেষণায় কী কী পরিবর্তন এসেছে তার বিশ্লেষণ করুন।

(খ) ফ্রান্সের তোষণনীতির মৌল বৈশিষ্ট্য কী ছিল বলে আপনি মনে করেন?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথে

১। অনাধিক পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন :

(ক) 'সংযুক্তিকরণ' (Anschluss) বলতে কী বোঝান হয় লিখুন।

(খ) সুদেতান জার্মানদের প্রতি জার্মানির দৃষ্টিভঙ্গী কী ছিল? জার্মানির আকাঙ্খা পূরণ ত্বরান্বিত হতে পেরেছিল কেন?

(গ) নাৎসি-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তির তাৎপর্য কী ছিল?

(ঘ) ব্রিটেনের 'Policy of guarantee' কী ছিল? কিভাবে এই নীতি ব্রিটেনকে পোলিশ স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করেছিল?

২। অনধিক দুশো পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন :

(ক) ১৯৩৯ সালের ইউরোপীয় পরিস্থিতির মূল্যায়ন করুন।

জার্মান বিদেশনীতি (১৯৩৩-৩৯)—ইতিহাসবিদ্যার নানা ধারা

১। অনধিক পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন :

(ক) উদ্দেশ্যবাদী ঘরানার ঐতিহাসিকদের মূল বক্তব্য লিখুন।

(খ) নাৎসি জার্মানির 'বাসভূমি' (Labensraum) তত্ত্ব বলতে কী বোঝেন?

(গ) গঠনবাদী ঘরানার ঐতিহাসিকদের মূল বক্তব্য লিখুন।

(ঘ) গঠনবাদীদের মতে নাৎসি সম্প্রসারণমূলক যুদ্ধের প্রধাণ কারণ কী ছিল বলে আপনি মনে করেন?

২। অনধিক তিনশো শব্দের মধ্যে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন :

(ক) উদ্দেশবাদী ঘরানার বিভিন্ন ইতিহাসবিদদের বক্তব্য আলোচনা করুন।

(খ) গঠনবাদী ঐতিহাসিকদের বক্তব্য আলোচনা করুন।

৮.১১.১ পরিশিষ্ট ১ : জার্মানি, ইতালি ও জাপানের রষ্ট্রনায়ক বৃন্দ (১৯১৮-১৯৪১)

সময়কাল	জার্মানি/চ্যান্সেলর	ইতালি/প্রধানমন্ত্রী	জাপান/প্রধানমন্ত্রী
নভেম্বর ১৯১৮	ম্যাক্স ফন বাডেন	ভিত্তরিও অরলান্দো	হারা কেই (তাকাশি)
নভেম্বর ১৯১৮	জনপ্রতিনিধিদের সরকার। প্রধান সদস্যরা হলেন এবার্ট, ফিলিপ শেইডেমান ও ল্যান্ডসবার্গ। অ্রাজ্যিক কর্তৃপক্ষের সাথে পরিচালিত সরকার।		
ফেব্রুয়ারি ১৯১৯	ফিলিপ শেইডেম্যান		
জুন ১৯১৯	বাউয়ের		
মার্চ ১৯২০	হারমান মুলার		
জুন ১৯২০	ফেহ্‌রেনবাখ	জিওভানি জিওলিত্তি	
মে ১৯২১	ভির্থ		
জুলাই ১৯২১		বোনোমি	
নভেম্বর ১৯২১			উচিদা ইয়াসুয়া
নভেম্বর ১৯২১			তাকাহাশি কোরেকিয়ো
জানুয়ারি ১৯২২			কাতো তোমোসাবুরো
ফেব্রুয়ারি ১৯২২		ফাক্‌তা	

অক্টোবর	১৯২২		বেনিতো মুসোলিনি	
নভেম্বর	১৯২২	কুনো		
অগাস্ট	১৯২৩	গুস্তাভ স্ট্রেসেমান		
সেপ্টেম্বর	১৯২৩			ইয়ামামোতো গোমবেই
নভেম্বর	১৯২৪	মার্ক্স		
জানুয়ারি	১৯২৪			কিয়োয়ুরা কেইগো
জানুয়ারি	১৯২৫	লুথার		
জুন	১৯২৪			কাতো তাকাচি
মে	১৯২৬			
জানুয়ারি	১৯২৬			ওকাৎসুকি রেইজুরো
মে	১৯২৬	মার্ক্স		
এপ্রিল	১৯২৭			তানাকা গিইচি
জুন	১৯২৮	হারমান মুলার		
জুলাই	১৯২৯			হামাগুচি ওসাচি
মার্চ	১৯৩০	হাইনরিশ ব্রুনিং		
জানুয়ারি	১৯৩১			ওকাৎসুকি রেইজুরো
ডিসেম্বর	১৯৩১			ইনুকাই কি
মে	১৯৩২			তাকহাশি কোরোকিয়ো

মে	১৯৩২		সাইতো মাকোতো
জুন	১৯৩২	ফ্রানৎস্ ফন পাপেন	
নভেম্বর	১৯৩২	কুর্ট ফন শ্লাইখার	
জানুয়ারি	১৯৩৩	অ্যাডলফ হিটলার	
জুলাই	১৯৩৪		ওকাদা কেইসুকে
ফেব্রুয়ারি	১৯৩৬		গোতো ফুমিও
ফেব্রুয়ারি	১৯৩৬		ওকাদা কেইসুকে
মার্চ	১৯৩৬		হিরোতা কোকি
ফেব্রুয়ারি	১৯৩৭		হায়াশি সেনজুরো
জুন	১৯৩৭		কোনো ফুমিমারো
জানুয়ারি	১৯৩৯		হিরানুমা কিইচিরো
অগাস্ট	১৯৩৯		আবে নোবুয়ুকি
জানুয়ারি	১৯৪০		ইওনাই মিৎসুমাসা
জুলাই	১৯৪০		কোনো ফুমিমারো
অক্টোবর	১৯৪১		তোজো হিদেকি

৮.১১.২ পরিশিষ্ট ২ : শব্দার্থ

<u>সাধারণ</u>

Socialist/Social Democrat : সমাজবাদী/সামাজিক গণতন্ত্রী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে দক্ষিণ ও পূর্বইউরোপে গঠিত বামপন্থী সংগঠন। প্রথম গঠিত হয় জার্মানিতে (১৮৬৯); এরপর বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গোরি, বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, নেদারল্যান্ডস্, রাশিয়া, ফিনল্যান্ড, সার্বিয়ায়। ব্রিটেন (লেবার পার্টি) ও ফ্রান্সে (Jaures) ভিন্ন পন্থায় আন্দোলন বিকশিত হয়। ডেনমার্ক, সুইডেন ও নরওয়েতে বিশেষ শক্তিশালী। ১৮৮৯ সালে সমাজবাদীদের উদ্যোগে প্যারিসে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' সম্মেলন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানি ও ইতালিতে গঠিত সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল এবং ফাসিবাদীদের দ্বারা ক্ষমতা দখলের পূর্ব পর্যন্ত সরকারের প্রধান। বলশেভিক বিপ্লবের (১৯১৭) পর বিপ্লবী কমিউনিস্টদের বিপরীতে সমাজবাদীরা পুঁজিবাদকে সবলে উৎখাতের পরিবর্তে তার ক্রমঃবিলয়ের নীতিতে বিশেষভাবে আস্থাশীল। জার্মানিতে রোজা লুক্সেমবুর্গ ও কার্ল লিব্‌ক্‌নেখট সমাজবাদী আন্দোলনের ধারাসম্ভূত সাম্যবাদী বিপ্লবের নেতা।

পরিশিষ্ট ২ : শব্দার্থ

<u>জার্মান</u>

Anschluss : 'সংযুক্তকরণ'। ১৯৩৮ সালের ১২ মার্চ জার্মানির সাথে অস্ট্রিয়ার সংযুক্তকরণ। নাৎসি বিদেশনীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে একচ্ছত্র প্রাধান্য বিস্তার। এই লক্ষ্যে অস্ট্রিয়ার নাৎসিরা আন্দোলন চালায় জার্মানির সমর্থনে। এর মাধ্যমে অস্ট্রিয়াতে নাৎসিরা ক্ষমতায় আসে।

Dolchtoss : 'পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত'। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির উদারপন্থী ও সমাজবাদী রাজনৈতিক নেতৃবর্গের বিশ্বাসঘাতকতায় এযাবৎ অপরাজিত জার্মান সেনা বাহিনীর পরাজয় ঘটেছে, জার্মানিতে প্রচলিত এরকম একটি মতবাদ।

Gestapo : তৃতীয় রাইখের গুপ্ত পুলিশ বাহিনী। ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে হারমান গোয়েরিং কর্তৃক স্থাপিত। এক বছর পর হিমলার এর দায়িত্ব পান। যে কোন প্রকার বামপন্থী ভাবধারার বিকাশকে নিশ্চিহ্ন করার ক্ষেত্রে বিশেষ সক্রিয়। SS-র গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ (তুলনীয় ইতালির OVRA)।

Gleichschaltung : 'সমন্বয়'। চ্যান্সেলর হওয়ার পর হিটলার কর্তৃক সমস্ত স্বাধীন সংস্থা, পরিষদ ও সংগঠনকে ধ্বংস অথবা বশীভূত করার প্রক্রিয়া। খ্রিস্টিয় চার্চও এর আওতার বাইরে ছিল না। প্রাদেশিক স্বশাসনের নীতিকে সম্পূর্ণ

অগ্রাহ্য করে প্রাদেশিক সরকারগুলি ভাঙা হয়। নাৎসিরা সেই স্থলাভিষিক্ত হয়। হিটলারের ক্ষমতারোহনের এক বছর পর 'রাইখ পুনর্গঠন আইন' (৩০ জানুয়ারী ১৯৩৪) তৈরির মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়ার একটি পর্যায় সমাপ্ত হয়। জার্মানি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রে পরিণত হয়, যা ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

Kampfbund : 'সংগ্রামী সংগঠন'। ১৯২০-এর দশকে হিটলারের নেতৃত্বাধীন NSDAP ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থী, সংসদীয় গোষ্ঠীর জোট। দক্ষিণ জার্মানির বাভারিয়া অঞ্চলে 'জাতিয় বিপ্লব' সাধনের কাজে নিয়োজিত এবং জার্মান প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে উচ্ছেদের জন্য সদাসচেষ্ট সংগঠন। ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসের তথাকথিত Munich Putsch-এর সংগঠন।

Kapp Putsch : ওলফ্‌গ্যাঙ্গা কাপের নেতৃত্বে ও সামরিক নেতা জেনারেল ফন লুটভিট্‌জের পরিচালনায় ১৯২০ সালের মার্চ মাসে জার্মানিতে সংগঠিত অভ্যুত্থান। মাত্র চারদিন স্থায়ী (১৩—১৭ মার্চ) এই অভ্যুত্থানে বার্লিন সমাজবাদীদের হাতছাড়া এবং কাপ চ্যান্সেলার হিসাবে ঘোষিত। পদচ্যুত সমাজবাদী সরকার প্রাদেশিক সমর্থনের মাধ্যমে ও অভ্যুত্থান-বিরোধী শ্রমিক ধর্মঘটের সহায়তায় ক্ষমতায় পুনর্বহাল। এই অভ্যুত্থানে লুটভিটজের অনুগামীরা শিরস্ত্রাণে স্বস্তিকা চিহ্নের ব্যবহার করে যা পরবর্তীকালে নাৎসি প্রতীক হয়ে উঠেছে।

Kristallnacht : 'কাচের রাত্রি' ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসের প্রথমদিকে সমগ্র জার্মানি জুড়ে ইহুদী নিধন প্রক্রিয়া। ইহুদী বিপনীর কাচ ভাঙচুর করা সন্ত্রাস সৃষ্টির অন্যতম অঙ্গ ছিল, সেই হিসাবে নামটির জন্ম।

Labensraum : 'বাসভূমি'। পূর্ব ইউরোপে, যথা ইউক্রেনে, জার্মান উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে জার্মান উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে সামাল দেওয়ার পরিকল্পনা। একই সাথে জার্মান সমাজে কৃষিক্ষেত্র ও শিল্পক্ষেত্রের বিকাশের মধ্যে ভারসাম্য আনার জন্য আবশ্যক জার্মান সম্প্রসারণবাদী নীতির অভিলক্ষ্য। উদ্দেশ্যবাদী ঘরানার ইতিহাসবিদদের মতে জার্মানি তথা হিটলারের বিদেশনীতির কেন্দ্রীয় বিষয়।

SA [Sturmabteilung] : আর্নস্ট রম (Ernst Rohm) পরিচালিত নাৎসি বেসরকারী সেনাবাহিনী। হিটলারের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করতে ১৯৩৪ সালে এর নেতাদের হত্যা করা হয়।

SS [Schutzstaffel } : প্রাথমিকভাবে হিটলারের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী বাহিনী। পরবর্তীকালে হাইনরিশ হিমলারের নেতৃত্ব নাৎসি দলের দমননীতির শক্তিশালী হাতিয়ার পুলিশবাহিনী। SA-কে দমন করার ক্ষেত্রে সক্রিয়।

ইতালীয়

Arditi : ইতালির সেনাবাহিনীর উচ্চবর্গীয় অংশ। সাহস, নৃশংসতা ও দেশপ্রেমের জন্য খ্যাত। মুসোলিনির ক্ষমতারোহণের সময় সহায়ক দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলির অন্যতম।

Mare Nostrum	‘আমাদের সমুদ্র’ মুসোলিনির ভাষায় ভূমধ্যসাগরের পরিচয়। ইতালীয় সম্প্রসারণবাদী বিদেশনীতির সূচক।
OVRA	১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত পুলিশ বাহিনী (তুলনীয় জার্মানির গেস্টাপো)। টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রের হাতিয়ার।
Popolari	‘জনপ্রিয় দল’। রোমান ক্যাথলিক রাজনৈতিক সংগঠন প্রথম মহাযুদ্ধের পর সৃষ্ট দুটি গণসংগঠনের অন্যতম। ১৯১৯ সালের নির্বাচনে সমাজবাদীদের পরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম সংগঠন। ক্যাথলিক ভ্যাটিকানের নির্দেশে পরিচালিত। মুসোলিনি পোপের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলে পোপোলারি চার্চের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়।
Squadristi	ফাসিস্ত বাহিনী। বেআইনী পন্থায় শহরে গ্রামে সমাজবাদী সরকারকে উচ্ছেদে নিয়োজিত। সংসদীয় নির্বাচনের সময় ভোটারদের সন্ত্রস্ত করতে ব্যবহৃত।
Trasformismo	ইতালির সংসদীয় রাজনীতিতে পরস্পর বিরোধী মতাবলম্বী গোষ্ঠীগুলির দাবীদাওয়াকে গ্রাহ্য করে পরিচালিত মতৈক্যভিত্তিক সরকার। ১৮৭০-এর দশক থেকে এই পন্থায় ইতালির উদারপন্থী শাসক গোষ্ঠীগুলি সংসদীয় ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা আনতে সচেষ্ট ছিল।

জাপানি

Sakurakai [Cherry Blossom Society]	জাপানের সামরিক অফিসারবর্গের সংগঠন। মাঞ্চুরিয়াকে চীন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে সেখানে জাপানি শাসন চালু করা ছিল এর লক্ষ্য। ১৯৩০ সাল থেকে বিশেষ ভাবে এই কাজে নিয়োজিত। কেবল লেফটেনান্ট-কর্নেল ও তার অধস্তন অফিসাররা এর সভ্য হতে পারতেন।
Seiyukai, Kenseikai & Minseito	১৯২০-র দশক থেকে জাপানের সংসদে (দায়েত) প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল সেইয়ুকাই এবং কেনসেইকাই। এই দশকের শেষ দিকে সেইয়ুকাই দলের শাসনকালে বিরোধী কেনসেইকাই ও অন্যান্য বিরোধী দল মিশে গিয়ে নতুন বিরোধী দল মিনসেইতো’র জন্ম দেয়।
‘দ্বিগুণ দেশপ্রেম’	প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে জাপানের জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলোর প্রচারিত আদর্শ। এই আদর্শ অনুসারে মনে করা হত যে এর অনুরাগীদের দেশপ্রেমের আবেগ সাধারণ মানুষের দ্বিগুণ হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাপান তার যোগ্য স্থান পাচ্ছেনা, এই জাতীয় ধারণা এই উগ্র জাতীয়তাবাদকে পুষ্ট করেছিল।

৮.১১.৩ পরিশিষ্ট ৩ : সময়পঞ্জি

১৯১৮
১১ নভেম্বর : জার্মানির সাথে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা।
১৯১৯
১৮ জানুয়ারি : প্যারিস শান্তি সম্মেলনের সূচনা।
২৮ জুন : জার্মানির সাথে ভার্সাই সন্ধি।
১৯২০
১০ জানুয়ারি : লিগ অফ নেশনস বা জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা।
১৯২১
১৩ ডিসেম্বর : ওয়াশিংটনে প্রশান্ত মহাসাগরীয় চতুঃশক্তি চুক্তি।
১৯২২
৬ ফেব্রুয়ারি : ওয়াশিংটনে নৌ চুক্তি ও নয়দেশীয় সন্ধি স্বাক্ষরিত।
১৬ এপ্রিল : জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে রাপালো চুক্তি।
৩০ অক্টোবর : মুসোলিনি ইতালির প্রধানমন্ত্রী হলেন।
১৯২৩
১১ জানুয়ারি : ফরাসী ও বেলজিয়াম সৈন্যদের দ্বারা রূঢ় দখল।
১৯২৪
১ ফেব্রুয়ারি : ব্রিটেন কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্বীকৃতিদান।
২ অক্টোবর : জাতিসঙ্ঘে জেনিভা প্রোটকল গৃহীত।
২৮ অক্টোবর : ফ্রান্স কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্বীকৃতিদান।
১৯২৫
১ ডিসেম্বর : লন্ডনে লোকার্নো চুক্তি স্বাক্ষরিত।
১৯২৬
২৪ এপ্রিল : বার্লিনে জার্মানি-সোভিয়েত ইউনিয়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত।
১০ সেপ্টেম্বর : জার্মানির জাতিসঙ্ঘে অন্তর্ভুক্তি।
১৯২৭
২০ জুন-৪ অগাস্ট : জেনিভা নৌ সম্মেলন।
১৯২৮
২৭ অগাস্ট : ব্রিঁয়া-কেলগ সন্ধি (প্যারিস সন্ধি) স্বাক্ষরিত।
১৯২৯
অগাস্ট : হেগ সম্মেলন ; ইয়ং পরিকল্পনা গৃহীত।

১৯৩০

২২ এপ্রিল	:	লন্ডনে নৌ চুক্তি।
৩০ জুন	:	রাইনল্যান্ডে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যাপসরণ শুরু।

১৯৩১

২০ জুন	:	মার্কিন রাষ্ট্রপতি হুভারের মোরাটরিয়াম।
২৮ সেপ্টেম্বর	:	মুকদেন অন্তর্ঘাত ; চীন ও জাপানের মধ্যে সংঘাত শুরু।

১৯৩২

২ ফেব্রুয়ারি	:	নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন শুরু।
২৯ নভেম্বর	:	ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি।

১৯৩৩

৩০ জানুয়ারি	:	হিটলার জার্মান রাইখের চ্যান্সেলর হলেন।
২৪ ফেব্রুয়ারি	:	মাঞ্চুরিয়া নিয়ে জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাব।
২৭ মার্চ	:	জাপানের জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ।
১৪ অক্টোবর	:	জার্মানির নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ও জাতি সঙ্ঘ ত্যাগ।

১৯৩৪

২৬ জানুয়ারি	:	জার্মানি ও পোল্যান্ডের অনাক্রমণ চুক্তি।
১৮ সেপ্টেম্বর	:	সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসঙ্ঘে যোগদান।

১৯৩৫

জানুয়ারি	:	রোমে মুসোলিনি-লাভাল আলোচনা।
১৬ মার্চ	:	জার্মানির বাধ্যতামূলক সেনা নিয়োগ এবং ভার্সাই সন্ধির সামরিক শর্ত উল্লঙ্ঘন।
১৪ এপ্রিল	:	স্ট্রেসা সম্মেলনের সম্মিলিত ঘোষণা।
১৮ জুন	:	ইঙ্গ-জার্মান নৌ চুক্তি।
২ মে	:	ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সন্ধি।
৩ অক্টোবর	:	ইতালির আবিসিনিয়া অভিযানের সূত্রপাত।

১৯৩৬

৭ মার্চ	:	জার্মানির রাইনল্যান্ড দখল ; রাইনল্যান্ডের পুনঃসামরিকীকরণের সূত্রপাত।
৯ মার্চ	:	ইতালির আবিসিনিয়া দখল।
১৮ জুলাই	:	স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সূচনা।
২৫ নভেম্বর	:	জার্মান-জাপানি কমিনটার্ন-বিরোধী চুক্তি।

১৯৩৭

৮ জুলাই	:	জাপান চীনের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করল।
সেপ্টেম্বর	:	জার্মানিতে মুসোলিনি ও হিটলারের সাক্ষাৎ।
৫ নভেম্বর	:	হসবাখ সম্মেলন।

৬ নভেম্বর	:	ইতালির কমিনটার্ন-বিরোধী গোষ্ঠীতে যোগদান।
১১ ডিসেম্বর	:	ইতালির জাতিসঙ্ঘের সদস্যপদ ত্যাগ।
১৯৩৮		
১২ মার্চ	:	অস্ট্রিয়া ও জার্মানির 'সংযুক্তকরণ' (Anschluss)।
সেপ্টেম্বর	:	মিউনিখ সম্মেলন; চেকোশ্লোভাকিয়া দখলে জার্মানিদের পরোক্ষে উৎসাহদান।
১৯৩৯		
১৫ মার্চ	:	জার্মানির বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া দখল।
২১ মার্চ	:	জার্মানি পোল্যান্ডের কাছে ডানজিগ বন্দর ও পোলিশ করিডর দাবী করে।
২৩ মার্চ	:	জার্মানি লিথুয়ানিয়ার মেমেল বন্দর দখল করে।
৩১ মার্চ	:	ব্রিটেন ও ফ্রান্স পোল্যান্ডকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়।
১ এপ্রিল	:	স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের অবসান, একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।
৭ এপ্রিল	:	ইতালির আলবানিয়া দখল।
২৮ এপ্রিল	:	জার্মান-পোলিশ অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর।
২২ মে	:	ইতালি ও জার্মানির 'ইস্পাতের চুক্তি' স্বাক্ষর।
২৩ অগাস্ট	:	নাৎসি-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর।
২৫ অগাস্ট	:	ব্রিটেন ও পোল্যান্ডের মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর।
১ সেপ্টেম্বর	:	জার্মানির পোল্যান্ড অভিযান, ডানজিগ দখল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত।

৮.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১। ই. এইচ. কার—**ইন্টারন্যাশানাল রিলেশনস বিটুইন দি টু ওয়ার্ল্ড ওয়ারস, ১৯১৯-১৯৩৯**।

২। এ. জে. পি. টেলর—**দি কোর্শ অফ জার্মান হিস্ট্রি।**

—**দি অরিজিনস অফ দি সেকন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার।**

৩। **অ্যান্ড্রু জে ক্রোজিয়ের—দি কজেস অফ দি সেকন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার।**

৪। উইলিয়াম কেলর—**টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি ওয়ার্ল্ড।**

৫। প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়—**আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস**। (ENTER)

—(অনুবাদ) ই. এইচ. কার—**দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।**

একক ৯ ❑ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল—ঔপনিবেশিকতার অবসান—মহাশক্তি হিসাবে আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার উত্থান

গঠন

৯.০ উদ্দেশ্য
৯.১ প্রস্তাবনা
৯.২ ভূমিকা
৯.২.১ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল
৯.২.২ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উৎপত্তি এবং মিত্রপক্ষের মধ্যে সংঘাত
৯.২.৩ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি
৯.২.৪ বিশ্বের রাজনীতিতে শক্তিসাম্যের পরিবর্তন
৯.২.৫ ভাবাদর্শের সংঘাত—আদর্শগত বিরোধ
৯.২.৬ এশিয়া ও আফ্রিকার ওপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব
৯.২.৭ সমাজবাদের প্রসার
৯.২.৮ বিশ্বসংগঠনের আদর্শ প্রসার
৯.২.৯ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান
৯.২.১০ আফ্রো-এশীয় উপনিবেশ : বিরোধিতার তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য
৯.২.১১ জাতীয়তাবাদের বিকাশ : ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অবসান
৯.২.১২ চীনের ইতিহাসে এই তিনটি পর্যায়ের সুস্পষ্ট রূপ
৯.২.১৩ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে জাপানের অবস্থা
৯.২.১৪ নতুন এশিয়ার অভ্যুদয়
৯.২.১৫ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন
৯.২.১৬ মালয়েশিয়া
৯.২.১৭ ব্রহ্মদেশ
৯.২.১৮ ইন্দোনেশিয়া
৯.২.১৯ ইন্দোচীন
৯.২.২০ কাম্বোডিয়া
৯.২.২১ লাওস
৯.২.২২ মধ্যপ্রাচ্যে ঔপনিবেশিকতার অবসান
৯.২.২৩ মধ্যপ্রাচ্যে সংকটের উৎস ও স্বরূপ
৯.২.২৪ মধ্যপ্রাচ্য সংকটে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ভূমিকা
৯.২.২৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মধ্যপ্রাচ্যের সংকট : প্যালেস্টাইন সমস্যা
৯.২.২৬ মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্ব

৯.২.২৭ পারস্য
৯.২.২৮ মিশর বা ইজিপ্ট
৯.২.২৯ প্যালেস্টাইন সমস্যা : মধ্যপ্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা সুদূরপ্রসারী সংকট
৯.২.৩০ মধ্যপ্রাচ্যে ঔপনিবেশিকতা অবসানের ফলাফল
৯.২.৩১ ঔপনিবেশিকতার অবসান : আফ্রিকার জাগরণ
৯.২.৩২ জাতীয়তাবাদের বিকাশ : আফ্রিকা ও এশিয়া : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ
৯.২.৩৩ আফ্রিকার জাগরণের প্রতি পাশ্চাত্য প্রতিক্রিয়া
৯.২.৩৪ আফ্রিকাতে ইসলামি জাতীয়তাবাদ
৯.২.৩৫ আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন
৯.২.৩৬ নিগ্রো স্বাধীনতা আন্দোলন
৯.২.৩৭ আফ্রিকার ঐক্য আন্দোলন
৯.২.৩৮ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে দুটি অতিরাষ্ট্রের উদ্ভব : আমেরিকা ও রাশিয়া
৯.২.৩৯ আমেরিকার উত্থান
৯.২.৪০ সোভিয়েত রাশিয়ার উত্থান
৯.৩ সারাংশ
৯.৪ অনুশীলনী
৯.৫ গ্রন্থপঞ্জী

৯.০ উদ্দেশ্য

১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ছ-বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা চলেছিল। যুদ্ধের শেষে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আবর্জনা থেকে এক নতুন পৃথিবীর প্রকাশ ঘটল, (যার সঙ্গে আগের পৃথিবীর কোন মিল ছিল না)। এই এককটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন—

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল কত ব্যাপক ও বিভিন্ন ছিল।
- পৃথিবীতে দুটি মহাশক্তির আবির্ভাব, পৃথিবীকে দুটি মেরুতে বিভাজন।
- এশিয়াতে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির একের পর এক পতন ঘটেছিল।
- নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।
- আফ্রিকাতে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব, তার বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র।

৯.১ প্রস্তাবনা

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটল। প্রবল ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও আশাবাদী ব্যক্তিরা ভেবেছিলেন যে শত্রুতার অবসানে কঠিন যুদ্ধের দিনগুলির ঐক্য বজায় থাকবে এবং তা শান্তির প্রতিশ্রুতি দেবে। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। আমেরিকা ও রাশিয়া এই দুটি বিরাট দেশ দুটি পরস্পর বিরোধী আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করত। ফলে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত হল। কখনো কখনো তা প্রকাশ্য যুদ্ধের চেহারা নিচ্ছিল, যেমন হয়েছিল কোরিয়া,

ভিয়েতনামে। যুদ্ধের ফলে ইউরোপের নেতৃস্থানীয় দেশগুলি যেমন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিল, আমেরিকার আর্থিক সাহায্য ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিল না। এভাবে আমেরিকা ইউরোপের অভিভাবক হয়ে উঠল। কিন্তু রাশিয়া তা মানতে চাইল না, সারা বিশ্ব আবার দুটি বিরোধী শিবিরে ভাগ হয়ে গেল। রাশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদ ও সংগ্রামী আদর্শ এশিয়া ও আফ্রিকার ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশগুলির কাছে মুক্তির বার্তা নিয়ে এলো। আমেরিকা স্বভাবতই তা পছন্দ করল না। আমেরিকা তার অতুল বৈভব নিয়ে মুক্তিকামী দেশগুলোর পাশে এলে শুরু হল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, যা পৃথিবীতে আবার যুদ্ধের সম্ভাবনা তৈরি করল। কিন্তু এর মধ্যেই শান্তি চিরস্থায়ী করার জন্য বিশ্ব সংগঠনের জন্ম হল। আমেরিকা ও রাশিয়া—এই দুই অতিশক্তির উত্থান বিশ্বকে নিশ্চিন্ত থাকতে দিল না।

৯.২ ভূমিকা

১৯৩৯ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের ১৪ই আগস্ট জাপানের আত্মসমর্পণ এই যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছিল। এই যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করার আগে এই যুদ্ধের কারণ ও গতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে জেনে নেওয়া দরকার। যেমন সেরাজেভো হত্যাকাণ্ড প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ নয়। তেমন পোল্যান্ড আক্রমণও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ নয়, এই কারণগুলি সংখ্যায় বহু ও বিচিত্র। ভার্সাই সন্ধির ত্রুটি, জার্মানি ও ইটালিতে একনায়কতন্ত্রের উত্থান, ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত, জাতিসংঘের ব্যর্থতা ইত্যাদি কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একদিকে ছিল অক্ষশক্তি, যার অন্তর্গত ছিল জার্মানি, ইতালি, জাপান। অপরপক্ষে ছিল মিত্রশক্তি, যার মধ্যে ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া। ১৯৩৯ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর জার্মান বাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করার পর ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এরপর ইতালি, রাশিয়া, আমেরিকা, জাপান—একে একে সকলেই নিজ স্বার্থে ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে যোগ দেয়। জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করার পর যুদ্ধ ঘোষণা করলেও ইঙ্গ-ফরাসি সৈন্যবাহিনী জার্মানি আক্রমণ করেনি। বরঞ্চ রাশিয়া পোল্যান্ডের কিছু অংশ এবং বাল্টিক রাজ্যগুলি যেমন, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া দখল করে নিল। এদিকে জার্মানির পর একে একে ডেনমার্ক, নরওয়ে, বেলজিয়াম, হল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ দখল করে ১৯৪০ সালে ফ্রান্সে ঢুকে পড়ে। ১৯৪০ সালের ১৩ই জুন জার্মান সৈন্যরা প্যারিস দখল করে। এর আগে ফ্রান্সের ডানকার্ক বন্দরে জার্মানির সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে প্রায় তিন লক্ষাধিক ইঙ্গ-ফরাসি-বেলজিয়াম সৈন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেও আশ্চর্যজনকভাবে জার্মান বোমারু বিমান ও কামানের গোলা উপেক্ষা করে মিত্রপক্ষীয় সেনাপতিরা ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ছ-দিনের মধ্যে যুদ্ধ জাহাজ ব্রিটেনে সরিয়ে নেন। ঐ বিশাল সেনাবাহিনী জার্মানির হাতে বন্দী হলে মিত্রপক্ষের তখনই আত্মসমর্পণ করতে হত। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মুসোলিনির শাসনাধীন ইতালি জার্মানির সঙ্গে পূর্বেকার সন্ধি অনুসারে অক্ষ বাহিনীতে যোগদান করে এবং ফ্রান্সের ওপর আক্রমণ করে। জার্মানির আক্রমণে বিধ্বস্ত ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী পল রেনো পদত্যাগ করলে জেনারেল পেঁতা দায়িত্ব নেন। তিনি জার্মানির কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর কাম্পেই এর বনাঞ্চলে এক পরিত্যক্ত রেলগাড়ির কামরায় যেভাবে অপমানজনক ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষর করতে হয়েছিল, ঠিক সেই স্থানে সেই কামরায় ১৯৪০ সালের ২১শে নভেম্বর ফরাসিদের আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করানো হয়। ফ্রান্সের পাঁচভাগের তিনভাগ জার্মানি নিয়ে নিলে বাকি অংশে

ফিলিপ পেঁতার নেতৃত্বে ক্রীড়নক সরকার টিকে থাকে। পরে লণ্ডনে অবশ্য ফরাসি বাহিনী জেনারেল দ্য গাল-এর নেতৃত্বে স্বাধীন সরকার গঠন করে।

১৯৪১ সালের ২২শে জুন জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করায় রাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সরাসরি যুদ্ধে যোগ দেয় ১৯৪১-এর ৭ই ডিসেম্বর জাপান হাওয়াই দ্বীপের পার্ল হারবারে বোমা নিক্ষেপের পর। এর আগেই জাপান যোগ দিয়েছিল অক্ষশক্তির দিকে, আমেরিকা সক্রিয় সাহায্য করতে শুরু করেছিল মিত্রশক্তিকে। জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ দখল করে নেয়। জার্মানির রাশিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে রুশ বাহিনী প্রচণ্ড সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে। বিখ্যাত স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে রুশ মার্শাল ঝুকভ জার্মান সেনাপতি ফন পাউলাসের আত্মসমর্পণ আদায় করেন। ১৯৪০ সালের জুন মাসে ফ্রান্সের পতন ঘটে। আগস্ট থেকে ব্রিটেনের উপর ব্যাপক বিমান আক্রমণ এবং পৃথিবীর নানা প্রান্তে যুদ্ধের বিস্তার আমেরিকাকে উদ্বিগ্ন করল। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মার্কিন সেনেটের অনুমোদনক্রমে মিত্রশক্তির অনুকূলে যুদ্ধ করতে শুরু করেন। ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে রুজভেল্ট ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল অ্যাটলান্টিক চার্টার স্বাক্ষর করে বিশ্বশান্তির আবেদন করলেও ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপানের আগ্রাসী নীতি আমেরিকাকে যুদ্ধে নামাল। ইতালি উত্তর আফ্রিকায় আক্রমণ চালালে ব্রিটিশ সেনাপতি আর্চিবল্ড ওয়াভেল তা প্রতিহত করেন। জার্মান সেনাপতি রোমেল আফ্রিকাতে ইতালির সাহায্যার্থে গেলে ব্রিটেন মন্টগোমারিকে ও আমেরিকা প্যাটনকে পাঠাল। শেষপর্যন্ত আফ্রিকাতে মিত্রপক্ষের জয় হল। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে মুসোলিনির পতন হল। ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইতালির নবগঠিত অ-ফ্যাসিস্ট সরকার মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে। হিটলারের জার্মান সৈন্য ইতালির সাহায্যার্থে গিয়েছিল কিন্তু তারা ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর কাছে পরাস্ত হল। ১৯৪৫ সালের ২৮শে এপ্রিল মুসোলিনি ফ্যাসিবিরোধী উন্মত্ত জনতার হাতে ধরা পড়ে নির্মমভাবে প্রাণ হারালেন। অন্যদিকে মার্কিন জেনারেল আইসেন হাওয়ার-এর পরিচালনায় ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর থেকে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী দ্বিতীয় রণাঙ্গনে জার্মানিকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে মিত্রপক্ষের নৌবহর অভিযানে জার্মানি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ঐ দিনটি Deliverance Day বা D-Day অর্থাৎ মুক্তি দিবস নামে বিখ্যাত। ১৯৪৪ সালের ২৫শে আগস্ট মিত্রবাহিনী প্যারিস দখল করে নেয়। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে জার্মানির পতন দ্রুত শুরু হল। ১৯৪৫ সালের ২মে রাশিয়ার লালফৌজ বার্লিন দখল করে নেয়। ১৯৪৫ সালের ৭ই মে জার্মানি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে।

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রুজভেল্ট ও চার্চিল ক্রিমিয়ার ইয়াল্টা সম্মেলনে মিলিত হয়ে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন। এরপর ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে জার্মানির পট্‌স্‌ড্যাম শহরে এক সম্মেলনে মিত্রপক্ষ মিলিত হয়ে জাপানকে আত্ম সমর্পণ করতে বললে জাপান প্রথমে অস্বীকার করল। ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট হিরোশিমা এবং ৯ই আগস্ট নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করলে জাপান বাধ্য হয়ে ১৪ই আগস্ট আত্মসমর্পণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটল।

৯.২.১ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো এত ব্যাপক ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ পৃথিবীতে আর ঘটেনি। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ কোনো না কোনোভাবে এই যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়েছিল। স্বভাবতই এই যুদ্ধের ফলাফল হয় অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। তাই প্রথমে সংক্ষেপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করা হল। তারপর, এই যুদ্ধের

অবসানে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব ঘটেছিল সেই ভিত্তিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। যুদ্ধের সময়ে মিত্রপক্ষ বারংবার ভবিষ্যৎ পুনর্গঠন সম্পর্কে ঘোষণা জারি করছিল। মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিরা একাধিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে অক্ষশক্তির কবল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন এবং তাঁদের আলোচিত বিষয়ের মধ্যে ভবিষ্যৎ শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়গুলি ছিল। আশাবাদী ব্যক্তিরা সুনিশ্চিত হয়েছিলেন যে শত্রুতার অবসানে কঠিন যুদ্ধের দিনগুলির ঐক্য বজায় থাকবে এবং তা শান্তির প্রতিশ্রুতি দেবে।

৯.২.২ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উৎপত্তি এবং মিত্রপক্ষের মধ্যে সংঘাত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ফল হল মিত্রপক্ষের মধ্যেকার যুদ্ধকালীন মৈত্রী এবং সহযোগিতার অবসান। ফ্রান্স, ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া তাদের আদর্শগত বিভেদ ভুলে ফ্যাসিবাদী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে মৈত্রীবন্ধ হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধশেষে এই সুসময় আর রইল না। সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকা আরো বেশি শক্তিমান ও প্রভাবশালী হয়ে উঠল। তখন তারা বিশ্বের অধিকার ও নেতৃত্ব নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হল তার পরিণাম হল সমগ্র বিশ্ব দুটি শত্রু শিবিরে ভাগ হয়ে গেল এবং বন্ধুত্বের বদলে সৃষ্টি হল ঠাণ্ডা লড়াই।

৯.২.৩ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে যে কত প্রাণ ও কত সম্পদ নষ্ট হয়েছে তা আজও পর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি। বিজয়ী দেশগুলির মধ্যে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও রাশিয়া যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আমেরিকা ততটা হয়নি। আবার, বিজিত দেশগুলির মধ্যে জাপান ও জার্মানির ক্ষতি হয়েছিল সর্বাধিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন তার বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য হারাতে থাকে এবং হীনবল হয়ে পড়ে। ব্রিটেনের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে, ব্রিটিশ পণ্য আর বিশ্বের বাজারে রপ্তানি হত না। যন্ত্রপাতি, সার ও বীজের অভাবে কৃষিক্ষেত্র অনাবাদি পড়ে থাকে, ফলে সেখানে দেখা দেয় তীব্র খাদ্য সংকট। আমেরিকা থেকে গম আমদানি করতে হয়। অনুরূপভাবে, কাঁচামাল ও কয়লার অভাবে কল-কারখানায় ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন হ্রাস পায়। ব্রিটেনের ৪ লক্ষ লোক যুদ্ধে প্রাণ হারায় এবং লক্ষ লক্ষ লোক আহত হয়, ফলে ব্রিটেনে লোকবল (man-power) হ্রাস পায়। ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্য ৫০% হ্রাস পায় এবং বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০০০ মিলিয়ন পাউন্ড। যুদ্ধে ১৭০০ মিলিয়ন পাউন্ড জাতীয় সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। ব্রিটেন তার ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে যুদ্ধ ফেরত সৈন্যদের ভাতা ও পুনর্বাসনের সমস্যা দেখা দেয়। স্থল ও নৌবহর হ্রাস করতে বাধ্য হয়ে ব্রিটেন তার সামরিক শক্তি খর্ব করে। অনুরূপভাবে ফ্রান্সের রাজনৈতিক অস্থিরতা তার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়াকে কম মূল্য দিতে হয়নি। প্রায় দশ মিলিয়ন রুশ সেনা যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছিল, ১৫ মিলিয়ন সাধারণ নাগরিক নিহত হয়েছিল। রাশিয়ার লোকসংখ্যার একদশমাংশ এই যুদ্ধে চিরতরে হারিয়ে গিয়েছিল। রাশিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির কোন সীমা ছিল না। পশ্চিম রাশিয়ার সমস্ত শহর ও গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। পূর্ব ইউরাল অঞ্চলে যে কলকারখানাগুলি অক্ষত ছিল অতি ব্যবহারে তাদের যন্ত্রপাতিগুলি ক্ষয় হয়ে যায়। অধিকাংশ কয়লাখনিগুলিতে হয় আগুন জ্বলতে থাকে নতুবা ভেতরে জল ঢুকে যায়। রাশিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে যারা তখনও কর্মক্ষম ছিল তারা ছিল পরিশ্রান্ত ও প্রয়োজনের

তুলনায় কম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে স্তালিন ভোগ্য পণ্যের উৎপাদনকে গৌণ স্থান দিয়ে ভারি শিল্প গঠনের দিকে জোর দেন। যথেষ্ট পরিমাণ লোহা, ইস্পাত, কয়লা ও খনিজ সম্পদ যাতে উৎপন্ন হয় সেদিকে স্তালিন তীক্ষ্ণ নজর দিলেন, কারণ যন্ত্রশিল্প, রেল, বিমান, মারণাস্ত্রের উৎপাদনে রাশিয়া পিছিয়ে থাকলে কোনদিন সে বৃহৎ শক্তি হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। কাজেই রাশিয়াতে সাধারণ লোকেদের জীবনযাত্রার মান ছিল বেশ নীচু। জার্মান সৈন্য এমনভাবে ঘোড়া ও গরুগুলিকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করেছিল যে লাঙল টানার পশু ছিল না। অপরদিকে, কৃষি শ্রমিক, ট্রাক্টর, সার ও বীজের যথেষ্ট অভাব ছিল। ফলে রাশিয়াতে ব্যাপক খাদ্য সংকট দেখা দিল। স্তালিন কৃষিক্ষেত্র সংগঠনের ভার দিয়েছিলেন নিকিতা ক্রুশ্চভকে। তিনি ২,৫০,০০০ যৌথ খামারকে একত্রিত করে ৯৫,০০০ বৃহৎ খামারে পরিণত করেন, যেখানে ট্রাক্টর, বৈজ্ঞানিক প্রথায় সার প্রয়োগ, উন্নত বীজ প্রয়োগ দ্বারা ফলন বাড়ান হয়েছিল। এইভাবে কৃষিতে ও শিল্পের মতো যান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ আবাদ দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপ সমগ্র বিশ্বে তার গুরুত্ব হারায় এবং একটি সমস্যাকীর্ণ মহাদেশে পরিণত হয়। ইউরোপের রাজনৈতিক ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়। পরস্পরবিরোধী শিবিরের অস্তিত্ব ইউরোপকে বহুধা বিভক্ত করে রেখেছিল। বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হল, যার আশু সমাধান ছিল অত্যন্ত জরুরী। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, মধ্য ইউরোপ থেকে নাৎসী শক্তির বিলোপ সাধন, জার্মানিতে যাতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ ঘটতে পারে, তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা, পূর্বতন শত্রু দেশগুলির সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর পারমাণবিক বোমার প্রভাব, ক্ষতিপূরণ বিশ্ববাণিজ্যের পুনর্বাসন, বিভিন্ন জাতিসমূহের পরস্পরবিরোধী দাবি, নিরস্ত্রীকরণ এবং এশিয়া ও আফ্রিকাতে বিকাশমান জাতীয়তাবাদ।

৯.২.৪ বিশ্বের রাজনীতিতে শক্তিসাম্যের পরিবর্তন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপের শক্তিসাম্য ব্যবস্থায় এক ব্যাপক পরির্তন ঘটল। ইউরোপে জার্মানি ও ইটালির শক্তি ও প্রভাব প্রচণ্ড হ্রাস পেল। ফ্রান্স রূপান্তরিত হল একটি সমস্যা জর্জরিত দূর্বল রাষ্ট্রে। ব্রিটেনও তার পূর্বেকার ক্ষমতা ও সম্মান হারাল। রাশিয়া ও আমেরিকা বিশ্বের দুই প্রধান শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। জার্মানি রাজনৈতিক সংহতি থেকে বঞ্চিত হয়ে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে রইল। পূর্ব জার্মানিতে স্থাপিত হল কম্যুনিস্ট শাসনব্যবস্থা, অন্যদিকে পশ্চিম জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হল গণতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র। পশ্চিম জার্মানি পাশ্চাত্য শক্তিগোষ্ঠীতে যোগদান করল বলে দুই জার্মানির একীকরণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক তীব্র সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

৯.২.৫ ভাবাদর্শের সংঘাত—আদর্শগত বিরোধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপে পরিস্থিতির অবনতি ঘটল। পূর্ব ইউরোপের প্রায় সর্বত্র কম্যুনিস্ট আন্দোলন শুরু হল। এর ফলে পোল্যান্ড, রুমানিয়া, যুগোশ্লোভিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ফিনল্যান্ড—

প্রায় সকল দেশ সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাবাধীন হয়ে পড়ল। এস্টোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া—এই তিনটি বাল্টিক রাজ্যের স্বাধীনতার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হল। ইউরোপের এই অঞ্চলে রুশ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হল। ইতালি একটি তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে রূপান্তরিত হল। সোতার সমস্ত আফ্রিকান, উপনিবেশ হারাল, উপরন্তু যুগোশ্লোভিয়া ও গ্রীসকে তার রাজ্যের কিয়দংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। এছাড়া, ইতালিতে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। ফ্রান্স আলসেস ও লোরেণ নামক অঞ্চল দুটি ফিরে পেল, কিন্তু তার পূর্বতন ক্ষমতা ও গৌরব আর ফিরে এলো না। যুদ্ধোত্তর বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের সুযোগে ফ্রান্স ও ইতালিতে কম্যুনিস্ট সক্রিয়তা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছিল। তবে উভয় দেশের জনসাধারণের ভোটে কম্যুনিজ্‌মের পরিবর্তে গণতন্ত্র জয়ী হয়েছিল।

৯.২.৬ এশিয়া ও আফ্রিকার ওপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব

এশিয়ার অধিকাংশ দেশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধ পরবর্তীকালে বেশীর ভাগ এশীয় দেশে অশান্ত ও উত্তাল জাতীয়তাবাদের জোয়ার হৃতবল পশ্চিমী দেশগুলির ঔপনিবেশিক শাসনজাল ছিন্ন করতে চেয়েছিল। দুই যুদ্ধের অন্তবর্তীকালে এশীয় দেশগুলিতে দেখা গেল বৈপ্লবিক আন্দোলন। ইউরোপের আধিপত্যের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনগুলি এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে শাসক পশ্চিমী শক্তিরা শাসিতদের সামান্য হলেও কিছু কিছু শাসনতান্ত্রিক অধিকার দিতে বাধ্য হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই আন্দোলনগুলি সশস্ত্র রূপ ধারণ করল এবং একের পর এক এশীয় দেশগুলি রাজনৈতিক স্বাধীনতা অথবা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করল। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান জন্ম নিল। ১৯৪৯ সালে স্বাধীন হল ইন্দোনেশিয়া, বার্মা (বর্তমান মায়ানমার) এবং সিংহল। সম্প্রতি স্বাধীনতা পেয়েছে মালব এবং সিঙ্গাপুর। ফরাসী ইন্দোচীনে চারটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটল—ভিয়েতনাম, ভিয়েতামিন, কাম্বোডিয়া এবং লাওস। ১৯৪৯ সালে চীনে কম্যুনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। কোরিয়া দুভাগে বিভক্ত হল। উত্তর কোরিয়াতে কম্যুনিস্ট চীন ও রাশিয়ার মদতে কম্যুনিস্ট সরকার ক্ষমতাসীন হল। দক্ষিণ কোরিয়া হল আমেরিকার প্রভাবাধীন অঞ্চল। মধ্যপ্র্যাচ্য জন্ম নিল একটি স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্র। ইরাক, ইরান সিরিয়া, লেবানন প্রভৃতি দেশ স্বাধীনতা লাভ করল। মিশরে রাজতন্ত্র জায়গা করে দিল প্রজাতন্ত্রকে। এশিয়ার মতো আফ্রিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব অনুভব করেছিল। সুদান, টিউনিসিয়া, লিবিয়া, আলজিরিয়া প্রভৃতি দেশ পশ্চিমী দেশগুলির শাসনপাশ ছিঁড়ে ফেলেছিল। এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখনীয় কালো মানুষদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। গোল্ড কোস্ট (বর্তমান ঘানা) ক্যামেরুন্‌স্, মালি, নাইজেরিয়া, সোমালিল্যান্ড, কঙ্গো, টাঙ্গানাইকা প্রভৃতি নিগ্রো জনসাধারণ অধ্যুষিত দেশগুলিতে স্বাধীনতা সূর্যের উদয় ঘটেছিল।

৯.২.৭ সমাজবাদের প্রসার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বের সর্বত্র সমাজবাদ লক্ষ্যণীয়ভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সমাজবাদী আদর্শের অনুকরণে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচিত হতে লাগল। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুসরণের প্রবণতা দেখা গেল।

৯.২.৮ বিশ্ব সংগঠনের আদর্শ প্রসার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পৃথিবীতে আন্তর্জাতিকতাবাদ জন্ম নিল। একটি বিশ্বসংগঠন গঠনের প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল। যখন পৃথিবী আবার দুটি শত্রু শিবিরে ভাগ হয়ে গেল এবং আণবিক অস্ত্র উৎপাদন অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল তখন জনমানসে এই আতঙ্ক সৃষ্টি হল যে যদি কোন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তবে সম্পূর্ণ মানব জাতি ও মানব সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। এই ভয়াবহ পরিণতি রোধ করার প্রয়াস থেকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা U.N.O. (United Nations Organisation) জন্মগ্রহণ করল।

৯.২.৯ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল আলোচনার সময় একাধিক দীর্ঘস্থায়ী পরিণামের কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি ফলাফল সম্বন্ধে পৃথক আলোচনা সম্ভবপর হলেও বর্তমান পাঠ্যাংশে এই আলোচনা আফ্রিকা ও এশিয়ায় ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ও বৃহৎ শক্তি হিসাবে আমেরিকা ও রাশিয়ার বিকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। প্রথমে আপনাদের কাছে এশিয়া ও আফ্রিকার ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের কথা আলোচনা করা হবে ও তারপর বলা হবে আমেরিকা ও রাশিয়ার কথা।

৯.২.১০ আফ্রো-এশীয় উপনিবেশ : বিরোধিতার তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য

ইউরোপে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল ফরাসি বিপ্লবের সূত্র ধরে। গোটা উনিশ শতক জুড়ে জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিপন্থী আদর্শ ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিংশ শতকে এশিয়ায় জাতীয়তাবাদী তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়ে। আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষরা এই তরঙ্গাভিঘাতের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল আরো অর্ধশতাব্দী পরে।

উনবিংশ শতকের চতুর্থ ও অন্তিম ভাগে আফ্রিকা ও এশিয়াতে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল। বিংশ শতক শুরু হয়েছিল এমন একটি ধারণা নিয়ে যে ইউরোপের সামরিক ও বাণিজ্যিক আধিপত্য রোধ করার ক্ষমতা কোনো রাষ্ট্রের নেই। কিন্তু ১৯৪৫ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে অন্তত ৪০টি দেশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদের স্বাধীনতা আদায় করে নিয়েছিল।

এই বিরাট সংগ্রামের পূতাগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল দুটি ঘটনা—একটি হল ১৯০৪-১৯০৫ সালে রুশ জাপান যুদ্ধ, যাতে রাশিয়া পরাজিত হয়েছিল জাপানের হাতে। এর দশ বছর পরে, শানটুঙ নামক স্থানে জাপান জার্মানিকে পরাজিত করল। অপরটি হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের অভ্যুদয়। ১৯২০ সালে তাঁর হাতে ফ্রান্স ও ১৯২২ সালে গ্রীস পরাজিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও কলহ এশিয়া ও আফ্রিকার ওপর তাদের দৃঢ়মুষ্টি শিথিল করে দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক কাঠামোতে ভাঙ্গন স্পষ্ট রূপে দেখা দিয়েছিল।

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ইউরোপীয় ভূখণ্ডের একটি বড়ো অংশ তাঁর অধিকারে এসেছিল, কিন্তু তাঁর সামরিক বিজয়রথে আরোহণ করে জাতীয়তাবাদী আদর্শ সমগ্র ইউরোপে অতি দ্রুত বিস্তারলাভ করেছিল। ঠিক তেমনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জাতীয়তাবাদী আদর্শ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘোষিত

লক্ষ্য আর ইউরোপে সীমাবদ্ধ ছিল না। উইলসনের চোদ্দ দফা নীতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমভাবে ইউরোপে ও উপনিবেশগুলিতে প্রযোজ্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের এই ঘোষণা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। লেনিন সাম্রাজ্যবাদের নিন্দায় মুখর হয়ে জার সাম্রাজ্যের অধীনস্থ জাতিসমূহের পৃথক রাজ্য গঠনের দাবী স্বীকার করলেন—এই ঘটনায় সমগ্র বিশ্বে মুক্তি ও সার্বভৌমত্বের দাবি জোরালো হয়ে উঠল। ক্রমে আফ্রো-এশীয় জাতীয় আন্দোলন পশ্চিমী আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি সার্বিক বিদ্রোহে পরিণত হয়।

এছাড়াও ছিল বিশ্বরাজনীতির চাপ, যা ১৯৪৭-এর পর আকস্মিকভাবে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘনিয়ে এনেছিল। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে জাপান, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও হল্যান্ডের বিরুদ্ধে এমন আঘাত হেনেছিল যে আর কোনোদিন ঐ তিনটি রাষ্ট্র উঠে দাঁড়াতে পারেনি। মধ্য প্রাচ্য ও আফ্রিকাতে আমেরিকার চাপ সাম্রাজ্যবাদকে পিছু হঠতে বাধ্য করেছিল।

৯.২.১১ জাতীয়তাবাদের বিকাশ : ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অবসান

এশিয়া ও আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে দেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতির অনগ্রসরতা ও রক্ষণশীলতা অপসারণ করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আধিপত্যের হাত থেকে নিজের স্বতন্ত্র স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য নিজস্ব ঐতিহ্য ও প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চতর শ্রেণীর মানুষরা জাতীয়বাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এদের হাতে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম হয়ে ওঠে রাজনৈতিক ও উদারপন্থী। যদিও মার্কস্‌বাদী ঐতিহাসিকরা এই পর্বের জাতীয়তাবাদকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ বলে অভিহিত করেছিলেন তবুও একে সীমাবদ্ধ জাতীয়তাবাদ বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কারণ, আফ্রিকা ও এশিয়াতে শিল্পায়নের মাত্রা ছিল খুবই কম। কাজেই এখানে বুর্জোয়া অগ্রগতি ঘটেনি বললেই চলে। তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়েছিল ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের পরে। যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল।

৯.২.১২ চীনের ইতিহাসে এই তিনটি পর্যায়ের সুস্পষ্ট রূপ

উনিশ শতকের শেষের দিকে চীনের অনগ্রসরতা দূর করার জন্য ক্যান-ইউ-ওয়েই শতদিবসের সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কিন্তু মাঞ্চু রাজবংশ ও বিদেশী হস্তক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে এই আন্দোলন সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। তখন এই দুই শত্রুর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করলেন সান-ইয়াৎ-সেন। ১৯১১ সালের বিপ্লবের ফলে মাঞ্চু রাজবংশের পতন ঘটল ও চীনে প্রথম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। এভাবে চীনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হল। কিন্তু আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিরোধিতা ও পাশ্চাত্য দেশগুলির শোষণ প্রজাতন্ত্রকে বিপন্ন করে তুলল। কুয়োমিনতাং দল গঠনকরে সান ইয়াৎসেন গণবিপ্লবের উপযোগী একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করলেন, যার কর্মসূচী হল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কার সাধন করা। চীনা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় শুরু হল কম্যুনিস্ট দলের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত কম্যুনিস্ট দল বা সি.সি.পি. (Chinese Communist Party) **কুয়োমিনতাং বা কে.এম.টি.** (Keo-Min-Tang) দলের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলছিল। কিন্তু ১৯২৫ সালে সান-ইয়াৎ-সেন মারা গেলে চিয়াং কাইশেক নির্মমভাবে কম্যুনিস্ট নিধন শুরু করল। এমতাবস্থায় সি.সি.পি-র নেতৃত্ব দখল করলেন মাও-সে-তুং। তিনি জাপানি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনের জাতীয়তাবাদী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের নেতৃত্ব সি.সি.পি. নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন। এর আগেই তিনি চীনা

সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা করে ও ১৯৩৪-৩৫ সালের অক্টোবরে লঙ মার্চ দ্বারা দীর্ঘ সাড়ে সাতহাজার মাইল পথ অতিক্রম করে সি.সি.পি. পরিচালিত গণ আন্দোলনের ভিত্তি মজবুত করেছিলেন। ১৯৪৯ সালের পয়লা অক্টোবর চীনের দীর্ঘ ও সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিণতি পেল গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

৯.২.১৩ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে জাপানের অবস্থা

পশ্চিমী সভ্যতার অভিঘাত জাপানে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তা চীনের থেকে বিপরীত। চীন পশ্চিমী অনুপ্রবেশের চাপে ক্রমিক দুর্বলতা ও অস্থিরতার পথে ধাবিত হল। অন্যদিকে জাপান নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠে এবং দ্রুতগতিতে পশ্চিমী দেশগুলির আদর্শে একটি শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়। ১৮৫৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমোডোর পেরী জাপানকে উন্মুক্ত করেন। এরপর ১৮৬৮ থেকে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জাপানে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটল এবং জাপান একটি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র থেকে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হল। কারণ জাপানি রাজনীতিবিদরা উপলব্ধি করেছিলেন যে পশ্চিমী দুনিয়া থেকে দূরে সরে থাকা নয়, পাশ্চাত্যকরণের মাধ্যমেই জাপানের অগ্রগতি আসবে। এই নীতি অনুসরণ করে ১৮৫০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য একেবারে শূন্য থেকে ২০০ মিলিয়ানে পরিণত হল। এরপর জাপান পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর অনুকরণে সাম্রাজ্যবাদের পথে পা বাড়ালো। সে সম্প্রসারণশীল নীতি গ্রহণ করে উনিশ শতকের শেষ দিকে চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হল। দুটি দ্বন্দ্বেই জয়ী হয়ে জাপান সুদূর প্রাচ্যে নিরঙ্কুশ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হল। কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় বিশেষ সুবিধার অধিকারী হয় জাপান এবং এর ফলে ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়া গ্রাস করে নিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পাশ্চাত্য দেশগুলো ইউরোপীয় যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় জাপান বিনা প্রতিরোধে সুদূর প্রাচ্যে একক আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হল। চীনে জার্মানির অধিকৃত অঞ্চলগুলো জাপান করায়ত্ত করে এবং চীনের উপর পনেরো দফা দাবি আরোপ করল। ভার্সাই সম্মেলনের পর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল। ওয়াশিংটন সম্মেলনের মাধ্যমে আমেরিকা জাপানের নৌশক্তি যথেষ্ট পরিমাণে খর্ব করতে সক্ষম হল। জাপান নৌবলে আমেরিকা ও ব্রিটেনের পরে স্থান পেল। শুধু তাই নয়, চীন ও রাশিয়ার থেকে অধিকৃত সমস্ত স্থান সে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হল। আমেরিকার উন্মুক্ত দ্বার নীতি তাকে সমর্থন করতে হল, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সে শক্তিসাম্য বজায় রাখতে বাধ্য হল।

কিন্তু ১৯৩০ সালের পর জাপান পুনরায় সম্প্রসারণশীল হয়ে উঠল। প্রথমে মাঞ্চুরিয়া ও পরে চীন জাপ আক্রমণের শিকার হয়। ১৯৩৯ সালে যখন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল জাপান দুর্বার গতিতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হল। এতে আমেরিকা যারপরনাই উদ্বিগ্ন হল। অবশেষে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে জাপান আমেরিকান ঘাঁটি পার্ল হারবার আক্রমণ করল। তখন আমেরিকা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

জাপানের আক্রমণে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিধ্বস্ত হয়েছিল। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে জাপানের পরাজয় হলেও এশিয়ায় পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। জাপ আক্রমণের

ফলে এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য ঘাঁটিগুলি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। ১৯৪৫ সালে জাপান পরাজিত হল কিন্তু পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ আর এশিয়ায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারল না। বস্তুতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপ ও এশিয়ার ফ্যাসীবাদী শক্তিগুলির চূড়ান্ত পরাজয় ঘটল। আবার, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের আঘাতে ক্ষীণবল হয়ে উঠল। তাদের পক্ষে সাম্রাজ্যের কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ল। স্বভাবতই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকায় নবযুগ এল এবং ঔপনিবেশিক শাসনের ক্রমিক অবসান ঘটল। এই নবযুগের অভ্যুদয়কে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ প্রতিরোধ করতে পারল না।

৯.২.১৪ নতুন এশিয়ার অভ্যুদয়

যুগ যুগ ধরে পশ্চিমী দেশগুলি এশিয়ার উপর অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব করে এসেছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত পশ্চিমী দুনিয়া উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল যে আমেরিকা বা ইউরোপ নয়, এশিয়া, বিশ্বের শক্তিসাম্য নিয়ন্ত্রণ করবে। নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী ছিল পাশ্চাত্যের উপর প্রাচ্যের প্রাধান্যের যুগ। আরবরা শুধু দক্ষিণ ইউরোপের এক বড়ো অংশের কর্তৃত্ব ভোগ করত তাই নয়, আরব ছিল এক অত্যন্ত উন্নত সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। অ্যাটিলা, চেঙ্গিস খাঁন ও তৈমুরের নেতৃত্বে মোঙ্গলরা ইউরোপের একটি বড়ো অংশ অধিকার করেছিল। পরবর্তীকালে তুর্কীরাও ইউরোপের একটি উল্লেখযোগ্য অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করেছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতক থেকে রেনেসাঁর আদর্শের প্রভাবে, যান্ত্রিক শিল্পের বিকাশে, জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের স্থাপনের দ্বারা উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধকৌশল এবং অর্থনৈতিক শক্তির বলে পাশ্চাত্য জগত ক্রমে ক্রমে প্রাচ্যকে গ্রাস করে নিল। এশীয় দেশগুলির উপরোক্ত শক্তিগুলির সবকটিরই অভাব ছিল। এছাড়া, এশীয় দেশগুলি ছিল মূলত কৃষিপ্রধান এবং কৃষি পদ্ধতি ছিল শতাব্দী প্রাচীন ও প্রকৃতি নির্ভর। একমাত্র জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে নিজেকে পাশ্চাত্য ধাঁচে বদলাতে পেরেছিল এবং একটি উন্নত শিল্পপ্রধান দেশে নিজেকে রূপান্তরিত করেছিল। কিন্তু এশিয়ার আর কোনো দেশ এই সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

এশীয় দেশগুলির কতকগুলি মৌলিক সমস্যা ছিল। কৃষিপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমানতা জনিত প্রবল চাপ এখানকার জীবনযাত্রার মান নিম্নমুখী করে তুলেছিল। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে এশিয়ার প্রবল জনসংখ্যার চাপ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন পৃথিবী পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক ঐক্য কূটনীতিক মেরুবিন্যাসে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, ভারতবর্ষের গোষ্ঠীনিরপেক্ষ আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। সুতরাং পশ্চিমী দেশগুলির পক্ষে আর পিছিয়ে পড়া এশীয় দেশগুলিকে উপেক্ষা করা সম্ভবপর নয়। বিপুল জনগোষ্ঠীপূর্ণ অসীম সম্ভাবনাময় এই দেশগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক মানোন্নয়নে পশ্চিমী দেশগুলি তাই নিজেদের স্বার্থেই এগিয়ে এসেছিল। যেখানে আমেরিকা ও ব্রিটেন সহায়তা দানে ব্যর্থ হত, সেখানে এগিয়ে আসত রাশিয়া। কোরিয়া ও ইন্দোচীনে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের পারস্পরিক সংঘাত সৃষ্টি করেছিল ক্ষতিকর যুদ্ধ। একই কারণে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থাও জটিল চরিত্র ধারণ করেছিল। এভাবে, যেমন এশিয়া মেরুকরণের কূটনীতিকে রোধ করতে পারত, তেমনি আবার বিশ্বকে সে অধিকতর মেরু বিভাজনের দিকে ঠেলে দিতে পারত। কাজেই এশিয়ায় সূর্যোদয়ের সঙ্গে পরিচিত না হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালের আন্তর্জাতিক ইতিহাসের গতিধারা বুঝে ওটা সম্ভবপর নয়।

৯.২.১৫ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে উত্তরপূর্বে জাপান ও উত্তর পশ্চিমে আয়ার্ল্যান্ডের মধ্যে যে ভূখণ্ড ভারত হল তার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। শুধুমাত্র ভৌগোলিক অবস্থানের দিকেই নয়, ভারত হল এশিয়ার মধ্যে প্রথম দেশ যেখানে প্রকৃত গণতন্ত্র গৃহীত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই দুই বৈশিষ্ট্য ভারতকে অত্যন্ত বিশিষ্টতা দান করেছে। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে ভারত এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার ভিত্তিভূমি ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এশীয় রণাঙ্গনে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক অভিযানের কেন্দ্রস্থল ছিল ভারতীয় উপমহাদেশ। কিন্তু যুদ্ধের অবসানের পর, ব্রিটেন রণক্লান্ত হয়ে পড়ে, তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দ ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের নীতি গ্রহণ করেন।

কিন্তু ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর কোনো সহজ সমস্যা ছিল না। এখানে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ সরকার যখন ভারতীয়দের প্রশাসনে অংশগ্রহণের অধিকার দিচ্ছিল তখন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতার সূচনা হল, এই বিবদমান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল হিন্দু ও মুসলমান। ১৯৩৪ সালে মহম্মদ আলি জিন্না লন্ডন থেকে ফিরে এসে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনগুলিতে বোঝা গেল যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হল কখনোই মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বার্থ স্বীকার বা রক্ষা করবে না। ১৯৪০ সাল থেকেই জিন্না মুসলিম লীগকে একটি গণপ্রতিবাদী দল হিসাবে গড়ে তুললেন ও পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবী শুরু করলেন। ১৯৪৩ সালে ক্রিপ্‌স্ মিশন ও ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশন যে স্বাধীনতা প্রস্তাব দিল জিন্না তা সরাসরি নাচক করে দিলেন। সুতরাং, কংগ্রেস আর এমন দাবি করতে পারল না যে ভারতবাসীর একমাত্র প্রতিনিধি সে। অন্যদিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজে ব্রিটেনের পক্ষে আর লীগের দাবিকে পাশে সরিয়ে রাখা সম্ভবপর হল না।

এরপর ক্ষমতা হস্তান্তর আলোচনায় লীগ ও কংগ্রেস পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল এবং যতটা সম্ভব বেশি সুবিধা আদায় করার চেষ্টা করতে লাগল। এর পরিণামে ভারতের এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে শুরু হল দাঙ্গা। ভারতের উত্তরার্ধে আফগানিস্তান থেকে বার্মা পর্যন্ত শুরু হল সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড। এমতাবস্থায় ভারত ভাগ অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল। ব্রিটিশ সরকার স্থির করেছিল যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ভারতকে স্বাধীন করে ফেলতে হবে। ১৯৪৭ সালে জুন মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে ভারত স্বাধীনতা আইন পাশ হল তাতে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দুটি দেশ গঠনের কথা বলা হয়, একটি হল ভারতবর্ষ, অপরটি পাকিস্তান। উত্তর ভারতে হিন্দু ও শিখরা ভারতে চলে এল এবং মুসলমানরা পাকিস্তানে চলে গেল। কিন্তু দক্ষিণ ভারত এই পুনর্বাসন প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত ছিল। সেখানকার মুসলমান অধিবাসীরা স্বস্থানে রয়ে গেল। তারা হল বৃহত্তম সংখ্যালঘু গোষ্ঠী।

ভারত বিভাজন সত্ত্বেও আরো বহু সমস্যা রয়ে গেল। যেমন, দেশীয় রাজ্যসমূহের ওপর অধিকার। ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেছিল যে দেশীয় রাজ্যগুলি নিজেরা ঠিক করবে তারা কোন পক্ষে যাবে—ভারত না পাকিস্তান। হায়দ্রাবাদ, জুনাগড় ও কাশ্মীর—এই তিনটি রাজ্য যেকোনো দিকে যেতে পারত। হিন্দু অধ্যুষিত অথচ মুসলমান শাসিত হায়দ্রাবাদ ও জুনাগড় ভারতের সঙ্গে যোগ দিল, কিন্তু কাশ্মীর নিয়ে সমস্যা তৈরি

হল। আজও তার সমাধান হল না। মুসলমান অধ্যুষিত কাশ্মীরের হিন্দুশাসক ভারতের সঙ্গে যোগদানের কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই মতো ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীরের অধিকাংশ দখল নিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান সেখানকার মুসলমান উপজাতিদের সাহায্য করার নামে আক্রমণ চালাতে লাগল। ১৯৪৮ সালের পয়লা জানুয়ারি ভারত এবিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদে নালিশ জানাল। চার্লস্ ডিক্সনের নেতৃত্বে একটি কমিশন কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল। কাশ্মীর কার্যত ভারতীয় ও পাকসেনাদের অবস্থান অনুযায়ী দুভাগে ভাগ হয়ে থাকল। তবে উভয় দেশই নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত মেনে নিল যে কাশ্মীর থেকে সৈন্য অপসারণ করতে হবে ও সেখানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদ তার সিদ্ধান্ত দুটি কার্যকর করার কাজে নিরন্তর চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থ হল। ১৯৫৭ সালে আবার নতুন করে যখন কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু হল তখন দুই পক্ষের সম্পর্ক আরো অবনত হয়েছে। পাকিস্তান যেমন কাশ্মীরে গণভোট করার দাবি জাপান ভারত তেমন অনড় রইল এই দাবিতে যে গণভোটের আগে পাকসেনার অপসারণ আবশ্যিক। ভারত নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল ভারত দাবি করল তা গণভোট। এদিকে পাকিস্তান আমেরিকার সাথে মৈত্রীবন্ধ হয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করতে লাগল, ভারতের মতে তা ছিল আশঙ্কাজনক। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিন্ধুনদের জল ব্যবহার নিয়ে দুই দেশ যদিও একমত হল তবুও কাশ্মীর নিয়ে ঠাণ্ডা লড়াই অব্যাহত রইল। ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর নিয়ে দুই দেশের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হল।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিকাশে ভারতের স্বাধীনতা লাভ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর এশিয়ার অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা প্রক্রিয়া আর রোধ করা সম্ভব হল না। এর ফলে এশীয় পরিস্থিতি আমূল বদলে গেল। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত দেশ হিসাবে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। এরপর যখন ব্রিটেনের এশীয় উপনিবেশগুলি একের পর এক স্বাধীনতা অর্জন করতে লাগল তখন ব্রিটিশ কমনওয়েলথের কাঠামো সম্পূর্ণ বদলে গেল। আগে এটি ছিল একটি আঁটোসাঁটো ইউরোপীয় সংগঠন, এখন তা অনেক বিস্তৃত কিন্তু শিথিল কাঠামো, যেখানে ইউরোপীয়রা হল অনেক কম সংখ্যক। ‘ব্রিটিশ’ এই বিশেষণটি অচল হয়ে গেল। বিশ্বশক্তি হিসেবে ব্রিটেনের স্থান এর ফলে আমূল বদলে গেল। আগে ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ ও ভারতীয় সেনাদলকে পুবে অথবা পশ্চিমে প্রয়োজনমতা যেকোনো দিকে চালনা করানো যেত কিন্তু এখন আর তা সম্ভব ছিল না। মধ্যপ্রাচ্য সংকটে এর ফলে ব্রিটেন কোনো কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারল না।

ভারত ও পাকিস্তানের ইতিহাসে দুটি বিপরীত ধারায় অগ্রসর হল। নেহরু ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ভারতকে পরিচালিত করেছিলেন। সেখানে জিন্না ১৯৪৮-এর সেপ্টেম্বরে মারা গেলেন। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খান ১৯৫১ সালে নিহত হলেন। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ বহুজাতিক রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করেছিল। এই আদর্শের খাতিরে তাকে কখনো কখনো অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছিল। যেমন, নাগা উপজাতির স্বায়ত্তশাসনের দাবি নাচক কিংবা ১৯৬১ সালে পতুর্গীজ দখল থেকে গোয়া দখল করা। বিপরীত থেকে পাকিস্তান ছিল একটি মুসলমান রাষ্ট্র। বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে ভারত অভিনবত্ব অর্জন করতে চাইল গোষ্ঠী নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করে। এর ফলে যে আশা করেছিল যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিবদমান রাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যস্থতা করার সুযোগ সে পাবে। পক্ষান্তরে, ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান ছিল আমেরিকার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মৈত্রীবন্ধ, সে বাগদাদ ও ম্যানিলা উভয় চুক্তিতে যোগদান করেছিল।

৯.২.১৬ মালয়েশিয়া

মালয় দেশে ব্রিটিশ শাসন ছিল প্রজানুরঞ্জক স্বৈরতন্ত্র, যা পরিচালনা করতে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। ব্রিটিশ শাসন সেখানে নিয়ে এসেছিল আধুনিকতা, সমৃদ্ধি ও জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী। মালয়ের তিনটি প্রধান জনগোষ্ঠী মালয়ী, চীনা ও ভারতীয়রা ব্রিটিশ বিরোধী ছিল না এই কারণে যে তাহলে দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। মালয়ে এগারোটি পৃথক সরকার ছিল আর অদূর ভবিষ্যতে এর কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা ছিল না, অথচ অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে সেখানে ব্রিটিশ শাসনের সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছিল। ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি মালয়ে জাপানি সৈন্যের কাছে ব্রিটিশ বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। যখন ব্রিটিশ ভারতীয় যুগ্ম বাহিনী প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তখন জাপানে আণবিক বোমা বর্ষণের খবর এল। যুদ্ধের প্রয়োজন আর থাকল না ঠিকই কিন্তু ব্রিটিশ বাহিনী আর ঔপনিবেশিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইল না। পক্ষান্তরে মালয় জনসাধারণ বিদেশি শাসন সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিল অথচ তারা স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী হয়ে উঠতে পারেনি।

তখন ব্রিটিশ সামরিক শাসনের পরিবর্তে সেখানে মালয় ইউনিয়ন নামে একটি অভিভাবক সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এই ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপিত হতে ব্রিটিশ সরকার তড়িঘড়ি মালয় যুক্তরাজ্য (Malay Federation) প্রতিষ্ঠা করল। ১৯৪৮ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ উপদেশের বলে তা কাজ করতে শুরু করল। এরপর ব্রিটিশ সরকার মালয় উপদ্বীপের লাভজনক রাবার ও টিন ব্যবসার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে নজর দিল। কিন্তু এবার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ঘটল কম্যুনিস্টদের, যারা ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুরে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। মালয় কম্যুনিস্টরা ছিল একাধারে জাতীয়তাবাদী ও পুঁজিবাদবিরোধী। তারা বিদেশিদের বিতাড়িত করতে চাইত। নানা নাশকতামূলক কাজকর্ম যেমন অন্তর্ঘাত, ট্রেন ডাকাতি, রাবার গাছ ধ্বংস করা ইত্যাদিতে তারা জড়িত ছিল। প্রায় ৬,০০০ কম্যুনিস্ট নিয়ে গঠিত রেড গেরিলা বাহিনী জঙ্গল থেকে আক্রমণ চালাতে লাগল। এদের দমন করতে জাতীয় আয়ের এক চতুর্থাংশ ব্যয় হত।

পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত এলিট গোষ্ঠীও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য দাবি তুলেছিল। এদের জাতীয়তাবাদী বলে গণ্য করা হত। ব্রিটিশ সরকার স্থির করেছিল যে তারা জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন করে কম্যুনিস্টদের প্রতিরোধ করবে। কম্যুনিস্টদের চাপে মালয় জাতীয়তাবাদীরা তাদের জাতিশত্রুতাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখল। ১৯৫৫ সালে যে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল তাতে Malay-Chinese-Indian Alliance Party (MCI) ৫২টি আসনের মধ্যে ৫১টি আসন লাভ করল। ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করল যে মালয়ে তাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই, তারা ক্ষমতা হস্তান্তরের আয়োজন করতে লাগল।

১৯৫৭ সালের আগস্ট মাসে একটি চুক্তির দ্বারা ব্রিটিশ সরকার মালয়েশিয়ায় তাদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটাল। সিঙ্গাপুর একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে প্রকাশিত হল। ১৯৫৯ সালের ৩০শে মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে Peoples' Action Party ক্ষমতায় এল। তারা বৈদেশিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ মানতে বাধ্য ছিল, কারণ সামরিক অবস্থানগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ সরকারের নৌ ঘাঁটি ছিল। এরপর মালয়ে আবার শান্তি ফিরে এল। যদিও মালয় গোষ্ঠী নিরপেক্ষতা তার সরকারি বিদেশ নীতি হিসাবে গ্রহণ করল তবুও ঠান্ডা লড়াইতে তার সহানুভূতি রইল আমেরিকা ও ব্রিটেনের প্রতি। কিন্তু নগররাষ্ট্র সিঙ্গাপুরের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল বলে ১৯১৬ সালে পরিকল্পনা করা হল যে, মালয়, সিঙ্গাপুর এবং উত্তর বোর্ণিও,

সাবা এবং সারাওয়াক—এই তিনটি উপনিবেশ নিয়ে গঠিত হবে মালয়েশিয়া যুক্তরাজ্য (Federation of Malayasia)। থাইল্যান্ড থেকে ফিলিপাইনস্ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি একক রাজ্য হবে এটি।

১৯৬৩ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়া জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে এশিয়ার সাথে ইউরোপীয়ান সম্পর্ক কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত যদিও MCI ক্ষমতাসীন ছিল তবুও দুর্ভাগ্যবশত মালয়ী ও চীনাদের মধ্যে জাতিগত বিরোধ শুরু হল। এর ফলে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সম্ভাবনাময় বহুজাতিক একটি রাষ্ট্রের পতন ঘনিয়ে এল। ১৯৬৯ সালে সিঙ্গাপুরকে যুক্তরাজ্য থেকে বিতাড়িত করা হল এই অজুহাতে যে সেখানকার চীনারা যুক্তরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। এরপর থেকে সিঙ্গাপুর প্রজাতন্ত্র ও মালয়েশিয়ার সাংবিধানিক রাজতন্ত্র উভয়েই ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ্ ভুক্ত হল।

৯.২.১৭ ব্রহ্মদেশ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রহ্মদেশ ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন। ১৯৩৫ সালে পাশ হওয়া ব্রহ্মদেশ শাসন আইন (Government of Burma Act, 1935) অনুসারে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে পৃথক করা হয়েছিল এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত এই সরকার অধিকাংশ বর্মীকে খুশি করতে পারেনি। কিন্তু কিছু বর্মী ভারত ব্রহ্মদেশের সমৃদ্ধির সিংহভাগ থেকে বঞ্চিত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই অসন্তোষ থেকে জন্ম নেয় Peasants Unions। ১৯৪২ সালে জাপানিরা ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করে রেঙ্গুন আর উর্বর ধান্যোৎপাদক অঞ্চল ইরাবতী উপত্যকা দখল করল। তারা সেখানে Independent Republic of Burma নামে একটি পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে কোনো দেশের থেকে ব্রহ্মদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। যখন ব্রিটিশ বাহিনী পিছু হঠছিল, তখন তারা পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করেছিল। এছাড়া, নিষ্ফল ভারত আক্রমণের ঘাঁটি হিসাবে জাপান তাকে ব্যবহার করেছিল। এর ফলে বর্মী শহর ও পরিবহণ ব্যবস্থা মিত্রপক্ষের বিমান আক্রমণের দ্বারা ক্রমাগত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হচ্ছিল। এর ওপর আবার বর্মী প্রতিরোধ বাহিনী ও জাপানিদের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ হচ্ছিল।

এইভাবে ব্রহ্মদেশের মানসিক ও ঐহিক ক্ষতি তাকে নিঃশেষিত শক্তিতে পরিণত করেছিল। এমতাবস্থায়, চীনা-আমেরিকান বাহিনী উত্তর ব্রহ্মদেশ এবং ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনী নিম্নব্রহ্ম অঞ্চল দখল করে নিল। ১৯৪৫ সালে এপ্রিল মাসে জাপান রেঙ্গুন ত্যাগ করল। পুতুল সরকার ভেঙে দিয়ে ব্রিটেন আবার ব্রহ্মদেশের শাসনভার গ্রহণ করল। ১৯৪৫ সালের মে মাসে ব্রহ্মদেশে প্রশাসন সংক্রান্ত একটি শ্বেতপত্র প্রকাশিত হল।

ঐ শ্বেতপত্রে এরকম ইঙ্গিত ছিল যে ব্রিটেন ব্রহ্মদেশে স্বাভাবিক সরকার পুনর্গঠন করতে চায়, নির্বাচনের মাধ্যমে এবং একটি সংবিধান গঠন করে ব্রহ্মদেশকে ব্রিটেন কমনওয়েল্থ্ ভুক্ত একটি স্বশাসিত দেশের মর্যাদা দিতে চায়। কিন্তু ব্রহ্মদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজ এত সহজ ছিল না। যুদ্ধকালীন প্রতিরোধ বাহিনীর একজন নেতা উ আউং সান (U Augn San) ব্রহ্মদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বর্মীদের অধিকার চেয়ে তাৎক্ষনিক স্বাধীনতা দাবি করলেন। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আউং সান নিহত হলেন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন উ নু (N Nu)। তিনি যে খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করলেন তাতে ব্রহ্মদেশকে Union of Burma বলে ঘোষণা করা হল। তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলী উপলব্ধি করলেন যে অন্তর্বিরোধ দীর্ণ ব্রহ্মদেশকে

আর ব্রিটেনের সঙ্গে যুক্ত রাখা যাবে না। কাজেই উ নু লন্ডন গিয়ে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন, যার দ্বারা ব্রহ্মদেশকে স্বাধীনতা দেওয়া হল।

স্বাধীনতার সময় থেকেই ব্রহ্মদেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ব্রহ্মদেশ প্রথম কম্যুনিস্ট চীনকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল। একই সঙ্গে ব্রিটেন ও আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। যদিও পিকিং উনুকে সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার বলে বর্ণনা করেছিল তবুও তিনি মুক্ত পৃথিবী ও কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের মধ্যেকার বিরোধ থেকে পৃথক থাকতেন। তিনি জোর দিয়ে বলতেন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা। তাঁর মত ছিল এই যে এশিয়ার প্রকৃত যুদ্ধ আদর্শবাদের লড়াই নয়, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই।

৯.২.১৮ ইন্দোনেশিয়া

১৯৩৯ সালের আগে জাভা, সুমাত্রা বোর্নিও এবং নিউগিনির বেশির ভাগ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল ইন্দোনেশিয়া। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই ইন্দোনেশিয়াতে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিস্ট আদর্শ ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছিল, সর্বত্র শ্রমিক ধর্মঘট দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ডাচ সরকার জাতীয়তাবাদী নেতাদের কারারুদ্ধ করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করেছিল। ১৯৪২ সালে জাপান ইন্দোনেশিয়া দখল করে যখন জাতীয়তাবাদী নেতাদের মুক্তি দিল তখন সেখানে ডাচ শাসকদের বিরুদ্ধে উত্তাল আন্দোলন গড়ে উঠল। জাপান আত্মসমর্পণ করার দুদিন পর ইন্দোনেশিয়ার জনপ্রিয় নেতা সুকর্ণ নেদারল্যান্ডস ইস্ট ইন্ডিজে ইন্দোনেশিয় প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করলেন। কিন্তু হল্যান্ডের ডাচ সরকার ঐ নতুন প্রজাতন্ত্রকে জাপানের উপগ্রহ বলে বর্ণনা করল, তাই ডাচ সরকার ঐ প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি জানাতে রাজি হল না।

১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে নেদারল্যান্ডস ইস্ট ইন্ডিজের গভর্ণর জেনারেল ডাচ সরকারকে অনুরোধ জানালেন ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিষয়ে একটি ফয়সালা করার জন্য। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ সরকারও ডাচ সরকারকে চাপ দিতে থাকল যে হল্যান্ড যেন ইন্দোনেশিয়ায় কমনওয়েলথ গঠন করার প্রস্তাবটি কার্যকর করে। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের সাথে আলোচনার জন্য জাভাতে একটি কমিশন এল। শেষ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া ও হল্যান্ডের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এর শর্তাবলি ছিল এই রকম—প্রথমত, ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্র গঠিত হবে জাভা এবং ইন্দোনেশিয়া দ্বারা। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্র, বোর্নিও এবং গ্রেট ইস্ট টেরিটরি (Great East Territory) নিয়ে গঠিত হবে একটি ইউনিয়ন এবং একটি সংবিধান পরিষদ ঐ ইউনিয়নের সংবিধান রচনা করবে। তৃতীয়ত, ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে নেদারল্যান্ডস ইন্দোনেশিয়ান ইউনিয়ন পরিপূর্ণভাবে গঠিত হবে এবং এই ইউনিয়নের প্রধান হবেন নেদারল্যান্ডসের রানী। ইউনিয়নের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক নীতি নির্ধারণ করবেন রানী। যুদ্ধবিরতির জন্য একমত হয়ে ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে নেদারল্যান্ডস ও ইন্দোনেশিয়ার প্রজাতন্ত্র উভয়েই এই চুক্তি অনুমোদন করল।

কিন্তু পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জন্য চুক্তির শর্তসমূহ বাস্তবায়িত করা সম্ভব হচ্ছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত না ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত একটি অন্তবর্তী সরকার গঠনের প্রয়াসও সফল হল না।

১৯৪৭ সালের মে মাসে ডাচ সরকার পাঁচটি দাবি সম্বলিত একটি চরমপত্র পাঠাল। প্রত্যুত্তরে ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্র মধ্যস্থতা চাইল। কিন্তু ডাচ সরকার কোনোরকম মধ্যস্থথা মানতে রাজি হল না। তখন, ব্রিটেন ও আমেরিকার চাপে উপায়ন্তর না দেখে ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্র অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে রাজি হল এবং ডাচ সরকারের চারটি দাবি মানতে রাজি হল। কিন্তু ডাচ সরকার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে ইন্দোনেশিয়া আক্রমণ করল।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ভারতের অনুরোধে নিরাপত্তা পরিষদ ইন্দোনেশিয়ার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে রাজি হল এবং যুদ্ধরত দুই পক্ষকে যুদ্ধ বন্ধ করার সুপারিশ করল। প্রথমে উভয় পক্ষ রাজি হলেও ইন্দোনেশিয়া যুদ্ধবিরতি মানতে চাইল না এই অজুহাতে যে ডাচ সরকার তখনও গোপনে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকা প্রস্তাবমতো নিরাপত্তা পরিষদ ইন্দোনেশিয়ার অবস্থার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য একটি কমিশন গঠন করল। ইন্দোনেশিয়া এই কমিশনের সুপারিশ মানতে রাজি হলেও ডাচ সরকার রাজি হল না। রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, সিরিয়া এবং কলম্বিয়া ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের পাশে দাঁড়াল। কিন্তু ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম হল্যান্ডকে সমর্থন করতে থাকল। আমেরিকা ও জাতীয়তাবাদী চীন অবশ্য হল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে পারস্পরিক মীমাংসা কামনা করল।

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নিয়োজিত কমিশন ডাচ-ইন্দোনেশীয় সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করতে ব্যর্থ হল। ডাচ সরকার আবার আক্রমণ করতে শুরু করল। ১৯৪৯ সালে আমেরিকা তার পূর্বেকার নীতি পরিবর্তন করে ডাচ সরকারকে সমালোচনা করল, ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রকে পরিপূর্ণ সমর্থন জানাল, জাকার্তায় ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করল এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে ডাচ সৈন্যের অপসারণ দাবি করল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর আমন্ত্রণে এশীয় ও আফ্রিকান দেশগুলির প্রতিনিধিরা নতুন দিল্লিতে একটি সম্মেলনে মিলিত হলেন ইন্দোনেশীয় সমস্যা আলোচনা করার জন্য। ১৯৪৯ সালে আমেরিকার প্রস্তাব ও দিল্লি সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত একই ছিল।

দিল্লি সম্মেলনের অব্যবহিত পরে নিরাপত্তা পরিষদ যে সিদ্ধান্তগুলি নিল তা হল এই—রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে, জাকার্তা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলগুলি ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রকে ফিরিয়ে দিতে হবে, ইন্দোনেশিয়া থেকে ডাচ সৈন্য অপসারণ করতে হবে, ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে হবে এবং ১৯৫০ সালের জুলাই মাসের মধ্যে ইউনিয়ন অব ইন্দোনেশিয়া গঠন সম্পূর্ণ করতে হবে। ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে ডাচ সরকার ও ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল এবং ডিসেম্বর মাসে আনুষ্ঠানিক ভাবে ইউনিয়ন অব ইন্দোনেশিয়া ঘোষিত হল।

এইভাবে স্বাধীনতা পাবার পরও ইন্দোনেশিয়াতে শান্তি ফিরে এল না, কারণ জঙ্গী জাতীয়তাবাদের প্রকোপে সেখানকার প্রশাসন ও রাজনীতি এতই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল যে প্রশাসনিক দক্ষতা এবং রাজনৈতিক ঐক্য কোনোটিই অর্জন করা সম্ভব হল না। ১৯৫৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত কোয়ালিশন সরকার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থায়ীত্ব আনতে পারল না, এই সুযোগে ১৯৫৯ সালে সুকর্ণ ক্ষমতা দখল করে সংবিধান বাতিল করে দিলেন। তিনি তাঁর সামরিক শাসনের নাম দিলেন "নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র" (Guided Democracy), বলা বাহুল্য এর মধ্যে গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও ছিল না।

১৯৫৯ সালে একটি রাজনৈতিক ইস্তাহার প্রকাশ করে বলা হয়েছিল যে ইন্দোনেশীয় বিপ্লবের প্রাথমিক দায়বদ্ধতা হল পৃথিবীর সমস্ত দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা, বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার

দেশগুলির সঙ্গে। এই বন্ধুত্বের ভিত্তি হবে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতা। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ মুক্ত এক পরিপূর্ণ শান্তিময় পৃথিবী। বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়া সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রসমূহ, ইরাক ও যুগোশ্লাভিয়ার মতো নিরপেক্ষবাদের এক প্রধান সমর্থক। অবশ্য পাশ্চাত্য শক্তিগুলি ঠান্ডা যুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার জড়িত না হওয়াকে পাশ্চাত্য বিরোধী ও কম্যুনিস্ট প্রবণ বলে অভিহিত করল।

৯.২.১৯ ইন্দোচীন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ফরাসী ইন্দো-চীন গঠিত ছিল লাওস, কাম্বোডিয়া, টনকিন, অন্নাম এবং কোচিন চীন নিয়ে। প্রথম চারটি ছিল ফ্রান্সের আশ্রিত এবং কোচিন চীন ছিল ফরাসি উপনিবেশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে নেদারল্যান্ডস ইস্ট ইন্ডিজের মতো ইন্দোচীনেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান ইন্দোচীন দখল করে এবং সেখানে ফরাসিদের বন্দী করে। ১৯৪৫ সালে ইন্দোচীন ছাড়ার আগে অন্নাম, টনকিন এবং কোচিন চীন সংযুক্ত করে ভিয়েতনাম নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, অন্নামের প্রাক্তন শাসক বাও দাই হলেন-এর শাসক।

১৯৪২ সালে অন্নাম-এর কম্যুনিস্টরা হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামের স্বাধীনতার জন্য একটি লীগ গঠন করল। এর নাম হল ভিয়েতমিন। জাপানের পতনের পর ভিয়েতমিন লীগ ভিয়েতনামকে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করে। বাও দাইকে সমস্ত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হল। ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে দ্য গল সরকার ইন্দোচীনকে ফ্রান্সের শাসনাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য বলে ঘোষণা করল। আলোচনার সুবিধার জন্য ভিয়েতনাম ও ফ্রান্স যুদ্ধবিরতি মেনে নিল। কিন্তু ভিয়েতনাম সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করল এবং কেবলমাত্র নামে ফরাসি ইউনিয়নের মধ্যে থাকতে চাইল। এর ফলে আলোচনা পণ্ড হল, ফ্রান্স ও ভিয়েতনাম আবার যুদ্ধ শুরু করল এবং ফ্রান্স ইন্দোচীনে এক বিরাট সংখ্যক সৈন্য পাঠাল। তবে ভিয়েতমিন সেনাদের পালটা আক্রমণে ভীত ফ্রান্স ১৯৪৬ সালে ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিল। কিন্তু এই মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সময় আবার সংঘর্ষ দেখা দিল ফলে আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

ভিয়েতমিনদের বাধা দেবার জন্য ফ্রান্স বাও দাই-র নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উৎসাহ দিতে লাগল। বাও দাই-র সঙ্গে একটি চুক্তি অনুসারে স্থির হল যে ভিয়েতনাম আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ভোগ করবে, কিন্তু তাকে ফরাসি ইউনিয়নের মধ্যে থাকতে হবে, এবং সেজন্য ভিয়েতনামে একটি ফরাসি সৈন্যবাহিনী মোতায়েন থাকবে। কাম্বোডিয়া এবং লাওস ফরাসি ইউনিয়নে যোগ দিতে রাজি হল এবং বিনিময়ে ১৯৪৯ সালে তারা 'হোমরুল'-এর মর্যাদা লাভ করল। বাও দাই-এর শাসনাধীন ভিয়েতনাম ব্রিটেন ও আমেরিকার স্বীকৃতি পেলেও বাও দাই ভিয়েতনামের রাজনৈতিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে ব্যর্থ হলেন। হো চি মিন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম অব্যাহত রাখলেন।

ইন্দোচীনের ঘটনাবলি প্রমাণ করল যে যতক্ষণ না পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে পাশ্চাত্যের প্রতি সমর্থন বিশিষ্ট কোন শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততক্ষণ ভিয়েতনামে ফ্রান্সের আধিপত্য বজায়রাখা যাবে না। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে ইন্দোচীনের গৃহযুদ্ধ এক নতুন মাত্রা পেল। হো চি মিন এক নতুন সামরিক কৌশল গ্রহণ করলেন। তাঁর রণনীতি ছিল ত্রিবিধ—জনমানস জয় করা, শত্রুদের সরবরাহ বন্ধ করা এবং শক্তিশালী শত্রুঘাঁটিগুলি বিচ্ছিন্ন করা আর সবচেয়ে শেষে তা আক্রমণ করা। শীঘ্রই উত্তর ভিয়েতনামী কম্যুনিস্টরা বা ভিয়েতনামীরা ফরাসি ঘাঁটিগুলির সরবরাহ বন্ধ করে দিতে সক্ষম হল।

উত্তর ভিয়েতনামের এই সংকটের সুযোগ নিয়ে অন্যান্য ইন্দোচীন রাজ্যগুলি ফ্রান্স থেকে সুবিধা আদায় করতে লাগল। ১৯৫৩ সালে কাম্বোডিয়া সামরিক, বিচার ও অর্থনৈতিক বিভাগে পূর্ণ সর্বভৌমত্ব আদায় করে প্রায় স্বাধীন হয়ে গেল। ঐ একই বছরে লাওসের সঙ্গে একটি চুক্তি করে ফ্রান্স তাকে ইউনিয়নের অভ্যন্তরে পূর্ণ স্বাধীনতা দিল।

দিয়েন বিয়েন ফুতে চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর ফ্রান্স সিদ্ধান্ত নিল যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করবে। ১৯৫৪ সালে জেনিভায় স্বাক্ষরিত একগুচ্ছ চুক্তির দ্বারা শত্রুতার অবসান ঘটল। ভিয়েতনামকে দুভাগে ভাগ করা হল, ঐক্যের প্রশ্নটি মুলতুবী রইল ১৯৫৬ সালের নির্বাচন পর্যন্ত। ১৯৫৪-৫৫ সালের মধ্যে উত্তরের Communist Democratic Republic of Vietnam এবং দক্ষিণের Nationalist Republic of Vietnam, কম্বোডিয়া এবং লাওস তাদের নিজেদের বৃদ্ধি ও বিকাশের পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে স্বাধীনতা পেল।

কিন্তু এত করেও দুই ভিয়েতনামের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা গেল না। জেনিভা আলোচনা থেকে হো চি মিন এই ধারণা অর্জন করেছিলেন যে কোনো না কোনো দিন তিনি সমস্ত ভিয়েতনাম নিয়ন্ত্রণ করবেন। তাই ১৯৫৬ সালে তিনি স্বনির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচনের আয়োজন করে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে তাতে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানালেন। স্বাভাবিকভাবেই দক্ষিণ ভিয়েতনামের শাসক নো দিন দিয়েম (Ngo Dinh Diem) ঐ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তিনি এবং হো চি মিন উভয়েই দাবি করতে লাগলেন যে তাঁরা হলেন ভিয়েতনামের বৈধ শাসক।

উত্তর ভিয়েতনামের অন্তর্গত ছিল হ্যানয় ও হাইমাং—দুটি স্থানই ছিল কম্যুনিস্ট প্রভাবিত। অন্যদিকে কোচিন চীন, সায়গন এবং অন্নাম ছিল পশ্চিমী দেশগুলির অধীনস্থ—এই অঞ্চলগুলি দক্ষিণ ভিয়েতনামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এইভাবে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুইভাবে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের শত্রু হয়ে রইল। এই বিভাজন ছিল কৃত্রিম। উত্তর ভিয়েতনাম কম্যুনিস্ট চীনের সমর্থনপুষ্ট ছিল, দক্ষিণ ভিয়েতনাম ছিল পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিশেষ করে আমেরিকার দ্বারা সমর্থিত। জার্মানি এবং কোরিয়ার মতো ইন্দোচীনের বিভাজন আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি পরিচিত ধরণের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছিল। দক্ষিণ ভিয়েতনাম ছিল পশ্চিমী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি।

৯.২.২০ কাম্বোডিয়া

(কাম্পুচিয়া) ইন্দোচীনের মধ্যস্থলে অবস্থিত কাম্বোডিয়া স্বাধীনতা লাভ করেছিল ভিয়েতনাম বিভাজনের সময়। এর জনসংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ। কিন্তু স্বাধীনতা ও ভৌমিক সংহতি রক্ষা করাই ছিল কাম্বোডিয়ার সমস্যা। এছাড়াও থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের সঙ্গে চলছিল সীমান্ত সংঘর্ষ। খেমর্ মন্দির নিয়ে থাইল্যান্ডের সঙ্গে কাম্বোডিয়ার বিবাদ আন্তর্জাতিক আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল, তবে এই বিবাদে কাম্বোডিয়া জয়ী হয়েছিল। কাম্বোডিয়ার শাসক নরোদম সিহানক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর এই নীতি এত সাফল্য অর্জন করেছিল যে সমস্ত সম্ভাব্য উৎস থেকে কাম্বোডিয়ার ওপর আর্থিক সাহায্য বর্ষিত হয়েছিল। ফলে কাম্বোডিয়া একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু আমেরিকা যখন ফ্রান্সের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ইন্দোচীনে কম্যুনিজমের প্রসার রুখতে চেয়েছিল তখন সিহানুক তা বাধা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি কম্যুনিস্ট চীনের দিকে ঝুঁকলেন এবং তাঁর কম্যুনিস্ট প্রতিবেশীদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিতে লাগলেন।

কিন্তু যখন চীন প্রতিবেশী দেশগুলিতে কম্যুনিজম প্রচারের কর্মসূচী গ্রহণ করল তখন আবার সিহানুক তাঁর নীতি পরিবর্তন করেছিলেন। যে তিনি, আমেরিকা যখন কম্যুনিস্টদের দমন করেছিল, তখন তার প্রতিবাদ করেছিলেন, এখন নিজেই আরো নিষ্ঠুর ও কঠোরভাবে কম্যুনিস্টদের দমন করতে লাগলেন। কিন্তু ১৯৭০ সালে আবার তাঁর হৃদয়ে পরিবর্তন ঘটল, তখন কম্যুনিস্টরাই একটি ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে নির্বাসনে পাঠাল। এরপর ভিয়েতমিন কম্যুনিস্টরা কাম্বোডিয়া ছেয়ে ফেললে ওয়াশিংটন দোটানায় পড়ল, কারণ ধারণের নীতি অনুসারে কাম্বোডিয়ায় হস্তক্ষেপ করার আরেকটি অজুহাত উপস্থিত হয়েছিল। ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সন কাম্বোডিয়ায় হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিলেন, কিন্তু একা নয়, সঙ্গে নিলেন দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যদের, আক্রমণের ঘাঁটি হল দক্ষিণ ভিয়েতনাম। কিন্তু পূর্বনির্ধারিত সময় সারণী অনুযায়ী আমেরিকা কাম্বোডিয়া ত্যাগ করল। কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েতনাম কাম্বোডিয়ানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কম্যুনিস্টদের দমন করতে লাগল।

৯.২.২১ লাওস

১৯৫৪ সালে জেনিভা প্রটোকল দ্বারা যে চারটি দেশস্বাধীন হয়েছিল লাওস ছিল তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। লাওসের অবস্থা ছিল পশ্চাদপদ। এখানে সীমিত অভিজাত শ্রেণি, যা গঠিত ছিল রাজা ও তার পরিবারবর্গ, বড়ো জমিদার এবং বৌদ্ধ পুরোহিতদের নিয়ে। লাওস সরকার স্থানীয় কম্যুনিস্টদের দমন করার নীতি গ্রহণ করেছিল। ছোটো এই দেশের গোলোযোগ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠল। আমেরিকা যেমন লাওসিয়ান কম্যুনিস্ট বিরোধীদের সমর্থন করতে লাগল, রুশ, চীনা ও ভিয়েতমিনরা তেমন কম্যুনিস্টদের সমর্থন করল। তবে কোনো পক্ষেরই প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সৌভান্না খৌমার ওপর পূর্ণ আস্থা ছিল না, শান্তির আশায় তিনি গৃহীত হয়েছিলেন এই মাত্র।

৯.২.২২ মধ্যপ্রাচ্যে ঔপনিবেশিকতার অবসান

মধ্যপ্রাচ্যের ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য ঃ উত্তরে পারস্য ও দক্ষিণে আরব উপকূল এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকেপশ্চিমে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত যে ভূখণ্ড বিস্তৃত তা মধ্যপ্রাচ্য নামে পরিচিত এবং এই ভূখণ্ডের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমান। মধ্যপ্রাচ্য এই অভিধাটি নির্দেশ করে যে ইউরোপ থেকে প্রাচ্যে যাবার তোরণদ্বার হল এই অঞ্চলটি। আফ্রিকা উন্মোচিত হবার পরে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়, কারণ পশ্চিম ইউরোপ এবং রাশিয়া থেকে আফ্রিকা যাবার পথে এটি অবস্থিত। মধ্যপ্রাচ্য চিন্তা, ধর্ম এবং ঐহিক কল্যাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

৯.২.২৩ মধ্যপ্রাচ্যে সংকটের উৎস ও স্বরূপ

আশ্চর্য এই যে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের এ হেন সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সত্ত্বেও তা ঐক্য ও মিলনের কারণ না হয়ে বিরোধ ও আশঙ্কার উৎস হয়েছে। খ্রিস্টান, ইহুদি ও ইসলাম—এই তিনটি ধর্মের সূতিকাগৃহ হল মধ্যপ্রাচ্য, ফলে মধ্যযুগে এখানে ধর্মযুদ্ধের আধিক্য ঘটেছিল। যে সময়ের ইতিহাস আলোচনা করা হচ্ছে তাতে যে সমস্যা অত্যন্ত দুর্দমনীয় আকারে দেখা দিয়েছে তা ঐ ধর্মীয় সংকটের ফসল। সংক্ষেপে এর সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে ইহুদি আন্দোলন বলে। এই আন্দোলন বলতে বোঝায় ইহুদিদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা এবং তাদের নিজস্ব

বাসভূমির অনুসন্ধান (Judaism এবং Zionism)। একই রকম ভাবে মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত অধিবাসীরা ইসলামের ছত্রছায়ায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, আধুনিককালে নিখিল আরব ঐক্য (Pan Aralism) এই শ্লোগান তাদের ঐক্যকে বজায় রেখেছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে পশ্চিমী শক্তিগুলির হস্তক্ষেপ আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কৃত্রিম বিভাজন সৃষ্টি করেছিল। বর্তমান সভ্যতার জীবনামৃত তেলের অফুরন্ত ভাণ্ডার পাশ্চাত্য শক্তিগুলিকে এখানে অন্ধ পতঙ্গের মতো আকর্ষণ করেছে, দুঃখজনক হল এই যে এই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করার উপযোগী প্রযুক্তির জন্য আরব দেশগুলিকে পাশ্চাত্য দেশগুলির ওপর নির্ভর করতে হত।

৯.২.২৪ মধ্যপ্রাচ্য সংকটে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ভূমিকা

১৯৩৯ সালের আগে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সক্রিয়তা ছিল সবচেয়ে বেশি, পুঁজি বিনিয়োগ করার সাথে সাথে এই দুটি দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব এখানে খুবই প্রকট ছিল। ফ্রান্সের শিক্ষা এবং সংস্কৃতি বেশি দৃশ্যমান ছিল ইজিপ্ট, সিরিয়া এবং লেবাননে। আলেকজান্দ্রিয়ায় ব্রিটিশরা ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেখানে তারা সামরিক অফিসারদের প্রশিক্ষণ দিত, সুশাসনের ধারণা ও প্রতিষ্ঠার সূচনা করেছিল। তবে, রাজনৈতিকভাবে ফরাসি ও ব্রিটিশ প্রভাব হয়েছিল বিপজ্জনক, যা ভবিষ্যতে মধ্যপ্রাচ্য সংকটকে অত্যন্ত জটিল করে তুলেছিল। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এখানে তুর্কীদের বিরুদ্ধে আরব জাতীয়তাবাদকে লালন করেছিলেন কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তুর্কী সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে ফরাসি ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এখানকার কৃত্রিম বিভাজনকে দৃঢ় করে তুলেছিল।

তা সত্ত্বেও ১৯২০-র দশকে ব্রিটেন টান্সজর্ডন ও ইরাকের শাসকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। ইজিপ্টে ব্রিটিশরা ক্রমাগত বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু দামাস্কাসে ফরাসিরা বিদ্রোহে অতিষ্ঠ হয়ে বোমাবর্ষণ করতে বাধ্য হয়েছিল। ব্রিটিশ ম্যানডেট ইরাক কার্যত স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল, ব্রিটেনের সাথে তার রক্ষণাত্মক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, ইরাকে ব্রিটেনের সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হল। ১৯২২ সালে প্রাপ্ত ইজিপ্টের স্বাধীনতা অতটা পূর্ণাঙ্গ ছিল না। ব্রিটেন সেখানে প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি দেখাশোনা করা ছাড়াও আভ্যন্তরীণ কোনো কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করত। ইটালি আবিসিনিয়া আক্রমণ করার পর ব্রিটেন ও ইজিপ্টের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ১৯৩৬ সালে। ১৯২৫-২৭ সালের মধ্যে সিরিয়াতে যে বিদ্রোহ দেখা যায় তার পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্স তার ম্যানডেটের মেয়াদ শেষ করতে চাইল না। শুধু তাই নয়, ফ্রান্স সিরিয়া ও লেবাননের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখল, কারণ দুটি রাজ্যই ফ্রান্সের ম্যানডেট ছিল।

৯.২.২৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মধ্যপ্রাচ্য সংকট : প্যালেস্টাইন সমস্যা

আরব রাজ্যগুলির দক্ষিণে ইটালির উপস্থিতি ইঙ্গ-মিশর চুক্তি সম্ভবপর করেছিল, তবুও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই বিদেশি প্রভাবের বিরুদ্ধে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক নতুন পর্যায় শুরু হল। কিন্তু সংকট আসন্ন হয়ে উঠল প্যালেস্টাইন সমস্যাকে ঘিরে। ১৯১৭ সালে যখন ব্রিটেন প্যালেস্টাইনের ম্যানডেট লাভ করেছিল তখন ব্যালফুর (Balfour) ঘোষণার দ্বারা এই প্রতিশ্রুতি ব্রিটেন দিয়েছিল যে প্যালেস্টাইন হবে ইহুদিদের নিজস্ব বাসভূমি। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইহুদিদের বাসভূমি সংক্রান্ত আন্দোলন (Zionist Movement) গড়ে উঠল এবং প্যালেস্টাইনে দলে দলে ইহুদি অধিবাসীদের আগমন ঘটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনকে বাধ্য হয়ে ভাবতে হল যে প্যালেস্টাইনে সে ইহুদিদের কতটা রাজনৈতিক ক্ষমতা দেবে। এই ভাবনা আবার আরব

অধিবাসীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। তারা ইহুদি অধিবাসীদের আগমন কিংবা প্যালেস্টাইন বিভাজন যে কোনো প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। এই দোটানার মধ্যে পড়ে ব্রিটিশ সরকার স্থির করল ইহুদি অধিবাসীদের সংখ্যা সীমিত করতে হবে। ১৯৩৯ সালের গোড়ায় এই সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হল ব্রিটিশ সরকার তখন প্রতিশ্রুতি দিল যে আগামী দশ বছরের মধ্যে একটি স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাজ্য গঠন করা হবে সেখানে আরব ও ইহুদিরা এমনভাবে প্রশাসনে অংশগ্রহণ করবে যাতে উভয়ের স্বার্থের নিরাপত্তা বজায় থাকে।

ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মধ্যপ্রাচ্যে তার গভীর প্রভাব পড়েছিল। এখান থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও তৈল সরবরাহ বজায় রাখা ব্রিটেনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী ছিল। ফ্রান্সের পতন হলে জার্মানির পক্ষে বলকান ও ভূমধ্যসাগরের দিকে নজর দেওয়াতে আর কোনো বাধা রইল না। অবশ্য মধ্যপ্রাচ্যের দিক দিয়ে দেখলে অবশ্য তত বিপদের কোনো আশঙ্কা ছিল না। কারণ, সেখানে জার্মানি ও ইটালির সাফল্য সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণা হয়েছিল। পারস্যের শাহ জার্মানির সাফল্যের উদাহরণে উৎসাহিত হয়েছিলেন, জেরুজালেমের মুফতি হিটলারের সঙ্গে চুক্তি করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন। ইজিপ্টের শাসক ফারুক জার্মানি ও ইটালির সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু ইহুদিদের পক্ষে হিটলারের সঙ্গে যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। কাজেই ইটালি বা জার্মানির পক্ষে সহানুভূতিসম্পন্ন জনসাধারণের সংখ্যা শেষ পর্যন্ত খুব বেশি ছিল না। ট্রান্সজর্ডন ও ইরাকের হাসিম বংশীয় শাসকরা বা ইবন সাউদের পক্ষে অক্ষ শক্তির সঙ্গে যোগ দিতে দ্বিধা ছিল না। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স মধ্যপ্রাচ্যে পরস্পরবিরোধী স্বার্থে জড়িত ছিল। তা শেষ পর্যন্ত অনিবার্যভাবে চূড়ান্ত আকার ধারণ করল।

৯.২.২৬ মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্ব

দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে ইরাকের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্ক মোটের ওপর বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। ইরাকি রাজনীতিবিদদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী নুরি-আল-সাঈদ ব্রিটিশ সহায়তার দ্বারা কার্যসিদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ইরাকি সরকার ইঙ্গ-ইরাকি চুক্তি অনুসারে জার্মানির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। কিন্তু চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা স্বাভাবিকভাবে ব্রিটেনের বিপর্যয়ের সুযোগ নিতে চেয়েছিল এবং জার্মান সহযোগিতার সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেছিল। জঙ্গী জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ছিলেন রশিদ আলি, যিনি ইরাকি খানদানি পরিবারের সন্তান ছিলেন কিন্তু বহির্জগৎ সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না।

১৯৪০ সালে রশিদ আলি ইরাকের প্রিমিয়ার হলেন, নুরি-আল-সঈদ তাঁকে সরকারি পদাধিকারি করে বিপন্মুক্ত হতে চেয়েছিলেন। যখন ইটালি যুদ্ধে যোগদান করল তখনও রশিদ আলি ইটালির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন না, চার্চিল অভিযোগ করলেন যে বাগদাদ হল অক্ষশক্তির প্রধান প্রচার কেন্দ্র এবং ব্রিটিশ বিরোধী অনুভূতির উৎস। ফ্রান্সের পতন হলে ব্রিটেন ভীত হয়ে রশিদ আলিকে ক্ষমতাচ্যুত করল। কিন্তু সেনাবাহিনীর জাতীয়তাবাদী একটি অংশ, যারা গোল্ডেন স্কোয়ার (Golden Square) নামে পরিচিত ছিল, রশিদ আলিকে আবার ফিরিয়ে আনল। রশিদ আলি ইঙ্গ-ইরাকি চুক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করলেও ইটালির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করলেন না।

এভাবে মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ অবস্থান বিপজ্জনক হয়ে উঠল। জার্মানি যুগোশ্লোভিয়া ও গ্রিস আক্রমণ করেছিল। এমতাবস্থায় অক্ষশক্তির সঙ্গে ইরাকের চুক্তির সম্ভাবনা ব্রিটেনের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটেন ইরাকি সেনাদের হাত থেকে হাব্বানিয়া বিমানঘাঁটি অধিকার করে নেওয়াতে ইরাকি প্রতিরোধ ভেঙে

পড়ল। রশিদ আলি ও তাঁর সমর্থকরা প্রথমে পারস্য পরে তুরস্কে পালিয়ে গেলেন। এরপর থেকে ব্রিটেন ও আরব জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে সম্পর্কের সবিশেষ উন্নতি ঘটল।

রশিদ আলি ঘটনার প্রভাব পড়ল পাশ্ববর্তী ফরাসি ম্যানডেট অঞ্চলগুলির ওপর। ১৯৪০ সালে যখন ফ্রান্সের পতন ঘটল তখন সিরিয়া দ্য গলের সাথে যোগ দিতে চাইল না। এদিকে জার্মানি ইরাকে যে বিমান সহায়তা পাঠাতে পারত তাঁর ঘাঁটি ছিল সিরিয়া। ফ্রান্স নিজের দেশে নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্য সিরিয়াতে জার্মান ঘাঁটি করার অনুমতি দিল, শুধু তাই নয়, মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি সম্পর্কে সংবাদ সরবরাহ করার কথায় রাজি হল। কিন্তু ব্রিটিশ কমনওয়েলথ বাহিনী ও ফরাসি মুক্তাঞ্চল বাহিনী সিরিয়া আক্রমণ করল। ফ্রান্সও কোন অজ্ঞাত কারণে জার্মান সহযোগিতা চাইল না। ১৯৪১ সালের ১৪ই জুলাই সিরিয়া ব্রিটেনের কাছে আত্মসমর্পণ করল। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যকে কেন্দ্র করে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সম্পর্কে লক্ষণীয় অবনতি ঘটল। এই বিরোধের কেন্দ্র ছিল সিরিয়া ও লেবাননে আরবদের সঙ্গে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সম্পর্ক।

সিরিয়াতে জার্মানির সমর্থক ভিশি (Vichy) বাহিনীর বিরুদ্ধে কমনওয়েল্থ্ ও ফরাসি মুক্তাঞ্চল বাহিনী একত্রে নিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু চার্চিল ফরাসি বাহিনীকে সক্রিয় হতে দিতে চাইতেন না বলে দ্য গল আশঙ্কা করলেন যে বেইরুট বা দামাস্কাসে ফরাসি শক্তি দৃঢ়ভাবেপ্রাথিত না করলে জার্মানি বা ব্রিটেন তা দখল করে নেবে অথচ তাঁর নিজের রাজনৈতিক অবস্থান ছিল গোলমেলে। কারণ তিনি আরব জাতীয়তাবাদ দমন করার মতো শক্তিশালী ছিলেন না, আবার ব্রিটেনের বা জার্মানির কাছে ফরাসি সার্বভৌমত্ব সমর্পণ করার মতো দুর্বলও ছিলেন না। আবার তিনি সিরিয়া এবং লেবাননের স্বাধীনতা দিতেও ইচ্ছুক ছিলেন না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দ্য গল আরবদের আশ্বাস দিলেন এই বলে যে চুক্তির মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব দেওয়া হবে আবার জার্মান ভীতি থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি ফরাসি সৈন্যবাহিনীকে ব্রিটিশ সেনাপতিত্বে কাজ করার আদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁর মনে সর্বদাই এই সন্দেহ জাগরুক ছিল যে ব্রিটেন ফ্রান্সকে বিতাড়িত করে মধ্যপ্রাচ্যে তাঁর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাঁর সন্দেহ যে অমূলক নয় তা প্রমাণ হল যখন ব্রিটেন নিজের শর্ত আরোপ করে ফ্রান্সের দেওয়া স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চাইল। ব্রিটেন আরব জাতীয়তাবাদ ও ঐক্যের দাবিকে সমর্থন করে ঐ অঞ্চলে তার প্রভাব বজায় রাখল। সিরিয়া ও লেবাননে তারা ফরাসিদের প্রতিকূল অনুভূতি সৃষ্টি করতে লাগল। ১৯৪১ সালের মে মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি ইডেনের বক্তব্যে এই নীতি প্রতিফলিত হল।

এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে ফ্রান্সের সংকট ঘনীভূত হতে থাকল কারণ ১৯৪৩ সালের নির্বাচনে সিরিয়া ও লেবানন উভয় স্থানেই ফরাসিরা পরাস্ত হল। আলজিয়ার্সে একটি ফরাসি জাতীয় কমিটি প্রতিষ্ঠিত হল ঠিকই কিন্তু আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বা গণতান্ত্রিক ভিত্তি কোনোটিই এই সংগঠনের ছিল না। মধ্যপ্রাচ্যে ফ্রান্সের সংকট ছিল এইখানে যে সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশই ছিল ব্রিটিশ, কিন্তু সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটেন নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি চাইত, আর এই শান্তির জন্য সে সিরিয়া ও লেবাননের বিষয়ে ফ্রান্সকে সুবিধা দেবার জন্য চাপ দিতে থাকল। শেষপর্যন্ত ১৯৪৪ সালের পয়লা জানুয়ারি একটি সমঝোতায় আসা গেল। এই সমঝোতা অনুযায়ী সিরিয়া ও লেবানন স্বাধীনতা পেল কিন্তু সামাজিক সহায়তা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণ রইল, সর্বোপরি স্থানীয় সৈন্যবাহিনীর ওপর ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রইল।

স্বভাবই সিরিয়া ও লেবানন নিজেদের স্বাধীনতার ওপর এই শর্ত আরোপ পছন্দ করল না। উপরন্তু দুটি দেশই জানত যে ব্রিটিশ সৈন্যের অনুপস্থিতিতে তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

শেষে সংকট আরো জটিল হল। ফ্রান্স নতুন করে সৈন্যবাহিনী পাঠাল। সিরিয়া লেবাননের প্রধান শহরগুলিতে দাঙ্গা দেখা দিল। ব্রিটেন যখন দ্য গলকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে বললেন, তখন তিনি আর এই অনুরোধ মেনে নেবার কোনো প্রয়োজন বোধ করলেন না। উপায়ান্তর না দেখে ব্রিটেন ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিরাপত্তা পরিষদের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করল। মার্চ মাসে সিদ্ধান্ত হল যে সিরিয়া ও লেবানন থেকে ব্রিটিশ ও ফরাসি সৈন্য অপসারিত হবে। এভাবে ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে সিরিয়া ও লেবানন স্বাধীনতা লাভ করল। এভাবে ইরাক, সিরিয়া ও লেবাননের ঘটনা ইঙ্গ-ফরাসি সম্পর্কের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করেছিল।

৯.২.২৭ পারস্য

এখানে ব্রিটিশ ও জার্মান সৈন্যের প্রত্যক্ষভাবে পরস্পরের মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ জার্মান সৈন্য ককেশাস পর্বতপার হয়ে অগ্রসর হয়েছিল।পারস্যের শাসক রিজা শাহ জার্মানির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। এছাড়াও জার্মানি পারস্যে বাণিজ্য করত, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ঘটাত। এভাবে পারস্যে জার্মানি বেশ ভালো প্রভাব বিস্তার করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর পারস্যকে ঘাঁটি করে জার্মানি যখন ভারতবর্ষ অভিমুখে অগ্রসর হতে চাইল তখন দেখা গেল যে জারশাসিত রাশিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে একটি আঁতাতের সূত্র ধরে রাশিয়া ও ব্রিটেন পরস্পরের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। রিজা শাহ সিংহাসন ত্যাগ করলেন। এরপরে পারস্য রাশিয়া ও ব্রিটেনের সাথে একটি বেসামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হল। ঐ চুক্তির শর্তানুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পারস্য থেকে ব্রিটিশ ও রাশিয়া সৈন্য অপসারণ করবে বলে স্থির হল।

৯.২.২৮ মিশর বা ইজিপ্ট

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে মিশর প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বযুদ্ধের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কারণ মিশর আক্রান্ত হয়েছিল। যদিও লোকালয়গুলি এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তবে মিশর ছিল ইটালি ও জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ প্রতিরোধের প্রধান ঘাঁটি, যা ব্রিটেন যে কোনো মূল্যে রক্ষা করতে চাইত। এর জন্য মিশরের সমস্ত প্রধান শহরগুলো চলে গিয়েছিল ব্রিটিশ দখলে। কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্য সরবরাহ কেন্দ্র (Middle East Supply Centre) যেখানে অনেক মিশরি বেসামরিক শ্রমিক হিসাবে কাজ করত। এর ফলে মিশরের অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছিল মুদ্রাস্ফীতি ও ঘাটতি। যেহেতু ব্রিটেন সরাসরি সরকারের দায়িত্বে ছিল না সেহেতু সে অর্থনীতির এই অধঃপতন রোধ করার কোনো চেষ্টা করল না। মিশরে তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মিশর যাতে তার সাথে যুদ্ধে সামিল হয় তা সুনিশ্চিত করা। ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের পতন হল। ইউরোপে ইটালি ও জার্মানির জয়জয়কার। তখন মিশর ভাবতে শুরু করল যে ব্রিটেনের প্রতিরোধের মেয়াদ শেষ হয়ে যেতে বসেছে। এমতাবস্থায় সে অক্ষশক্তির সঙ্গে আলোচনার পথ খোলা রাখাই সমীচীন মনে করল। বাধ্য হয়ে ব্রিটেন মিশরের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করল, আলি মাহির হাসান সাবরির অনুকূলে পদত্যাগ করলেন।

হাসান সাবরি ১৯৩৬ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকারকে যুদ্ধসমর্থন করতেলাগলেন। কিন্তু মিশরের একটি প্রভাববিহীন সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এই মত প্রচার করতে লাগল যে যুদ্ধের শেষে আলাপ আলোচনার সুবিধা পাবার জন্য মিশরের যুদ্ধে যোগদান করা উচিত।

এদিকে ব্রিটিশ বিরোধী গোষ্ঠী আলি মাহিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। মিশরের ক্ষমতাহীন রাজাকে প্রভাবিত করে আলি মাহির আবার ক্ষমতায় ফিরে এলেন। কিন্তু ব্রিটেন সেনা পাঠিয়ে রাজাকে বাধ্য করল ওয়াফদ্ দলের নেতা নাহাস পাশাকে দিয়ে সরকার গড়তে। এটাই প্রমাণ করল যে যেকোনো মূল্যে ব্রিটেন মিশরে তার প্রভাব বজায় রাখবে। যদিও এরপর ওয়াফদ্ দল ব্রিটেনের প্রতি তার আনুগত্য বজায় রেখে চলেছিল তবুও ব্রিটিশ সৈন্যের উপস্থিতি তার পক্ষে কণ্টকস্বরূপ ছিল। মিশর ক্ষুব্ধ হয়ে দেখল যে ব্রিটেন সুদানকে স্বাধীনতা দিচ্ছে, অথচ এখানে মিশর ব্রিটেনের সঙ্গে যৌথভাবে উদ্যোগ শুরু করার স্বপ্ন দেখেছিল। শেষ পর্যন্ত মিশর যুদ্ধে যোগদান করা সাব্যস্ত করল কারণ কোনো আন্তর্জাতিক সংগঠনে যোগদান করা মিশরের ন্যায্য দাবি আদায়ের একমাত্র উপায় বলে মিশর মনে করত।

৯.২.২৯ প্যালেস্টাইন সমস্যা : মধ্যপ্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা সুদূরপ্রসারী সংকট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার অব্যবহিত আগে একটি শ্বেতপত্রের দ্বারা ব্রিটেন প্যালেস্টাইনে ইহুদি অনুপ্রবেশ সীমিত করেছিল। কিন্তু এর ফলে প্যালেস্টাইনে একটি নিজস্ব বাসভূমি অর্জন করার স্বপ্ন বিফল হতে বসেছিল। ফলে ইহুদিরা বেআইনি অনুপ্রবেশ করতে লাগল এবং এর জন্য ম্যানডেট কর্তৃপক্ষের সাথে তারা যুদ্ধে যেতেও প্রস্তুত ছিল। এতদিন পর্যন্ত ব্রিটেনের সমর্থনে জায়নিস্টরা প্যালেস্টাইনে নিজেদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছিল। ১৯৩৬ সালে মনে হল যে ব্রিটেন হয়ত বিভাজনের প্রস্তাবে রাজি হলেও হতে পারে। কিন্তু ১৯৩৯ সালে ব্রিটেন ও ইহুদিরা উভয়েই যখন নাৎসী জার্মানি দ্বারা আক্রান্ত হল তখন ইহুদিরা উপলব্ধি করল যে এখন জার্মানিকে পরাস্ত করাই একমাত্র লক্ষ্য। যুদ্ধের বিভীষিকা শেষ হলে পর ইহুদিরা গোটা বিশ্বের কাছে সফলভাবে তাদের দাবি পেশ করতে পারবে, তখন নিশ্চয়ই ম্যানডেটের অবসান ঘটবে এবং তাদের স্বপ্ন পূরণ হবে। এমনিতেই ইহুদিরা ইতিমধ্যেই প্যালেস্টাইনে যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল, কাজেই প্যালেস্টাইনকে নিজভূমিতে পরিণত করার উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে অস্বাভাবিকতা ছিল না।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদিরা দোটানায় পড়েছিল। ইহুদি নেতা বেন গুড়িয়ন (Ben Gurion) মন্তব্য করেছিলেন যে এমনভাবে ইহুদিদের সংগ্রাম করতে হবে, যেন হিটলার বা ব্রিটিশ ম্যানডেট কারো কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু বাস্তবে এই নীতি কার্যকরী করা অসম্ভব ছিল। প্যালেস্টাইনের ইহুদিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সংগঠিত গোষ্ঠী ছিল হাগানা, তারা ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেছিল। অন্যদিকে ব্রিটেন দোটানায় ছিল এই চিন্তায় ইহুদি না আরব কার সঙ্গে মৈত্রী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বেশি লাভজনক হবে। ১৯৪৩ সালে যখন এল আলামেন ও স্টালিনগ্রাদের বিজয় যুদ্ধের গতিপরিবর্তন করেছিল, অক্ষশক্তির বিজয় রথ থামিয়ে দিয়েছিল তখন ইহুদিরা তাদের দোটানার অবসান করেছিল। অন্যদিকে জার্মানিতে হিটলার ইহুদিদের ওপর এমন নৃশংস অত্যাচার চালাতে শুরু করলেন যে মনে হল সমগ্র ইহুদি জাতটাকে তিনি নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। ফলে হাগানা আরো দৃঢ়ভাবে ইহুদিদের সংগঠিত ও শক্তিশালী করতে লাগলো, এ ব্যাপারে ব্রিটেনকে তারা কোন গুরুত্ব দিতে রাজি হল না।

কিন্তু চার্চিলের সহানুভূতির বলে ব্রিটেন ইহুদিদের সাথে বিরোধে না জড়িয়ে একটি ইহুদি সেনাদল গঠন করল, যারা ইটালিতে নিজস্ব পতাকাতলে যুদ্ধ করল, যেপতাকা পরে ইজরায়েলের পতাকায় পরিণত হয়েছিল। ইতিমধ্যে ইহুদি সংগঠন আরো শক্তিশালী হল, কারণ, ১৯৪০ সাল থেকে আমেরিকাতে বিভিন্ন ইহুদি সংগঠনগুলি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, World Zionist সংগঠনের প্রতিনিধিস্বরূপ আমেরিকাতে প্রতিষ্ঠিত হল American

Zionist Emergency Council যা যুদ্ধ শেষে ইহুদিদের সমস্যার সুরাহার জন্য আমেরিকার রাজনৈতিক মহলে চাপ সৃষ্টি করত। এর ফলে ইহুদিদের সুবিধা হল কারণ ব্রিটেনের সঙ্গো সরাসরি বিরোধ হলে আমেরিকার সমর্থন পাওয়া নিশ্চিত হল, অন্যদিকে আমেরিকার যুদ্ধে যোগ দিলে যুদ্ধাবসানের আলোচনায় ইহুদিদের পক্ষে আমেরিকার বক্তব্য জোরালো হবে। ১৯৪২ সালের মে মাসে নিউ ইয়র্কের বিল্ট্মোর হোটেলে American Zionist Emergency Council বেন গুড়িয়নের নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত নিল যে প্যালেস্টাইনে ইহুদি অনুপ্রবেশ অবাধ করতে হবে, প্যালেস্টাইনের উন্নতির জন্য সর্বাঙ্গীণ প্রয়াস করতে হবে এবং প্যালেস্টাইন হবে একটি ইহুদি কমনওয়েল্থ ও নতুন গণতান্ত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত একটি দেশ। ক্রমশ AZEC একটি জঙ্গী সংগঠনে রূপান্তরিত হল। আমেরিকাকে এই সংগঠনটি যুদ্ধকালীন যে পরামর্শ দিয়েছিল তা ছিল সর্বজনগ্রাহ্য শ্রমিক ইউনিয়ন ও কংগ্রেসীয় কমিটি উভয়ের কাছেই তা সমর্থিত হয়েছিল।

কাজেই যুদ্ধশেষে AZEC-র অবস্থান হয়েছিল অত্যন্ত দৃঢ়ভিত্তিক। তারা একটি সরকার ও সামরিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিল, এভাবে সামরিক শক্তি অর্জন করে ইহুদিরা এক সামরিক জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। হিটলারের অত্যাচার সশস্ত্র দুনিয়ার সহানুভূতি তাদের ওপর বর্ষণ করেছিল। আমেরিকা ও ব্রিটেনে তাদের কর্মকেন্দ্র দুটি বিদেশ ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাজ করত। তারা আরবদের সঙ্গো সুসম্পর্ক বজায় রাখত। কিন্তু প্যালেস্টাইনের সন্ত্রাসবাদী ইহুদি সংগঠনগুলির সঙ্গো তাদের সম্পর্ক ঠিক সুস্পষ্ট ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত ব্রিটেন প্যালেস্টাইনের ওপর থেকে ম্যানডেট প্রত্যাহার করে নিল। এরপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে প্যালেস্টাইনকে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়—একটি ইহুদি অধ্যুষিত রাষ্ট্র, অন্যটি আরব জাতি অধ্যুষিত রাজ্য। কিন্তু আরবজাতি এই সমাধান সূত্র মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে ব্রিটেন আনুষ্ঠানিকভাবে প্যালেস্টাইনে তার ম্যানডেট ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নিল। এর সূত্র ধরে ইহুদিরা তাদের নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র ইজরায়েল প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করল। কিন্তু মিশর, জর্ডন, সিরিয়া, লেবানন ও সৌদি আরব নিয়ে গঠিত আরবলীগ নতুন ইজরায়েল রাষ্ট্রকে যৌথভাবে আক্রমণ করল। কিন্তু আরব সঙ্ঘ ক্ষুদ্র ইজরায়েল বাহিনীর কাছে পরাস্ত হল। শক্তির লড়াইয়ে জয়লাভ করে ইজরায়েল দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গো তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হল এবং মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে ইজরায়েল একটি উল্লেখযোগ্য শক্তিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হল।

৯.২.৩০ মধ্যপ্রাচ্যে ঔপনিবেশিকতার অবসানের ফলাফল

মনে হতে পারে যে একমাত্র প্যালেস্টাইন ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের অন্যত্র বুঝি ব্রিটিশ ক্ষমতা ও আধিপত্য অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। আরব রাষ্ট্রগুলিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটেন যেভাবে হস্তক্ষেপ করেছিল তাতে এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে মধ্যপ্রাচ্য এখনও ব্রিটিশ করতলগত, এখানে যোগাযোগ ও সৈন্যচালনার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা তার রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য সরবরাহ কেন্দ্র ব্রিটিশ পুঁজি সরবরাহ ও বিনিয়োগের মাধ্যম ছিল, অথচ মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল।

মধ্যপ্রাচ্যে ফ্রান্স ছিল ব্রিটেনের পুরোনো শত্রু। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও পরে ফ্রান্সের ক্ষমতা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিল আর তার সমস্ত সামরিক ঘাঁটিগুলি বেহাত হয়ে গিয়েছিল। জারতন্ত্রী রাশিয়ার ধারা অনুসরণ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর পারস্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু রাশিয়া ব্যর্থ হয়েছিল। তুরস্ক ও উপসাগর অঞ্চলে রাশিয়া যে চাপ সৃষ্টি করেছিল তাও নিষ্ফল হয়েছিল। পৃথিবীর অন্যত্র

যেমন মধ্যপ্রাচ্যেও তেমন আমেরিকা তার অর্থনৈতিক ও সামরিকসক্রিয়তা বিস্তার করেছিল, আরবে সে বিমান ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছিল, তুরস্ক, ইরাক, আরব এবং পারস্যে লেন্ড-লীজ চুক্তি সম্পাদন করেছিল আমেরিকা। যদিও মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট মধ্যপ্রাচ্য সফর করেছিলেন এবং আরব নেতাদের সঙ্গো কথা বলেছিলেন। তবুও এমন মনে করার কারণ ছিল না যে আমেরিকা অদূর ভবিষ্যতে মধ্যপ্রাচ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে না। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং জায়নিজ্‌মের প্রতি তার সমর্থন ব্রিটিশ অবস্থানকে বিপন্ন করে তুলেছিল—এছাড়া তখনকার মতো আমেরিকার আর কোনো সক্রিয়তা নজরে পড়ছিল না

তবুও, একথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না যে মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেনের ক্ষমতা ধীরে ধীরে বিলীয়মান হচ্ছে। সমস্ত বিশ্ব জুড়েই ব্রিটিশ ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছিল। মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে ব্রিটেনের অপরিশোধিত ঋণ ঐ অঞ্চলে তার অবস্থানের গুণগত পরিবর্তন ঘটাচ্ছিল। গ্রিস থেকে ব্রিটেন নিজেকে সরিয়ে নেবার পর পূর্ব ভূমধ্যসাগরে আমেরিকা প্রবেশ করেছিল। সুতরাং, ধীরে হলেও আমেরিকা যে মধ্যপ্রাচ্যে পা দিতে চলেছে তা আর অবিদিত রইল না। ঠান্ডা লড়াই এর বহিঃপ্রকাশ ঘটলে পর বোঝা গেল যে মধ্যপ্রাচ্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে চলেছে, ব্রিটেনের মতো একটি অবক্ষয়মান শক্তির কর্মক্ষেত্র হয়ে আর মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থান করা সম্ভব নয়।

৯.২.৩১ ঔপনিবেশিকতার অবসান : আফ্রিকার জাগরণ

পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে এশিয়ার বিদ্রোহের মতোই আফ্রিকার জাগরণ আন্তর্জাতিক ইতিহাসের চমকপ্রদ ঘটনাগুলির অন্যতম। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই আফ্রিকার সমস্যার প্রকৃতি আমূল বদলে যায়। আফ্রিকার প্রতি ঔপনিবেশিক নীতির স্থানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক নীতির বিষয়বস্তু হলে দাঁড়ায় আফ্রিকা। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ আফ্রিকার সঙ্গো ইউরোপের প্রথম সংযোগ ঘটেছিল দাস ব্যবসার মাধ্যমে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কুড়ি বৎসরে ইউরোপীয় শক্তিগুলো আফ্রিকার আংশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে পৌঁছে গিয়েছিল আফ্রিকার সম্পূর্ণ বিভাজনে। বিংশ শতকেও দাসব্যবসার কালো ছায়া ইউরোপ ও আফ্রিকার সম্পর্ককে আবৃত করেছিল। কাজেই আফ্রিকা সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত যখন ইউরোপের কূটনৈতিক আলোচনা কক্ষে নির্ধারিত হত তখন দাস ব্যবসার স্মৃতি আফ্রিকাকে গভীর ঘৃণায় মথিত করত। এর ফলে সেখানে জন্ম নিয়েছিল তীব্র প্রতিক্রিয়া, কখনো তা আক্রমণাত্মক, কখনো বিদ্বেষপূর্ণ রূপ ধারণ করে ইউরোপের আধিপত্য ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল।

ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আফ্রিকার প্রধান অভিযোগের মূল প্রতিপাদ্য ছিল এই যে দেশবাসীর ওপর কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। আফ্রিকার প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছিল তা হয়ত প্রত্যক্ষভাবে কঠোর বা নিষ্ঠুর ছিল না কিন্তু তা ছিল পিতৃসুলভ। এই আচরণের ঘেরাটোপ থেকে আফ্রিকা তার উপজাতীয় আদিম জীবনযাত্রা থেকে মুক্ত হতে পারেনি, ফলে আফ্রিকা আধুনিক জীবনের উপযুক্ত হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছিল। আধুনিক প্রযুক্তি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের অপরিহার্য ফল ছিল, আফ্রিকায় তা জীবনযাত্রার ধারাকে সহজ ও গতিশীল করে দিয়েছিল। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের প্রাচীর গড়ে দিয়েছিল। দুই বিশ্বযুদ্ধের ফলে আত্মনির্ধারণে নীতি গুরুত্ব অর্জন করেছিল। এই নীতির প্রথম প্রবক্তা ছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন ও পরে তা আটলান্টিক

চার্টারে স্থান পেয়েছিল। শক্তিই হল অধিকার সাম্রাজ্যবাদের এই অন্তর্নিহিত তত্ত্ব দুই বিশ্বযুদ্ধের দ্বারা নিন্দিত হয়েছিল। তথাপি ১৯৪৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, লাইবেরিয়া এবং ইথিওপিয়া ব্যতীত সমস্ত আফ্রিকা মহাদেশ তখনও সেই একই ইউরোপীয় দেশগুলির অধীনে ছিল, যারা বিগত ৭০ বছর ধরে আফ্রিকা শাসন করছিল। কিন্তু আফ্রিকার জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হচ্ছিল, তা পনেরো বছরের মধ্যে প্রায় সমস্ত মহাদেশেরঔপনিবেশিক শাসনপাশ ছিন্ন করেছিল।

৯.২.৩২ জাতীয়তাবাদের বিকাশ : আফ্রিকা ও এশিয়া ; একটি তুলনামূলক আলোচনা

আফ্রিকা ও এশিয়ার জাতীয়তাবাদী বিকাশের মধ্যে সাদৃশ্য ছিল এই যে উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল ক্রমবিকাশের ধারায়। এই জাতীয়তাবাদের উত্থানের পেছনে ছিল পাশ্চাত্য কর্তৃত্ব ও প্রভাব। কিন্তু আফ্রিকা ও এশিয়ায় জাতীয়তাবাদী বিকাশের মধ্যে পার্থক্যও ছিল। এশিয়ার জাগরণ সর্বদা উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে হয়েছিল। ইন্দোচীন ছাড়া এশীয় দেশগুলির মুক্তি অবধারিত হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি হিসাবে, ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ এবং ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভ তা প্রমাণ করেছিল। আবার, কোনো কোনো এশীয় দেশ, যেমন জাপান ইউরোপীয় অর্থনৈতিকও রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, কিন্তু কখনো জাপান ইউরোপের উপনিবেশে পরিণত হয়নি। চীন ছিল আধা স্বাধীন, আধা উপনিবেশ, ইউরোপীয়দের সংসর্গ তাকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। অন্যদিকে আফ্রিকার মূল সমস্যাই ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন। ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং পর্তুগাল—এই চারটি ঔপনিবেশিক শক্তির অস্তিত্ব আফ্রিকায় ছিল। উত্তরে মিশর ও দক্ষিণে দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্য (Union of South Africa) ছিল ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত। তবে, দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েল্থ্ ভুক্ত হয়েও স্বাধীন নীতি অনুসরণ করে আর তা হল সম্পূর্ণ ঔপনিবেশিকতা বিরোধী। এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের মতো আফ্রিকার জনগণের ক্ষোভের উৎস ছিল চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ। শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে আফ্রিকান বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর উদ্ভব চরমপন্থী জাতীয়তাবাদকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছিল। একদিকে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ, অন্যদিকে আফ্রিকার স্বাধীনতা স্পৃহা এবং এই মহাদেশে কম্যুনিজ্মের প্রসার জাতীয়তাবাদের শিকড়কে শক্ত করে তুলেছিল।

৯.২.৩৩ আফ্রিকার জাগরণের প্রতি পাশ্চাত্য প্রতিক্রিয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আফ্রিকার অধিবাসীরা যোগদান করেছিল। এই অভিজ্ঞতা এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অনৈক্য তাদের স্বাধীনতা লাভ করতে আগ্রহী করে তুলেছিল। তারা দেখেছিল শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘুরা তাদের শোষণ করে সামাজিক মর্যাদা, রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা লাভ করেছিল। এতে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত আফ্রিকানরা তাদের ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তি পেতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই আফ্রিকার জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনতা বিদেশি শোষণ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল।

আফ্রিকানরা যখন এইভাবে পাশ্চাত্য শোষণের বিরুদ্ধে জাগ্রত হয়েছিল পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে তখন তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল—প্রথমত, ধারাবাহিকভাবে মুক্তিকামী দেশগুলিকে স্বাধীনতা

দান করা। গোল্ড কোস্ট বা আধুনিক ঘানা, সুদান এবং নাইজেরিয়াতে ব্রিটেন এই নীতি গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয়ত, আফ্রিকারস্বাধীনতা যুদ্ধকে দমন করা, শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বর্ণবিদ্বেষী নীতি গ্রহণ করে ব্রিটেন স্বাধীনতা স্পৃহা অবদমিত রেখেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্য এই নীতি গ্রহণ করেছিল। তৃতীয় ধারাটি ছিল শাসক ও শাসিতের মধ্যে মিলনসূত্র গ্রথিত করে শাসকদের সঙ্গে নাগরিক সমতা আনয়ন করা। ফ্রান্স ছিল এই নীতির প্রবক্তা।

৯.২.৩৪ আফ্রিকাতে ইসলামি জাতীয়তাবাদ

আফ্রিকার সমস্যা জটিলতর হয়েছিল যেখানে মুসলমান সংখ্যালঘু ও নিগ্রো সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের উপস্থিতি। মিশর ছাড়া আফ্রিকার মুসলমান জনসাধারণ বেশির ভাগই ছিল ফ্রান্সের অধীনস্থ অঞ্চলে। মুসলমানদের সমস্যা আফ্রিকায় ফরাসি ঔপনিবেশিক শক্তির প্রধান সমস্যা ছিল। কিন্তু নিগ্রো সমস্যা ছিল অধিকতর ব্যাপক, যা আফ্রিকায় জড়িত সমস্ত পশ্চিমী শক্তিগুলিকে বিব্রত করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্স আফ্রিকাতে যে ঔপনিবেশিক শাসন স্থাপন করেছিল তা ছিল ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির উৎস। ফরাসি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের মুসলমান অধিবাসীদের তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। টিউনিসিয়া ও মরক্কো ছিল ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্য। কিন্তু আলজিরিয়াকে ফ্রান্স সাংবিধানিকভাবে নিজস্ব রাজ্য বলে গণ্য করত। সেখানকার ৯ মিলিয়ন অধিবাসীদের মধ্যে 1 মিলিয়ন ছিল ফরাসি, কিন্তু মরক্কোর আট মিলিয়ন জনসংখ্যার অর্দ্ধ মিলিয়ন ছিল ফরাসি। সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে টিউনিসিয়া ও মরক্কোতে রাজনৈতিক বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। মরক্কোর রাজনৈতিক সমস্যা জটিলতর আকার ধারণ করেছিল কারণ দ্বিতীয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মরক্কোতে শিল্পায়ন ও শহরের উদ্ভব সেখানকার রাজনৈতিক সমস্যাকে ভিন্নতর মাত্রা দিয়েছিল। মরক্কোর সুলতান ছিলেন ফরাসি সরকারের হাতের পুতুল, কিন্তু তিনি এখন স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে লাগলেন। মরক্কোর আরবরা ছিল ফ্রান্সের সমর্থক, তারা ফরাসি সরকারকে রসদ সরবরাহ করত। তারাও বিরোধি শিবিরে যোগদান করল। ফলে ফ্রান্সকে বাধ্য হয়ে তার ঔপনিবেশিক নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হতে হল। ফ্রান্স আর সামরিক শক্তির দ্বারা স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করতেপারছিল না। ১৯৫০ সালে হাবিব বরগিবা (Habib Bourguiba) টিউনিসিয়ার আন্দোলনকে এক নতুন মাত্রা দান করলেন। ১৯৫১ সালে টিউনিসিয়া স্বায়ত্তশাসন লাভ করল, আবার সে মন্ত্রীসভা গঠন করার অধিকার পেল। এরপর মরক্কোকেও স্বাধীনতা দেওয়া হল। টিউনিসিয়াও ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা লাভ করল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণে লিবিয়া স্বাধীন হয়ে গেল।

৯.২.৩৫ আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন

আলজিরিয়াতে স্বাধীনতা আন্দোলন সশস্ত্র আকার ধারণ করেছিল বলে তা পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। এই আন্দোলন দীর্ঘায়িত হয়েছিল কারণ এখানে ছিল জঙ্গী জাতীয়তাবাদ, ফরাসি অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং প্রশাসনিক জটিলতার ত্র্যহস্পর্শ যোগ। আলজিরিয়ার ফরাসি অধিবাসীরা, যাদের অধিকাংশই ছিল সম্পন্ন কৃষক এবং ব্যবসায়ী, অর্থনৈতিক প্রাধান্য ভোগ করত। এই প্রাধান্য আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিলেই ফরাসি অধিবাসীদের মধ্যে সৃষ্টি হত তীব্র প্রতিক্রিয়া। যদিও ফরাসিরা ছিল সংখ্যালঘু তবুও তারা নিজেদের কয়েকটি ফ্যাসিস্ট সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করেছিল, O.A.S. ছিল এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই ফ্যাসিবাদী

সংস্থাগুলি আলজিরীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে নির্বিচারে অস্ত্র প্রয়োগ করত। আলজিরিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল মুসলমান। সুতরাং, ফরাসিদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। এছাড়া আলজিরিয়াকে ফ্রান্স তার নিজের সাম্রাজ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করত। তাই এখানে ফ্রান্স দেশীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলেছিল এবং সেখানে নিজ সংবিধান আরোপ করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের সামনে এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছিল। যুদ্ধকালীন বামপন্থী ফরাসি সরকার আলজিরিয়াকে ফরাসি প্রতিনিধি সভায় (Chamber of Deputies) ১৩ জন প্রতিনিধি পাঠানোর অনুমতি দিয়েছিল। যুদ্ধের পরে ফ্রান্স একটি নতুন সংবিধান রচনা করল, যেখানে বলা হল যে আইন পরিষদে (Legislative Assembly) ফরাসি ও আলজিরিয়ার সম সংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে আরব সদস্যরা অনেক বেশি সংখ্যক আসন লাভ করেছে। এতে সন্ত্রস্ত হয়ে ফ্রান্স ঐ সংবিধান বাতিল করে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন জঙ্গী আকার ধারণ করল। ফ্রান্স নির্মমভাবে আলজিরীয় আরবদের দমন করার কাজে নেমে পড়ল। মিশর, টিউনিসিয়া যাতে আলজিরিয়ার পাশে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য তাদের বিরুদ্ধেও সামরিক বলপ্রয়োগ করা হল। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য নিরপেক্ষ দেশগুলি আলজিরিয়ার পাশে দাঁড়াল। ১৯৫৫ সালের বান্দুং সম্মেলনে আলজিরিয়ার স্বাধীনতার জন্য জোরালো দাবি পেশ করা হল। ১৯৫৮ সালে দ্য গল যখন ক্ষমতায় এলেন তিনি আনুকূল্যের সঙ্গে আলজিরিয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা বিবেচনা করে গণভোটের কথা ঘোষণা করলেন এবং স্থির করলেন যে আলজিরিয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলবেন। ফরাসি ঔপনিবেশিক সরকারের বিরোধিতা ও ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও দ্য গল আলিজিরয়া এলেন আভিয়ান সম্মেলনে যোগদান করার জন্য। এখানে একটি চুক্তির দ্বারা আলজিরিয়ায় ফরাসি সামরিক অত্যাচার বন্ধ হল। ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে যে নতুন সংবিধান রচিত হল তদনুসারে ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত গণভোটের দ্বারা আলজিরিয়া স্বাধীনতা অর্জন করল।

৯.২.৩৬ নিগ্রো স্বাধীনতা আন্দোলন

দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আফ্রিকার কালোদের ওপর ইউরোপীয় দাদারা কর্তৃত্ব করে আসছিল। কিন্তু ঘানা, ব্রিটিশশাসিত উত্তর আফ্রিকার কয়েকটি দেশে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাজ্যে নিগ্রোরা কিছু কিছু রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করাতে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ণবিদ্বেষী নীতি গ্রহণ করেছিল এই ভয়ে যে নিগ্রো চেতনা তাদের অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। কিন্তু এশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে ব্রিটেন বুঝতে পেরেছিল যে ঔপনিবেশিকতার দিন ফুরিয়ে এসেছে। কাজেই সে আফ্রিকাতে সামরিক দমন নীতির বদলে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করল। এভাবে ব্রিটিশ পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া ও টাঙ্গানাইকাতে একটি বহুজাতিক আইন পরিষদ গঠিত হল। এই একই নীতির ফলে মধ্য আফ্রিকাতে British Central African Unionগড়ে উঠল। কিন্তু ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক নীতি ছিল একটু আলাদা। ফ্রান্স চাইত আফ্রিকাবাসীদের ধারাবাহিকভাবে নাগরিক অধিকার দানের মধ্যে দিয়ে তাদের ফরাসি শাসন কাঠামোর মধ্যে একীভুত করে দিতে। যদিও ফ্রান্সের এই নীতি এশিয়া ও মুসলমান অধ্যুষিত আফ্রিকাতে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি কিন্তু নিগ্রো অধ্যুষিত আফ্রিকাতে ফ্রান্স সফল

হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের বিপর্যয়ের সময় নিগ্রোরা ফ্রান্সের পাশে দাঁড়িয়েছিল। মুসলমান আফ্রিকানদের মতো নিগ্রোদের কোনো বাইরের ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না। নিগ্রোদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ফরাসি সাম্রাজ্যভুক্ত থেকেও নাগরিক ও রাজনৈতিক সমতা অর্জন। ফরাসি পার্লামেন্টে অনেক নিগ্রো প্রতিনিধি বসত। কাজেই শক্তির বদলে মুক্তিদানেই ফরাসি সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হতে পারত।

৯.২.৩৭ আফ্রিকার ঐক্য আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আফ্রিকান দেশগুলিকে নিয়ে একটি ঐক্য আন্দোলন জোরালো হয়ে ওঠে। বিভিন্ন আফ্রিকান দেশগুলির মধ্যে আঞ্চলিক ও শুল্ক ঐক্য সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হল। এর ফলে আফ্রিকার স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলি বৃহত্তর স্বার্থে নিজেদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিতে রাজি ছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েষ্ট ইন্ডিজের নিগ্রো জনসাধারণ প্রথম সর্ব আফ্রিকা ঐক্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ১৯১৯ সালের থেকে নিয়মিতভাবে সর্ব আফ্রিকান সম্মেলন আহুত হয়ে আসছে। ১৯৪৫ সালে ব্রিটেনের ম্যাঞ্চেষ্টারে একটি সম্মেলন আহুত হয়েছিল, প্রসিদ্ধ নিগ্রো নেতারা নিজেরাই এখানে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৫৮ সালে ঘানার স্বাধীনতা প্রাপ্তির অল্প কিছুদিন পরেই সেখানকার রাষ্ট্রপতি এনক্রুমা (Nkrumah) আক্রাতে স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলির প্রথম সম্মেলন আহ্বান করলেন। একজন বিদেশি পর্যবেক্ষক মন্তব্য করলেন যে এশিয়া যদিও রাজনৈতিকভাবে অনেক অগ্রসর তবুও সেখানে আফ্রিকার মতো ঐক্যের জন্য এত আগ্রহ নেই। ১৯৬৩সালের মে মাসে ইথিওপিয়ার রাজার আহ্বানে আদ্দিস আবাবাতে যে আফ্রিকান শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করা হয় তাতে এনক্রুমা প্রস্তাব রাখেন যে শীঘ্রই একটি সর্ব আফ্রিকান সংসদ স্থাপন করা হোক, যাকে বৈদেশিক নীতি, প্রতিরক্ষা এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিষয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া উচিত। অন্যদিকে, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের (United Arab Republics) রাষ্ট্রপতি নাসের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পরবিরোধী স্বার্থকে মেলানো সম্ভব নয়। তখন ইথিওপিয়ার রাজা প্রস্তাব দিলেন আফ্রিকার বিভিন্ন দেশগুলি একটি সাধারণ চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ হোক। ঘানা এবং নাইজেরিয়ার প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে তা গৃহীত হল। আফ্রিকার ঐক্যের যে সনদ তৈরি হল তাতে আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা (Organisation of African Unity) প্রতিষ্ঠিত হল। এখানে সকল রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়ে একটি পরিষদ গঠিত হবে, সকল রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের নিয়ে একটি কাউন্সিল অব মিনিস্টারস গঠিত হবে এবং একজন সাধারণ সম্পাদক সহ একটি সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। ইথিওপিয়ার রাজার মতে আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা এই তমসাময় মহাদেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি।

১৯৪৫ সালে ইউরোপ একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল, তার শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাড়িঘর সবই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, লক্ষ লক্ষ লোক হয়েছিল নিরন্ন, গৃহহারা এবং উদ্বাস্তু। মনে হয়েছিল ইউরোপের ভাগ্য দুটি অতি-শক্তির (Super Powers) হাতে নিহিত রয়েছে, এই দুটি শক্তি হল আমেরিকা ও রাশিয়া। এই দুটি দেশের সম্মিলিত বিজয়ী বাহিনী ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল এল্‌ব্ নদীর তীরে মিলিত হয়েছিল। ১৯৪৫ সাল পরাজিত জার্মানির জীবনে একটি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল। শীঘ্রই জার্মানি আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তৃতীয় রাইখের ধ্বংস ছাড়াও ধ্বংস আরো ব্যাপক ছিল। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছিল যে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলি এত ভঙ্গুর যে তা যথেষ্ট

নিরাপত্তা বিধান করতে পারেনা, ফলে জাতীয়তাবাদের প্রতি বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, উদারনীতিবাদের মতো মৌলিক বিশ্বাস ভেঙ্গে গিয়েছিল, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল।

৯.২.৩৮ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে দুটি অতি রাষ্ট্রের উত্থান : আমেরিকা ও রাশিয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রাশিয়া ও পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে সহযোগিতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাছাকাছি হয়েছিল। ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে সঙ্গে নিয়ে তারা ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। ফ্যাসীবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে মিত্র জোট ঐক্যবদ্ধ থাকার আবশ্যকতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল। এই সময় রাশিয়া ও আমেরিকা তাদের আদর্শগত মতপার্থক্য ভুলে গিয়েছিল। তারা একত্রে যুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবী পুনর্গঠনের জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করেছিল। আশা করা হয়েছিল যে যুদ্ধ পরবর্তী সময়েও এই ঐক্যবন্ধন অটুট থাকবে।

আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে গুপ্ত বিরোধ

প্রকৃতপক্ষে পরিস্থিতি কখনোই এত আশাব্যঞ্জক ছিল না। শক্তিশালী অক্ষদেশগুলির ভয়ে রাশিয়া ও আমেরিকা একটি বাহ্যিক মিত্রতার বাতাবরণ বজায় রেখেছিল মাত্র। রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্তালিনের মধ্যে যে আলোচনা হত, যুদ্ধকালীন এইসব সভাতেই এঁদের মধ্যেকার বিরোধ প্রকটিত হয়ে পড়ত। তবুও সাধারণ শত্রুর মোকাবিলায় আপাতত তাঁরা বিরোধসমূহ মুলতুবী রেখেছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁরা যে নীতি গ্রহণ করতেন তা ছিল ধোঁয়াটে, ফলে যে কোনো ভাবে তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারত। যখন ঐ সব নীতি কার্যকরী করার সময় আসত তখন তা বিতর্ক ও বিরোধের আকার ধারণ করত। বিশেষত যখন আমেরিকা ও রাশিয়া একমত হবার জন্য কোনো সাধারণ শত্রুর অস্তিত্ব নেই, তখন উভয়ের পক্ষে একমত হওয়া অসম্ভব ছিল। অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সাফল্য লাভের পেছনে রাশিয়ার অবদান ছিল অনস্বীকার্য। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়ার প্রাধান্য ও গুরুত্ব ছিল অবশ্যম্ভাবী। অন্যদিকে, আমেরিকা এগিয়ে না এলে ইউরোপে জার্মানি ও ইটালির বিরুদ্ধে এবং সুদূরপ্রাচ্যে জাপানের বিরুদ্ধে টিকে থাকা মিত্রজোটের পক্ষে সম্ভব হত না। শুধু তাই নয়, আমেরিকা ইউরোপের শক্তিশূন্যতা পূরণ করল। কারণ একদিকে ব্রিটেনের শক্তিহীনতা ও অন্যদিকে হিটলারের অধীন জার্মানির পরাজয় ইউরোপের শক্তিসাম্যের কাঠামোটি তছনছ করে দিয়েছিল। এমতাবস্থায়, স্তালিনের নেতৃত্বে রাশিয়া ছিল মহাদেশীয় ইউরোপের একমাত্র সম্ভাব্য নিয়ন্তা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপের নানাবিধ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসে আমেরিকা রাশিয়ার প্রাধান্যের দিকে চ্যালেঞ্জ করল। এইভাবে দুই অতিশক্তির পরস্পরবিরোধী অবস্থান আবার আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে ভারাক্রান্ত করে তুলল।

অতি শক্তি হিসাবে আমেরিকা ও রাশিয়ার বিপরীত অবস্থান

দ্বিমেরুকরণ : টয়েনবির মত

সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই পরস্পরবিরোধিতার ফলে সমগ্র বিশ্ব দুটি বিপরীত মেরুতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল বলে মনে করেন টয়েনবি। এই

ইংরেজ ঐতিহাসিকের মতে পৃথিবী দুটি গোলার্ধে ভাগ হয়ে যায় এবং দুই গোলার্ধের দেশগুলি হয় রাশিয়া নতুবা আমেরিকার উপগ্রহ রাষ্ট্র হিসেবে অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। বেশিরভাগ দেশই ছিল আমেরিকার উপর নির্ভরশীল, অল্প কয়েকটি দেশ রাশিয়ার প্রভাবাধীন, মোটের ওপর এই দুটি দেশের উপর নির্ভরশীলতা ছাড়া স্বাধীন অস্তিত্ব আর কারো রইল না।

কিন্তু টয়েনবির এই ব্যাখ্যা অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট। কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতন্ত্রী চীনের এবং স্বাধীন ভারতের অভ্যুদয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। চীন ও রাশিয়া উভয়েই কম্যুনিস্ট দুনিয়ার নেতৃত্ব লাভে উদগ্রীব ছিল। বিশেষত, ১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণের পর রাশিয়া ও চীনের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। দুই দেশের মধ্যে যেকোনো সময় প্রকাশ্য বিরোধিতা ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়। চীন ও রাশিয়ার শত্রুতা ঠান্ডা লড়াইয়ে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল। অন্যদিকে, রাশিয়ার নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট গোষ্ঠীও অক্ষত ছিল না। যুগোশ্লোভিয়া রাশিয়াকে অগ্রাহ্য করে তার সার্বভৌমত্ব জাহির করেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে থাকে এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে তোলে। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশ এই আন্দোলনে সামিল হয়। আমেরিকা ও রাশিয়া এই তৃতীয় গোষ্ঠীর অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তাই পৃথিবীর দ্বিখণ্ডীকরণ কখনোই সম্পূর্ণ ছিল না। তবে একথা অনস্বীকার্য যে আমেরিকা ও রাশিয়ার বিরোধ নীতির বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল।

টয়েনবির মত খণ্ডন

আমেরিকা ও রাশিয়ার বিরোধের পটভূমি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে যেসব ঘটনা আমেরিকা ও রাশিয়াকে বিপরীতমুখী করে তুলেছিল, তাই এই শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত। এই ঘটনাকে ছোটো অনুচ্ছেদে ভাগ করে দেখানো হলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে।

পোল্যান্ড সমস্যা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর রাশিয়া অবিলম্বে পূর্ব পোল্যান্ড দখল করে নিয়েছিল। জার্মান আক্রমণে বিধ্বস্ত পোল্যান্ডের উদ্বাস্তুদের নিয়ে লন্ডনে একটি নির্বাসিত পোল সরকার গড়ে উঠেছিল। এই সরকার নিরন্তর সোভিয়েত বিরোধিতা করে গিয়েছিল। ১৯৪৩ সালের মস্কো ও তেহেরান সম্মেলনে এই বিরোধ ঘনীভূত হয়েছিল যখন রাশিয়া কোনো মতেই ইউক্রেন ও শ্বেত রাশিয়া পোল্যান্ডকে ফিরিয়ে দিতে রাজি হল না। ১৯৪৪ সালে যখন পোল-সোভিয়েত যুগ্ম বাহিনী পোল্যান্ডে কার্জন রেখা অতিক্রম করল, তখন সেখানে Polish Committee of National Liberation গঠিত হল। এই কমিটি লাবলিনে (Lublin) স্থানান্তরিত হল ও লাবলিন সরকার বলে পরিচিতি পেল। এভাবে পোল্যান্ডের রাজনীতিতে দুটি সমান্তরাল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গঠিত হল—একটি লাবলিন কমিটি, অন্যটি লন্ডনে নির্বাসিত সরকার। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইয়াল্টা সম্মেলনে চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্তালিন সিদ্ধান্তে এলেন যে একটি ব্যাপক সর্বদলীয় জাতীয় সংহতির অস্থায়ী পোল সরকার (Polish Provisional Government of National Unity) গঠন করা হবে। ঐ বছরের জুন মাসে পুরাতন অস্থায়ী সরকারের ষোলো জন সদস্যকে নিয়ে অস্থায়ী সংহতি সরকার গঠিত হল। এই সরকার ছিল প্রকৃতপক্ষে সবকটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত। একটি মোর্চা বা

Democratic Bloc সমাজবাদী, শ্রমিক, কৃষক ও গণতন্ত্রীদের একটি শাখা নিয়ে গঠিত হয়েছিল, এদের আনুগত্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি। ১৯৪৭ সালে যে নির্বাচন হয় তাতে এই মোর্চা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত করে পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি গঠিত হল।

পোল্যান্ডের পরিণতির অনিবার্যতা

আসলে পোল্যান্ডকে যে সোভিয়েত রাশিয়ার হাতে ছেড়ে দিতে হবে তা একরকম অনিবার্য ছিল। ইয়াল্টা সম্মেলনে তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। কারণ, এখানে চার্চিল ও রুজভেল্ট ঐক্যমত হয়ে পোল্যান্ডের বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছিলেন তা হল এই যে পোল্যান্ডের তদানীন্তন সরকারে গণতান্ত্রিক ভিত্তি প্রসারিত হবে সেই দেশের ভেতরকার ও বাইরের গণতান্ত্রিক নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করে। এই সিদ্ধান্ত না নেওয়া ছাড়া পশ্চিমী শক্তিদ্বয়ের (আমেরিকা ও ব্রিটেন) কোনো উপায় ছিল না। কারণ তাঁরা শাঁখের করাতের মধ্যে পড়েছিলেন, ইয়াল্টায় যদি পোল্যান্ড সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত না হত তাহলে সোভিয়েত সহায়তায় লাবলিন সরকার পোল্যান্ডে ক্ষমতা দখল করত।

পোল্যান্ডের ঘটনা—শঠে শঠ্যং সমাচরেৎ

পোল্যান্ডে রাশিয়ার আচরণ থেকে মনে হতে পারে যে রাশিয়া তার নিরাপত্তার বিষয়টিকে এতই প্রাধান্য দিয়েছিল যে সে যেকোনো প্রকারে পোল্যান্ডকে তার প্রভাবাধীনে রাখতে চেয়েছিল। আসলে, পশ্চিমী দেশগুলিও সুযোগমতো এই একই নীতি অনুসরণ করেছিল। ইউরোপ ও আমেরিকায় পশ্চিমও তার নিজস্ব প্রভাবাধীন এলাকা তৈরি করেছিল।

নাৎসী অধিকারমুক্ত ও শত্রু দেশগুলিতে মার্কিনী নীতি

পশ্চিমী শক্তিবর্গের মুক্তপন্থী নীতি যে নিছক বাগাড়ম্বরের বেশি কিছু নয়, এটা বোঝা গেল যখন উত্তর আফ্রিকায় আমেরিকা ও ব্রিটেন জ্যঁা দালাঁর আত্মসমর্পণের শর্ত মেনে নিল। দালাঁ ছিলেন ফরাসি বাহিনীর নাৎসি সহযোগী। তিনি আত্মসমর্পণের শর্ত হিসাবে উত্তর আফ্রিকায় রাজনৈতিক আধিপত্য আদায় করেছিলেন।

ইতালি

দক্ষিণপন্থী সামরিক নেতা বাদোলিও ছিলেন পাশবিক ইথিওপিও অভিযানের নায়ক। পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এঁর সাথে আলাপ আলোচনা করে ও মুসোলিনির প্রশাসনিক কাঠামো অটুট রেখে দিয়েছিল। কাজেই বোঝা গিয়েছিল যে আদর্শ নয় প্রভাব বজায় রাখাই আসল কথা আর এজন্য পশ্চিমী শক্তিবর্গ যে কোনো ব্যক্তিকে কাজে লাগাবে।

গ্রিস

ব্রিটিশ বাহিনী যখন এথেন্সে প্রবেশ করে, তখন ব্রিটিশ সরকারের ব্যবস্থাপনায় গ্রিসে নাৎসি সহযোগী ও রাজতন্ত্রীদের একটি কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছিল। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরে ব্রিটেন যখন বামপন্থীদের

নিরস্ত্র করার চেষ্টা করে তখন সেখানে গৃহযুদ্ধ শুরু হল। ব্রিটিশ বাহিনী দক্ষিণপন্থীদের সমর্থন করে বামপন্থীদের ওপর নির্মম অত্যাচার করেছিল। ব্রিটিশ পাশবিকতায় ব্রিটেনে হাউস অব কমন্সে প্রতিবাদের ঝড় উঠলেও রুজভেল্ট চার্চিলকে সমর্থন করেছিলেন। স্তালিনও সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন, কারণ, ১৯৪৪ সালের অক্টোবরে স্তালিন, চার্চিল ও রুজভেল্টের মধ্যে সমঝোতা হয়েছিল যে রোমানিয়া ও বুলগেরিয়া সোভিয়েত প্রভাবাধীন থাকবে আর গ্রিস থাকবে ব্রিটিশ প্রভাবে। এই সমঝোতা মেনে নিয়ে স্তালিন গ্রিক কম্যুনিস্টদের কোনো সমর্থন জানাননি বরঞ্চ তাদের নিরুৎসাহ করেছিলেন।

জার্মানি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার আগেই জার্মানির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ নিয়ে মিত্রপক্ষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি দুটি পরস্পর বিরোধী ধারণা গ্রহণ করে। রাশিয়া চেয়েছিল জার্মানিতে একটি কেন্দ্রীভূত সরকার গড়ে জার্মানির সম্পদ ব্যবহার করে সোভিয়েত অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করতে। অন্যদিকে আমেরিকা চেয়েছিল জার্মানিতে একটি গণতান্ত্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থা স্থাপিত হোক। ১৯৪৬ সালে রাশিয়া অধিকৃত জার্মানি থেকে কম্যুনিস্ট ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে বিতাড়ন প্রক্রিয়া শুরু হল এবং সোস্যালিস্ট দল ও কম্যুনিস্ট দল একত্রিত হয়ে তৈরি হল সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি (Socialist Unity Party)। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষুব্ধ হল। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব বার্নেস (Byrnes) ঘোষণা করলেন যে পশ্চিম জার্মানির অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্রিটিশ ও মার্কিন অধিকৃত জার্মান ভূখণ্ডে অভিন্ন অর্থনৈতিক ও শিল্পনীতি অনুসরণ করা হবে। এইভাবে ১৯৪৭ সালের পয়লা জানুয়ারি ইঙ্গ মার্কিন অধিকৃত অঞ্চল দুটি একীভূত হল এবং ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ফ্রান্স অধিকৃত অঞ্চলও এর সাথে যুক্ত হল। সংযুক্ত অঞ্চলে নতুন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হল, মুদ্রামান স্থিতিশীল হল এবং শিল্পোৎপাদন শতকরা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেল। এরপর সেখানে নতুন মুদ্রা ব্যবস্থা চালু হল।

জার্মানি বিষয়ে সোভিয়েত অসন্তোষ

পশ্চিম জার্মানির পাশ্চাত্য অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা স্বভাবতই রাশিয়ার মনঃপুত ছিল না। রাশিয়া মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ পরিষদ থেকে ক্ষুব্ধ হয়ে বেরিয়ে আসে। পশ্চিমাঞ্চলের স্থিতিশীল মুদ্রা ব্যবস্থার সঙ্গে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে বেহাল অবস্থায় পড়বে এই রকম আশঙ্কা দেখা দিল।

বার্লিন অবরোধ

এই অবস্থায় রাশিয়া বার্লিন শহর অবরোধের সিদ্ধান্ত নিল। কারণ, বার্লিন শহরটি ছিল পশ্চিম অধিকৃত এবং তা ছিল সোভিয়েত অধিকৃত পূর্ব জার্মানির কেন্দ্রস্থলে। তাই রাশিয়া পশ্চিম শক্তির সঙ্গে বার্লিন শহরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে চাইল। ১৯৪৮ সালের ২৪ শে জুলাই বার্লিন অবরোধ শুরু হল। এর ফলে রাশিয়া অধিকৃত পূর্ব বার্লিন অতিক্রম করে পশ্চিম বার্লিনে কোনো সরবরাহ পাঠানো সম্ভব হচ্ছিল না। পশ্চিম বার্লিনের জনজীবন সংকটাপন্ন হয়ে উঠল। ১৯৪৯ সালের ১২ই মে অবরোধ তুলে নেওয়া পর্যন্ত আকাশ পথে সরবরাহ অব্যাহত রইল।

বার্লিন অবরোধের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

যদিও বার্লিন অবরোধের সোভিয়েত নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল, তবুও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোভিয়েত মার্কিন সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করেছিল। এরপরেই মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসি অধিকৃত অঞ্চলগুলিকে একত্রিত করে ঐক্যবদ্ধ পশ্চিম জার্মানি রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটল। এর নাম হল জার্মান ফেডারেল রিপাব্লিক। শুধু তাই নয়, আমেরিকার নেতৃত্বে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (North Atlantic Treaty Organisation বা NATO) গঠিত হল পশ্চিম ইউরোপের যৌথ নিরাপত্তা বলবৎ করার জন্য। ১৯৫৫ সালে পশ্চিম জার্মানিও NATO-র অন্তর্ভুক্ত হল। অন্যদিকে, পূর্ব জার্মানিও জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র নামে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মর্যাদা পেল, যাকে স্বীকৃতি দিল সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি। কিন্তু জার্মানির ঘটনাবলি স্তালিনের ব্যর্থতা প্রমাণিত করেছিল। কারণ, স্তালিন ঐক্যবদ্ধ জার্মানিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে খণ্ডিত জার্মানি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। তবুও হাল না ছেড়ে ১৯৫২ সালের ১০ই মার্চ স্তালিন পশ্চিমের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠালেন। যার মধ্যে ছিল একটি চতুঃশক্তি সম্মেলন আহ্বান, জার্মানির ঐক্যকরণ, জার্মানি থেকে বিদেশি সেনা অপসারণ প্রভৃতি শর্ত। স্তালিন জার্মানির নিরপেক্ষতা ও তার নিজস্ব সেনা গঠনের বিষয়েও সম্মতি দিলেন। কিন্তু পশ্চিম এই সব প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল। ফলে জার্মান সমস্যার কোনো সমাধান হল না, বরঞ্চ, পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠল, কারণ, পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি নিয়ে রাশিয়া NATO-র প্রত্যুত্তরে গঠন করল ওয়ারশ চুক্তি (Warsaw PACT), যেখানে পূর্ব জার্মানিকে অন্তর্ভুক্ত করা হল। পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী ও রাশিয়ার বিভাজন সম্পূর্ণ হল।

রাশিয়া ও পশ্চিমের সংঘর্ষ : প্রতিদ্বন্দ্বী চুক্তি সংগঠন প্রতিষ্ঠা

জার্মানিকে কেন্দ্র করে রাশিয়া ও পশ্চিমী গোষ্ঠীর বিরোধের তাৎক্ষণিক ও প্রত্যক্ষ পরিণাম ছিল আমেরিকার নেতৃত্বে NATO গঠন। এর প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়ার উদ্যোগে সম্পাদিত হল ওয়ারশ চুক্তি। এইভাবে আরো আঞ্চলিক চুক্তিজোট বিশ্বের রাজনীতির ঐক্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করে তুলল। মার্কিন সোভিয়েত বিরোধ আরো ঘনীভূত হল। ঠান্ডা লড়াইয়ের শ্বাসরোধকারী পরিবেশ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে ভারী করে তুলল।

NATO

১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, কানাডা, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, নরওয়ে, পর্তুগাল, আইসল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ডস্ NATO গঠন করল। এর উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের জন্য সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করা, নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক সহায়তা গড়ে তোলা, বিদেশি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একক বা সমবেতভাবে অস্ত্র ধারণ এবং নিরাপত্তা পরিষদ যতক্ষণ না পর্যন্ত আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা। নামে উত্তর আটলান্টিক হলেও এই চুক্তি সংগঠনে ইতালি, গ্রিস এবং তুরস্কের মতো দেশ ছিল। এদের কাজ ছিল ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে রাশিয়ার সম্প্রসারণে বাধা দেওয়া। এইভাবে NATO সোভিয়েত বিরোধী চরিত্র ধারণ করল যা তার ঘোষিত উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকে নিছক মিথ্যায় পরিণত করেছিল।

ওয়ারশ চুক্তি

NATO-র প্রত্যুত্তর হল ১৯৫৫ সালে সম্পাদিত হওয়া ওয়ারশ চুক্তি। এটি ছিল পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি নিয়ে গঠিত একটি পাল্টা চুক্তি সংগঠন। স্বাক্ষরকারী দেশগুলি ছিল রাশিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, আলবানিয়া এবং পূর্ব জার্মানি। মস্কো ছিল এই সংগঠনের কর্মকেন্দ্র। এই চুক্তির দোহাই দিয়ে রাশিয়া ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরির কম্যুনিস্ট বিদ্রোহ দমন করেছিল।

SEATO

কম্যুনিস্ট ভীতি থেকে উৎপন্ন হয়েছিল South East Asian Treaty Organisation (SEATO)। কম্যুনিস্ট চীনের অভ্যুদয় সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে কম্যুনিস্ট আদর্শ ও নীতির সম্প্রসারণের আশঙ্কা সৃষ্টি করেছিল। এই আশঙ্কাকে মূলধন করে আমেরিকা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে কম্যুনিস্ট বিরোধী শিবির গড়ে তুলতে উৎসাহী হয়েছিল। SEATO ছিল একটি প্রতিরক্ষা পদ্ধতি, যাতে সামিল হয়েছিল আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, ফিলিপাইন্স্। দেখা যাচ্ছে যে এখানে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির উপস্থিতি ছিল নগণ্য। এর অঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল প্রধান, তা হল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও সন্নিহিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কম্যুনিজ্মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এই সংগঠনের নিজস্ব সামরিক বাহিনী না থাকায় আমেরিকার সামরিক শক্তির উপর তা নির্ভরশীল ছিল। ফলে আমেরিকা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে নাক গলানোর সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল।

ANZUN PACT 1951

কোরীয় যুদ্ধে কম্যুনিস্টদের সাফল্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে আমেরিকা ১৯৫১ সালে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সাথে এই চুক্তি গড়ে তুলেছিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কম্যুনিজ্ম্ সম্প্রসারণ রোধ করার জন্য। যে কোনো একটি দেশ বিদেশি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে তিনটি দেশ একত্রে লড়বে আর তিনটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ এই চুক্তিটি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে।

বাগদাদ চুক্তি অথবা CENTO

তৈলসম্পদে সমৃদ্ধি ও ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য মধ্যপ্রাচ্য অনিবার্যভাবে পাশ্চাত্য ও সোভিয়েত বিরোধিতার লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত আরব দেশসমূহ নিয়ে গঠিত আরব লীগ এই দ্বন্দ্বকে মধ্যপ্রাচ্যে আসতে না দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদি রাষ্ট্রের সৃষ্টি, ইহুদিদের প্রতি পশ্চিমী শক্তিবর্গের সমর্থন আরব দেশগুলিকে রাশিয়ার দিকে ঠেলে দিল। ফলে আমেরিকা আর দূরে থাকতে পারল না। তেল, ইহুদি ও রুশভীতি এই তিনটি রন্ধ্র দিয়ে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে পা রেখেছিল। ১৯৫৫ সালে ব্রিটেনের উদ্যোগে স্বাক্ষরিত হল বাগদাদ চুক্তি, যাতে যোগ দিয়েছিল ইরাক, তুরস্ক, পাকিস্তান ও পারস্য এবং অবশ্যই ব্রিটেন। কিন্তু প্রত্যাশামতো মিশর, সিরিয়া ও সৌদি আরব এই চুক্তিতে যোগদান করল না, তারা নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করল। উপরন্তু মিশরে ব্রিটিশ, ফরাসি ও ইহুদি আক্রমণের ব্যর্থতা মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেনের প্রভাব হ্রাস করল। রাশিয়া এই সুযোগের সুবিধা নিতে বিলম্ব করল না। তখন আমেরিকা প্রথমে আর্থিক ও পরে সামরিক সাহায্যের সম্ভার নিয়ে এসে মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তার

করতে সক্ষম হল। কিন্তু মিশর, সিরিয়া ও জর্ডন আমেরিকার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হল। তবুও বাগদাদ চুক্তি ব্যর্থ হয়েছিল কারণ তা কোনো সামরিক গোষ্ঠী গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল। সোভিয়েত প্রভাবও তা দূর করতে পারেনি, উপরন্তু আরব দেশগুলি পাশ্চাত্য বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল।

নিরস্ত্রীকরণের আবডালে অস্ত্র প্রতিযোগিতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হল তখন আমেরিকা ছিল একমাত্র দেশ যার হাতে ছিল পারমাণবিক বোমার শক্তি। আমেরিকা মনে করেছিল যে এর ফলে রাশিয়া তার শর্ত মেনে নেবে। কিন্তু রাশিয়া তাতে ভয় না পেয়ে ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিজেই পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হয়ে বসল। কাজেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) নিরস্ত্রীকরণের জন্য যতই চেষ্টা করুক না কেন তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। পারমাণবিক বোমা অস্ত্রের বিকাশের এক নিরতিশয় সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করল। বিভিন্ন জাতীয় সরকার তাদের উদ্যোগ ও অর্থ ব্যয় করতে লাগল আরো শক্তিশালী অস্ত্র বানানোর কাজে, যার ফলে ১৯৫২ সালে আমেরিকা বানালো হাইড্রোজেন বোমা, ১৯৫৩ সালে রাশিয়াও এই সাফল্য অর্জন করল। ১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালে যথাক্রমে ব্রিটেন ও ফ্রান্স হাইড্রোজেন বোমা বানিয়ে ফেলল।

ঠান্ডা যুদ্ধ ও অস্ত্র বৃদ্ধি

এমতাবস্থায় যখন ঠান্ডা লড়াই তুঙ্গে উঠল, তখন নিরস্ত্রীকরণের যাবতীয় প্রচেষ্টা অনিবার্যভাবে ব্যর্থ হল। জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council) ও সাধারণ সভায় (General Assembly) সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্ত পশ্চিমী শক্তিবর্গ অস্ত্রসংখ্যা প্রকাশিত করে একটি আন্তর্জাতিক সহমত গড়ে তোলার প্রস্তাব দিল। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়া পাল্টা প্রস্তাব দিল যে আগে অস্ত্র ও সৈন্যসংখ্যা এক তৃতীয়াংশ কমানো হোক, তারপর তথ্য প্রকাশ করা হবে ও একটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গড়ে তোলা হবে।

পশ্চিমী শক্তিবর্গ ও রাশিয়ার চাপান উতোর

১৯৫২ সালে যে নিরস্ত্রীকরণ কমিশন গঠন করা হল তার সদস্য হিসাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রস্তাব দিল যে আণবিক অস্ত্রের পরিমাণ ধাপে ধাপে কমানো হোক, আমেরিকা ও রাশিয়া কোনো দেশকে বিপন্ন না করে। কিন্তু রাশিয়া এই প্রস্তাব এক কথায় খারিজ করে দিল। কিন্তু ১৯৫৫ সালে যখন রাশিয়া পাল্টা প্রস্তাব দিল, এবং এই প্রস্তাব ইঙ্গ-ফরাসি প্রস্তাবের প্রায় কাছাকাছি ছিল, তখন পশ্চিমী শক্তিবর্গ ইউরোপের বিশেষত জার্মানির নিরাপত্তার বিষয়টি আগে বিবেচনা করার কথা তুলল।

নিরস্ত্রীকরণ অসম্ভব

ক্রমশ বোঝা গেল যে জাতীয় পর্যায়ে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ একান্ত অসম্ভব। বিশেষ করে আমেরিকা এই প্রশ্ন থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিল, কারণ ইতিমধ্যেই জার্মানির পুনরস্ত্রীকরণ সম্ভবপর হয়ে উঠেছে এবং মধ্যপ্রাচ্যে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। এমতাবস্থায় জেনিভা সম্মেলনে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে যতই প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোক না কেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত রাজনীতি ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশ্নগুলির মীমাংসা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নিরস্ত্রীকরণের কোনো সুষ্ঠু সমাধান সম্ভবপর নয়। বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপ ও পূর্ব জার্মানিতে সোভিয়েত

আধিপত্য এই ধরণের কোনো সমাধানকে বাস্তবায়িত হতে দিল না। উপরন্তু রাশিয়া তখন দ্রুতগতিতে পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করার আলোচনাও চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ১৯৫৭-র আগস্ট মাসে যখন পশ্চিমী শক্তিবর্গ আংশিক নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব দিল তখন রাশিয়া এককথায় তা প্রত্যাখ্যান করল। তবে ১৯৫৮ সাল থেকে পরমাণু বোমা পরীক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা শুরু হল। এ বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য জেনিভায় আবার একটি সম্মেলন বসল। রাশিয়া ঘোষণা করল যে সে পরমাণু পরীক্ষা নিষিদ্ধ করবে, তারপরেই সে বেশ অনেকগুলি পরমাণু পরীক্ষা চালাল। ব্রিটেনও রাশিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করল। ১৯৬০ সালে ক্যাম্প ডেভিডে আইজেনহাওয়ার ও ক্রুশেচভ ভুগর্ভে পরমাণু পরীক্ষার ওপর স্থগিতাদেশ জারি করলেন। ১৯৬৩ সালে আমেরিকা, ব্রিটেন ও রাশিয়া একটি পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করল। কিন্তু ইতিমধ্যে ফ্রান্স ও চীনে পরমাণু বোমা তৈরি করতে সফল হয়ে গিয়েছিল। এই দুটি দেশ কোনোভাবেই এই নিষেধাজ্ঞা মানতে রাজি ছিল না।

পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েতকরণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্সের শক্তিহানি পূর্ব ইউরোপে এক শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল। রাশিয়ার লালফৌজ পূর্ব ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে জার্মানিকে অপসারণ করতে সক্ষম হয়। এই পরিস্থিতিতে, পশ্চিমী শক্তিবর্গের পক্ষে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত সম্প্রসারণ মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আবার স্তালিন রাশিয়ার নিরাপত্তার পুনরুজ্জীবনের জন্য পূর্ব ইউরোপের সম্পদ প্রয়োজন ছিল। আবার পূর্ব ইউরোপ রাশিয়ার শিল্প পণ্যের সম্ভাব্য বাজার ছিল। জার্মান কবল থেকে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিকে মুক্ত করে রাশিয়া সেখানে সমধর্মীয় রাজনৈতিক কাঠামো স্থাপন করতে চেয়েছিল এই উদ্দেশ্যে যে একটি অনুগত প্রভাবাধীন বলয় রাশিয়ার কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাবে এবং বিশ্ব রাজনীতিতে তার শক্তি বৃদ্ধি ঘটবে।

সোভিয়েতকরণের গতিধারা

পূর্ব ইউরোপে মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলিতে সোভিয়েতকরণ কেন ও কিভাবে সম্ভব হল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। পিটার কালভোকোরেসি তাঁর World Politics Since 1945 গ্রন্থে বলেছেন যে রুজভেল্ট ও চার্চিল ইয়াল্টা সম্মেলনে রাশিয়ার প্রতি যে নমণীয় মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন, তার ফলে সে পূর্ব ইউরোপে বিনা বাধায় অগ্রসর হয়েছিল, তবে যুদ্ধ পরবর্তী বাস্তব পরিস্থিতিতে পূর্ব ইউরোপে রাশিয়াকে সক্রিয় বাধাদান সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে সেটন ওয়াটসন তাঁর (East European Revolution গ্রন্থে বলেছেন যে রাশিয়া সুপরিকল্পিত উপায়ে পূর্ব ইউরোপকে গ্রাস করেছিল। এর জন্য রাশিয়া একটি ত্রিস্তর পরিকল্পনা করেছিল—প্রথম পর্যায়ে কমিউনিস্ট ও অ-কমিউনিস্ট গোষ্ঠী নিয়ে যৌথ প্রশাসন, দ্বিতীয় স্তরে অ-কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলিকে বিদায় করে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে কমিউনিস্টদের স্থাপন ও তৃতীয় স্তরে সর্বাত্মক একদলীয় কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা করা। আবার ডেভিড হরোউইজ এই ব্যাখ্যা মানেননি। তাঁর From Yalta to Vietnam গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে যদি ঠান্ডা লড়াই রাজনীতির আগমন না ঘটত এবং পাশ্চাত্য দেশগুলি

তীব্র বিদ্বেষ পরিত্যাগ করত তবে রাশিয়া অনমণীয় হত না এবং পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল করত।

পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েতকরণের ফলে পশ্চিমী শক্তিগুলির সঙ্গে সংঘাতের সূচনা

১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরির সোভিয়েতকরণ সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালে কমিউনিজ্‌ম্‌ প্রসার রোধ করার জন্য অর্থনৈতিক সাহায্যদানের ব্যাপক কর্মসূচি অর্থাৎ মার্শাল পরিকল্পনা ঘোষণা করে মার্কিন সরকার। ঐ বছরই চেকোশ্লোভাকিয়া মার্শাল পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল। তখন স্তালিনের নির্দেশে চেক প্রধানমন্ত্রী গটওয়াল্ড সমস্ত বিরোধী দলকে উৎখাত করে কমিউনিস্ট দলের শাসন কায়েম করলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনা পাশ্চাত্য মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল এবং রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী গোষ্ঠীর সম্পর্কের অবনতি ঘটল। এই পরিস্থিতিতে, যুগোশ্লাভিয়ার স্বাতন্ত্র্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী সচেতনতার স্ফুরণ লক্ষ্য করা গেল। সেখানে মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে জার্মান প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল। তাই জার্মানির কবল মুক্ত হতে যুগোশ্লাভিয়া রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল না। মার্শাল পরিকল্পনা ঘোষণার পর টিটো বলকান অঞ্চলে একটি রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন। টিটো গ্রিসের কমিউনিস্ট সংগ্রামীদেরও সাহায্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। স্বভাবতই স্তালিন ক্রুদ্ধ হলেন। পাশ্চাত্য চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য সাম্যবাদী ব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে যে কমিনফর্ম গঠন করা হল, সেখান থেকে যুগোশ্লাভিয়াকে বহিষ্কার করা হল। তার ওপর বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা জারি হল। কিন্তু টিটো তাতে দমলেন না। তিনি অপ্রতিহত ক্ষমতায় বহাল রইলেন এবং পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুললেন।

ছদ্মবেশী সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদ

যুগোশ্লাভিয়া ও ফিনল্যান্ড ছাড়া পূর্ব ইউরোপের সর্বত্র সাম্যবাদী কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু স্তালিন পুরোপুরি গ্রাস করার নীতি থেকে বিরত রইলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে পাশ্চাত্য গোষ্ঠী ও রাশিয়ার মধ্যবর্তী ভৌগোলিক অঞ্চল হিসাবে পূর্ব ইউরোপ থাকুক। ঐ অঞ্চল সম্পূর্ণ দখল করার সঙ্গতি রাশিয়ার ছিল না, আর তাতে পশ্চিমী দেশগুলির মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারত। অন্যদিকে মার্শাল পরিকল্পনাকে প্রতিহত করার জন্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক সংহতি বিধানের জন্য ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে Council for Mutual Economic Assistance (CMEA) গঠিত হল। দ্রুত শিল্পায়নের নীতি ও যৌথ খামার ব্যবস্থা গ্রহণ করে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত ধাঁচের অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন করা হল। পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি যাতে সামরিক বিষয়ে রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল হয় সেজন্য Military Co-ordination Committee গঠিত হল, সোভিয়েত প্রতিরক্ষা বাহিনীর মার্শাল বুলগানিন হলেন এর চেয়ারম্যান। একটি যৌথ প্রতিরোধ বাহিনী গঠিত হল তাতে অনুগামী রাষ্ট্রগুলিকে ১.৫ মিলিয়ন সৈন্য দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। এভাবে পূর্ব ইউরোপে স্তালিন এক ছদ্মবেশী সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করলেন।

মধ্যপ্রাচ্য সংকট : ইজরায়েলের অভ্যুত্থান

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে একদিকে আরব জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটেছিল, অন্যদিকে ইহুদি জনগোষ্ঠীর ক্রমিক আগমনের ফলে আরব-ইহুদি পৌনঃপুনিক সংঘর্ষের অবতারণা হয়েছিল। ইহুদি জাতিগোষ্ঠীর

নিজ বাসভূমি প্রতিষ্ঠার দাবি আর আরব জাতীয়তাবাদের মুক্তিলাভের উদগ্র বাসনা এই দুই পরস্পরবিরোধী বিষয়কে একবিন্দুতে মেলাতে গিয়ে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বিশেষত গ্রেট ব্রিটেনকে প্রচণ্ডভাবে দোটানায় পড়তে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত ব্রিটেন প্যালেস্টাইনের ম্যান্ডেট ছেড়ে দেয়। এরপর জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে ১৯৪৭ খিস্টাব্দের নভেম্বরে প্যালেস্টাইনের ম্যান্ডেট ছেড়ে দেয়। এরপর জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে প্যালেস্টাইন দ্বিধাবিভক্ত হয়—একটি ইহুদি জাতি অধ্যুষিত রাষ্ট্র এবং অপরটি আরবজাতি অধ্যুষিত রাষ্ট্র। ইহুদিরা তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র ইজরায়েল প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে। মিশর, জর্ডন, সিরিয়া, লেবানন ও সৌদি আরব নিয়ে গঠিত আরব লীগ নতুন ইজরায়েল রাষ্ট্রকে যৌথভাবে আক্রমণ করে। কিন্তু আরব সঙ্ঘ ক্ষুদ্র ইজরায়েল বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। এভাবে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে ইজরায়েল একটি উল্লেখযোগ্য শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করল।

এশিয়াতে ঠান্ডা লড়াইয়ের অনুপ্রবেশ : কোরিয়ার যুদ্ধ

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে জাপান কোরিয়াকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, জাপানকে দ্রুত পরাজিত করার জন্য আমেরিকা ও রাশিয়া উভয়েই কোরিয়ায় প্রবেশ করেছিল। ৩৮° সমান্তরাল রেখার উত্তরে রাশিয়ার ও দক্ষিণে আমেরিকার সৈন্য অবস্থান করছিল। জাপানের পরাজয়ের পর কোরিয়া দুই অতি শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট সিংম্যান রীর নেতৃত্বে একটি মার্কিন অনুগত সরকার দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দক্ষিণ কোরিয়াকে আমেরিকা আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দিতে থাকে। এইভাবে কোরিয়া উপদ্বীপে এক উত্তেজনাকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল আমেরিকা। মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের পরামর্শদাতা জন ফস্টার ডালেস দক্ষিণ কোরিয়ার আইন সভায় ভাষণে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বৈষয়িক ও নৈতিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ১৯৫০ সালের ১৯ জুন ডালেস এই প্রতিশ্রুতি দিলে উত্তর কোরিয়ার সোভিয়েত অনুগামী সরকার ৩৮° রেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবেশ করলে কোরিয়া যুদ্ধের সূচনা হল। দক্ষিণ কোরিয়া জাতিপুঞ্জে সাহায্যের আবেদন জানাল। যদিও যুগোশ্লাভিয়া, ভারত ও মিশর এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল, তবুও সিংহভাগ মার্কিন সহায়তায় গঠিত মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ম্যাক আর্থারের নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী জাতিপুঞ্জের তরফে কোরিয়ায় গেল, তবুও উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার ৯৫ ভাগ দখল করে নিল। আসলে আমেরিকা কোরিয়ার সাম্যবাদী শাসনের অবসান ঘটাতে চেয়েছিল। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় ম্যাক আর্থারকে কোরিয়ায় স্থিতিশীলতা আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হল। এই সূত্র ধরে ম্যাক আর্থার ৩৮° রেখা অতিক্রম করে উত্তর কোরিয়াকে পদানত করলেন। এরপর ম্যাক আর্থার চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সম্প্রসারিত করতে চাইলেন। তখন চীনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী চীনে প্রবেশ করে ও দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওল দখল করে। ম্যাক আর্থার চীনের বিরুদ্ধে যখন প্রচণ্ড রকম প্রতিশোধের কথা ভাবছেন, তখন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান তাঁকে বরখাস্ত করলেন। কারণ আমেরিকা সুদূর প্রাচ্যে একটি দীর্ঘসূত্রী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চায়নি। এ বিষয়ে আমেরিকার মিত্র রাষ্ট্রগুলিও চাপ সৃষ্টি করেছিল। কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে ঠান্ডা লড়াই রাজনীতি এশিয়া ভূখণ্ডে প্রসারিত হয়েছিল এবং ইউরোপ কেন্দ্রিকতার অবসান ঘটেছিল। চীনে সাম্যবাদী শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং চীনের সাথে রাশিয়ার ঘনিষ্ঠতা আমেরিকাকে বিচলিত করে তুলেছিল। আমেরিকা সামগ্রিকভাবে সাম্যবাদ বিরোধী নীতি গ্রহণ করে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ফিলিপাইন্স্, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডকে নিয়ে ANZUS

চুক্তি জোট গড়ে তোলে। শুধু তাই নয়, ভিয়েতনামে মার্কিন অনুপ্রবেশ এবং পশ্চিম জার্মানিতে সামরিক শক্তিবৃদ্ধি কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিন অসাফল্যের পরোক্ষ ফল।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব রাজনীতিতে ঠান্ডা লড়াই রাজনীতির উন্মেষ ঘটে এবং সমগ্র বিশ্ব দুটি পরস্পর বিবদমান শক্তি শিবিরে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এই দ্বিমেরুকরণ বিশ্বরাজনীতিতে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এছাড়া বিশ্ব রাজনীতিতে বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একটি বিকল্প তৃতীয় কূটনৈতিক বলয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ঠান্ডা লড়াইয়ের ফলে উদ্ভূত সংঘাত পূর্ণ পরিস্থিতি ভারতের পক্ষে আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছিল, কারণ পাকিস্তান পাশ্চাত্য শক্তিগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে জোটবন্ধ হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে চেয়েছিল। ফলে ভারতের পক্ষে একটি বিকল্প শান্তিপূর্ণ প্রগতিশীল পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। এইভাবে জোট নিরপেক্ষতা নীতির উদ্ভব হল।

জোট নিরপেক্ষতার প্রকৃতি

জোট নিরপেক্ষতার অর্থ এই নয় যে ভারত আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবে। বিপন্ন স্বাধীনতা, আক্রান্ত ন্যায়নীতি ও আগ্রাসন সমন্বিত এই বিশ্বে নিরপেক্ষতা সম্ভব নয়। তৃতীয় বিশ্বের তথা এশিয়ার দেশগুলিকে নিয়ে একটি কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে বিবদমান দুই শক্তিশিবির থেকে তাদের মুক্ত রাখা সম্ভব হবে। এছাড়া তারা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারবে। ১৯৫৫ সালের এপ্রিলে প্রথমে দিল্লি ও পরে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং এ নির্জোট সম্মেলন হয়। ১৯৬১ সালের জুন মাসে হয় কায়রো সম্মেলন এবং সেপ্টেম্বর মাসে হয় বেলগ্রেড সম্মেলন। এই সম্মেলনগুলি নির্জোট আন্দোলনকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল। এর ফলে সদ্যস্বাধীনতা প্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা লাভ করেছিল। এর ফলে ঠান্ডা লড়াই কিছুটা প্রশমিত হয়েছিল। আমেরিকার জঙ্গী হস্তক্ষেপনীতি ভিয়েতনাম, মধ্যপ্রাচ্য প্রভৃতি অঞ্চলে বাধা পেয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়াও তার ছদ্মবেশী সাম্রাজ্যবাদী নীতি থেকে কিছুটা সরে এসেছিল। আমেরিকা ক্রমশ সংঘাত নীতি থেকে সমঝোতা নীতির দিকে সরে এসেছিল।

তৃতীয় বিশ্বের উত্থান ও তার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই তৃতীয় বিশ্বের ধারণা বিকশিত হয়েছিল। এই ধারণার বহুমুখিতা বিভিন্ন লেখকের লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। আলজিরিয়ার লেখক ফ্রানজ ফ্যানন (Franz Fanon) মনে করেন যে তৃতীয় বিশ্ব হল সমাজতান্ত্রিক ও পাশ্চাত্য শিবিরের অন্তর্বর্তী স্তরে অবস্থিত। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দেশগুলি নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের ভৌগোলিক বলয়। হরোউইজ বলেন যে তৃতীয় বিশ্বের স্বাতন্ত্র্য তার অর্থনীতিতে। পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য অর্থনীতি বা সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনীতি এই দুইয়ের কোনোটি গ্রহণ না করে তৃতীয় বিশ্ব তার নিজ অর্থনৈতিক বিকাশের পথ

বেছে নিয়েছে, তবে প্রয়োজন বুঝে দু ধরণের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণকারী দেশের থেকেই সাহায্য চেয়েছে। মাও সে তুং মনে করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পরিচালিত দুই শক্তি কেন্দ্রকে অনুসরণ না করে এশিয়া ও আফ্রিকার শোষিত জাতিসমূহ তৃতীয় বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। দেখা যাচ্ছে যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। যেমন, এই দেশগুলি ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক আধিপত্যের অধীন ছিল বলে এরা স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এই দেশগুলি অনুন্নত এবং জীবনযাত্রার মান অনেক নিম্নমুখি। কোনো শক্তিজোটের মধ্যে না থেকে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে আগ্রহী বলে এরা প্রায় সকলেই নির্জোট আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত। তবে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট ছিল। যেমন, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা—এই তিনটি মহাদেশ জুড়ে এদের অবস্থিতি এদের ভৌগোলিক পার্থক্য রচনা করেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক কাঠামো ও উন্নয়নের মাত্রা এক নয়। ভিয়েতনাম, কিউবা, ইয়েমেন, অ্যাঙ্গোলা প্রভৃতি দেশ সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থার সমর্থক, আবার ভারত পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রী অর্থনীতির মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থিত। অধিকাংশ দেশগুলির আর্থিক কাঠামো হল পুঁজিবাদী। আবার ইরাক, ইরান, ভারত ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলি অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নয়নশীল অথবা উন্নত। অধিকাংশ দেশই হল অনগ্রসর। রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ভারতসহ ইন্দোনেশিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশ যেমন জোট নিরপেক্ষ, তেমন পাকিস্তান, ইরান, জর্ডন, তুরস্ক, সৌদি আরব ও থাইল্যান্ড মার্কিন জোটের অন্তর্ভুক্ত। অর্থনৈতিক অগ্রসরতায় জাপান পাশ্চাত্য গোষ্ঠীর সমকক্ষ এবং জাপানও আমেরিকার সঙ্গে জোটবদ্ধ। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য। একটি বিকল্প কূটনৈতিকব্যবস্থা গ্রহণ করে তৃতীয় বিশ্ব ঠান্ডা লড়াইয়ে দীর্ণ পৃথিবীতে সংঘাতহীন পরিবেশ আনার চেষ্টা করেছে। কোরিয়ার যুদ্ধ, আরব-ইজরায়েল দ্বন্দ্ব, ইন্দোচীন সমস্যা প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যায় তৃতীয় বিশ্ব ইতিবাচক ও প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এর ফলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পিছু হটেছে ও সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদ সংযত হয়েছে। তাই, বিশ্বশান্তির পক্ষে তৃতীয় বিশ্বের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৯.২.৩৯ আমেরিকার উত্থান

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জে. এম. কীন্‌স চোদ্দো দফা নীতির প্রবর্তক মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের সমালোচনা করে বলেছিলেন যে তাঁর কোনো পরিকল্পনা, কোনো কর্মসূচি, কোনো গঠনমূলক ধারণা নেই, আছে খালি বাগাড়ম্বর, আর তার বলেই তিনি সারা বিশ্বে এমন মর্যাদা ও নৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছেন যে ইতিহাসে তার তুলনা নেই। কিন্তু ১৯৪৫ সালের পর ঐ কথা আর বলা যেত না। আমেরিকার বিশাল অর্থনৈতিক এবং শিল্পোৎপাদিকা শক্তি বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৫০% বহন করত, এই শক্তির সঙ্গে মানানসই ছিল তার সামরিক শক্তি। পক্ষান্তরে, একই প্রজন্মের মধ্যে দুবার ইউরোপ বিশ্বকে যুদ্ধে জড়িত করেছিল। সুতরাং, রণক্লান্ত, বিধ্বস্ত ইউরোপের ওপর আমেরিকা তার মূল্যবোধ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন চাপিয়ে দেবার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলোতে চারিদিকে যখন পরাজয়ের অবসন্নতা তখন আমেরিকার সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ছিল অবিসংবাদিত। এমতাবস্থায় পশ্চিম ইউরোপের পুনর্গঠন যে আমেরিকার পথ ধরে

হবে তা নতুন কোনো সম্ভাবনার ইঙ্গিত আনেনি। বিংশ শতকের গোড়ার থেকেই আমেরিকার শিল্পোৎপাদন ও বিপণন পদ্ধতি ইউরোপীয় সমাজগুলিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল। জর্জেস ডুহামেল (Georges Duhamel) ১৯৩০-এর দশকে লিখেছিলেন America The Menace। রবার্ট অ্যারন (Robert Aron) এবং অ্যারামন্ড ড্যানডিয়ার (Aramond Dandier) লিখেছিলেন The American Cancer। দুটি বই-ই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। আমেরিকা যে নতুন উৎপাদন পদ্ধতি চালু করেছিল তাতে গণভোগ্য পণ্যগুলির ব্যাপক ও একটি নির্দিষ্ট মান বজায় রেখে উৎপাদন হত, শুধু তাই নয়, এই পণ্যগুলির জন্য নতুন বিপণন পদ্ধতি ও নতুন গণসংযোগ পদ্ধতিও চালু হয়েছিল। এই নতুন পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছিল ফোর্ডবাদ (Fordism)। কারণ বিখ্যাত এই মোটর গাড়ি নির্মাতা শুধু জনসাধারণের জন্যই উৎপাদন করেননি, ও শুধুই উৎপাদন বৃদ্ধি করেননি, উচ্চহারে বেতন দিয়ে ঝিমিয়ে পড়া শ্রমিক শক্তিকে চাঙ্গা করে তুলেছিলেন। দুটি যুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে বলা হত যে আমেরিকার এই পদ্ধতি আমেরিকার জন্য উপযুক্ত, কারণ সেখানে যন্ত্রায়ণের প্রসার ঘটানোর মতো পুঁজি আছে, জিনিসের মান ধরে রাখার মতো প্রসারিত আভ্যন্তরীণ বাজার আছে এবং আছে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক শ্রমিক। ১৯৩৯ সালের আগে সত্যি সত্যি ইউরোপের অর্থনৈতিক কাঠামোতে এর কোনোটি মানানসই ছিল না। কিন্তু ১৯৪৫ সালের পরে আমেরিকার অভিজ্ঞতা ও পদ্ধতি কাজে না লাগিয়ে ইউরোপের পুনর্গঠন ও শিল্প বিকাশ সম্ভবপর ছিল না।

শিল্প ও অর্থনীতির বিকাশের পথ ধরে এসেছিল সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার। আমেরিকার অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি তাকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চালকের আসন দিয়েছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও পুঁজিবাদের ধারণার সাথে সাথে আমেরিকার নৈতিক ও জাগতিক শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাও ইউরোপে প্রবেশ করেছিল। একথা সত্য যে ১৯৪৫ সালের পর থেকে আমেরিকা সমস্ত রকম সম্ভাব্য উপায়ে ইউরোপের পুনর্গঠনে অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ইউরোপের পুনর্গঠন মানেই যে মার্কিণীকরণ—বিষয়টি এত সরল নয়। একথা অনস্বীকার্য যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আমেরিকা সবচেয়ে উন্নত শিল্পায়িত দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আসতে গেলে হয় তাকে নতুন কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হত নতুবা ঐ মডেল অনুসরণ করতে হতো। ইউরোপ দ্বিতীয় বিকল্পটি গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিন মিলিয়নেরও বেশি আমেরিকান সৈন্য তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঠামো ইউরোপে আমদানি করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করে আমেরিকা তার নিজস্ব মডেল অনুযায়ী জার্মানিকে পুনর্গঠিত করার সুযোগ পেয়েছিল। প্রথমে এই মডেল চালু করা হয়েছিল আমেরিকার প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন দক্ষিণ জার্মানিতে, তারপরে তা মিত্রপক্ষের দখলীকৃত অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে, এবং Federal Republic of Germany জন্ম লাভ করে। এই খণ্ডিত জার্মানির মডেলটি পরে, বিশেষত ঠান্ডা লড়াই শুরু হবার পরে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ গ্রহণ করেছিল।

৯.২.৪০ সোভিয়েত রাশিয়ার উত্থান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন যে অসাধারণ সামরিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল, তার উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে জার্মানির পক্ষে ৮০% প্রাণহানি ঘটেছিল তার পূর্ব সীমান্তে। যুদ্ধের পরেও ইউরোপের মধ্যস্থলে রাশিয়ার উপস্থিতি অব্যাহত ছিল। নতুন উত্থিত কম্যুনিস্ট দেশগুলিকে ক্রমাগত সমর্থন করে সে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করে চলছিল। এসবের দ্বারা রাশিয়া আমেরিকার সমকক্ষ এক অতিশক্তি হিসাবে পরিগণিতও হয়েছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছিল যে রাশিয়ার শক্তি সম্পর্কে ধারণা অনেকটাই অতিরঞ্জিত হয়েছিল। যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আমেরিকার অর্থনৈতিক

শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সেখানে রাশিয়ার কেন্দ্রাভিমুখী অর্থনৈতিক কাঠামোর দুর্বলতা ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছিল। এছাড়া তার উন্নয়নের হার আমেরিকার মতো উর্ধ্বমুখি ছিল না, তার শক্তি, প্রতিভা, বিশ্বে তার ভূমিকা, এমনকি সোভিয়েত ভীতি সবই তখন যতটা অতিকায় মনে হয়েছিল বাস্তবে তা ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তা ধরা পড়েনি। বরঞ্চ জর্জ কেন্নান (Gcorge Kennan) তাঁর বইয়ে লিখেছেন যে সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে পশ্চিমী জগৎ এমন একটি পরিবেশের সন্ধান পেয়েছিল যা তার নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের সম্পূর্ণ বাইরে অবস্থিত।

মনে রাখা দরকার যে কেন্নানের মতো একজন তথ্যনিষ্ঠ আমেরিকান লেখক এমন একটা সময়ে এই মূল্যায়ন করেছেন যখন আমেরিকা বিশ্বের অবিসংবাদিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে পরিগণিত। তবুও ইউরোপে রাশিয়ার উপস্থিতি আমেরিকার মধ্যে একধরণের বিচ্ছিন্নতা ও কোণঠাসা হবার বোধ তৈরি করছিল। রাশিয়া আণবিক অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে আমেরিকার মনে এই ভীতির সৃষ্টি করেছিল যে সে আমেরিকায় আণবিক অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারে। ইউরোপে মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতি সোভিয়েত সৈন্যদের সদা প্রস্তুত রেখেছিল এবং তার ইউরোপের মিত্রদের ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কঠোর করেছিল।

রাশিয়া তার ইউরোপের মিত্রদের নিয়ে একটি সুরক্ষা বলয় তৈরি করেছিল, যার স্থায়ীত্ব নির্ধারণ করতে প্রথমে দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তিসমূহ এবং পরে তা আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল ওয়ারশ চুক্তি নামে। নিজের অংশের জার্মানির ওপর রাশিয়া তার নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করেছিল, জার্মানিতে যাতে আর কোনো সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে না পারে তার জন্য যথেষ্ট সাবধানতা নিয়েছিল রাশিয়া। আমেরিকার উপস্থিতি সত্ত্বেও পশ্চিম ইউরোপের কম্যুনিস্টদের বিশেষত ফ্রান্স ও ইটালির কম্যুনিস্ট দলকে সমর্থন করত রাশিয়া, এছাড়া সোভিয়েত রাষ্ট্রের শত্রু বলে যেসব দেশকে চিহ্নিত করেছিলেন লেনিন ও স্তালিন তাদের সাথেও রাশিয়া সামরিক বন্ধুত্ব রেখে চলছিল।

কম্যুনিস্টদের প্রতি সমর্থন-নীতি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো দুটি পুঁজিবাদী দেশকে সন্ত্রস্ত করেছিল। তারা রাশিয়াকে জার্মানির থেকেও বেশি বিপজ্জনক বলে মনে করতে লাগল। তবে পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামরিক চুক্তি রাশিয়াকে লাভবান করেছিল, স্তালিন সুকৌশলে একের বিরুদ্ধে অন্যকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতেন। যেহেতু পশ্চিম ইউরোপের কোনো অবিভাজ্য অস্তিত্ব ছিল না, সেহেতু অনেক পশ্চিমী শক্তি রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা ও সহায়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে চাইত। এমনকি যখন ঠান্ডা লড়াই তুঙ্গে তখনও সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সুম্পর্ক নষ্ট হয়নি। বস্তুত পক্ষে পশ্চিমী গোষ্ঠী কখনোই মধ্য ইউরোপে সোভিয়েত প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করতে চায়নি।

এভাবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সোভিয়েত প্রভাবাধীন একটি ইউরোপীয় এলাকা গড়ে উঠেছিল, যার পশ্চিম ইউরোপীয় বিকাশধারার বাইরে অবস্থিতি ছিল। সোভিয়েত রাশিয়া স্পষ্টত একটি বিকল্প সামাজিক সংগঠন ও বিকাশের মডেল উপস্থাপিত করেছিল, যা আমেরিকাকে বিচলিত করেছিল। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুটি অতিশক্তির উদ্ভবের ধারণার জন্ম হয়েছিল। শীঘ্রই বোঝা গিয়েছিল যে পৃথিবীতে মাত্র দুটি দেশের অতিশক্তি হবার মতো দায়বদ্ধতা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামরিক শক্তি রয়েছে। রাশিয়া যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং আমেরিকার মতে আর্থ-সামাজিক বিকাশ তার হয়নি তবুও সে-ই আমেরিকার সমতুল্য শক্তির মর্যাদা লাভ করেছিল।

৯.৩ সারাংশ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে ইউরোপ কেন্দ্রিক রাজনৈতিক বিন্যাসের ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এ দুটি ইউরোপ বহির্ভূত অতিরাষ্ট্রের আবির্ভাব এবং এশিয়া-আফ্রিকায় ঔপনিবেশিকতার অবসান ও নতুন নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রূপান্তর ঘটায়। এগুলোর অধিকাংশই ছিল ইউরোপের বাইরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় ও চীনে কম্যুনিস্ট শক্তির ক্ষমতালাভ সূদুর প্রাচ্যের রাজনীতিতে মতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছিল। দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেও সংঘর্ষ দেখা দেয়। মধ্যপ্রাচ্য হল আরেকটি সংঘর্ষের এলাকা। সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের সঙ্গে নবজাগ্রত আরব জাতীয়তাবাদের জীবন মরণ সংঘর্ষ চলে। আফ্রিকাতে ঔপনিবেশকতার অবসানের দাবিতে ছোটো বড়ো নানা ধরণের সংঘর্ষ শুরু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পরস্পর বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে।

৯.৪ অনুশীলনী

প্রশ্নাবলি ও উত্তর সংকেত

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।

উ: অনুচ্ছেদ ১.২-২.৯ দেখে উত্তর লিখুন।

২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার একটি খসড়া লিখুন।

উ: ১.২.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ভাবাদর্শের সংঘাত কিভাবে শক্তিসাম্যের পরিবর্তন আনল?

উ: ১.২.৪ এবং ১.২.৫ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪. এশিয়া ও আফ্রিকার ওপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কি প্রভাব পড়েছিল?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.৬ লিখুন।

৫. আফ্রিকা ও এশিয়াতে উপনিবেশের অবসান কী তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য বহন করে?

উ: ১.২.১০ এবং ১.২.১১ অনুচ্ছেদ লিখুন।

৬. চীনের ইতিহাস কিভাবে ঔপনিবেশিকতার অবসানকে প্রতিফলিত করেছিল?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.১২ লিখুন।

৭. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাপানের পরিণতি কি হল?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.২৩ লিখুন।

৮. নতুন এশিয়ার অভ্যুদয়কালে কি কি সমস্যা আপনি লক্ষ্য করেন?

উ: ১.২.১৪ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৯. ভারতের স্বাধীনতা অর্জন কিভাবে হয়েছিল? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর অভিঘাত কি ছিল?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.১৫ লিখুন।

১০. মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা লাভের বিভিন্ন পর্যায়ের একটি ধারা রচনা করুন।

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.১৬ লিখুন।

১১. ব্রম্ভদেশ কিভাবে স্বাধীনতা লাভ করল?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.১৭ লিখুন।

১২. ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কি ভূমিকা আপনি লক্ষ্য করেন?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.১৮ লিখুন।

১৩. ইন্দোচীনে আমেরিকা ও রাশিয়ার দ্বন্দ্ব কিভাবে আপনার চোখে পড়ে?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.১৯ লিখুন।

১৪. টীকা লিখুন : (১) কাম্বোডিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন (২) লাওসের স্বাধীনতা আন্দোলন।

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.২০ এবং ১.২.২১ লিখুন।

১৫. মধ্যপ্রাচ্যের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য কি কোনোভাবে তার আন্তর্জাতিক সংকটকে ঘনীভূত করেছিল বলে আপনি মনে করেন?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.২২ এবং ১.২.২৩ লিখুন।

১৬. মধ্যপ্রাচ্য সংকটে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ভূমিকা কি ছিল?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.২৪ লিখুন।

১৭. আপনি কি মনে করেন প্যালেস্টাইন সমস্যা মধ্যপ্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা গুরুতর সংকট? আমেরিকার হস্তক্ষেপ কি সংকটকে বাড়িয়ে তুলেছিল?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.২৫ এবং ১.২.২৬ লিখুন।

১৮. সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়ায় ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্ব কি ভূমিকা পালন করেছিল?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.২৬ লিখুন।

১৯. টীকা লেখুন : (১) পারস্যের স্বাধীনতা লাভ (১) মিশরে ব্রিটিশ প্রভাবের অবসান

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.২৭ এবং ১.২.২৮ লিখুন।

২০. মধ্যপ্রাচ্যে ঔপনিবেশিকতার অবসানের কি ফলাফল হয়েছিল?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.৩০ লিখুন।

২১. আফ্রিকা ও এশিয়াতে জাতীয়তাবাদের বিকাশের ধারার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন।

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.৩১ লিখুন।

২২. আফ্রিকার জাগরণের আন্তর্জাতিক ফলাফল কী হয়েছিল? এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.৩৩ এবং ১.২.৩৪ লিখুন।

২৩. আফ্রিকার ঐক্য আন্দোলনের সাফল্য কি সম্ভবপর বলে আপনি মনে করেন?

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.৩৭ লিখুন।

২৪. টীকা লিখুন : (১) আলজিরিয়ার স্বাধীনতা অর্জন (১) নিগ্রো স্বাধীনতা আন্দোলন

উ: অনুচ্ছেদ ১.২.৩৫ এবং ১.২.৩৭ লিখুন।

২৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আমেরিকা ও রাশিয়ার উত্থানের পটভূমি লিখুন।

২৬. আমেরিকা ও রাশিয়ার শক্তির একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

উ: ২৫ ও ২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুচ্ছেদ ১.২.৩৮, ১.২.৩৯ এবং ১.২.৪০ দেখুন।

৯.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১. Europe and the Wider World–ed. by Bernard Waites.

২. The World Since 1919–Langsamand Mitchell.

৩. International Relations Since 1919–A.C. Roy.

৪. A History of War and Peace 1939-1965–Wilfried Knapp.

৫. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস—প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৬. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস—জয়ন্তকুমার রায় ও প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী।

৭. Keplar : Twentieth Century World.

৮. World Politics Since 1945–Peter Kelvokoressi.

একক ১০ ❑ চীনের বিপ্লব

গঠন

১০.০ উদ্দেশ্য
১০.১ প্রস্তাবনা
১০.১.১ উনবিংশ শতাব্দীতে চীনের সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সংযোগ
১০.১.২ পাশ্চাত্য সংস্পর্শের ফলে চীনে আধুনিকতার সূচনা
১০.১.৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর চীনে জাতীয়তাবাদ ও কম্যুনিজমের সূচনা
১০.১.৪ ড. সান ইয়াৎ সেনের উত্থান
১০.১.৫ সান এর নেতৃত্বে ১৯১১ সালের গণতান্ত্রিক বিপ্লব
১০.১.৬ ১৯১১ সালের বিদ্রোহ : প্রসার, ব্যর্থতা ও তাৎপর্য
১০.১.৭ চীনে কম্যুনিস্ট দলের প্রতিষ্ঠা
১০.১.৮ চীনে সমর নায়কদের শাসনকাল ও তার প্রতিক্রিয়া
১০.১.৯ চৌঠা মে'র আন্দোলন ও তার অবদান
১০.১.১০ সান ইয়াৎ সেনের কার্যকলাপের শেষ পর্যায়
১০.১.১১ কুয়োমিনতাং-কম্যুনিস্ট ক্রমবর্ধমান বিবাদ ও বিচ্ছেদ
১০.১.১২ সাম্যবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়
১০.১.১৩ চিয়াং কাইশেক ও কম্যুনিস্ট দলের বিরোধ
১০.১.১৪ লং মার্চ ও পার্টি নেতৃত্বে মাও সে তুং
১০.১.১৫ জাপান বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম ও কম্যুনিস্ট-কুয়োমিনতাং দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট
১০.১.১৬ সাম্যবাদী আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় (১৯৩৭-৪৫) : ইয়েনান কাল
১০.১.১৭ কে. এম. টি. সি. সি. পি. সংগ্রামের শেষ পর্যায়
১০.১.১৮ তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধে কম্যুনিস্টদের বিজয়
১০.১.১৯ মাওয়ের সাফল্যের কারণ
১০.১.২০ উপসংহার
১০.২ সারাংশ
১০.৩ অনুশীলনী
১০.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১০.০ উদ্দেশ্য

১৯৪৯ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চীন বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রকে চিরতরে বিদায় দিতে পেরেছিল। এই অতুলনীয় কৃতিত্বের কথাই এই এককটিতে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন—

- পাশ্চাত্য সংযোগ চীনের জনজীবনে কেমনভাবে আলোড়ন তুলেছিল। চীন কিভাবে পাশ্চাত্য প্রবাব আত্মস্থ করেছিল একাধিক সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে।
- চীনে কিভাবে সাম্যবাদী ধারণার সূত্রপাত ঘটেছিল। রাশিয়া প্রথমদিকে চীনা বুদ্ধিজীবীদের পথ প্রদর্শক ও উপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।
- মাও সে তুং-এর অভিনব ও একান্ত নিজস্ব চিন্তাধারা কিভাবে রাশিয়ার অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে চীনের নিজস্ব আন্দোলনধারা গড়ে তুলল।
- চীনে একই সঙ্গে জাপানি আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করে জনসমর্থিত একটি ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। চীনের এই অভূতপূর্ব সাফল্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১০.১ প্রস্তাবনা

উনবিংশ শতকের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ ও খ্রিস্টান মিশনারীদের বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক কার্যকলাপ এবং ধর্মপ্রচার চীনের চিরাগত জীবনচর্যার ভরকেন্দ্রকে বিচলিত করেছিল। চীনাদের ওপর বিদেশিদের অতিরাষ্ট্রিক অধিকার, শুল্ক দপ্তর, ডাকঘর, রাজস্ব বিভাগ সর্বত্র বিদেশিদের নিযুক্ত এবং শিক্ষা ও চিকিৎসাক্ষেত্রে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারকদের প্রভাব চীনবাসীকে নিজভূমে পরবাসী করে রেখেছিল। এর ওপর জাপান চীন ভূখণ্ডে সাম্রাজ্য বিস্তার করার জন্য চীন আক্রমণ করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর চীন পশ্চিমী শক্তিদের ব্যবহারে আরো অসম্মানিত হল। জাপানের ২১ দফা দাবি, প্যারিস শান্তি সম্মেলনের চীনা-বিরোধী সিদ্ধান্ত, ভার্সাই সন্ধির শানটুং সংক্রান্ত প্রতিকূল নির্দেশ—এসবের বিরুদ্ধে চীনা ছাত্রকুল শুরু করে চৌঠা মের আন্দোলন। এদিকে চীনের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগে জঙ্গী সমর নায়করা উত্তর ও মধ্য চীনে স্বশাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে দেশের সংহতি বিনষ্ট করে। এদিকে ডঃ সন ইয়াৎসেন প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী কুয়োমিনতাং দল আন্দোলন করতে শুরু করলো দক্ষিণ চীনে। তাঁর মৃত্যুর পর চিয়াং কাইশেক কুয়োমিনতাং দলের পরিচালক হলেন। ইতিমধ্যে চীনে সাম্যবাদী দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি নামে। চিয়াং সাম্যবাদীদের ধ্বংস করার জন্য জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে মদত দিতে লাগলেন। কিন্তু মাও সে তুং-এর সুযোগ্য নেতৃত্ব চীনকে বহিঃশত্রু জাপানকে ও আভ্যন্তরীণ শত্রু জাতীয়তাবাদীদের পরাস্ত করতে সক্ষম করে। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী চীন। এই এককটিতে চীনের ইতিহাসের এই বিচিত্র গতির একটি রূপরেখা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। চীন কিভাবে বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ দুর্নীতির মোকাবিলা করেছিল, এই এককে তা তুলে ধরা হয়েছে। পাশ্চাত্য প্রভাবকে চীন আত্মস্থ করেছিল তার নিজস্ব ঐতিহ্যের ভিত্তিতে ও প্রয়োজন অনুযায়ী। এই কাজ সম্পন্ন হয়েছিল সাম্যবাদী দলের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে। চীন শেষ অবধি তার জাতীয় জীবনে দীর্ঘস্থায়ী তমসাচ্ছন্ন রজনী অতিক্রম করে উপনীত হয়েছিল কল্যাণকর এবং সম্ভাবনা সমৃদ্ধ এক উজ্জ্বল সুপ্রভাতে।

১০.১.১ উনবিংশ শতাব্দীতে চীনের সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সংযোগ

উনবিংশ শতাব্দীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিবর্গ চীনের সাথে বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের এবং চীনের অভ্যন্তরে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের দাবি নিয়ে চীনের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছিল। এই সমস্ত দাবি চীনের জাতীয় জীবনে এক বিপর্যয় নিয়ে এল, যা রোধ করার মতো শক্তি তদানীন্তন চিন সরকারের

ছিল না। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ বা আফিং যুদ্ধের পরে যে সন্ধি হয়েছিল তার শর্তানুযায়ী বিদেশি শক্তিবর্গের কাছে উন্মুক্ত বন্দরের সংখ্যা ছিল পাঁচে। সেই সংখ্যা ১৯১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল পঞ্চাশে। বিদেশি শক্তিবর্গ চীনা নাগরিকদের ওপর অতিরাষ্ট্রিক অধিকার লাভ করেছিল। চীনের সঙ্গে বৈদেশিক ব্যবসা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাড়ল অর্থনৈতিক শোষণ। চীনের শুল্ক দপ্তর, ডাকঘর, রাজস্ব বিভাগ সর্বত্র বিদেশিরা নিযুক্ত হতে থাকে। শিক্ষা এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের প্রভাব বিস্তৃত হয়।

১০.১.২ পাশ্চাত্য সংস্পর্শের ফলে চীনে আধুনিকতার সূচনা

এইভাবে চীনে আধুনিকতার সূচনা হল, যা পরিণতি পেল ১৮৯৮ সালের শতদিবসের সংস্কার আন্দোলন এবং ১৯০০ সালের বক্সার আন্দোলনের মাধ্যমে। এইসব ঘটনা চিনের ইতিহাসে আশু এক রাজনৈতিক বিবর্তনের পথ প্রস্তুত করেছিল। পরিণামে ১৯১১ সালে চিং শাসনের অবসান ঘটল এবং দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। এর পর থেকে চীনের ইতিহাসের ধারা প্রবাহিত হল বিচিত্র গতিতে। কোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ দুর্নীতিই চীনের জাতীয় মেরুদণ্ড ভঙ্গ করতে পারেনি। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে আফিং সেবনের মতো মারাত্মক সামাজিক ব্যাধিগুলি মাওয়ের আন্দোলনের জোয়ারে খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছিল। সাম্যবাদী দলের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে চীন শেষ অবধি তার জাতীয় জীবনে দীর্ঘস্থায়ী তমসাচ্ছন্ন রজনী অতিক্রম করে উপনীত হয় কল্যাণকর এবং সম্ভাবনা সমৃদ্ধ এক উজ্জ্বল সুপ্রভাতে। চৈনিক রূপান্তর ঘটল।

১০.১.৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর চীনে জাতীয়তাবাদ ও কম্যুনিজমের সূচনা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর চীনে নানা কারণে জাতীয়তাবাদ প্রবল হতে থাকে। একদিকে ছিল বিদেশিদের হাতে পরাজয়ের গ্লানি, বিদেশি শোষণ এবং জঙ্গী নায়কদের দুঃশাসন, এর ফলে দেশে দারিদ্র, অত্যাচার ও অনৈক্য বেড়ে যাচ্ছিল। অপরদিকে পশ্চিম হতে আগত নতুন নতুন ভাবধারা বুদ্ধিজীবীদের অনুপ্রাণিত করেছিল চীনকে বিপদের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে। চীনের অনৈক্য, দ্রারিদ্র্য ও অপশাসনের অবসান ঘটানোর জন্য এবং একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপনের জন্য বিদেশি সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। সেজন্য পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত নেতারা স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমী দেশগুলির কাছে সাহায্য পাওয়ার আশা করেন। কিন্তু ভার্সাই সন্ধি ও ওয়াশিংটন সম্মেলন উভয় স্থানেই চীন অত্যন্ত হতাশ হয়। কারণ, প্রথমটিতে চীনকে বঞ্চিত করে শানটুং প্রদেশটি জাপানকে দেওয়া হল। আর দ্বিতীয়টিতে চীনকে বিদেশি শোষণ ও কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করার কোন ব্যবস্থা করা হল না। কিন্তু ঐ দুটি কারণই ছিল চীনের দূর্দশার মূল। ফলে চীনের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি যে বিদেশি শক্তিগুলি চীনকে কোনো রকম কার্যকরী সাহায্য করবে না। তাই, এই পরিস্থিতিতে চীনে যেমন জাতীয়তাবাদী কুয়োমিনটাং দলের পুনর্গঠন ঘটল, তেমন কম্যুনিস্ট দলের আবির্ভাব সম্ভব হল। তবে চীন যে পুরোপুরি বিদেশি সহায়তা বর্জন করতে পেরেছিল তা নয়। এই সময়েই রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তুলেছিল। কুয়োমিনটাং দলের পুনর্গঠন বা কম্যুনিস্ট দলের প্রতিষ্ঠা—দুটি ঘটনাতেই রাশিয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব কাজ করেছিল।

১০.১.৪ ড. সান ইয়াৎসেন-এর উত্থান

1866 খ্রিস্টাব্দে ক্যান্টনের একটি কৃষক পরিবারে সান ইয়াৎসেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৮০ দশকে তিনি হংকং-এ যান এবং খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৮৫

সালে চীনে ফিরে এসে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। চীনের সমস্যাপূর্ণ পরিস্থিতি তাঁকে চিন্তাকুল করে তুলেছিল। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে সান-ইয়াৎসেন চীনের পুনরুভ্যদয় সমিতি (Revive China Society) বা জিং-জং-খুই নামে একটি গুপ্ত সমিতি সংগঠিত করেন যার কেন্দ্রীয় কার্যালয় তৈরি হয় ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রথমে ক্যান্টনে এবং তারপরে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে হুইজাউতে সান-এর নেতৃত্বাধীন জিং-জং-খুই মাঞ্চুর রাজতন্ত্র বিরোধী অভ্যুত্থানের চেষ্টা করল, কিন্তু উভয় স্থানেই তা ব্যর্থ হল। অবিচলিত সান মাঞ্চু রাজতন্ত্র বিরোধী জেহাদ চালিয়ে যেতে লাগলেন। ইতিমধ্যেই চীনে আরো কতকগুলি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠল, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'চীনের পুনরুত্থান সমিতি" (Society for Restoration of China)। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সান-ইয়াং-সেন টোকিওতে বসে সমস্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করলেন। মাঞ্চু বিরোধী সমস্ত বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী সান-এর নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজি হলেন।

১০.১.৫ সান এর নেতৃত্বে ১৯১১ সালের গণতান্ত্রিক বিপ্লব

মাঞ্চু বিরোধী সমস্ত বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী সান-এর নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজি হলেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি তুং মেং হুই United League নামে এটি নতুন ও ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুললেন। এই সংগঠনটি ১৯১১ সালের গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা করেছিল। Jean Chesneaux (জাঁ শ্যেনো) তাঁর China from the Opium War to the 1911 Revolution গ্রন্থে বলেছেন যে তুং মেং হুই একটি ঐক্যবদ্ধ বৈপ্লবিক সংগ্রাম সার্থকভাবে পরিচালনা করেছিল এবং এর ফলে একটি সুস্পষ্ট মতাদর্শ গড়ে উঠেছিল। তুং মেং হুই-র প্রাণপুরুষ সান তিনটি নীতি প্রচার করেছিলেন—(১) জাতীয়তাবাদ (২) গণতন্ত্র (৩) সমাজতন্ত্র বা জনসাধারণের জীবিকা। জাতীয়তাবাদ বলতে সান বুঝতেন মাঞ্চু শাসনের বিরোধিতা। বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। তেমনি সমাজতন্ত্র বলতে তিনি বুঝতেন যদি জমির মালিকানার ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায় তবে একদিকে চীনের কৃষকরা সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে মুক্তি পাবে, অন্যদিকে চীনে পশ্চিমী পুঁজিবাদের উত্থান রোধ করা সম্ভব হবে। এখানেও সান কিন্তু সমগ্র সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলেননি। গণতন্ত্র বলতে তিনি বুঝেছিলেন একটি প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান যেখানে সকল নাগরিক সমান অধিকার ভোগ করবে। এ ছাড়া শাসন, আইন ও বিচার বিভাগ হবে পৃথক। ফরাসি বিপ্লবের অনুকরণে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শের কথা ঘোষণা করে তুং মেং হুই তার ইস্তাহারে বলেছিল যে এখন প্রয়োজন জনগণের বিপ্লবের। Immanuel Hsu (ঈম্যানুয়েল সু) তাঁর Rise of Modern China গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে সান একটির মধ্য দিয়ে তিনটি বিপ্লব সংগঠিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন—জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের মাধ্যমে মাঞ্চু রাজবংশ ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলির উচ্ছেদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রজাতন্ত্র গঠন এবং সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের ভূমি বন্টনের উপর সাম্য প্রতিষ্ঠা করে চীনে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের উত্থানের পথ রোধ করা। সান বিপ্লবের একটি বিস্তৃত কর্মসূচি রচনা করেছিলেন। তিনভাগে বিভক্ত এই কর্মসূচির প্রথম পর্যায়টি ছিল তিন বৎসর ব্যাপী। এই সময়ে দেশ সামরিক শাসনাধীনে থাকবে কিন্তু প্রতি জেলায় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। স্থানীয় জনগণের সাহায্যে সামরিক প্রশাসকরা দেশ থেকে অনিষ্টকর প্রথাগুলি যেমন, দাসত্ব, পদবন্ধন, অহিফেন-ধূমপান ইত্যাদি দূর করার জন্য সচেষ্ট হবেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছয় বছরের জন্য কেন্দ্র সামরিক শাসনে থাকবে বটে কিন্তু সামরিক প্রশাসক ও জনসাধারণের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করে

একটি অস্তায়ী সংবিধান রচিত হবে। এই পর্যায়কে বলা হবে অবিভাবকত্বের কাল (Period of Tutelage)। এরপর আসবে তৃতীয় পর্যায় যখন সামরিক শাসন বিলুপ্ত হবে এবং দেশে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সম্বলিত শাসনতান্ত্রিক সরকার গঠিত হবে।

১০.১.৬ ১৯১১ সালের বিদ্রোহ : প্রসার, ব্যর্থতা ও তাৎপর্য

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে চিং সরকার ঘোষণা করে যে দেশের অভ্যন্তরে যাবতীয় রেলপথকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে। সরকার রেলের বিদেশি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শেয়ারগুলি প্রকৃত মূল্যের ৪৫ বা ৪৬ শতাংশ মূল্য দিয়ে কিনে নেবে। মূল্যের বাকি অংশের বিনিময়ে বিদেশি কর্তৃপক্ষকে ঋণপত্র লিখে দেবে। এভাবে চিং সরকার দেশকে বিদেশী ঋণের জালে জড়িয়ে ফেলে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদকে পুষ্ট করছিল। স্বভাবতই জনসাধারণ এর বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু চিং সরকার এতে কর্ণপাত করেনি। এই ঘোষণা সি-চুয়ান, হুনান, হুপেই, কুয়াংটং প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীদের বিদ্রোহী করে তুলল। সি-চুয়ান অঞ্চলে সরকারি সেনাবাহিনীর সাথে বিক্ষোভকারীদের প্রচন্ড সংঘর্ষ হল। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্রোহী কৃষকরা সি-চুয়ানের প্রাদেশিক রাজধানী চেং তু অবরোধ করল। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর উ-চাং অঞ্চলে এক জঙ্গী গণ অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল। বছরের দশম মাসের দশম দিনে এই অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়েছিল বলে এবং দুই দশের অভ্যুত্থান (Double Ten Rising) বলে অভিহিত করা হয়। শ্রমিক ও ছাত্ররা এই উত্থানের সামিল হয়েছিল। জঙ্গী আন্দোলনের মুখে পড়ে উ-চাং-এর চিং শাসনকর্তা এলাকা ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। এই সুযোগে বিপ্লবীরা দুটি প্রতিবেশী শহর হ্যানকো এবং হ্যান-ইয়াং দখল করে নিল। উ-চাং বিপ্লবীদের সমর্থনে তুং মেং হুইর সদস্যরা সারা দেশে আন্দোলন গড়ে তুলল। একের পর এক প্রদেশ মাঞ্চু শাসনের কবল থেকে মুক্ত হল। সমগ্র মধ্যচীন বিপ্লবীদের কবলিত হল। মাঞ্চু শাসনের দুর্বলতা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল। মুক্ত প্রদেশগুলির বিপ্লবী প্রতিনিধিরা নানকিং-এ মিলিত হয়ে একটি প্রজাতন্ত্র গঠনের কথা ঘোষণা করে। ১৯২২ সালের ১জানুয়ারি বিপ্লবীরা নানকিং-এ একটি সমান্তরাল সরকার গঠন করল। ড: সান-ইয়াৎ সেন এই অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হলেন।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব সাফল্যের সাথে চীনের রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করেছিল। এমন কি, সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের ছদ্মবেশেও চিং রাজতন্ত্রের ফিরে আসার রাস্তা বিপ্লবীরা খোলা রাখেননি। কিন্তু ১৯১১ সালের এই বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ সান ইয়াৎ সেনের তিনটি নীতিকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে কার্যকরী করার প্রচেষ্টা হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের প্রাধান্য তখনও অটুট ছিল। গণতান্ত্রিক কাঠামো তৈরি করা হয়নি। ভূমি বন্টনের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। ফলে চীনের সাধারণ মানুষের কাছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছিল অধরা। বিপ্লবীদের মতাদর্শগত অনৈক্যের সুযোগে অনেক সমাজবিরোধী ও প্রতিবিপ্লবী তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যেই বিপ্লবীদের হাত থেকে ক্ষমতা অপসৃত হল এবং ইউয়ান-শি-কাই-এর মতো সমর নায়কদের (Warlords) হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হল।

আসলে কাগজে কলমে নতুন প্রজাতন্ত্রের পক্ষে সফল হবার মতো অনেক উপাদান ছিল। যেমন, সংবিঠান, সংসদীয় কার্যপদ্ধতি, আইনের ধারা ইত্যাদি। কিন্তু সংবিধান কাগজ বন্দী রয়ে গেল, তাই সংসদীয় কার্যপদ্ধতি বা আইন কোনোটিই বাস্তবায়িত হল না। সবচেয়ে বড়ো কথা হল এই যে প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত প্রজাসমূহের সংসদীয় প্রতিষ্ঠান, আইনের শাসন বা দায়িত্বশীল গণতন্ত্রী নাগরিকত্বের কোনো ধারণা ছিল না।

১৯১১ সালের বিপ্লবের শুরুতে দক্ষিণ চীনের প্রজাতন্ত্রীরা একটি প্রতিনিধি পরিষদ আহ্বান করেছিল, কিন্তু এ ধরণের কোনো প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়নি কারণ নির্বাচন কি তাই জানা ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ বা উৎসাহ দেখা গেল না। চীনা জনগণ সানের তিন পর্যায় বিশিষ্ট বৈপ্লবিক কার্যক্রম অগ্রাহ্য করল। ফলে ইউয়ান-শি-কাই সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেলেন।

ইউয়ান-শি-কাই ছিলেন পিকিং সরকারের প্রতিনিধি। নানকিং এ অস্থায়ী সরকার গঠনের পর সান একটি তারবার্তায় ইউয়ানকে জানালেন যে তিনি যদি প্রজাতন্ত্র সমর্থন করেন তাহলে সান তাঁকেই রাষ্ট্রপতি হিসাবে বরণ করবেন। ইউয়ান মাঞ্চু রাজপরিবারের সঙ্গে এই মর্মে এক বোঝাপড়া করেন যে নতুন সরকারের কাছ থেকে রাজপরিবারের সদস্যরা সুব্যবহার পাবেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারী শিশু সম্রাট পু-ঈর তরফে সিংহাসন ত্যাগের কথা ঘোষণা করা হল। ১৪ ফেব্রুয়ারী সান পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো ইস্তফা দিলেন, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ইউয়ান চীনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন।

সান তাঁর পদত্যাগ পত্রে তিনটি শর্তের উল্লেখ করেছিলেন। প্রথমত, অস্থায়ী সরকার নানকিং-এ গঠিত হবে। দ্বিতীয়ত, নতুন রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা নানকিং-এ এসে কার্যভার গ্রহণ করলে তিনি রাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দেবেন। তৃতীয়ত, নতুন রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী সরকারের সংবিধান মেনে চলবেন। তিনি ইউয়ানকে সামন্ততান্ত্রিক শক্তির ঘাঁটি পিকিং থেকে সরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। সান ভেবেছিলেন যদি ইউয়ানকে নানকিং-এ বিপ্লবী শক্তির হেফাজতে রাখা হয় এবং একটি সংবিদানের বেড়াজালে বন্দী করা হয় তবে ইউয়ান কখনো একনায়কে পরিণত হতে পারবেন না। কিন্তু ইউয়ান ছিলেন আরো ধুরন্ধর। তিনি এমন এক ষড়যন্ত্রের জাল রচনা করেন, যাতে পিকিং-এ সরকারি সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করল বেং ইউয়ান নানকিং-এ সরকার গড়তে অস্বীকার করলেন এই অজুহাতে যে তাহলে পিকিং-এ প্রজাতন্ত্র টিঁকিয়ে রাখা যাবে না। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১০ ই মার্চ ইউয়ান পিকিং-এ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করলেন। ঐ দিনই যে নতুন সংবিদান ঘোষিত হল তাতে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার চালু হল। চীনা নাগরিকরা সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুইভাবে বিভক্ত হল এবং অধিকাংশ চীনা নাগরিক ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হন। প্রজাতন্ত্র স্থাপনের স্বপ্ন মরীচিকাতে মিলিয়ে যেতে দেখেও সান রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন। ৫ এপিল সিনেট অস্থায়ী সরকার পিকিং-এ নিয়ে এল। চীনে সমর নায়কতন্ত্র কায়েম হল। কিন্তু রাত্রির পরেই যেমন ঊষার আগমন ঘটে, তেমনি জঙ্গী শাসনের পরেও নতুনের অভ্যুদয় ঘটার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কারণ, চল্লিশ বছর ব্যাপী জঙ্গী সাসনকালে যে অর্থহীন যুদ্ধ বিগ্রহ চলেছিল তাতে চীনের অন্তর্নিহিত সংহতি বিনষ্ট হয়েছিল, অর্থনীতি ভেঙে পড়েছিল এবং দেশের অধিকাংশ লোক মরিয়া হয়ে উঠেছিল। এমতাবস্থায় চীনে নতুন ভাবাদর্শ প্রবেশ করার ও তা স্থায়ী হবার এক উপযুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল। ঐতিহ্যকে আঁকড়ে না থেকে চীনা জনগণ নতুন ও বিদেশি ধ্যানধারণা গ্রহণ করতে উন্মুখ হয়েছিল।

১০.১.৭ চীনে কম্যুনিস্ট দলের প্রতিষ্ঠা

১৯০৫ সাল নাগাদ চীনে মার্কসবাদ সম্বন্ধে সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। সেই সময় মিন-পাও (The Peoples Tribune) পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় কার্ল মার্কসের জীবনী প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে স্বৈরতান্ত্রিক পত্রিকা তিয়েন-ই-পাও (Journal of Natural Justice) ফ্রিডরিশ এঙ্গেলসের Introduction to the Communist Manifesto-র অনুবাদ প্রকাশিত করে। এঙ্গেলসের Origin of the Family থেকে অংশ

বিশেষের অনুবাদও ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সময় সেন্ট সাইমনের ইউটোপিয়্যান সমাজতন্ত্র, ক্রোপটকিন এবং বাকুনিনের স্বৈরতন্ত্র এবং মার্কসের বিপ্লবী দর্শন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে, বিশেষত ছাত্রসমাজকে প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত করে।

আগেই বলা হয়েছে চীনে কম্যুনিস্ট প্রবাব বিস্তারে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের ভূমিকা ছিল প্রত্যক্ষ। লেনিন মনে করতেন যে বিভিন্ন এশীয় উপনিবেশ শোষণ করার সুবিদা তাকার ফলেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রচন্ড ধ্বংসকান্ডের পরেও পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের পতন ঘটেনি। সুতরাং, ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য এশীয় উপনিবেশগুলিতে ইতিমধ্যেই বিদেশি প্রভুদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তা আরো শক্তিশালী করার জন্য কম্যুনিস্টদের চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের পতন ত্বরান্বিত হবে লেনিনের মতে কম্যুনিস্টরা দুটি উপায়ে এই উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে। প্রথমত এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া সম্প্রদায়, কম্যুনিস্টদের উচিত হবে ঐ সম্প্রদায়ের সঙ্গে একযোগে কাজ করা। প্রয়োজন হলে ঐ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাময়িক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয়ত, ঐ একই সময়ে কম্যুনিস্টদের উচিত হবে কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের স্বতন্ত্র শক্তি গড়ে তোলা, যাতে উপযুক্ত মুহূর্তে শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের হাত থেকে শক্তি দখল করা যায়। ১৯২০ সালে দ্বিতীয় কমির্ন্টান কংগ্রেসের পর চীনসহ বিভিন্ন এশীয় দেশে লেনিনের এই দ্বিমুখী কর্মপন্থার প্রয়োগ শুরু হয়।

অপর পক্ষে, চীনা বুদ্ধিজীবীরা বলশেভিক বিপ্লবের তাত্ত্বিক ভিত্তি মার্কসীয় ভাবধারার আলোকে চীনের সাম্প্রতিক দুর্দশার একটি যুক্তিসংগত ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছিলেন। মার্কস ও লেনিনের চিন্তাধারায় চীনকে দুর্দশা থেকে মুক্ত করার জন্য তাঁরা পথও খুঁজে পেলেন। এই সময় থেকেই পিকিং ও সাংহাইতে মার্কস-লেনিন ভাবধারায় গঠিত কিছু পাঠ চক্র গড়ে উঠল। পিকিং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিতে চরম মতবাদ প্রকাশের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হল। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক লি-তা-চাও মুক্তকণ্ঠে তাঁর মার্কসবাদে দীক্ষার কথা প্রকাশ করে সিন-চাও-শি New Tide Society নামক একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। স্বল্পকালের মধ্যে স্থাপিত হয় মার্কসীয় গবেষণা কেন্দ্র। 'New Youth' পত্রিকার ১৯১৮ সালের নভেম্বর সংখ্যায় লি একটি রচনায় বলশেভিক বিপ্লবের বিজয়কীর্তন করেন, ১৯১৯ সালের একটি সংখ্যায় কেবলমাত্র মার্কসবাদ সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হয়। রসিকতা করে লি-র গ্রন্থাগারের কার্যালয়কে বলা হত 'Red Chamber', যেখানে তাঁর যুবক ও উৎসাহী অনুচরবৃন্দ মিলিত হতেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন চু-চিউ-পাই, চ্যাং-কুয়ো-তাও এবং মাও-সে-তুং, যিনি ছিলেন লি-র সহকর্মী।

তৎকালীন সংগ্রামী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন চেন-তু-সিউ। তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য তিনি ১১ জুন ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কারারুদ্ধ হন। উক্ত বৎসরের সেপ্টেম্বরে তাঁর মুক্তির পর তিনি পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করেন এবং সাংহাই-এ নতুন কর্মকেন্দ্র স্থাপন করে গভীরভাবে মার্কসবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি পশ্চিমী রাজনৈতিক আদর্শে সম্পূর্ণভাবে আস্থাহীন হন। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে পশ্চিমী গণতন্ত্র হচ্ছে বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের হাতে রাজনৈতিক অস্ত্র যা জনসাধারণকে প্রতারণা করে ক্ষমতা দখলে সহায়তা করে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে তিনি মার্কসীয় পাঠচক্র (Marxist Study Circle) গঠন করেন এবং আগস্টে প্রতিষ্ঠা করেন সমাজতান্ত্রিক যুব সেনাদল (Socialist Youth Corps)। এই দুটি সংগঠন চীনা সাম্যবাদী দলের অগ্রদূত হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে।

সাংহাইতে যেমন চেন-তু-সিউ, পিকিং-এ তেমনি লি তা চাও মার্কসীয় মতবাদ প্রচার ও জনপ্রিয়তা সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে লি-র মার্কসীয় গবেষণা কেন্দ্রের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয়

সমাজতন্ত্র পাঠ সমিতি (Society for the Socialism)। 1920 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে পিকিং-এর সমস্ত মার্কসীয় চক্র মিলিতভাবে পরিচিত হয় মার্কসীয় মতবাদ অনুশীলন সূচক পিকিং সমিতি (Peking Society for the Study of Marxist Theory)। এইভাবে একটি বিশেষ নামে বিভিন্ন মার্কসীয় চক্র বা সমিতির পরিচিতি একটি মার্কসীয় বা সাম্যবাদী দলের অভ্যুত্থানের পূর্বাভাস বলে মনে করা যেতে পারে। এ. এ. মূলের (A.A. Muller) এবং এন. বর্টম্যান (N. Bortman) নামে দুজন রুশ নেতা লিকে এরূপ দল গঠনে সাহায্য করেন। কিন্তু গ্রিগোরাই ভয়টিন্‌স্‌কি (Gregorii Voitinsky) নামে রুশ কমিন্টানের এক প্রতিনিধি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে চীনে আসার আগে পর্যন্ত সাম্যবাদী দল গঠন সম্পর্কে কোনো বাস্তব ভিত্তিক ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। ঐ বছরের মার্চে ভয়টিস্‌কি দল গঠন সম্পর্কে লি এবং চেনের সঙ্গে আলোচনা করেন। আলোচনান্তে স্থির হয় যে এঁদের দুজনের নেতৃত্বে একটি চীনা সাম্যবাদী দল গঠিত হবে। যার একটি শাখা থাকবে সাংহাই-এ, চেনের নেতৃত্বে, অপর একটি শাখা থাকবে লি-র নেতৃত্বে পিকিং-এ। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সাংহাই-এ ফরাসি এলাকায় অবস্থিত একটি বালিকা বিদ্যালয়ে (power Middle School for Girls) আহূত একটি সভায় গোপনে চীনা সাম্যবাদী দল প্রতিষ্ঠিত হয়। মাও সে তুং সমেত বারো জন প্রতিনিধি এই সভায় যোগদান করেন। লি এবং চেন সভায় উপস্থিত না থাকলেও চীনা সাম্যবাদী দলের যৌথ স্থাপয়িতা হিসাবে অভিনন্দিত হলেন। দলের প্রধান কর্মকেন্দ্র হল সাংহাই, কিন্তু পিকিং-এ লির শাখা কার্যত স্বাধীনভাবে দলীয় কার্য পরিচালনা করতে থাকে।

শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের বিপ্লবী ভূমিকা সম্পর্কে চেন এবং লি-র মধ্যে মত পার্থক্য ঘটেছিল। চেন শ্রমিকদের ভূমিকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণিকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত কারণ তাঁরা শহরের সংস্পর্শে আসার ফলে বেশি প্রগতিশীল ও সঙ্ঘবদ্ধ, অথচ কৃষক সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন ও রক্ষণশীল। কিন্তু লি-র মতে যে দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী, সে দেশের অর্থনীতিতে কৃষকদের স্থান অবশ্যই শীর্ষে থাকা উচিত, বিপ্লবে তাদের অবহেলা করা চলতে পারে না। লি তাঁর অনুচরবর্গকে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত করতে বললেন। তিনি বলতেন চীনে কৃষকদের বন্ধন মুক্তি হচ্ছে চীনদেশের বন্ধনমুক্তি। তখনকার মতো চেন-এর মত অধিকাংশ সাম্যবাদীর সমর্থন পেলো কিন্তু লি-র সহকারী ও ভাবীকালের চীন বিপ্লবের নেতা মাও-সে-তুং লি-র আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেন।

১০.১.৮ চীনে সমর-নায়কদের শাসনকাল ও তার প্রতিক্রিয়া

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে সমরনায়ক ইউয়ান শি-কাই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু সমরকুশল নায়ক হিসাবে একনায়কতন্ত্রের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল এবং তিনি রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হলেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলিতে তিনি সামরিক অফিসারদের নিযুক্ত করেছিলেন। প্রদেশসমূহের শাসনভার তাঁরই বশংবদ সামরিক নেতাদের উপর তিনি দিয়েছিলেন। এইভাবে তিনি দেশে সামরিক শাসন প্রচলিত করেছিলেন। কেন্দ্রে অর্থাৎ পিকিং-এ ইউয়ানের শাসন প্রচলিত হল আর প্রদেশগুলিতে থাকল প্রাদেশিক সমরনায়কদের অধীনে। ১৯১৬ সালে ইউয়ান-শি-কাই -এর মৃত্যুর ফলে এই প্রাদেশিক শাসনকর্তারাই দেশে সামরিক শাসন প্রর্বতন করেন।

সমর নেতাদের ক্ষমতার উৎস ছিল সেনাবাহিনী। এই সেনাবাহিনী পাশ্চাত্য ধাঁচে গঠিত হওয়ার জন্য দুর্বল কেন্দ্রীয় শাসন তা প্রতিরোধ করতে পারেনি। কিন্তু সমরনায়কদের পশ্চাতে কোনো রাজনৈতিক দল ছিল

না বলে তাঁরা সুস্থ এবং সুসংগঠিত প্রশাসন প্রবর্তনে অপরাগ হয়েছিলেন, ফলে তাঁদের শাসনকালে প্রশাসনিক অবনতি ঘটেছিল, জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সমাজ জীবন দুর্নীতিপরায়ণ হয়েছিল। ইউয়ান-শি-কাইয়ের মৃত্যুর পর সমরনায়করা ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এবং ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যুক্তি বা বিচারবুদ্ধি অগ্রাহ্য পরে পরস্পরের সঙ্গো বিদ্বেষমূলক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলেন। এর ফলে চীনে সৃষ্টি হল এক ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব—সামরিক শাসকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংসদের অভ্যন্তরে রাজনীতিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সামরিক শাসক ও রাজনীতিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই ত্রিপক্ষীয় দ্বন্দ্বে একদিকে যেমন দেশের সংসদীয় প্রশাসন দুর্বল হয়, অপরদিকে তেমনি রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা বিঘ্নিত হয়। শক্তিশালী কর্ণধারের অভাবে কেন্দ্রবিমুখ শক্তিগুলি স্বার্থোদ্ধত কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। সমরনায়কেরা ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এবং ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যুক্তি বা বিচারবুদ্ধি অগ্রাহ্য করে পরস্পরের সঙ্গো বিদ্বেষমূলক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। ফলে দেশের আইনশৃঙ্খলা ক্ষতিগ্রস্ত হল।

জনসাধারণ অশেষ দুঃখ দুর্গতির শিকার হল। লুণ্ঠন এবং অতিরিক্ত কর আদায় জনগণকে উৎপীড়িত করল। মুদ্রার মূল্যহ্রাস, ব্যবসায়ে মন্দা, জনকল্যাণমূলক রেলপথ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পূর্তকার্যে অবনতি এইসব কারণে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিঘ্নিত হল। চিন সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে যে আফিম সেবন বন্ধ হয়েছিল সামরিক শাসকরা তা পুনরুজ্জীবিত করলেন। আফিং গাছ-চাষের উপযোগী জমির উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করে তাঁরা সুকৌশলে কৃষকগণকে ঐসব জমিতে আফিং উৎপাদন করতে বাধ্য করতেন।

কিন্তু সামরিক শাসনকালের কিছু সদর্থক প্রতিক্রিয়াও উল্লেখযোগ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চীনে পাশ্চাত্য দেশ থেকে আমদানি কমে গেল। ফলে শহরাঞ্চলে দেশীয় শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পেল। ব্যবসা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রেও পশ্চিমী প্রতিযোগিতার চাপ কমে গেল, তাই চীনের অভ্যন্তরে চীন ও জাপানি ব্যবসায়ীরা সুযোগ পেতে লাগল। বিদেশি ব্যবসায়ীদের সহেগ জড়িত 'কমপ্রাডোর' নামে চীনা প্রতিনিধিগণের অভ্যুদয় ঘটল। চীনা মূলধন নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে যেমন আধুনিক ব্যাঙ্ক প্রবর্তিত হল তেমনি ঐ সব ব্যাঙ্ক ঋণদানের ব্যবস্থা চালু করল। পাশাপাশি প্রাচীন ঋণদানের ব্যবস্থাও রইল। সাঁহাই, টিয়েন্টসিন, হ্যানকাও প্রভৃতি শহরে স্বল্প মজুরীর বিনিময়ে কলকারখানায় শ্রমিকদের প্রয়োজন দেখা দিল, গ্রাম থেকে শ্রমিকরা দলে দলে শহরে এসে সে প্রয়োজন মেটাতে লাগল। এভাবে একদিকে শহরভিত্তিক জীবনযাপন সমাজের রূপ বদল করল অন্যদিকে পারিবারিক জীবনযাত্রার বন্ধন শিথিল হল। পরিবারের সভ্যরা নিজেরা উপার্জনশীল হয়ে পরিবার প্রধানের আওতা মুক্ত হলেন। তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটল ও মানসিক স্বাতন্ত্র্যবোধ জেগে উঠল। কারখানা শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়তে থাকল। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সর্বহারা শ্রমিকদের সংখ্যা দেড় মিলিয়নের কম ছিল না। দেশে বিদ্যালয় সংখ্যা ও অনিবার্যভাবে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেল। গ্রামের জমিদাররা গ্রাম ত্যাগ করে শহরবাসী হলেন। গ্রামীণ সমস্যা সমাধানে আর তাঁদের সহায়তা পাওয়া গেল না। ফলে কৃষক সম্প্রদায় এখন গ্রামীণ সমাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে লাগল। বণিক, কমপ্রাডোর, আধুনিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন ছাত্র, কলকারখানার শ্রমিক-এরা সকলে প্রাচীন সমাজের রূপ বদলে দিল।

১০.১.৯ চৌঠা মে'র আন্দোলন ও তার অবদান

প্রাচীন সমাজের ভাঙ্গন রোধ করতে এগিয়ে এসেছিল নব ছাত্র সম্প্রদায়। এদের প্রায় দুই পঞ্চমাংশ শিক্ষালাভ করেছিল জাপানে, বাকি অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। চীন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করার পুরস্কার স্বরূপ

বক্সার প্রটোকল অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের দেয় ক্ষতিপূরণের অর্থের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ মকুব করে দিল। এই অর্থে পিকিং-এ সিং হুয়া কলেজ (Tsing-Hua Cllege) প্রতিষ্ঠিত হল। এই কলেজ থেকে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা উচ্চশিক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেতো। ১৯২৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের দেয় বাকি ক্ষতিপূরণও মকুব করে দিল। সেই অর্থমূল্যে প্রতিষ্ঠিত হল China Foundation for the Promotion of Education and Culture। তবে, আমেরিকার থেকে ফ্রান্সের প্রভাব চীনের ছাত্রদের ওপর বেশি পড়েছিল। যুদ্ধকালীন ইউরোপের শ্রমিক ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে চীন থেকে ১,৪০,০০০ চুক্তিবদ্ধ চীনা শ্রমিক পাঠানো হয়েছিল। এই সময় ফ্রান্সে Y. M. C. A-র সভ্য জেম্‌স্ ইয়েন (James Yen)-এর মতো ছাত্রকর্মীরা গণশিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আবার, ফ্রান্সে যে চীনা ছাত্ররা অধ্যয়নরত ছিল তা শ্রম ও অধ্যয়ন আন্দোলন গড়ে তুললো। এভাবে শ্রম ও পাণ্ডিত্যের অন্তরায় দূর হল। স্বদেশ প্রেমিক ছাত্ররা দেশের দুর্নীতি ও দুর্দশা দূর করার জন্য বিপ্লবের পথ ধরতে বদ্ধপরিকর হল। চীনে সমাজতন্ত্র ধীর গতিতে অগ্রসর হতে লাগল। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল রাশিয়াতে জারশাসনের উচ্ছেদ ঘটাল এবং সমাজতন্ত্রী সরকার গঠন করল। এতে পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি আতঙ্কিত হল। এর ফলে যে ভার্সাই চুক্তি দ্বারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছিল, তাতে চীনের কোন দাবি গৃহীত হল না তো বটেই বরঞ্চ শান্টুং অঞ্চলে জাপানের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তাকে চীনে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া হল। এইভাবে চীনে চৌঠা মে আন্দোলনের পটভূমি রচিত হয়েছিল।

শান্টুং সংক্রান্ত ভার্সাই চুক্তির শর্ত প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই ছাত্ররা জাপান বিরোধী বিক্ষোভ শুরু করে দিয়েছিল। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল বলে এটি চৌঠা মে আন্দোলন নামে পরিচিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে চীনে ক্ষমতাসীন ছিল জাপানি মদতপুষ্ট আনহোয়েই গোষ্ঠী, যাদের নেতা চিলেন তুয়ান-চি-জুই। এই গোষ্ঠী জাপান থেকে ২০০ মিলিয়ন ইয়েন ঋণ গ্রহণ করে চীনকে এক মারাত্মক ঋণের চক্রে জড়িয়ে ফেলেছিল। কাজেই ছাত্রসমাজের ক্রোধ আছড়ে পড়ল জাপান বিরোধী বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে। তিনজন জাপানপন্থী মন্ত্রী আক্রান্ত হলে বিক্ষোভকারীরা দমন নীতির শিকার হলেন। এর ফলে এক বৃহত্তর আন্দোলনের জন্ম হল। চীনা ছাত্ররা পিকিং ছাত্র সংগঠন (Peking Students Union) গঠন করল আন্দোলন সুসংগঠিত করে তা সমগ্র চীনে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। চীনা সংবাদপত্রগুলি, শিক্ষক, আইনজীবী, শ্রমিক প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই আন্দোলনকে স্বাগত জানাল। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে ছাত্রবিক্ষোভ সমগ্র চীনে ছড়িয়ে পড়ল। চীনের প্রধান শহরগুলিতে ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠল, ছাত্ররা জাপানি পণ্য বয়কট করার ডাক দিল। ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়াল শ্রমিকরা। সাংহাই অঞ্চলের শিল্প শ্রমিক, ব্রিটিশ মালিকানাধীন কাইলান খনি শ্রমিক এবং পিকিং হ্যানকাও রেল শ্রমিকরা ছাত্র ধর্মঘটের সমর্থনে শ্রমিক ধর্মঘট পালন করলেন। দক্ষিণ চীনের বিভিন্ন শহরে ব্যবসায়ী ও শ্রমিকরা বিদ্রোহী ছাত্রদের সমর্থনে একসাথে অনেকগুলি বিক্ষোভ মিছিল ও ধর্মঘটের সামিল হয়েছিলেন। নানা স্তরের মানুষের থেকে উঠে আসা এই প্রতিবাদ বিক্ষোভকে সামাল দেবার ক্ষমতা তদানীন্তন চীন সরকারের ছিল না। তাই গ্রেপ্তার হওয়া ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা নিঃশর্তে মুক্তি পেলেন। জাপানপন্থী তিনজন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করা হল। সর্বোপরি, চীন সরকার ভার্সাই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করল।

চৌঠা মে'র আন্দোলনকারীরা একই সঙ্গে দ্বিমুখী সংগ্রাম চালিয়েছিল। একদিকে তারা বৃহৎ শক্তিগুলির চীনের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী ও অসম চুক্তি ব্যবস্থা চালিয়ে যাবার নীতির বিরোধিতা করেছিল, অন্যদিকে দেশের

রক্ষণশীল অংশের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের সাথে হাত মেলানো বন্ধ করতে চেয়েছিল। এই যোগসূত্র প্রায় 20 বছর পরে মাও সে-তুঙ-কে এবং চীন বিপ্লবকে একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী বলে চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছিল। মাও-সে-তুঙের 'নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব' (New Democratic Revolution)-এর তাত্ত্বিক ভিত্তি এভাবে রচিত হয়েছিল। স্বতঃস্ফূর্ত এই আন্দোলনে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, ছাত্র সংগঠন, বণিক সংগঠন এবং শ্রমিক সংগঠনগুলি ও বিভিন্ন বামপন্থী পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত বুদ্ধিজীবীরা এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল।

চীনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামকে স্বাগত জানিয়েছিলেন চীনের বুর্জোয়া শ্রেণি কারণ তাঁরা নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। জাপানি পণ্য বয়কট করার কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে চীনা শিল্পপতিরা জাপানি পণ্যের বিরুদ্ধে দেশীয় বাজার দখল করতে পেরেছিলেন। তাঁরা দেশজ পণ্য (Patriotic Goods) কেনার জন্য প্রচার চালিয়েছিলেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে ছোটো উদ্যোক্তাদের চাঁদার টাকায় ছোটো ছোটো কারখানা গড়ে উঠে। এই সমবায় ভিত্তিক পুঁজিবাদের (Co-operative capitalism) উত্থান চৌঠা মে আন্দোলনের অর্থনৈতিক আদর্শ প্রতিফলিত করেছিল। এর ফলে বেশ কিছু দেশলাই ও কাগজের কারখানা গড়ে উঠেছিল। শ্রমিক শ্রেণি কেবলমাত্র দেশপ্রেমিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, তবে কৃষক শ্রেণি ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত কারণ চীনের গ্রামীণ সমাজ শহরভিত্তিক এই আন্দোলন থেকে ছিল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তবে চৌঠা মের আন্দোলন থেকেই শ্রমিকরা তাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেছিল।

১৯১৯ সালে ২৮ জুন যখন চীনের প্রতিনিধিদ্বয় ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষর করতে বিরত হলেন তখন চৌঠা মে আন্দোলন পরিসমাপ্ত হয়েছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু তা চীনে এক সংস্কৃতিমূলক বিপ্লবী আন্দোলনে প্রেরণা দিয়েছিল। মাতৃভাষায় প্রকাশিত কয়েকশো সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্র দেশে নতুন চিন্তাধারা বিস্তার করেছিল। নতুন নতুন পুস্তক প্রকাশন এবং পাশ্চাত্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির মাতৃভাষায় অনুবাদ চীনা সমাজে নতুন চিন্তার পুষ্টি সাধন করে। পিকিং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের (Peita-পেইত) যুবক অধ্যাপকবৃন্দ ও তাঁদের ছাত্রগণ এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কৃতিমূলক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিভিন্ন সমিতি গঠিত হয়েছিল। এই নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলন পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য ঐতিহ্য লালিত পুরাতনপন্থী ধ্যান-ধারণা ও সামাজিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। প্রাচীন পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা যেমন সমালোচিত হয়েছিল, তেমনি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতনতা এসেছিল। চীনে এক বৌদ্ধিক এবং রাজনৈতিক বিশ্বজনীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। এই সময় জন ডিউই, বারট্রান্ড রাসেলের মতো পাশ্চাত্য মনীষীরা চীনে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন, দোভাষীর সাহায্যে তাঁদের বক্তৃতা চীনে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এইভাবে ডিউইর বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী, রাসেলের মুক্তপন্থী সমাজতন্ত্রবাদ, রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্যের ভাবাদর্শ, ক্রপটণকিনের নৈরাজ্যবাদ, রোমা রোল্যাঁ ও কালজয়ী রুশ সাহিত্যিক টলস্টয়ের মানবিকতা ও মানবতাবাদ মার্কস ও এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ—এ সব কিছু চীনা ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের আকৃষ্ট করেছিল।

এইভাবে চীনের বুদ্ধিজীবীরা নানা ধরনের দার্শনিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। হু-শি ছিলেন মার্কিন প্রয়োগবাদে বিশ্বাসী, তিনি ক্রমবিকাশের মাধ্যমে চীনের উন্নয়নের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। অপরপক্ষে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লি তা চাও এবং বিপ্লবী সাংবাদিক চেন

তু-সিউ মনে করেছিলেন যে সোভিয়েত দেশের অনুকরণে চীনের সমাজ ও রাষ্ট্রের অচিরাৎ আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। একদল বুদ্ধিজীবী মনে করেছিলেন চীনকে পাশ্চাত্য দেশগুলির অনুকরণের শিল্পে উন্নত হতে হবে। লিয়াং চি ও লিয়াং সু মিং বিশ্বাস করতেন যে চীনের উন্নতি কাম্য চীনা জাতির ঐতিহ্যমণ্ডিত আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করে নয়। আবার মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী লি তা-চাও গ্রামের উন্নতিসাধনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। চীনা ধ্রুপদী ঐতিহ্যে সমষ্টিগত জমি চাষ (জিংতিয়ান) সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তার সাথে মার্কসবাদী সাহিত্যে বর্ণিত "আদিম সাম্যবাদ' সংক্রান্ত ধারার সাদৃশ্য পেয়েছিলেন লি তা-চাও। অনেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যান্ডের ধাঁচে চীনে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-কাঠামো গড়ে তোলার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। তবে যে দুটি মতের বৈপরীত্য চীনের পরবর্তী ইতিহাসের ধারাকে প্রভাবিত করেছিল তার একটি হল হু-শি প্রচারিত প্রয়োগবাদী ও বিবর্তনবাদী পথ যা পরবর্তীকালে চীনের জাতীয়তাবাদী দল কুয়োমিনতাং সমর্থন করেছিল। অপর দিকে চরমপন্থী বুদ্ধিজীবীরা মার্কসবাদের অনুপ্রেরণায় সোভিয়েত বিপ্লবের ধাঁচে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে পরবর্তী চীনের ইতিহাসে এই দুই মতাদর্শের লড়াই প্রধান স্থান অধিকার করেছিল।

১০.১.১০ সান-ইয়াৎ-সেনের কার্যকলাপের শেষ পর্যায়

ইউয়ান-শি কাই-এর মৃত্যুর পর সান-ইয়াৎ-সেন জাপান থেকে চীনে ফিরে আসেন। তিনি চীনের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে চীনের কেবল সেই যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করা উচিত যা চীনকে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করবে। প্রতিবাদস্বরূপ তিনি ক্যান্টনে একটি সরকার গঠন করেন এবং সেটিকে চীনের একমাত্র বৈধ ও স্বাধীন সরকার বলে দাবি করেন। কিন্তু তাঁর এই প্রয়াসের পিছনে যথেষ্ট পরিমাণে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি ছিল না। ফলে ক্যান্টন সরকার দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তবুও প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান রক্ষা করতে এবং তাঁর জাতীয়তাবাদী দল বা কুয়োমিনতাং দলকে শক্তিশালী করতে আত্মনিয়োগ করলেন।

কিন্তু নিজ দল কুয়োমিনতাং-এর মধ্যে একতা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব সানকে পীড়া দিত। তাই তিনি কুয়োমিনতাং দলকে (K.M.T.) পুনর্গঠন করতে সচেষ্ট হলেন। এজন্য সান সোভিয়েত সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ১৯২৩ সালের পুনরুজ্জীবিত করতে। কুয়োমিনতাং বা K.M.T. দল সুশৃঙ্খল সভ্যদের দ্বারা গঠিত এক অত্যন্ত সুসংগঠিত দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল এবং সান-এর প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্যের বদলে একটি সাধারণ কর্মসূচি গৃহীত হল। রাশিয়ার কম্যুনিস্ট দলের অনুকরণে দলের পুনর্গঠন করা হল। যে সকল সভ্য রুশ মডেল অনুকরণে সম্মত হল না তাদের বহিষ্কার করা হল। সভ্যের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে চীনা কম্যুনিস্ট দলের (Chinese Communist Party) সদস্যদের K.M.T.-র সদস্যপদ দেওয়া হতে লাগল। C.C.P. প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েত রাশিয়া সান-ইয়াৎ-সেনকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কারণ নবজাত C.C.P.-র প্রভাব ছিল অত্যন্ত সীমিত, কমিন্টার্ন থেকে চীনা কম্যুনিস্টদের নির্দেশ দেওয়া হল K.M.T-র জনপ্রিয়তার সুযোগে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য K.M.T.-র সঙ্গে সহযোগিতা করতে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কমিন্টার্নের এই নির্দেশ লি তা চাও এবং চেন তু শিউ মেনে নিয়েছিলেন।

আবার সান যে C.C.P.-র সদস্যদের গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন তার কারণ হল যে তিনি ভাবতেন তাঁর

জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের দলমত নির্বিশেষে সকল চীনার অংশ গ্রহণ করা উচিত। কৃষক ও শ্রমিক দলের সঙ্গে C.C.P.-র যোগাযোগকে তিনি কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল যে সোভিয়েত সহায়তায় C.C.P.-র শ্রেণি সংগ্রামের নীতি তাঁর জাতীয়তাবাদী পরিকল্পনার গুরুতর প্রতিবন্ধক হয়ে পড়বে। তাই তিনি K.M.T. দলের সঙ্গে C.C.P.-কে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, K.M.T. ও C.C.P.-র সহযোগিতার ভিত্তি ছিল পারস্পরিক সুবিধা। তাই তা কখনো আন্তরিকতার অভাবে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। তাই অনিবার্যভাবে উভয় দলের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল, তবে তা হয়েছিল সান-এর মৃত্যুর পরে।

দলের পুনর্গঠনের জন্য সোভিয়েট সাহায্যের ওপর নির্ভর করলেও দলের আদর্শ বা মতবাদের জন্য তিনি নিজের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার ওপর নির্ভর করেছিলেন। তিনি লেনিনের এই তত্ত্ব মানতে পারেননি যে ধনতন্ত্র অনিবার্যভাবে সাম্রাজ্যবাদের দিকে নিয়ে যায়। তিনি শোষণকারী দেশের বিরুদ্ধে শোষিত দেশের সংগ্রাম সমর্থন করেছিলেন কিন্তু ঐ সংগ্রামের সঙ্গে প্রতিটি দেশের শ্রেণিসংগ্রামকে তিনি জুড়ে দিতে চাননি। K.M.T.-র আদর্শকে তিনি রূপ দিয়েছিলেন “জনগণের তিন নীতি”তে। এই তিনটি নীতি বলতে বোঝাত জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও জনগণের জীবিকা—তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত নীতিগুলির চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেছিল। জাতীয়তাবাদ অর্থ ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। গণতন্ত্র বলতে বোঝাত জনগণের হাতে মূল শক্তি থাকার কথা, পশ্চিমী ধাঁচের সংসদীয় গণতন্ত্র নয়। জনগণের জীবিকা ছিল সমাজতন্ত্রবাদের সমার্থক। এই নীতিগুলির প্রকৃতিগত পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে K.M.T. দলের কর্মসূচির ক্ষেত্রে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন সমর্থনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। K.M.T. দলের কর্মসূচির ক্ষেত্রে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন সমর্থনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। K.M.T. দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে লি তা চাও সহ তিনজন কম্যুনিস্ট সদস্য ছিলেন। তাছাড়া মাও সে তুঙ সহ আরও ছয়জন কম্যুনিস্টকে কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য হিসাবে রাখা হয়। সাম্রাজ্যবাদ ও সমরনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে দ্বিমুখী সংগ্রাম চালাবার উদ্দেশ্যে কম্যুনিস্ট-কুয়োমিনতাং বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠেছিল।

আরো যে একটি কারণে K.M.T.-ও C.C.P. কাছাকাছি এসেছিল তা হল তৎকালীন চীনের শ্রমিক আন্দোলনের গতিশীলতা। C.C.P. প্রতিষ্ঠার মাত্র একবছরের মধ্যেই বেশকিছু শিল্পে শ্রমিক আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হংকং অঞ্চলের প্রায় ৬০,০০০ নাবিক এবং বন্দরশ্রমিক আট সপ্তাহব্যাপী একটি ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন। দক্ষিণ চীনের ক্যান্টন থেকে আরম্ভ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত অঞ্চলের রেল শ্রমিকরা এই ধর্মঘট তহবিলে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। এই হরতাল সফল হয়েছিল। ধর্মঘটী শ্রমিকদের মজুরি ১৫ শতাংশ থেকে ৩০শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তাদের সংগঠন আইনগত স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ১৯২২ সালের আগস্ট মাসে পিকিং-এর নিকটবর্তী “চ্যাংঘ-সিনটিয়েন লোকোমোটিভ এ্যান্ড কার রিপেয়ার ফ্যাক্টরি”র শ্রমিকরা কম্যুনিস্টদের নেতৃত্বে আন্দোলন করে আট ঘন্টা কাজের দিন, সবেতন ছুটি, মজুরি বৃদ্ধি এবং অন্যান্য অধিকার আদায় করে নিয়েছিলেন। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য অঞ্চলের রেল শ্রমিকেরা সংগঠতি হতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁরা একটি সাধারণ সভা আহ্বান করে ইউনিয়ন গঠন করার কথা ঘোষণা করলে সমরনায়ক উপেই-ফুর সৈন্যবাহিনী ইউনিয়ন অফিস ভেঙে চুরমার করে দিল। এর প্রতিবাদে রেল শ্রমিকরা একটি সাধারণ ধর্মঘট পালন করে সফল হলেন। ক্রুদ্ধ উপেই ফু-র সৈন্যরা নিরস্ত্র শ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়ে চারজন শ্রমিককে হত্যা করল এবং অসংখ্য শ্রমিক আহত করল। এই ঘটনার প্রতিবাদে আবার শ্রমিক ধর্মঘট হল। কিন্তু ৭ ফেব্রুয়ারি ঘটনার তাৎপর্য অন্যত্র। এই ঘটনা

চীনের মানুষের কাছে শ্রমিক শ্রেণি ও কম্যুনিস্টদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল। সান শ্রমিকদের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। ফলে শ্রমিক শ্রেণি, কম্যুনিস্ট দল ও কুয়োমিনতাং দল কাছাকাছি এল। সর্বোপরি, শ্রমিকরা বুঝেছিলেন যে চীনের কৃষকদের বাদ দিয়ে একটি যথার্থ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রাম চালানো সম্ভব নয়। সমরনায়কদের অত্যাচার চীনের কৃষিজীবী মনুষ্যকে অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে নিমজ্জিত করেছিল। তার ওপর কৃষিজ পণ্যের মূল্য মারাত্মক হারে হ্রাস পাবার ফলে কৃষকদের অবস্থা আরো দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থার প্রতিবাদে উত্তর চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক-বিদ্রোহ হয়েছিল। এই সময় থেকেই কম্যুনিস্টরা কৃষকদের সমর্থন লাভ করার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। দক্ষিণ চীনে জনৈক কম্যুনিস্ট সদস্য পৌং-পেই-এর নেতৃত্বে প্রায় দুই লক্ষ সদস্যবিশিষ্ট একটি কৃষক সংগঠন গঠিত হল।

K.M.T. পুনর্গঠনের পর সান উত্তর চীনে তাঁর বহু বিলম্বিত অভিযান পাঠানোর সুযোগ পেলেন। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল সমরশাসনের উচ্ছেদ সাধন করা এবং সমর-শাসন সমর্থকদের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করা। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে উত্তর চীনের সমরনায়কদের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ বাঁধে তার সুযোগে সান উত্তর চীনে অভিযান পাঠাতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু সমরনায়ক ফেং ইউ সিয়াং এই গৃহযুদ্ধ দমন করে পিকিং অধিকার করলেন। জাতীয় সংযুক্তিকরণের উদ্দেশ্যে ফেং একটি সভা আহ্বান করে সানকে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু এই সভাতেই আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে ১৯২৫ সালের ১২ মার্চ সান মারা যান।

১০.১.১১ কুয়োমিনতাং-কম্যুনিস্ট ক্রমবর্ধমান বিবাদ ও বিচ্ছেদ

সানের মৃত্যুর পর তাঁর রাজনৈতিক দায়িত্ব বিভক্ত হয়ে K.M.T.-র দুজন নেতার ওপর বর্তায়—দক্ষিণপন্থী ওয়াং-চিং য-উই এবং বামপন্থী হু হ্যান মিন। সামরিক দায়িত্ব পুরোপুরি অর্পিত হল চিয়াং-কাই-শেকের ওপর। ইতিমধ্যে 1925 সালের জানুয়ারি মাসে সাংহাইতে C.P.C.-র চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে সারা দেশে কম্যুনিস্ট পার্টির সংগঠনকে শক্তিশালী করে জঙ্গী শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি সাংহাই-এর বিভিন্ন মালিকানাধীন বস্ত্র-শিল্প শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করার প্রতিবাদে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হল। ১৫ মে এই বরখাস্তের প্ররিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক-মালিক যৌথ আলোচনা চলাকালীন জাপানিরা কু চৌং-হুং একজন কম্যুনিস্ট প্রতিনিধিকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ৩০ মে প্রায় দুহাজার শ্রমিক এবং ছাত্র সাংহাইতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিদেশিদের পুলিশবাহিনী প্রচুর সংখ্যক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করল। এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সাংহাইতে ১০০০০ ছাত্র শ্রমিকের বিক্ষোভ মিছিলে ব্রিটিশ পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালাল। ৩০ মে'র এই হত্যাকাণ্ডের ফলস্বরূপ সাংহাই ফেডারেশন অফ্ ট্রেড ইউনিয়নস্ গঠিত হল। প্রায় দু-লক্ষ শ্রমিক এই সংগঠনের সদস্য হল। ১ জুন থেকে সাংহাইতে বিভিন্ন শিল্প-শ্রমিক, ছাত্র, ছোটো ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট শুরু হল। সাংহাই এর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে পিকিং, নানকিং, চাংসা, হ্যাংকাও প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রতিবাদ সংগঠিত হতে থাকে। গ্রামাঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিতে থাকে।

১৯২৫ সালের ২৩ জুন ক্যান্টনে একটি প্রতিবাদ মিছিলের ওপর গুলি চালিয়ে ৫২ জন শ্রমিককে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ক্যান্টন শ্রমিকদের প্ররোচনায় হংকংও প্রতিবাদে সামিল হল। ক্যান্টনের জাতীয়তাবাদী সরকার ব্রিটিশ হংকং-এর সাথে যাবতীয় বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ১৯২৫ সালের জুন মাস থেকে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী এই শ্রমিক আন্দোলন কুয়োমিনতাং দলের বামপন্থী

গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। ১৯২৬ সালের মে মাসে ক্যান্টনে যে তৃতীয় জাতীয় শ্রমিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিলতাতে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে কম্যুনিস্ট প্রভাব বৃদ্ধি পেতে দেখা গেল। ঐ কংগ্রেসে বলা হল যে শ্রমিকরা যে অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

এদিকে কুয়োমিনতাং দলের দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী,যার সমর্থক ছিলেন কুয়োমিনতাং সামরিক নেতা চিয়াং কাই শেক, কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ এবং কম্যুনিস্ট গোষ্ঠীর গুরুত্ব বৃদ্ধিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল। এদিকে ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে মাও সে তুং Analyais of the Classes in Chinese Society নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন চীনা বিপ্লবের ক্ষেত্রে সব থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে শ্রমিক শ্রেণি। তাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বন্ধু হবে কৃষক শ্রেণি। কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়া ভূমিকা হবে দোদুল্যমান আর দক্ষিণপন্থী অংশ বিপ্লব বিরোধী ভূমিকাতে অবতীর্ণ হতে পারে। চেন তু শিউ যদিও মাও-এর সঙ্গে ভিন্নমত হয়েছিলেন, তবুও পরে মাও সঠিক বলে প্রমাণিত হল।

কে.এম.টি. সরকারের প্রধান কর্মকেন্দ্র ক্যান্টনে অর্থাৎ দক্ষিণ চীনে স্থাপিত হয়েছিল। তাই জাতীয় ঐক্য বিধানের জন্য কে.এম.টি. সরকারের পক্ষে উত্তর চীনে অভিযান পাঠানো অনিবার্য ছিল। ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে চিয়াং কাই শেক এই উত্তরাভিমুখী অভিযান শুরু করেন। এই অভিযান সফল করার জন্য কে.এম.টি. ও সি.সি.পি.র রাজনৈতিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চরেরা বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে সেখানকার কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনকে কাজে লাগিয়ে ধর্মঘট ও অন্তর্ঘাতের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনকে দুর্বল করে ফেলেছিল। আবার সোভিয়েত সরকারও কে.এম.টি. সরকারকে ২ মিলিয়ন রুবল মূল্যের যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিল। এই দুধরনের সহায়তার ফলে ক্যান্টন থেকে মধ্য চীন পর্যন্ত অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে চিয়াং অগ্রসর হতে সক্ষম হলেন। তবুও সোভিয়েত সহায়তা সম্পর্কে তিনি ছিলেন সন্দিহান কারণ তাঁর ধারণা হয়েছিল যে সোভিয়েত রাশিয়ার দুরভিসন্ধি হল সাহায্য দানের মাধ্যমে কে.এম.টি. দলের ওপর কম্যুনিস্টদের আধিপত্য স্থাপন করা। এই সংশয় অচিরেই দুই দলের বিরোধ প্রকাশ্য করে তুলে বিচ্ছেদ অনিবার্য করে তুললো। অবশ্য ক্রমবর্ধমান কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনও এই ভাঙনের জন্য দায়ী ছিল।

জাতীয়তাবাদী বাহিনীর উত্তরমুখী অভিযানের পর অসংখ্য শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল। ১৯২৭ সালের গোড়ার দিকে হুপেই ও হুনানা প্রদেশের শ্রমিক সংগঠনগুলি নিয়ে দুটি আলাদা ফেডারেশন গড়ে উঠল। দক্ষ শ্রমিক থেকে কারিগর ও কুলি সকলেই এই ফেডারেশনগুলির সদস্য ছিলেন। এদের ছিল নিজস্ব তহবিল, নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী, শিল্প বিরোধ মোকাবিলা করার নিজস্ব পদ্ধতি এবং সংহতিবিনাশকারী ‘ব্ল্যাকলেগ’দের শাস্তিদান পদ্ধতি। কিন্তু চীনের শ্রমিক আন্দোলন ছিল একাধারে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও জাতীয় পুঁজিবাদী শ্রণির বিরোধী। কারণ বিদেশি মালিকানাধীন কারখানার শ্রমিক ধর্মঘট ছিল স্পষ্টতই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, কিন্তু সমস্যা দেখা দিল চীনা পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন কারখানার শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে। জাতীয়তাবাদী সরকার শ্রমিক ও মালিক উভয়ের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মিটিয়ে দিতে চেয়েছিল। প্রথম দিকে এই নীতি অবশ্য উভয় পক্ষই সমর্থন করেছিল।

কিন্তু এই সময় থেকে কৃষক আন্দোলন একটি বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। শ্রমিক সমিতির মতো চীনের বহু স্থানে কৃষক সমিতি গড়ে ওঠে। কৃষকরা যেমন ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে খাজনা কমানোর জন্য আন্দোলন করেছিলেন, তেমনি সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধেও তাঁরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। ১৯২৫ সালের শেষদিকে কে.এম.টি. দলের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় যে “কৃষক আন্দোলন প্রশিক্ষণ সমিতি” গড়ে উঠেছিল মাও

সে তুং তার প্রশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে মাও তাঁর এই অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রকাশ করেন "Report on an Investigation of the Peasant Movement in Hunan" নামক প্রতিবেদনে। এই রিপোর্টে মাও চীনের বিপুল সংখ্যক কৃষকের বৈপ্লবিক শক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন, কিন্তু সি.সি.পি.-র একাংশ, এমন কি কমিন্টার্ন পর্যন্ত মাও-এর কথায় আস্থা জ্ঞাপন করলেন না।

তবুও, যে অনুপাতে কম্যুনিস্টরা গণবিক্ষোভকে সাফল্যের সঙ্গো জাগাতে লাগল ঠিক সেই অনুপাতে কে.এম.টি.র রক্ষণশীল সদস্যদের আশঙ্কা বাড়তে লাগল। ১৯২৬ সালের ২০ মার্চ চুংশান নামে একটি যুদ্ধ জাহাজের ক্যাপ্টেন কম্যুনিস্টদের প্ররোচনায় চিয়াং কাই শেককে অপহরণের চেষ্টা করেছিল। এর ফলে হয়তো তখনই কে.এম.টি.-সি.সি.পি. সহযোগিতার অবসান ঘটতো যদি না স্তালিন এইসময় হস্তক্ষেপ করতেন। সি.সি.পি.-র কাছে প্রেরিত একটি তারবার্তায় স্তানিল নির্দেশ দেন যে কম্যুনিস্ট-কৃষক-শ্রমিকদের নিয়ে একটি নতুন সেনাবাহিনী গঠন করা হোক এবং উহান তথা কে.এম.টি. সরকারকে একটি সাম্যবাদী একনায়কে পরিণত করা হোক।

এদিকে চিয়াঙ কাই শেক অপ্রতিহত গতিতে তাঁর অভিযান চালাতে থাকেন এবং অবিলম্বে সাংহাই দখল করে সেখানকার কম্যুনিস্ট ও শ্রমিক দলকে নির্মমভাবে দমন করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, নানকিং, হ্যাংচাও, ফুচাও, ক্যান্টন প্রভৃতি যে সমস্ত স্থান চিয়াঙ দখল করতে পারলেন সেখানেই তিনি কম্যুনিস্টদের দমন করতে লাগলেন। কম্যুনিস্টদের চাপে উহান সরকার চিয়াঙকে সামরিক সর্বাধিনায়কের পদ থেকে বরখাস্ত করল। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে চিয়াঙ নানকিঙে এটি বিকল্প সরকার গড়ে তুললেন। এরপর তিনি সমস্ত কম্যুনিস্টদের কে.এম.টি.দল থেকে বিতাড়িত করলেন। অবশ্য ১৯২৮ সালের মে মাসে মাও সে তুঙ ও চুতে তাঁর অনুগামীদের একত্রিত করেছিলেন হুনান-কিয়াংসি সীমান্তের পার্বত্যাঞ্চলে। তবুও কম্যুনিস্টরা কোণঠাসা হয়ে পড়ল এবং উহান ও নানকিঙ সরকার একত্রিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। সাংহাইয়ের ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এ ব্যাপারে বিশেষ সমর্থন জানালো। চিয়াঙ আবার জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হলেন। উহান সরকারকে স্বেচ্ছায় ভেঙে দিল। ফলে নানকিঙের সরকার একমাত্র জাতীয়তাবাদী সরকারে পরিণত হলো। বামপন্থীরা ঐ সরকারে একেবারেই কোণঠাসা হয়ে পড়ল। ১৯২৮ সালের ৮ জুন জাতীয়তাবাদীরা পিকিং অধিকার করল। এইভাবে ১৯২৯ সাল শুরু হবার আগেই চীনের অধিকাংশ চিয়াঙের নেতৃত্বাধীনে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে এল।

এই কেন্দ্রীয় সরকারের বকলমে আসল ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল কে.এম.টি. দলের হাতে। কেননা সমস্ত সরকারি অফিসার পার্টির দ্বারা নিযুক্ত হত এবং পার্টির কাছেই তারা দায়ী থাকত। দলের শীর্ষে ছিল জাতীয় কংগ্রেস, যার অধিবেশন না থাকলে ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার ছিল দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সভার। ঐ সভার মধ্যে ছিল একটি স্থায়ী সভা, যার সভাপতি ছিলেন কাই শেক। তাই প্রকৃত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল চিয়াঙ ও তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহযোগী নিয়ে গঠিত একটি ক্ষুদ্র চক্রের হাতে। এ ধরণের রাজনৈতিক কাঠামোয় দুর্নীতি ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্ম অনিবার্য ছিল। উপরন্তু ঐ সময়ে চীন এক অত্যন্ত জটিল রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে পড়েছিল। ফলে দেশের জনসাধারণের মঙ্গালের জন্য অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের কাজে কে. এম. টি. সরকার ব্যর্থ হওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত ঐ সরকারকে চরম দাম দিতে হয় ১৯৪৯সালে।

১০.১.১২ সাম্যবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়

(ক) নানকিং সরকারের সমস্যা : নানাকিং সরকারের সমস্যাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, কে.এম.টি.-র অন্তর্দলীয় বিরোধ এবং সমরনায়কদের উৎপাত। দ্বিতীয়ত, কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বিরোধে দেশে চরম আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা যায়। তৃতীয়ত, চীন জাপান কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল। জাপানি আক্রমণ রুখতে গিয়ে কে.এম.টি. দলের শক্তি এত বেশি ক্ষয় হয় যে কম্যুনিস্টরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে দলের শক্তিবৃদ্ধি করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল।

চিয়াং এর উত্তরমুখী অভিযানের ফলে উত্তরাঞ্চলের জঙ্গীশাসকরা সম্পূর্ণভাবে কখনোই অবদমিত হয়নি। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে হুনান, হোনান, হুপে, হোপে, ফুকিয়েন, কোয়াংটুং এবং কোয়াংসি প্রদেশে। বেশ কয়েকটি বিদ্রোহ করে এবং বিদ্রোহে সাহায্য করে এই জঙ্গী শাসকরা নানকিং সরকারকে বিব্রত ও বিপদগ্রস্ত করেছিল। ১৯৩০ সালে চীনের মধ্যাঞ্চলের জঙ্গী শাসকরা যখন বিদ্রোহ শুরু করল তখন কে.এম.টি. দলের বামপন্থী গোষ্ঠীর নেতা ওয়াং চিং ওয়াই তাদের সমর্থন করলেন। কিন্তু চিয়াংয়ের কাছে পরাস্ত হয়ে ওয়াং ক্যান্টন দলে গিয়ে সেখানে একটি পৃথক সরকার স্থাপন করলেন। কিন্তু ১৯৩১ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করলে চিয়াং আর সংঘাতের পথে গেলেন না। বরং ক্যান্টন সরকারের সাথে একটি সমঝোতায় এসে তখনকার মতো উভয় সঙ্কটের হাত থেকে রেহাই পেলেন কিন্তু নানাকিং সরাকরের সীমিত সামর্থ্যের অনেকটা এইসব আভ্যন্তরীণ গোলযোগ মেটাতে ব্যয়িত হল।

(খ) জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ : ১৯৩১ সলে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে জাপান পর্যায়ক্রমে চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশাল অংশ জয় করে সেখানে তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্র মাঞ্চুকুয়ো প্রতিষ্ঠা করেন। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে জাপান ১৯৩৭ সালে চীন আক্রমণ করে। কিন্তু চীনের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ এবং চিয়াং-এর অনমনীয় দৃঢ়তার বলে চীন আত্মসমর্পণের বদলে জাপানের সঙ্গে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুরু করে, যা শেষ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের সঙ্গে। জাপানি আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে নানকিং সরকার প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়ল।

(গ) কম্যুনিস্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা : জঙ্গী শাসকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও জাপানি আগ্রাসন ছাড়া কম্যুনিস্টদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল নানকিং সরকারের আরেকটি, সম্ভবত সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা। নানা সমস্যায় জর্জরিত নানকিং সরকার কখনোই কম্যুনিস্ট সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য পূর্ণশক্তি নিয়োগ করতে পারেনি প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় সত্ত্বেও কম্যুনিস্ট উদ্যম এতটুকুও নষ্ট হয়নি। তারা ব্যর্থতার গ্লানি ঝেড়ে পেলে আবার নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করতে উদ্যত হয়েছিল।

(ঘ) রুশ পন্থী কম্যুনিস্টদের ব্যর্থতা :১৯২৭ সালে কে.এম.টি দলের সাথে বিচ্ছেদের পর সি.সি.পি.-র বিপ্লবাত্মক কাজে বারবার ব্যর্থতা ও নেতৃত্বে বারবার পরিবর্তন এসেছিল। এই অস্থির অবস্থার জন্য দায়ী ছিলেন স্তালিন, যিনি চীনের বাস্তব অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণ না করেই কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে নির্দেশ পাঠাতে থাকেন। তাঁর নির্দেশে মস্কোয় শিক্ষণপ্রাপ্ত নেতারা শহরাঞ্চলে ধর্মঘট, অন্তর্ঘাত ও অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার বারবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নিষ্ফল এইসব প্রচেষ্টার জন্য নেতৃত্বে বারংবার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৯২৭ সালে প্রবীণ কম্যুনিস্ট নেতা চেন-তু-শিউকে ব্যর্থতার অভিযোগে বরখাস্ত করে স্তালিনের পছন্দসই নেতা চু-জিউ-পাইকে পার্টির উচ্চতম নেতৃত্বে স্থাপন করা হল। কিন্তু ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে

ক্যান্টনে যে কম্যুনিস্ট অভ্যুত্থান হল তাও ব্যর্থ হবার পর পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বে আসেন শিয়াং জুং ফা ও লি লি সান। মস্কোর নির্দেশ ছিল শ্রমিকরা কম্যুনিস্ট নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে চীন বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা নেবে। তাদের কর্মসূচি হবে শহরাঞ্চলে ধর্মঘট, অন্তর্ঘাত ও অভ্যুত্থানের দ্বারা বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা। ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি মধ্য চীনে জঙ্গী শাসকরা গৃহযুদ্ধ শুরু করলে লি লি সান বিপ্লবের শুভ মুহূর্ত আগত মনে করে ধর্মঘট ও অন্তর্ঘাত শুরু করে দিলেন ও লাল ফৌজ পাঠিয়ে হুনানের রাজধানী চ্যাংসা দখল করে নিলেন। কিন্তু সরকারি সৈন্যবাহিনী তাদের অচিরেই উৎখাত করল। স্তালিনের ভ্রান্ত চীনা নীতির দায় বর্তালো লি লি সানের উপর। ১৯৩০ সালের প্রথম দিকে মস্কোর সান-ইয়াৎ-সেনের নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন শেষে আঠাশ জন ছাত্র পিকিং-এ ফিরে আসে স্তালিনের নীতি কার্যকর করার দায়িত্ব নিয়ে। আঠাশ বলশেভিক নামে পরিচিত এই তরুণ দলের নেতা ওয়াং মিং এবং পো কু সি.সি.পি.-র মস্কোপন্থী গোষ্ঠীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

(ঙ) মাও সে তুঙের উত্থান : এই সময় সি.সি.পি. স্পষ্টতই দুটি পৃথক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ল—চীনের কেন্দ্রীয় সংগঠন (Central Politbureau) কমিন্টার্নের প্রভাবধীন ছিল এবং অপর গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেন মাও সে তুং যিনি হুনান এবং কিয়াংসি গ্রামাঞ্চলে সাম্যবাদী কার্যকলাপে নিরত থাকেন। মাও সি.সি.পি.র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আওতার বাইরে গ্রামাঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। স্তালিনের নীতির সঙ্গে মাওয়ের বাস্তবমুখী নীতির অমিল ছিল প্রচুর। সেজন্য দীর্ঘদিন তাঁকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্ত শেষ পর্যন্ত তিনি জয়ী হয়েছিলেন। ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিখ্যাত হুনান প্রতিবেদনে তিনি হুনান কৃষক আন্দোলনের নজির দেখিয়ে দাবি করেন যে চীনে বিপ্লবের অগ্রদূত হল কৃষকরা। এই ধারণা স্পষ্টত মস্কোর তাত্ত্বিক চিন্তাধারা থেকে পৃথক ছিল। চু তে ও চেন ই নামে দুজন অনুগামীর সাহায্যে মাও কিয়াংসি ও হুনান প্রদেশের পশ্চাদভূমি অঞ্চলে কৃষক সংগঠন ও সোভিয়েত গড়ে তোলেন এবং সামরিক বাহিনী গঠন করেন। ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে তিনি কিয়াংসি প্রদেশের জুই-চিনে সদর দপ্তর সরিয়ে নিয়ে যান। তাঁরা গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করে, কৃষকদের মধ্যে ভূমি পুনর্বন্টন করে সোভিয়েত গঠন করে এবং গেরিলা যুদ্ধেরকৌশল রপ্ত করে স্বয়ম্ভর আঞ্চলিক ঘাঁটি গড়ে তুলেছিলেন। সি.সি.পি.-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কখনোই মাওয়ের কর্মপদ্ধতি অনুমোদন করেনি। মস্কো তাঁদের সহ্য করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ শহরাঞ্চলে যখন বিপ্লবীরা বারবার ব্যর্থ হচ্ছিল তখন মাও ও তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের পদ্ধতির সাফল্য প্রমাণ করছিলেন।

(চ) মাওপন্থী ও মস্কোপন্থী গোষ্ঠীর বিরোধিতা—মাও পরিচালিত আন্দোলনের অগ্রগতি : সি.সি.পি. র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে বা পলিটব্যুরো ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত মাও-এর প্রবল বিরোধিতা করে যায়। ঐ বছরের জুলাই মাসে আঠাশ বলশেভিরে ষড়যন্ত্রে ও কমিন্টার্নের নির্দেশে মাও সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাচ্যুত হলেন। বলশেভিকদের সঙ্গে মাওয়ের বিরোধ অবশ্য ১৯৩১ সালে শুরু হয়েছিল, যখন ১৯৩১ সালের ৭ নভেম্বর মাও জুই চিনে (কিয়াংসি) সর্বপ্রথম সমগ্র চীনের সোভিয়েত সমূহের একটি কংগ্রেস আহ্বান করেছিলেন। মাও এই কংগ্রেসে যোগদানের জন্য পলিটব্যুরোর সভ্যদের আমন্ত্রণ জানালেন। আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে পলিটব্যুরোর প্রতিনিধি হিসাবে আঠাশ বলশেভিক দল জুই চিনে উপস্থিত হলেন বটে, কিন্তু তাঁরা মাও-এর কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করলেন। তাঁর গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতি, ধনী কৃষকদের মধ্যে ভূমিবন্টনের মানসিক প্রবণতা, সুবিধাবাদী প্রয়োগবাদ ইত্যাদির তীব্র নিন্দা করা হয়। এই সম্মেলনে বলশেভিক দল কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল—ভূমি সংক্রান্ত সংস্কার সাধনে সর্বহারাদের নেতৃত্ব গ্রহণ, লাল ফৌজের সম্প্রসারণ, গেরিলা যুদ্ধরীতির স্থলে নিয়মিত যুদ্ধ

পদ্ধতি প্রবর্তন। এইভাবে চীনা সাম্যবাদী দলের বলশেভিক সভ্যগণ মাও অনুসৃত এবং মাও প্রদর্শিত বিপ্লবী পথ ত্যাগের আহ্বান জানালেন।

কিন্তু মাও কর্তৃক আহূত কংগ্রেসে স্বাভাবিকভাবেই মাও-এর প্রাধান্য স্বীকৃত হয় এবং বলশেভিকরা কোণঠাসা হয়ে পড়লেন। মাও All China Soviet Government-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন আর আগের মতোই First From Red Army-র Chief Political Commissar পদের অধিকারী রইলেন। আঠাশ বলশেভিকদের মধ্যে মাত্র তিনজনকে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভ্যপদ দেওয়া হল। মাওপন্থীরা জুই-চিনে চীনা সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করলেন। এই সাধারণতন্ত্র পরিচিত হয় সর্বহারা শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব (Democratic Dictatorship of the Proletariat and Peasantry) নামে।

ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মাও এইভাবে জুই-চিন কংগ্রেসে উল্লেখযোগ্য জয়লাভে সমর্থ হলেন। তাঁর বাস্তব ভিত্তিক কার্যক্রম ক্রমশ অধিকতর সমর্থন লাভ করতে থাকে। এই কার্যক্রম গঠিত হল পাঁচটি উপাদান নিয়ে, যথা— কৃষক শ্রেণির সমর্থন, স্বীয় দল এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা, একটি স্বাধীন সামরিক শক্তি, নিরাপদ স্থানে একটি স্থলবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা। তথাপি পলিটব্যুরো আঠাশ বলশেভিকগণের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে এবং মাও পলিটব্যুরোর সভ্যপদ থেকে বঞ্চিত থাকেন।

বলশেভিকদের সঙ্গে মাও-এর মতবিরোধের কতকগুলি মৌলিক কারণ ছিল, যেমন, মাও ক্ষুদ্র জমিদার, সম্পন্ন কৃষক এবং দরিদ্র কৃষক, সকলের মধ্যে সমভাবে জমি বন্টনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু বলশেভিকদের কার্যক্রম ছিল সকল শ্রেণির জমিদার এবং সম্পন্ন কৃষকদের বঞ্চিত করে কেবলমাত্র দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে জমি পুনর্বন্টন করা। মাও-এর রণকৌশল ছিল গেরিলা যুদ্ধপদ্ধতির অনুশীলন অর্থাৎ সেনাবাহিনী কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান না করে শত্রু সেনাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে শত্রুপক্ষের মনোবল ভেঙে দেবে এবং যুদ্ধে জয়লাভ করা সহজসাধ্য করে তুলবে। অপরপক্ষে বলশেভিক সভ্যদের আদর্শ ছিল সাম্যবাদী সোনাবাহিনী একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে সেই নির্দিষ্ট ঘাঁটি থেকে শত্রুপক্ষের উপর অগ্রিম আক্রমণ করলে যুদ্ধে জয়লাভ অধিকতর সহজসাধ্য হবে। বলশেভিকরা মনে করত যে গেরিলা যুদ্ধ অপেক্ষা অবস্থান যুদ্ধ অধিকতর ফলপ্রদ। জামানি আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মাও-এর আদর্শ ছিল জাপানি বিরোধী সকল স্তর থেকে সৈন্যদল সংগ্রহ করে এক সম্মিলিত সেনাবাহিনী গঠন করা কিন্তু বলশেভিকরা এরূপ কোনো সংযুক্ত ফ্রন্টের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁদের আদর্শ ছিল লাল ফৌজের একক তৎপরতায় জাপানকে যুদ্ধে প্রতিহত করা। মাও এবং বলশেভিকদের মধ্যে এরকম মৌলিক মতপার্থক্য ঘটার জন্য উভয়ের মধ্যে সন্ধিস্থাপন অসম্ভব হয়ে ওঠে।

১০.১.১৩ চিয়াং কাই শেক ও কম্যুনিস্ট দলের বিরোধ

একদিকে যখন মস্কোপন্থী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রবল মাও-বিরোধিতা চলছিল অপরদিকে তখন কম্যুনিস্টদের উৎখাত করার জন্য চিয়াং কাই শেক বারবার সামরিক অভিযান চালাচ্ছিলেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে রুশ উপদেষ্টাদের চীন থেকে অপসারিত করার পর চিয়াং তাঁর সেনাবাহিনীর উন্নতিসাধনের জন্য জার্মানির সাহায্য গ্রহণ করেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কর্নেল ম্যাক্স বাওয়ার (Colonel Max Bauer) চীনে আমন্ত্রিত হন এবং ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে

আমন্ত্রিত হন প্রখ্যাত রণকুশলী সেনাপতি হান্স ভন সীক্ট্ (Hans Von Seeckt)। ১৯৩৪ সালে সীক্ট্ চীনে অবস্থিত জার্মান সামরিক মিশনের অধিকর্তা নিযুক্ত হলেন। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য সীক্ট দেশে ফিরে গেলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন আলেকজান্ডার ভন ফাকেনহাউসেন (Alexander Von Fakenhausen)। এই জার্মান সামরিক মিশন চিয়াংকে পাঁচ লক্ষাধিক সৈন্য সম্বলিত এবং জার্মান সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত একটি সেনাবাহিনীর অধিকারী করে তোলে। এইভাবে সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে চিয়াং কাই শেক ১৯৩০-৩৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সাম্যবাদী শক্তির উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে পাঁচটি সুপরিকল্পিত অভিযান ব্যর্থ হয়। তৃতীয় এবং চতুর্থ অভিযান চালানো হয় ১৯৩১-এর জুলাই হতে ১৯৩৩-এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত। কিন্তু এই দুটি অভিযানও ব্যর্থ হয় প্রধানত জাপানের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসনের জন্য। জাপানি আগ্রাসনের ফলে চীনের জনমত দাবি করে যে জাপানের বিরুদ্ধে লড়তে হলে গৃহবিবাদ থামানো দরকার। বিপরীতপক্ষে চিয়াং কাই শেক মনে করতেন যে শত্রুর সার্থক মেকাবিলার জন্য প্রথম দরকার আভ্যন্তরীণ সংহতি, সেজন্য প্রয়োজন কম্যুনিস্টদের উৎখাত করা, তারপর ঐক্যবদ্ধ চীনের পক্ষে সার্থকভাবে জাপানি আক্রমণ রোধ করা সম্ভব হবে। ১৯৩৩ সালে জাপানিদের সাথে টাংকু যুদ্ধ বিরতি চুক্তিতে সই করার পর চিয়াং কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে পঞ্চম অভিযানের প্রস্তুতি নেন। ঐ বছরের অক্টোবরে সাত লক্ষ সৈন্য নিয়ে তিনি অভিযান শুরু করলেন।

১০.১.১৪ লং মার্চ ও পার্টি নেতৃত্বে মাও সে তুং

মাও-এর কর্মজীবনে তখন এক সঙ্কটকাল উপস্থিত। তখন চীনা সাম্যবাদী দলের উপর রুশ সমর্থিত “অষ্টাবিংশতি বলশেভিক”দের পূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত। যদিও মাও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতির পদে বহাল থাকেন, তথাপি তিনি বলশেভিকদের চক্রান্তে প্রকৃত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্ষমতাবিহীন সম্মানার্থক নেতায় পরিণত হন। এইরূপ পরিস্থিতিতে উদ্ভূত হয় ফুকিয়েনের বিদ্রোহ সংক্রান্ত ঘটনা। ২৬ অক্টোবর ১৯৩৩ খিস্টাব্দে ফুকিয়েনের বিপ্লবী জনগণ সাম্যবাদীদের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে জাপান বিরোধী ও চিয়াং বিরোধী একটি চুক্তি সম্পাদন করেন এবং ২০ নভেম্বর ফুচাও এ একটি জনগণের বিপ্লবী সরকারও (People’s Revolutionary Government) গঠন করেন। কিন্তু তৎকালীন রুশ সমর্থিত বামপন্থী নেতৃত্বাধীন সাম্যবাদীরা ফুকিয়েনের বিদ্রোহীদের কোনো সমর্থন জানাননি। পরিণামে চিয়াং ২০ জানুয়ারি ১৯৩৪ সাল নাগাদ বিদ্রোহীদের সহজেই পরাভূত করতে সক্ষম হন এবং সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান পরিচালনায় তৎপর হলেন। অপরপক্ষে ‘অষ্টাদশ বলশেভিক দল’ শত্রুপক্ষকে সুযোগদানের অপরাধে জনগণের অবিশ্বাসের পাত্র হলেন এবং মাও-এর নেতৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল। মাও সি.সি.পি.-র পলিটব্যুরোর প্রধান রূপে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে মাওয়ের ক্ষমতার লড়াই চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। অবশেষে ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে পার্টির মিটিংয়ে আসা মাওয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ হল। জুই চিন থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরে তিনি গৃহবন্দী হলেন। সাম্যবাদীদের ঘাঁটি তখন কিয়াংসি প্রদেশ। চিয়াং-এর কে.এম.টি. বাহিনী তখন পঞ্চম বা শেষ অভিযান পরিচালনায় তৎপর। কে.এম.টি. বাহিনী কিয়াংসি প্রদেশ অবরোধ করেছিল বলে প্রায় একলক্ষ সাম্যবাদী অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে অবরোধ ভেঙে দুর্গম পথে অনির্বচনীয় দুঃখ কষ্ট বরণ করে এক ঐতিহাসিক পদযাত্রা শুরু করতে বাধ্য হলেন। এইভাবে শুরু হল বিখ্যাত লং মার্চ। ১৯৩৪ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত মাও সে তুং, চু-

তে, লিউ সো পেঙ, লিন পিয়াঙ, পেঙতে হুয়াই প্রভৃতি নেতার নেতৃত্বে এই লংমার্চ সংঘটিত হয়েছিল। এই পদযাত্রা শুরু হয় কিয়াংসি প্রদেশ থেকে এবং পরিসমাপ্ত হয় পীত লদীর বাঁকে অবস্থিত শেনসি প্রদেশে। এই পদযাত্রায় সাম্যবাদীরা ৬ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেন। পদযাত্রীদের মধ্যে মাত্র ৮ হাজার গন্তব্য স্থানে সশরীরে উপনীত হতে সক্ষম হলেন। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কম্যুনিস্টরা ইয়েনানে তাদের প্রধান কার্যালয় সরিয়ে নিয়ে গেলেন। লং মার্চের সময় আঠারোটি গিরিশ্রেণি এবং চব্বিশটি নদী অতিক্রম করেছিলেন। পথে নানা ধরণের দুর্যোগ দুর্বিপাক এবং চিয়াংয়ের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে অনেকেই প্রাণ হারিয়েছিলেন। কিন্তু এই অভূতপূর্ব এবং অসম বাঁচার লড়াইয়ে যাঁরা টিকতে পেরেছিলেন তাদের নিয়ে ইয়েনানে মাও রুশ প্রভাব মুক্ত একটি পার্টি ও সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। এইভাবে মস্কোর বিরোধিতা সত্বেও লংমার্চের বিপজ্জালের মধ্যে মাও নিজেকে চীনা কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ১৯৩৮ সালের আগে মস্কো তাঁর এই সম্মানকে স্বীকার করে নেয়নি। বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণিভুক্ত কর্মীবাহিনীর কর্মকুশলতা, পদযাত্রীদের মনোবল, মানসিক দৃঢ়তা, সহনশীলতা এবং সর্বোপরি বৈপ্লবিক অনুপ্রেরণা লং মার্চের সাফল্য সুনিশ্চিত করেছিল। এর ফলে চীনের সুবিস্তৃত অঞ্চলের উপর সাম্যবাদী প্রভাব বিস্তৃত হল। এরপর আর মস্কোর পক্ষে সি.সি.পি.-তে মাও সে তুং-এর নেতৃত্বকে যথাযথ স্বীকৃতি জানানো ছাড়া উপায় ছিল না।

১০.১.১৫ জাপান-বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম ও কম্যুনিস্ট-কুয়োমিনতাং দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট

১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ফ্যাসিবাদের বিপদ সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। ইটালিতে মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের, জার্মানিতে হিটলারের নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট নাৎসী দলের এবং জাপানে তোজোর নেতৃত্বে উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতা হিসাবে সোভিয়েত কর্ণধার স্তালিন অত্যন্ত সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে মতাদর্শগত দিক দিয়ে ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু কম্যুনিস্টরা। তাই ১৯৩৫ সালের আগস্ট মাসে কমিন্টার্ন সমস্ত দেশের কম্যুনিস্ট পার্টিকে সেই দেশের অন্যান্য বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলির সাথে হাত মিলিয়ে 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট' (Anti-Fascist United Front) গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। এই আহ্বানে সাড়া দিতে মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বাধীন চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির কোন কুণ্ঠা ছিল না। বস্তুতপক্ষে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকেই মাও জাপানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দল এবং সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপন করেছিলেন। কারণ, যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠলে চিয়াং-এর কম্যুনিস্ট উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ থাকবে এবং সেই সুযোগে চীনে কম্যুনিস্ট পার্টির শক্তিবৃদ্ধি করা সহজ হবে।

১৯৩৫ সালের শেষের দিক থেকেই চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি কম্যুনিস্ট বিরোধী অভিযান বন্ধ রেখে জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলার বিষয়ে চীনে জনমত গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়। চীনে সেই সময় জাপ-বিরোধী জাতীয় চেতনার একটি জোয়ার দেখা দিয়েছিল. চীনের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা চিয়াং কাই শেককে কম্যুনিস্টদের বদলে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু চিয়াং কাই শেকের নানকিং সরকার তখন চীনা সাম্যবাদীদের উচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প ছিল। চীনের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের চাপ সত্বেও চিয়াং উগ্র কম্যুনিস্ট বিরোধিতা পরিত্যাগ না করে জনপ্রিয়তা হারালেন। চিয়াং মনে করতেন যে জাপানিদের চেয়েও সাম্যবাদীরা বেশি বিপজ্জনক, তাই তারাই পয়লা নম্বরের শত্রু। জাপানও

সাম্যবাদ বিরোধী তাই দেশের আভ্যন্তরীণ শত্রু কম্যুনিস্টদের দমন করে তবে বিদেশি শত্রু জাপানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া সমীচীন। ফলে ১৯৩৫ সালের শেষদিকে জাপান যখন আবার উত্তর চীন আক্রমণ করল তখন এই আক্রমণ রোধ করতে চিয়াং খুব সক্রিয় ভূমিকা নিলেন না। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতি এবং চিয়াং সরকারের নিষ্ক্রিয়তা চীনের বিভিন্ন স্থানে জঙ্গী ছাত্র আন্দোলনের জন্ম দিল। এর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল পিকিং।

কিন্তু চিয়াং তাঁর কম্যুনিস্ট বিরোধিতায় অটল থাকেন এবং যেহেতু লংমার্চের পর কম্যুনিস্টরা চীনের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন সেহেতু চিয়াং উত্তর চীনে চ্যাং সুয়ে লিয়াং এবং ইয়াং হু চেং এর অধিনায়কত্বে সৈন্য প্রেরণ করলেন। এইভাবে উত্তর চীনে একই সঙ্গে সাম্যবাদী, কে.এম.টি. এবং জাপানি সৈন্যের সহ অবস্থান জটিলতার সৃষ্টিকরল। কারণ সাম্যবাদীদের চাপ সত্ত্বেও চিয়াং কোনোমতেই জাপানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে চাইলেন না।

কিন্তু মাও, চু-তে, চৌ এন লাই প্রমুখ নেতারা চিয়াং-এর এই মানসিকতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তবুও তাঁরা ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে চিয়াং-এর সঙ্গে মিলিতভাবে একটি গণতান্ত্রিক সংযুক্ত ফ্রন্ট (Democratic United Front) গঠনের প্রস্তাব করেন। মাও ছিলেন তখনকার চীনা কেন্দ্রীয় সোভিয়েত সরকারের (Chinese Central Soviet Government) চেয়ারম্যান। এই পদাধিকার বলে মাও চিয়াংকে এই প্রস্তাব দিলেন—প্রথমত, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করা, দ্বিতীয়ত, জনগণকে অধিকার দেওয়া, তৃতীয়ত, দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন, চতুর্থত, কৃষকদের অতি অবশ্যই সাহায্য দান করতে হবে, পঞ্চমত, পুঁজিবাদের বিরোধিতা না করে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করতে হবে। এখানে বলা দরকার যে মাও সাময়িকভাবে পুঁজিবাদের বিরোধিতা না করার কৌশল নিয়েছিলেন। কারণ, পুঁজিবাদী চিয়াং ছাড়া জাপানি সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করা যেত না। এরপর মাও পুঁজিবাদী চিয়াংকে পরাস্ত করার কথা ভেবেছিলেন। তৎকালীন পরিস্থিতিতে মাও-এর এই নীতি ছিল অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত।

তবে, চিয়াং যে মাও-এর প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন তার কারণ ছিল ভিন্ন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে চ্যাং সুয়ে লিয়াং এবং ইয়াং হু চেং নামে দুজন কুয়োমিনতাং সেনানায়ককে তিনি উত্তর-পশ্চিমে কম্যুনিস্টদের সম্পূর্ণভাবে দমন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই অভিযান আদৌ সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। তাছাড়া, সৈন্যরা বিরামবিহীন গৃহযুদ্ধের ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। চ্যাং ও ইয়াং—এই দুই সেনানায়কসহ কে.এম.টি সৈন্যরা কম্যুনিস্ট প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা কম্যুনিস্টদের সাথে যোগ দিয়ে যৌথভাবে জাপানি আক্রমণ রোধ করতে চাইলেন। কিন্তু চিয়াং সৈন্যবাহিনীকে কম্যুনিস্ট দমনে উৎসাহিত করার জন্য ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর সিয়ানে এসে উপস্থিত হলেন। তখন আকস্মিকভাবে সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দিল। চ্যাং সুয়ে লিয়াং এবং ইয়াং হু চেং-এর হাতে চিয়াং বন্দী হলেন। এই দুই সেনানায়ক ৮ দফা শর্ত সম্বলিত একটি “জাতীয় ইস্তাহার” (National Manifesto) প্রকাশ করলেন। তাতে চিয়াংকে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করে কম্যুনিস্টদের সাথে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলে জাপান-বিরোধী লড়াই চালাতে বলা হল। কম্যুনিস্ট নেতা চৌ এন লাই-এর প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে কম্যুনিস্ট-কে.এম.টি. যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর ফলে কম্যুনিস্ট-কে.এম.টি. গৃহযুদ্ধে ছেদ পড়ে এবং জাপান-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠার রাস্তা পরিস্কার হল। ১৯৩৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর চিয়াংকে মুক্তিদান করা হল।

১০.১.১৬ সাম্যবাদী আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় (১৯৩৭-৪৫) : ইয়েনান কাল

(ক) ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুলাই জাপান নতুন উদ্যমে চীনের লুকাও চিয়াও অঞ্চল আক্রমণ করল। কিছুদিন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলার পর জাপানি সেনারা পিকিং-এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করে নিল। ১৩ আগস্ট জাপানের স্থল ও নৌবাহিনী যৌথভাবে সাংহাই আক্রমণ করল। জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণের এই ঘটনা অঘোষিত যুদ্ধ নামে পরিচিত। দুর্ভাগ্যবশত, চিয়াং-এর নেতৃত্বে কে.এম.টি বাহিনী জাপানকে প্রতিরোধ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। অথচ কম্যুনিস্ট পরিচালিত লালফৌজ, যা পরিচিত হয়েছিল 'এইট্‌থ্ রুট আর্মি এবং 'নিউ ফোর্থ আর্মি' নামে, তা উত্তর ও মধ্য চীনে সাফল্য লাভ করেছিল। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে জনসাধারণ কম্যুনিস্টদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে কম্যুনিস্ট নেতৃত্বাধীন বাহিনা জাপানি অধিকৃত এলাকার আশেপাশে শেন্ সি, চাহার হেপেই, সুইউয়ান, শানটুং, হেনান, আন্‌হুই এবং কিয়াংসি প্রদেশে গণতান্ত্রিক ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। এই সমস্ত ঘাঁটিগুলিতে কম্যুনিস্ট নেতৃত্বে জাপান বিরোধী জনপ্রিয় শাসনতান্ত্রিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল। এখানে কৃষকদের ওপর থেকে করের বোঝা হ্রাস করা হয়েছিল এবং সুদের হার কমানো হয়েছিল, যার ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছিল। চীনা জনগণ জাপানি জঙ্গীদের বিরুদ্ধে কি কৌশল অবলম্বন করবে সেই মর্মে "দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ" (On Protracted War) নামে একটি পুস্তিকা ১৯৩৮ সালে রচনা করেছিলেন। এতে বলা হয়েছিল যে যেহেতু উন্নত সামরিক সরঞ্জামের অধিকারী জাপান চীনে তার সর্বশক্তি নিযুক্ত করেছে সেহেতু চীনকে এক দীর্ঘমেয়াদী ও কষ্টসাধ্য যুদ্ধ করতে হবে, অন্তত ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না অন্যান্য দেশ এসে চীনকে সহায়তা করে। ইয়েনানে অনুষ্ঠিত চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির (C.C.P.) ষষ্ঠ অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল মাও নির্দেশিত সমর কৌশল অনুসরণ করা হবে। এতে যে কম্যুনিস্টরা সফল হয়েছিল তার প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে জাপান কে.এম.টি.-র ওপর আক্রমণ বন্ধ রেখে কম্যুনিস্ট বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাতে থাকে। এই কঠিন সংগ্রামময় দিনে স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন রাশিয়া ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত উদার হাতে চীনকে আর্থিক সাহায্য ও ঋণ দিয়েছিল। কম্যুনিস্টদের সাফল্য পাশ্চাত্য শক্তিদেরও নাড়া দিয়েছিল। চীন-জাপান যুদ্ধের সূচনাকালে ব্রিটেন ও আমেরিকা নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু কম্যুনিস্টরা ক্রমাগত সাফল্য পাওয়ায় ব্রিটেন ও আমেরিকা যুদ্ধ বন্ধ করতে আবেদন জানাল। কে.এম.টি. তো জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য উন্মুখ ছিল। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল। ঐ বছরের শীতকাল এবং ১৯৪০ -এর বসন্তকালে কে.এম.টি. বাহিনী যুক্তফ্রন্টের নীতি লঙ্ঘন করে শেন সি অঞ্চলের গণতান্ত্রিক ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করল। কম্যুনিস্ট বাহিনী সাফল্যের সাথে কে.এম.টি. আক্রমণ প্রতিহত করে জনমানসে আরো উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তুলল। কিন্তু কে.এম.টি. বাহিনী ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার অভিযান চালাতে শুরু করল। প্রচুর লোকক্ষয়ের বিনিময়ে 'নিউ ফোর্থ আর্মি' এই আক্রমণ প্রতিহত করল। কম্যুনিস্ট সেনাপতি ইয়েতনি আনগুইতে কে.এম.টি. নেতাদের সাথে কথাবার্তা চালাতে গেলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল, এই ঘটনা দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনা নামে খ্যাত। এরপর নানকিং সরকার, চিয়াং কাই শেকের বাহিনী এবং জাপানি বাহিনী মধ্য চীনের বিভিন্ন জায়গায় কম্যুনিস্টদের বিপর্যস্ত করে তুলল। সি.সি.পি.-র কেন্দ্রীয় কমিটির মিলিটারি কমিশন 'নিউ ফোর্থ আর্মি'কে সাতটি পৃথক ডিভিশনে ভাগ করেছিল। গণতান্ত্রিক ঘাঁটিগুলির সাধারণ মানুষরাও

এই যৌথ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সংগঠিত হল। কম্যুনিস্ট বাহিনীর কাছে পরাস্ত হয়ে চিয়াং জনগণের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে হিটলারের নাৎসী বাহিনী সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করল। এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে জাপান ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের শেষার্ধ এবং গোটা ১৯৪২ সাল ধরে চীনের গণতান্ত্রিক ঘাঁটিগুলির বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর তাণ্ডবলীলা চালাল। জাপানি আগ্রাসনের তীব্রতা গণতান্ত্রিক ঘাঁটিগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছিল। এই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সি.সি.পি.-র সঠিক নেতৃত্ব ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এই প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠেছিল। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন সোভিয়েট লাল ফৌজ নাৎসী বাহিনীকে চূড়ান্ত পরাজিত করল তখন জাপানের মনোবল হ্রাস পেল। এই সুযোগে কম্যুনিস্ট বাহিনী জাপানি অধিকৃত গণতান্ত্রিক ঘাঁটিগুলি পুনরায় দখল করে মুক্তাঞ্চলগুলির সীমানা বাড়িয়ে নিল। এই সময় কে.এম.টি. বাহিনী তৃতীয় বার কম্যুনিস্ট বিরোধী আক্রমণ চালাল। এবার তাদের লক্ষ্য ছিল সি.সি.পি.র প্রধান কার্যালয় ইয়েনান। এবার কম্যুনিস্ট সৈন্যদলের সাথে গণতান্ত্রিক এলাকাগুলির সাধারণ মানুষরাও প্রতিরোধে সামিল হলেন। এইভাবে কম্যুনিস্টদের সংগ্রাম একটি জনযুদ্ধের রূপ নিল। কে.এম.টি. আক্রমণ সমগ্র চীনের জনমতকে সজাগ করে দিয়েছিল। চিয়াং ও তাঁর কে.এম.টি. দলের জনপ্রিয়তা একেবারেই হ্রাস পেয়েছিল।

(খ) ইয়েনান—একটি নতুন চীনা সমাজ : জাপানি এবং কে.এম.টি. যৌথ আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে মাও তাঁর বিখ্যাত তাত্ত্বিক প্রবন্ধ "On New Democracy" রচনা করেছিলেন। এই প্রবন্ধে মাও চীনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল এই যে চীন হল একটি আধা উপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশ। এখানে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র ও তাদের সহযোগী শক্তিগুলি হল জনসাধারণের শত্রু। তাই শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির মতো কেবল শ্রমিক শ্রেণির অংশগ্রহণ বিপ্লবকে সফল করতে পারে না। এখানে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী যেমন, শ্রমিক শ্রেণি, দরিদ্র ও মধ্য কৃষক শ্রেণি, বুদ্ধিজীবী ও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণি ও জাতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি ঐক্যবদ্ধভাবে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রাম গড়ে তুলে বিপ্লব সফল করবে। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হবে, সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে উঠবে নয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। যেখানে পুঁজিপতি-শ্রমিক কোন বিভেদ থাকবে না। বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও সোভিয়েত গণতন্ত্র উভয়ের থেকেই এই নতুন গণতন্ত্র পৃথক। কারণ, এখানে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ থাকবে না। আবার সর্বহারার একনায়কত্বের (Dictatorship of the Proletariat) পরিবর্তে এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও পুঁজিপতি শ্রেণির একনায়কতন্ত্র। এইভাবে মাও বিপ্লবের পরবর্তী স্তরে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের আদর্শে চীনে কিভাবে একটি নতুন সমাজ গড়ে উঠবে, তার রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন। এই রূপরেখা শুধু চীনে নয়, বিভিন্ন আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিপ্লবের মডেল হিসাবে কাজ করেছিল। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইয়েনানকে কেন্দ্র করে সি.সি.পি. একদিকে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়েছিল অন্যদিকে একটি নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। ইয়েনান ছিল কৃষকদের কর্মকাণ্ডের প্রধান স্নায়ুকেন্দ্র। অন্যদিকে সাংহাই ছিল চীনের শ্রমিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। জাঁ শ্যেনো বলেছেন যে ইয়েনান ছিল একটি স্নায়ুকেন্দ্র যা একটি অসম্ভব সফল সামরিক সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, আবার এটি ছিল নতুন সামাজিক ও মানবিক সম্পর্কের প্রতীক একটি মডেল।

বস্তুত মাও যুদ্ধকালীন অবস্থার সুযোগ নিয়ে সাম্যবাদী দল ও সাম্যবাদী সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন করেন এবং জনগণকে সাম্যবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত করে সাম্যবাদী বিপ্লবের জন্য সংগঠিত করেন। চীনের কৃষিভিত্তিক সমাজ ও অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ প্রচারে তৎপর হন। তাঁর বিশেষ কার্যক্রম ছিল গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। কিন্তু মস্কোপন্থী লি লি সান, ওয়াং মিং, পো কু প্রমুখ মাও-এর পথ সমর্থন করতেন না। তাঁরা শহরাঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণির অংশগ্রহণকে অধিকতর গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু মাও লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে কৃষক সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেন ও কৃষককুলকে নিয়ে বিপ্লবী সেনাদল গঠনে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি তাদের নিয়ে কৃষি মজদুর ইউনিয়ন গঠন করেছিলেন। কৃষকেরা যাতে জমি উপগ্রহণ ও পুনর্বন্টন আন্দোলনে যোগদান করে তজ্জন্য তাদের উৎসাহিত করেছিলেন। এর ফলে কৃষক সম্প্রদায় আত্মসচেতন হয় এবং ঐতিহ্যগত ভীরুতা ত্যাগ করে সংগ্রামের পথে পা বাড়ায়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ১৬ বছর বা ততোধিক বয়স্ক কৃষকেরা কেন্দ্রস্থানীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে সংযুক্ত হলেন। মাও বিশ্বাস করতেন যে সকল শ্রেণির চীনা অধিবাসীই নতুন চীন সংগঠনে এগিয়ে আসতে পারে এবং রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি 'সান সান চি' পদ্ধতি (Three-Thirds System) প্রবর্তন করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে দলীয় সভ্যেরা প্রশাসনে এবং পরিষদ সমূহে মোট সভ্যপদের এক-তৃতীয়াংশের অধিকারী হবেন; অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য নির্বাচিত হবেন প্রগতিশীল বামপন্থী এবং স্বাধীন মতাবলম্বী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে। এই পদ্ধতি ছিল গণতন্ত্রভিত্তিক।

এই সময়ে মাও-এর ছয়টি প্রধান নীতি উল্লেখযোগ্য। খণ্ডিত সেনাদল (Crack troops) গঠন এবং সরল প্রশাসন (Simple administration), গ্রামমুখী অভিযান (Hsia-hasiang) যাতে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আর দলীয় ক্যাডাররা কৃষক ও শ্রমিকদের সঙ্গে একজোটে সাম্যবাদী আন্দোলনে সামিল হতে পারে। যে সব অঞ্চলে ভূমি-সংক্রান্ত কোনো সংস্কার কার্য সাধিত হয়নি, সেই সব অঞ্চলে খাজনা ও সুদের হার ২৫ থেকে ৪৯ শতাংশ হ্রাসকরণ, যাতে সুদসমেত খাজনা ভূমির উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশের অধিক না হয়। গ্রামীণ অর্থনীতি পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক এবং সমবায় আন্দোলন প্রবর্তন। সাংগঠনিক অর্থনীতি (Organizational economy) প্রবর্তন, যাতে প্রতিটি সংগঠন এবং ক্যাডার কায়িক এবং তত্ত্বাবধায়ক কার্যে (managerial and manual work) অংশ গ্রহণ করতে পারে। গ্রামীণ অঞ্চলসমুহের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের জন্য এক নতুন শিক্ষা আন্দোলন প্রবর্তন করেছিলেন মাও।

(গ) কৃষকদের জাতীয় সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা : ১৯৩০ দশকের গোড়ার দিকে চীনা সোভিয়েত অঞ্চলগুলিতে ভূস্বামীদের জমি ক্রোক করে সেগুলি ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছিল। কিন্তু গণতান্ত্রিক ঘাঁটিগুলিতে জমি ক্রোক না করে কৃষকদের ওপর থেকে খাজনার পরিমাণ প্রায় ২৫ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছিল। মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে কৃষকদের দেয় সুদের পরিমাণও অনেকটাই কমানো হয়েছিল। ভূস্বামীদের ওপর অতীত দিনের পূঞ্জীকৃত করের বোঝা চাপানো হয়েছিল। ভূস্বামী মহাজনদের কাছ থেকে যে সমস্ত কৃষকেরা ঋণ নিয়েছিলেন তাঁদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তাই চীনা সোভিয়েত এলাকায় যে জঙ্গী কৃষিনীতি ছিল তা অনেকটা পরিত্যক্ত হয়েছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃষকদের অনুকূলে ও জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। এতে হয়তো কৃষকদের অর্থনৈতিক স্বার্থ কিছুটা বিসর্জন দিতে হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারণ জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে

যোগদান করার ফলে তাঁদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়েছিল। তাঁরা নিজেদের সামরিক ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। নয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গীভুত হয়ে তাঁদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ভুস্বামী শ্রেণি সাধারণভাবে সাম্রাজ্যের সহায়ক শক্তি। কারণ তাঁরা জাপানি আক্রমণকে সমর্থন করেছিল। তবে ঘাঁটি এলাকায় যে জাপান বিরোধী সামন্ত প্রভু ছিল না তা নয়, তবে তারা ছিল মুষ্টিমেয় সংখ্যক।

(ঘ) উৎপাদনের জন্য সংগ্রাম : যখন জাপানি সৈন্য ও কে.এম.টি. বাহিনী মুক্তাঞ্চলগুলি ঘিরে ফেলেছিল তখন সেখানকার সরবরাহ পথগুলি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ও সেখানকার জনসাধারণের জীবন অচল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সি.সি.পি. বাস্তব ব্যবস্থা হিসাবে সৈন্য থেকে আরম্ভ করে কৃষক পর্যন্ত সকলকে উৎপাদন করার জন্য নির্দেশ দিল। ১৯৪১ সালে এইট্‌থ রুট আর্মির ৩৫৯ নম্বর বাহিনী ঘন ও গভীর নান্নিওয়ান অরণ্যাঞ্চল পরিষ্কার করে সেখানে কৃষি খামার, গবাদি পশুর চারণক্ষেত্র, হস্তচালিত বস্ত্রশিল্প এবং কাঠকয়লার উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করে এক অসম্ভব কাজ সম্ভব করার নজির সৃষ্টি করেছিল। এছাড়া সমবায় পদ্ধতিতে হস্তশিল্প গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এরকমভাবে কৃষি সরঞ্জাম, বস্ত্র, কাগজ ঔষধ প্রভৃতি তৈরি হত।

(ঙ) নারী প্রগতির সূচনা : ইয়েনানের মুক্তাঞ্চলে নারীরা প্রশংসনীয় ভাবে বিভিন্ন কাজে যুক্ত হবার প্রয়াস দেখিয়ে প্রগতির সামিল হয়েছিলেন। সৈন্যদের দেখাশোনা করা, কৃষিকাজে সাহায্য করা, শিল্প সমবায়ে কাজ করা, কুটির শিল্পে যুক্ত থাকা প্রভৃতি কাজে গণতান্ত্রিক ঘাঁটি এলাকার মহিলারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। গ্রামাঞ্চলে নারী সংগঠনগুলি মেয়েদের সামাজিক ও পারিবারিক অত্যাচার থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করত। তারা স্বামী শ্বশুর শাশুড়ির অত্যাচার থেকে, রাজনৈতিক ও সামাজিক নিপীড়ন থেকে মেয়েদের রক্ষা করত। জোর করে দেওয়া বিয়ে ভেঙে দিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েরা সাধারণভাবে পিছিয়ে ছিল। স্থানীয় কমিটিগুলিতে মাত্র ৮ শতাংশ মেয়ে যেতে পেরেছিলেন। অল্প কয়েকজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলাই কেবলমাত্র পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করতে পেরেছিলেন।

(চ) ইয়েনান সংস্কৃতি : সি.সি.পি. ইয়েনানে ঘাঁটি তৈরি করার পর ইয়েনানে সাম্যবাদ (Yenan Communism) গড়ে তুলেছিলেন, যা রাশিয়ার পছন্দসই ছিল না। ফলে এরপর থেকে রাশিয়ার সঙ্গে চীনের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। কিন্তু পশ্চিমের বেশ কিছু কম্যুনিস্ট ব্যক্তিগত উদ্যোগে চীনে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ডাক্তার নর্মান বেথুন, যিনি কানাডা থেকে এসেছিলেন। ভিয়েতনাম, কোরিয়া ও জাপানের কম্যুনিস্টরাও সেই সময়ে ইয়েনানে এসেছিলেন, যেমন ভিয়েতনামের হো চি মিন বা জাপানের নোসাকা সাঞ্জো। নোসাকা জাপানি যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে একটি মার্কসীয় শিক্ষাশিবির গড়ে তুলেছিলেন। বিভিন্ন শহরের বুদ্ধিজীবীরা মুক্তাঞ্চলের গ্রামগুলিতে নিরক্ষরতা দূর করার কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে সি.সি.পি. আয়োজিত শিল্পী-সাহিত্যিকদের একটি ফোরামের সামনে মাও শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বর্জন করে জনগণের অবস্থান নিয়ে তাদের জন্যই সৃজনশীল কাজ করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

১০.১.১৭ কে.এম.টি.-সি.সি.পি. সংগ্রামের শেষ পর্যায়

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা : ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাপান আত্মসমর্পণ করল। দীর্ঘ আটবছর জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চীন জয়লাভ করল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনের গৌরব বৃদ্ধি পেল। কারণ চীন স্বৈরতন্ত্র ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে সংগ্রাম করেছিল। চিয়াং কাই শেকের নেতৃত্বাধীন

কে.এম.টি. দল এই সুযোগে আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল যার ফল হল চারবছর ব্যাপী এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। জাপানি আক্রমণের চাপে যে বিবাদ সুপ্ত ছিল, এখন তা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হল। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৯ সালে মাওয়ের নেতৃত্বে সি.সি.পি. কে.এম.টি.-কে চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করে ক্ষমতা দখল করল।

(ক) তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের পটভূমিকা : জাপান যুদ্ধের সময় কে.এম.টি. দল প্রচুর বিদেশি অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল। এখন তারা তা কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে উদ্যত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের বিশাল বাজার দখল করার জন্য কে.এম.টি.-কে মদত দিতে লাগল। এদিকে দীর্ঘ আটবছর যুদ্ধের পর চীনের সাধারণ মানুষ একটি শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক জীবনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। এই ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সি.সি.পি. ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত একটি ইস্তাহারে শান্তি, গণতন্ত্র ও ঐক্যের পথে গৃহযুদ্ধ এড়ানোর এবং কে.এম.টি. দলের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে চীনের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ঘোষণা করল। এই ঘোষণার সূত্র ধরে মাও চুংকিং-এ কে.এম.টি. নেতৃত্বের সঙ্গে মাসাধিক কাল ধরে আলাপ আলোচনা করেন। ১৯৪৫ সালের ১০ অক্টোবর কে.এম.টি.-সি.সি.পি. একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় যেকোনো মূল্যে গৃহযুদ্ধ এড়ানো হবে এবং ‘রাজনৈতিক আলোচনা সংক্রান্ত সম্মেলন’ আহ্বান করে দেশকে পুনর্গঠিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু কে.এম.টি. দল চুক্তি না মেনে সি.সি.পি.-র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত একটি কে.এম.টি. দলিল “Manual for the Suppression of the Communist Bandits” আবার চিয়াং সৈন্য বাহিনীর মধ্যে বিলি করার নির্দেশ দেন। আমেরিকান নীতিও গৃহযুদ্ধের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। আমেরিকান সেনাবাহিনীর প্রাক্তন প্রধান মার্শাল এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের নিজস্ব সচিব ডিন অ্যাচিসন চীন সফরে এসে ঘোষণা করলেন যে তাঁরা দুটি পরস্পর বিরোধী দলকে সমঝোতায় আনবেন এবং জাতীয়তাবাদী দলকে ক্ষমতায় আনবেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করার অর্থ দেশে আবার রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ অনিবার্য করে তোলা।

(খ) কে.এম.টি. সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা : জাপান বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটিগুলিতে একদল উদারপন্থী গণতান্ত্রিক মানুষ সি.সি.পি.-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে ডেমোক্রেটিক লীগ গঠন করেছিলেন। কিন্তু ডেমোক্রেটিক লীগের নরমপন্থী অংশ বেরিয়ে এসে “ইয়ং চায়না পার্টি” গঠন করেছিল। ১৯৪৬ সালে যে ‘রাজনৈতিক আলোচনা সংক্রান্ত সম্মেলন’ আহূত হয়েছিল তাতে ডেমোক্রেটিক লীগ ও সি.সি.পি.-র সম্মিলিত চাপে পাঁচটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। যেমন, এমন একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে হবে যেখানে প্রতিটি রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। কে.এম.টি. ও লালফৌজ ঐক্যবদ্ধভাবে একটি জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করবে। একটি জাতীয় আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনার পরে প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্তশাসন চালু করা হবে। কে.এম.টি. সরকার এই সমস্ত প্রস্তাবগুলি মানল না, উপরন্তু চুং কিং-এ আলোচনা সম্মেলনের একটি অধিবেশনে সৈন্য দ্বারা হামলা চালাল, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে অস্বীকার করল, কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র কার্যালয়গুলি ধ্বংস করল। কম্যুনিস্টরা তীব্র প্রতিবাদ করল কিন্তু কোনো প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করল না।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া ও মুকডেন দখল করে সেখানে মাঞ্চুকুয়ো সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে জাপানের আত্মসমর্পণের পর সোভিয়েত রাশিয়া মাঞ্চুকুয়ো সরকারকে নিজের প্রভাবাধীন করে তুলল। কে.এম.টি. সরকার এই অজুহাতে সি.সি.পি.র বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে লাগল। তারপর ১৯৪৬

সালের মার্চ মাসে সোভিয়েত বাহিনী মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করলে কে.এম.টি. বাহিনী তা দখল করে নিল। এবার আর সি.সি.পি. নিষ্ক্রিয় না থেকে প্রতি আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করল। অল্পকিছুদিনের মধ্যে সি.সি.পি. বাহিনী প্রায় সমগ্র উত্তর চীন দখল করে নিল।

সি.সি.পি. শুধু সামরিক আক্রমণের পথেই গেল না, তারা তাদের সংগ্রাম নীতিরও পরিবর্তন করল। ১৯৪৬-এর মাঝামাঝি সময়ে সি.সি.পি. নানকিং-এর সম্পদশালী ভূস্বামী শ্রেণির বিরুদ্ধে কৃষক জনতাকে সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এভাবে সি.সি.পি. যেমন অনিবার্য গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তেমন সামন্ততন্ত্র বিরোধী কৃষিবিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিল। যে সমস্ত ভূস্বামী ও সামন্তপ্রভু জাপানি আক্রমণকারীদের সাথে সহযোগিতা করেছিল সি.সি.পি. তাদের শাস্তিদানের দাবি তুলল। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে শ্লোগান উঠল কৃষকরাই হল জমির প্রকৃত মালিক। ভূস্বামী ও জমিদারদের ওপর চাপানো করের পরিমাণ বাড়ানো হল। যেইমাত্র জাপান আত্মসমর্পণ করল অমনি সি.সি.পি. ভূস্বামী সামন্তদের বিরুদ্ধে জঙ্গী কৃষক সংগ্রাম সমর্থন করতে শুরু করল।

(গ) কে.এম.টি. দলের পরাজয় : ১৯৪৬ সালের ২৬ জুন কে.এম.টি. বাহিনী সি.সি.পি. অধিকৃত মুক্তাঞ্চলগুলি আক্রমণ করতে শুরু করল। আমেরিকা প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও পরামর্শ দিয়ে কে.এম.টি.-কে সাহায্য করতে লাগল। 16 লক্ষ সৈন্য নিয়ে গঠিত কে.এম.টি. বাহিনী মুক্তাঞ্চল ঘিরে ফেলে সেখানে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করল। তখন সি.সি.পি. এক অভিনব রণকৌশল গ্রহণ করল। কম্যুনিস্ট বাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে মুক্তাঞ্চল সমূহের প্রধান শহরগুলি ছেড়ে চলে গেল। ফলে প্রায় সাত লক্ষ কে.এম.টি. সৈন্য সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ল। অথচ সি.সি.পি. বাহিনী সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পুরো শক্তি নিয়ে দক্ষিণ শানটুং, শেনসি ও ইয়াংসির নিম্ন উপত্যকায় জোরদার কে.এম.টি বিরোধী আক্রমণ চালিয়ে তাদের দুর্বল করে ফেলল। কে.এম.টি. দলকে এভাবে বিপর্যস্ত করে সি.সি.পি.র গণফৌজ তাদের উপর্যুপরি আক্রমণ করতে লাগল। ১৯৪৭ সালে ডিসেম্বর মাসে সি.সি.পি.-র কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় মাও একটি প্রতিবেদন পেশ করলেন যার শিরোনাম "The Present Situation and Our Tasks" , এতে মাও দাবি করলেন যে কে.এম.টি. দলের কুড়ি বছরের প্রতিবিপ্লবী শাসনের অবসান আসন্ন। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রিত কালাগান শহর দখল করে কে.এম.টি. দল একটি জাতীয় আইনসভা গঠন করে। কিন্তু সি.সি.পি. ও ডেমোক্রেটিক লীগকে অত্যন্ত অল্প আসন দেওয়ার জন্য প্রতিবাদস্বরূপ তারা ঐ আইনসভা বয়কট করল। একই বছরে ডিসেম্বর মাসে জাতীয় সভা একটি স্বৈরতন্ত্রী সংবিধান সৃষ্টি করে চিয়াং-এর হাতে অপ্রতিহত ক্ষমতা ন্যস্ত করল। এরপর কে.এম.টি. সরকারকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করার ডাক দিল।

(ঘ) কে.এম.টি. অধিকৃত অঞ্চলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন : সি.সি.পি. আক্রমণের চাপে ব্যতিব্যস্ত কে.এম.টি. সরকার নিজ স্বার্থরক্ষার তাগিদে আমেরিকার পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করল। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে চীন ও আমেরিকা যুক্তরাজ্যের মধ্যে যে বাণিজ্যিক, মিত্রতা ও নৌচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তার ফলে চিয়াং চীনের আঞ্চলিক, সামরিক, কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত চিয়াং পরিচালিত জাতীয়তাবাদী সরকার আমেরিকার কাছ থেকে প্রায় ৪০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সাহায্য লাভ করেছিল। মার্কিন পণ্যে কে.এণ.টি. অধিকৃত অঞ্চল ছেয়ে গিয়েছিল। গৃহযুদ্ধ চালানোর ব্যয় উশুল করার চেষ্টা হয়েছিল সাধারণ

মানুষের ওপর অত্যধিক কর চাপিয়ে। জাতীয় পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন বাণিজ্য ও শিল্প ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ল। কৃষিও প্রায় ধ্বংসের মুখে দাঁড়ালো। কে.এম.টি. চীনে এক চরম অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিল। এখানে অস্বাভাবিক হারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেল। অকল্পনীয় মুদ্রাস্ফীতি জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলল। এই অস্বাভাবিক ও অসহনীয় অর্থনৈতিক সংকট কে.এম.টি. চীনে ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলনের জন্ম দিল। শ্রমিক ও ছাত্র সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষ এই প্রতিবাদ আন্দোলনের সামিল হয়ে কে.এম.টি. সরকার ও মার্কিন সহায়কদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুললেন। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সাংহাইতে যে বিক্ষোভ মিছিল হল তার মূল দাবি ছিল "আমেরিকান ফৌজ চীন ছাড়"। ডিসেম্বর মাসে দোকানদারদের সরকার বিরোধী বিক্ষোভ নিষ্ঠুরভাবে দমন করল কে.এম.টি. পুলিশ। কে.এম.টি. চীনের গ্রামাঞ্চলে সাবেকি ধাঁচের যে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিল তার জঙ্গী চরিত্রের রূপটি জমিদার বিরোধী দাঙ্গা, খাজনাদানে অস্বীকৃতি এবং কর আদায়কারীদের ওপর আক্রমণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল। কিন্তু আগে এই কৃষক আন্দোলনগুলি পরিচালনা করত কেন্দ্রীয় আদেশপুষ্ট গুপ্ত সইমতিগুলি। কিন্তু এখন বিদ্রোহীরা মুক্তাঞ্চলের কম্যুনিস্ট নেতৃত্বাধীন কৃষক বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ করলেন। তাঁরা কে.এম.টি. মদতপুষ্ট সামন্ত শ্রেণির বিরুদ্ধে কৃষি বিপ্লব গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন।

(ঙ) ছাত্র আন্দোলন : ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে কে.এম.টি. অধিকৃত এলাকায় জঙ্গী ছাত্র আন্দোলন মাথাচাড়া দিল। এই আন্দোলন দমন করার জন্য কে.এম.টি. সরকার পুলিশ ও ফৌজের সাহায্য গ্রহণ করল। ১৯৪৭ সালের মে মাসে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সংকট, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ, মার্কিন সাম্রাজ্যের তাঁবেদারী প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন বড়ো শহরে জঙ্গী ছাত্র আন্দোলনের পুনরুত্থান ঘটল। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ চিয়াং সরকার তৎক্ষণাৎ Provisional Measures for the Maintenance of Order নামে একটি আইন পাশ করে ধর্মঘট, মিছিল. বিক্ষোভ ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে দেয়। অক্টোবর মাস চিয়াং যখন ডেমোক্রেটিক দলটি ভেঙে দিলেন তখন ঐ স্বৈরাচারী আচরণে কে.এম.টি. দল সম্পর্কে যাবতীয় মোহ ভঙ্গ হল। এঁদের অধিকাংশ সি.সি.পি.-র সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। অবশিষ্টাংশ এবং কে.এম.টি. অপশাসন উচ্ছেদ এবং মার্কিন অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য সি.সি.পি.র সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার কথা ঘোষণা করলেন। চীনা কৃষক ও শ্রমিক দলের মতো গণতান্ত্রিক দলগুলিও কে.এম.টি. বিরোধী রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এইভাবে সি.সি.পি.-র নেতৃত্বে একটি জনগণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠল। ১৯৪৮ সালের ১ মে সি.সি.পি. একটি নতুন 'জনগণের রাজনৈতিক আলোচনা সংক্রান্ত সম্মেলন' আহ্বান করার কথা ঘোষণা করল। বলা হল যে এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক মোর্চা সরকার গঠিত হবে এবং সেখানে কে.এম.টি. স্বৈরাচারীরা স্থান পাবে না। বিভিন্ন স্তরের গণতান্ত্রিক মানুষ এই প্রয়াসকে স্বাগত জানাল।

১০.১.১৮ তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধে কম্যুনিস্টদের বিজয়

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে গণমুক্তি ফৌজ কে.এম.টি. বাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত বড়ো বড়ো শহরগুলি দখল করে নিল। ফলে ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে কে.এম.টি. সরকারের অভ্যন্তরীণ শাসন দুর্বল হয়ে পড়ল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনটি বড়ো সফল সামরিক অভিযানের দ্বারা প্রায় সমগ্র উত্তর চীন গণফৌজের দখলে চলে এল। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সি.সি.পি. কেন্দ্রীয় কমিটির

দ্বিতীয় প্লেনারি অধিবেশনে মাও কম্যুনিস্ট কর্মীদের শহরাঞ্চলে তাদের কাজের পরিধি বাড়ানোর আহ্বান জানালেন। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগের মধ্য দিয়ে একটি জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং চীনকে সমাজতন্ত্রের পথে উত্তরণের বিষয় নিয়েও ঐ অধিবেশনে বিশদ আলোচনা হয়।

পরাজয়ের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে চিয়াং সি.সি.পি.-র কাছে শান্তির প্রস্তাব পাঠালেন। সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ থেকে জানুয়ারি ১৯৪৯ পর্যন্ত চিয়াং সরকারের ১৫ লক্ষ সৈন্য প্রাণ হারিয়েছিল। এমতাবস্থায় কে.এম.টি.-র শান্তিকামী দল চিয়াংকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করল। চিয়াং ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি পদত্যাগ করলেন, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি লি সুং জেন দক্ষিণ চীনে জাতীয়তাবাদীদের অধিকার বজায় রাখার আশায় সি.সি.পি.-র সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাতে লাগলেন। কিন্তু মাও কোনোরকম আপোষ মীমাংসার কথা অগ্রাহ্য করলেন। ১৯৪৯ সালের ২১ এপ্রিল তাঁর সেনাবাহিনী ইয়াংসি নদী অতিক্রম করে দক্ষিণ চীনে উপনীত হল এবং তিনদিন পর কে.এম.টি. সরকারের প্রধান কর্মকেন্দ্র নানকিং অধিকার করে নিল। কে.এম.টি. সরকারের কর্মকেন্দ্র তখন ক্যান্টনে স্থানান্তরিত হল। সাম্যবাদীরা এখন চীনে আর কোনো বাধার সম্মুখীন হল না। ১৯৪৯ সালে ১ অক্টোবর কার্যত চীন বিজয়ের আগে মাও চীনা জনগণতন্ত্রে (Reoples' Republic of China) প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করলেন। জাতীয়তাবাদী সরকার ১৯৪৯ সালের ১৩ অক্টোবর ক্যান্টন ত্যাগ করে চুংকিং-এ কর্মকেন্দ্র স্থাপন করল। ১৯৪৯ সালের ১৩ অক্টোবর জাতীয়তাবাদী সরকার ক্যান্টন ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে ফরমোজায়, বর্তমান তাইওয়ানে প্রতিষ্ঠিত হল। তখন সাম্যবাদীদের সমগ্র চীনা ভূখণ্ড বিজয় সম্পূর্ণ হল। দীর্ঘ ২৮ বছর (১৯২১-৪৯) সংগ্রামের পর মাও সে তুং ক্ষমতার শীর্ষাসন গ্রহণ করতে সক্ষম হলেন।

১০.১.১৯ মাও-র সাফল্যের কারণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও আর্থিক সাহায্যপুষ্ট চিয়াং কাই শেককে পরাস্ত করার সম্ভাবনা প্রথম দিকে সুদূর পরাহত ছিল। মাও-র না ছিল আর্থিক সঙ্গতি না ছিল উপায় উদ্ভাবনের সম্ভাবনা। তদুপরি সোভিয়েত রাশিয়া প্রথম দিকে চিয়াংকে সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জোরে জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন আদায় করে শেষ পর্যন্ত মাও বিজয়ী হন। দেশের কাছে মাও-এর দুটি আবেদন—বিদেশি সাম্রাজ্যবাদিতার বিরোধিতা এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রবর্তন চীনা জাতির অন্তর স্পর্শ করেছিল। এক শক্তিশালী চীন গঠিত হবে— যেখানে কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকবে না—মাও-এর এই আদর্শ চীনা জনগণের এতই মনঃপুত হয়েছিল যে তারা মাওকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করেছিল। ফলে মাও-এর ক্ষেত্রে সাফল্য হয়ে উঠেছিল অনিবার্য। মাও সঠিকভাবে নির্ধারণ করেছিলেন যে কৃষিপ্রধান চীনে কৃষকদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। তাই কৃষকদের স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তিনি কৃষক সম্প্রদায়ের পূর্ণ ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। কৃষকরা লাল ফৌজের সাথে মিলিত হয়ে কে.এম.টি. বাহিনীকে পরাভূত করেছিলেন। এছাড়া মাও কতকগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়িত করেছিলেন। যেমন, ভূমি-সংক্রান্ত সংস্কার-সাধন, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদিতার অবসান, সেনাবাহিনীতে নিয়মানুবর্তিতা ও আজ্ঞাধীনতা প্রবর্তন, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সৎ কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি। এর ফলে মাও জনসাধারণের আস্থা ও সমর্থন আদায় করেছিলেন। অন্য দিকে চিয়াং প্রশাসন ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত। তা কোনো সদর্থক কর্মসূচি বা ভবিষ্যতের সন্ধান দিতে পারেনি।

চিয়াং প্রশাসন নগরকেন্দ্রিক হওয়ার ফলে গ্রামের ওপর শহরের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার আশঙ্কায় কৃষক সম্প্রদায়ের কাছে তা গ্রহণযোগ্য ছিল না। কে.এম.টি. সেনাদলও শেষ পর্যন্ত চিয়াং সরকারের প্রতি অনুগত ছিল না। কারণ জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য স্পষ্ট কারণ ছিল, কিন্তু গৃহযুদ্ধের কোনো কারণ সেনাদলের বোধগম্য হয়নি। ফলে তাদের মধ্যে যুদ্ধ করার কোনো উৎসাহ ছিল না। তদুপরি তাদের ছিল প্রয়োজনীয় খাদ্যাভাব, প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণের অভাব। ফলে তারা স্বাভাবিকভাবেই সাম্যবাদী সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেছিল। এ সমস্ত কিছু সাম্যবাদীদের নৈতিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি করেছিল। ফলে, সাম্যবাদীদের সাফল্য অবধারিত হয়ে উঠেছিল।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মাওবাদী চীনের উত্থানের অভিঘাত : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে মাওবাদী তথা সাম্যবাদী চীনের উদ্ভব সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা কিন্তু তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল নয়। তবে, যুদ্ধের ফলে চিয়াং কাই শেকের জাতীয়তাবাদী সরকারের দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়েছিল। দরিদ্র ও কৃষক শ্রেণির দুর্দশা বৃদ্ধি পাবার ফলে চিয়াং কাই শেককে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভবপর হয়েছিল। এর ফলে ঔপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে চীন একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে অভূতপূর্ব এক রাজনৈতিক অভিজ্ঞান লাভ করেছিল। তাই একদিকে চীন যেমন তার রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হল, অপরদিকে এশিয়া, অফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা অত্যাচরিত জনগণের সঙ্গে একাত্মবোধ করতে লাগল। কে.এম.টি. পরিচালিত জাতীয়তাবাদী সরকারের প্রতি আমেরিকা অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিল। তাই জাপানি আক্রমণ রোধ করার জন্য এবং অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের জন্য আমেরিকা চীনকে বহু অর্থ ও সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করেছিল। কিন্তু মাও পরিচালিত সাম্যবাদী দল যখন চীনে ক্ষমতা দখল করল তখন স্বাভাবতই আমেরিকা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত বোধ করল। আমেরিকা ও চীনের সম্পর্কের অবনতি ঘটল অনিবার্যভাবে। এর প্রতিফলন দেখা গেল কোরিয়ার যুদ্ধে। মার্কিন প্রভাবিত দক্ষিণ কোরিয়া সোভিয়েত প্রভাবিত উত্তর কোরিয়া দখল করে সোজা চীন সীমান্তে উপনীত হল। বিপন্ন ও ভীত চীন উত্তর কোরিয়ার সাহায্যার্থে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পাঠাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আমেরিকা উত্তর কোরিয়া তো বটেই দক্ষিণ কোরিয়ার একাংশ কম্যুনিস্টদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। ইন্দোচীনেও প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। সেখানে উত্তরাংশে হো চি মিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত কম্যুনিস্ট ভিয়েতমিনকে স্বীকৃত দিল চীন, সোভিয়েত রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট দেশসমূহ। রুষ্ট আমেরিকার প্ররোচনায় রাষ্ট্রসংঘ থেকে চীন বিতাড়িত হল। শুধু তাই নয়, চীনের জাতীয়তাবাদী সরকারের অধীনস্থ ফরমোজা ও তার পার্শ্ববর্তী দ্বীপগুলি আমেরিকান নৌ ও সামরিক সুরক্ষায় ছিল বলে কম্যুনিস্ট সরকার কখনোই এই অঞ্চলগুলি অধিকার করতে পারল না। ফলে চীন ও আমেরিকা পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে রইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার স্বাভাবিক বন্ধুত্ব রূপ পেয়েছিল ১৯৫০ সালে স্বাক্ষরিত মৈত্রী ও পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তিতে। মনে হয়েছিল যে রাশিয়া ও চীন মিলে একটি দৃঢ় শক্তিজোট গঠন করবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই শক্তিজোট মোটেও স্থায়ী হল না। কারণ, সাম্যবাদের প্রসারের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিরোধের সূচনা হল, যার জন্য রাশিয়া চীনকে পারমাণবিক অস্ত্র ধার দিতে চাইল না। তবুও ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চীনের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। এমনকি ১৯৫৭ সালের ১৫ অক্টোবর সোভিয়েত রাশিয়া চীনকে আনবিক অস্ত্র প্রস্তুতিতে সহায়তা করতে রাজি ছিল। চীনও হাঙ্গেরিতে বিদ্রোহ দমনে সোভিয়েত রাশিয়ার নীতি সমর্থন করেছিল। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের

নভেম্বরে মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কম্যুনিস্ট সম্মেলনেও চীন সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ব্যক্ত করেছিল।

চীনে গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর তার নিজের পাশ্চাত্য বিরোধিতার সঙ্গে এশিয়া, আফ্রিকার সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলির পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি মিলে গিয়েছিল। কিন্তু চীন সহযোগিতামূলক নীতির পাশাপাশি আধিপত্যমূলক মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়েছিল। ভারতের সঙ্গে চীনের সম্পর্কে এই সহযোগিতা ও সংঘাতের দ্বৈত চরিত্রের আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটেছিল। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চশীল নীতির ভিত্তিতে চীন ও ভারতের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। ১৯৫৫ সালে বান্দুং সম্মেলনে এশিয়া ও আফ্রিকার ২৯ টি দেশ যোগদান করেছিল। এই সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পঞ্চশীলের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছিলেন। চৌ এন লাই আরো বলেছিলেন যে সমচিন্তার সন্ধানের জন্যই চীন এই সম্মেলনে যোগদান করেছে। এরপর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনের মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। মধ্য প্রাচ্যের রাজনীতি অশান্ত হয়ে উঠলে চীন আরব জাতীয়তাবাদের পক্ষ সমর্থন করল। ১৯৫৬ সালে মিশরের উপর ইজরায়েল, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যৌথ আক্রমণের বিরুদ্ধে মিশরকে চীন সমর্থন করেছিল। কিন্তু এর পাশাপাশি চীন এশিয়ার রাজনীতিতে পেশী শক্তির প্রয়োগ করেছিল। তিব্বতের উপর চীন বলপূর্বক আধিপত্য স্থাপন করেছিল। ভারতের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হল, যার পরিণতিতে ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধ শুরু হল। এসবের মধ্যে দিয়ে এশিয়াতে চীনের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার তাগিদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

১০.১.২০ উপসংহার

এক অভূতপূর্ব ক্রান্তিকালে পূর্ব এশিয়ার আধুনিক যুগ শুরু হয়েছিল। একদিকে ছিল আধুনিক শিল্পবিজ্ঞানে শক্তিশালী নবীন পাশ্চাত্য, অপরদিকে ছিল প্রাচীন ঐতিহ্যের অচলায়তনে বন্দী চীন। ফলে সংঘাত ছিল অনিবার্য। এই সংঘাতে চীনের পক্ষে জয়ী হবার একমাত্র উপায় ছিল পুরোনো ঐতিহ্যের মোহ ত্যাগ করে পশ্চিমের আধুনিক ভাবধারা ও রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থা নিজের প্রয়োজনানুযায়ী আত্মস্থ করা। এই কঠিন কাজটি চীন করেছিল বিলম্বিত লয়ে। তাই তার দুঃখ হয়েছিল দীর্ঘস্থায়ী। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ছাড়াও সামন্ততান্ত্রিক অপশাসন ও বিভিন্ন অঞ্চলে গণবিদ্রোহের ফলে চীনের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল। তখন চীনে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল প্রাচীনপন্থী ও কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের প্রতিরোধে সংস্কার আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। তবে ততদিনে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা বিশেষত বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র সম্প্রদায় সামন্ততান্ত্রিক শোষণে দীর্ণ সমাজশৃঙ্খল ভাঙার প্রয়োজন অনুভব করেছিল। এর পরিণতি হল ৪ মের আন্দোলন, যা নতুন সংস্কৃতি অধিগত করার জন্য চীনকে যোগ্য করে তুলেছিল। এই আন্দোলনের শেষে দুটি রাজনৈতিক দলের সক্রিয়তা শুরু হয়। দুটি দলই জাতির মুক্তিসাধনা করতে গিয়ে পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত হয়। এই বিবাদে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় সাম্যবাদী দল। এর নেতৃত্বে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে চীন সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

১০.২ সারাংশ

উনবিংশ শতাব্দীতে চীনের সঙ্গো পশ্চিমী শক্তিবর্গের সংযোগ ঘটেছিল, ফলে চীনে আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর চীনে একইসঙ্গো জাতীয়তাবাদ ও সাম্যবাদের জন্ম হয়েছিল। ড: সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে ১৯১১ সালের বিপ্লব চীনে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু প্রজাতন্ত্র স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে অভ্যস্ত চীনে শিকড় বিস্তার করতে পারার আগেই জঙ্গী সমর নায়করা ক্ষমতা দখল করল। কিন্তু তাদের অপশাসনে অতিষ্ঠ চীনা জনসম্প্রদায় নতুন ভাবাদর্শ গ্রহণ করতে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। এইভাবে চীনে সাম্যবাদ এক উর্বর জমি লাভ করেছিল। চৌঠা মে'র সংস্কারকামী আন্দোলন সাম্যবাদের প্রসারে সহায়তা করেছিল। সান ইয়াৎ সেনের কুয়োমিনতাং দল সাম্যবাদীদের সঙ্গো ঐক্যবদ্ধ হয়ে চীনের সমরনায়কদের বিনাশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যু কুয়োমিনতাং দল কম্যুনিস্টদের উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল। ইতিমধ্যে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করল। চিয়াং জাপানি জঙ্গীদের দ্বারা কম্যুনিস্টদের ধ্বংস করার চিন্তা করলেন। এদিকে সাম্যবাদী দলের মধ্যেও গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কার্যকারিতা ক্রমশ মাও সে তুং-এর পদ্ধতিকে সঠিক প্রমাণিত করল। মাও হয়ে উঠলেন, কম্যুনিস্ট দলের অবিসংবাদিত নেতা। মাও-এর অনবদ্য নেতৃত্ব চীনা জনগণের মধ্যে এক নতুন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা নিয়ে এল। মাও-এর গেরিলা যুদ্ধ নীতি পরাক্রান্ত জাপানকে পর্যুদস্ত করে তুলল। মাও-এর নেতৃত্বাধীন নতুন চেতনায় উদ্ভাসিত জনসাধারণ একই সঙ্গো পরাস্ত করল চিয়াং কাই শেকের জাতীয়তাবাদী সরকারকে এবং জাপানি জঙ্গী আক্রমণকে। জনসমর্থিত চীনা গণপ্রজাতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র এবং ঔপনিবেশিকতার দুঃস্বপ্ন মুছে ফেলে নতুন দিনের স্বপ্ন সফল করল।

১০.৩ অনুশীলনী

প্রশ্নাবলি ও উত্তর সংকেত

১. উনবিংশ শতাব্দীতে চীনের সঙ্গো পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শের ফলাফল কি হয়েছিল?
উ: ২.১.১, ২.১,২, ২.১.৩. অনুচ্ছেদ দেখুন।

২. ড: সান ইয়াৎ সেনের কর্মজীবনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
উ: ২.১.৪, ২.১.৫ অনুচ্ছেদ দুটি দেখুন।

৩. ১৯১১ সালে বিপ্লবের তাৎপর্য কি? এই বিদ্রোহ কেন ব্যর্থ হয়েছিল?
উ: ২.১.৬ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪. চীনে প্রথম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস কিভাবে ব্যর্থ হল?
উ: ২.১.৬ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৫. চীনে কম্যুনিজম্ প্রসারের প্রথম পর্যায়ে রাশিয়ার ভূমিকা কি ছিল?
উ: ২.১.৭ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৬. প্রথম দিকের চীনা কম্যুনিস্ট নেতাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
উ: ২.১.৭ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৭. সমর নায়কদের শাসনকাল চীনের ইতিহাসে কি অবদান রেখেছিল?
উ: ২.১.৮ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৮. চৌঠা মে'র আন্দোলন কেন হয়েছিল? কিভাবে চীনের জনজীবন এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল?
উ: ২.১.৯ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৯. সান ইয়াৎ সেনের ওপর রাশিয়ার প্রভাব কতখানি ছিল তা বিশ্লেষণ করুন। সান কেন কম্যুনিস্টদের সাথে সমঝোতা করার পক্ষপাতী ছিলেন?
উ: ২.১.১০ অনুচ্ছেদ দেখুন।

১০. আপনি কি মনে করেন যে কুয়োমিনতাং ও কম্যুনিস্টদের বিরোধ অনিবার্য ছিল? এ বিষয়ে আপনার মতামত দিন।
উ: ২.১.১১ অনুচ্ছেদ থেকে লিখুন। এ ছাড়াও ২.১.১০ অনুচ্ছেদের সাহায্যে উত্তর তৈরি করুন।

১১. কে.এম.টি.-কম্যুনিস্টদের বিচ্ছেদ কিভাবে ঘটল? কেন এই বিরোধ ও বিচ্ছেদ ঘটেছিল?
উ: ২.১.১১ অনুচ্ছেদ দেখুন।

১২. নানকিং সরকারের সমস্যা কিভাবে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতিতে সাহায্য করেছিল?
উ: ২.১.১২ অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৩. মস্কোপন্থী কম্যুনিস্টদের ব্যর্থতা কিভাবে মাও-সে তুংয়ের উত্থানে সাহায্যকরেছিল?
উ: ২.১.১২ অনুচ্ছেদের (ঘ) ও (ঙ) অংশ দেখুন।

১৪. কোন পটভুমিকায় 'লং মার্চ' হয়েছিল? এরতাৎপর্য কি ছিল?
উ: ২.১.১৩ এবং ২.১.১৪ অনুচ্ছেদের যথাযথ সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এই উত্তরটি লিখবেন।

১৫. কেন কে.এম. টি.-সি.সি.পি. যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠেছিল? কেন তা স্থায়ী হতে পারল না?
উ: ২.১.১৫এবং ২.১.১৬ অনুচ্ছেদ মিলিয়ে উত্তর তৈরি করুন।

১৬. জাপানি আক্রমণের মোকাবিলা মাও সে তুং-এর নেতৃত্বকে সর্বজনগ্রাহ্য করেছিল--আপনি কি এই মত গ্রহণ করবেন?
উ: ২.১.১৬ (ক)অংশ থেকে উত্তর দিন।

১৭. ইয়েনানের নতুন ব্যবস্থা কি কি নতুনত্ব এনেছিল? একে কি আপনি গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের পদধ্বনি বলবেন?
উ: ২.১.১৬ (খ), (গ), (ঘ),(ঙ) ও (চ) অংশগুলি সংযোজন করে উত্তর দেবেন।

১৮. কিভবে শেষপর্যন্ত মাও-এর নেতৃত্বে সি.সি.পি. জয়ী হল তার বিবরণ দিন। বিশ্লেষণ করুন কেন মাও সফল হয়েছিলেন?
উ: ২.১.১৭ এবং ২.১.১৮ অনুচ্ছেদের বিভিন্ন অংশগুলি থেকে উত্তরের পক্ষে প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি চয়ন করুন। প্রশ্নের শেষাংশের জন্য ২.১.১৯ অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৯. গণপ্রজাতন্ত্রী চীন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কি প্রভাব বিস্তার করেছিল?

উ: ২.১.১৯ অনুচ্ছেদ থেকে উত্তর লিখুন।

১০.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১. চীনের ইতিহাস—ডঃ হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

২. চীন ও জাপানের ইতিহাস—ডঃ সিদ্ধার্থ গুহরায়।

৩. আধুনিক যুগে পূর্ব এশিয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—শ্রীদেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

৪. A History of the Far East in Modern Times—Harold M. Vinacke.

৫. East Asia— The Modern Transformation—Fairbank and others.

৬. The Far East—Clyde and Beers.

৭. China from the Opium War to the 1911 Revolution—Jean Chesneaux and others.

একক ১১ ❐ ঠান্ডা যুদ্ধের উদ্ভব এবং তার বিবর্তন

গঠন

১১.১ উদ্দেশ্য
১১.২ প্রস্তাবনা
১১.৩ ঠান্ডা যুদ্ধ : সংজ্ঞা
১১.৪ ঠান্ডা যুদ্ধের পটভূমি
১১.৫ ঠান্ডা যুদ্ধের উদ্ভব—প্রসার
১১.৫.১ ইরান, গ্রীস এবং তুর্কী সংকট
১১.৫.২ ঠান্ডা যুদ্ধের প্রসার : ইউরোপ
১১.৫.৩ ঠান্ডা যুদ্ধের প্রসার : এশিয়া
১১.৫.৪ পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্কের উন্নতি এবং নব্য ঠান্ডা যুদ্ধ (Neo Cold War)
১১.৫.৫ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান
১১.৬ ঠান্ডা যুদ্ধের উদ্ভবের দায়িত্ব
১১.৭ সারাংশ
১১.৮ অনুশীলনী
১১.৯ উত্তরসংকেত
১১.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি আপনাকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্যায়ে, বিশ্বরাজনীতির অন্যতম সমস্যা ঠান্ডা যুদ্ধ (cold war) সম্বন্ধে অবহিত করাবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন—

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানে বিশ্ব রাজনীতির পরিস্থিতি।
- বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশ্বশক্তি (Super Power) হিসাবে উত্থান।
- বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বাড়াবার উদ্দেশ্যে উভয় দেশের দ্বন্দ্ব।
- ঠান্ডা যুদ্ধের প্রসারের ধারা।
- ঠান্ডা যুদ্ধ উদ্ভবের দায়িত্ব।

১১.২ প্রস্তাবনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে, বিশ্বরাজনীতিতে এক সংকটময় পরিস্থিতির সূচনা হয়। মিত্র-শক্তি গোষ্ঠীর দ্বারা অক্ষ-শক্তি গোষ্ঠীর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটলেও মিত্র-জোটের অন্তর্ভুক্ত প্রধান ইউরোপীয় দেশগুলিও ভীষণভাবে

দুর্বল হয়ে পরে। গ্রেট ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের মতন বৃহৎ সাম্রাজ্যশালী দেশগুলিও এর ব্যতিক্রমী ছিল না। এর ফলে ১৯৪৫ সালের পর বিশ্বরাজনীতিতে ইউরোপীয় শক্তিগুলির আধিপত্যের অবসান ঘটে। এদের পরিবর্তে, বিশ্বরাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তারের সচেষ্ট হয় দুই নতুন শক্তি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন। অচিরেই এই আধিপত্য এবং নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার প্রচেষ্টা বিশ্বরাজনীতিতে এক নতুন দ্বন্দ্ব সম্পর্কের সৃষ্টি করে যাকে 'ঠান্ডা যুদ্ধ' বলে অভিহিত করা হয়। এই এককের অন্যান্য অংশে ঠান্ডা যুদ্ধ কিভাবে বিশ্বরাজনীতির অন্যতম সমস্যা হয়ে ওঠে তার আলোচনা করা হয়েছে।

১১.৩ ঠান্ডা যুদ্ধ : সংজ্ঞা

ঠান্ডা যুদ্ধ বলতে আমরা সাধারণত একটি দীর্ঘমেয়াদী, দ্বন্দ্বমূলক পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বুঝি। বিশ্ব ইতিহাসে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে 'ঠান্ডা যুদ্ধ' কথাটির ব্যবহার, বিংশ শতাব্দীর আগেও লক্ষ্য করা যায়। 'ঠান্ডা যুদ্ধ' কথাটির প্রথম ব্যবহার আমরা চতুর্দশ খ্রিস্টাব্দের স্পেনীয় লেখক ডন জুয়ান ম্যানুয়েলের (Don Juan Manuel) লেখায় পাই। ম্যানুয়েল তৎকালীন খ্রিস্টীয় এবং ইসলামীয় সভ্যতার মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ (Crusade) আলোচনার প্রসঙ্গে এই কথাটির ব্যবহার করেন।

পরবর্তীকালে 'ঠান্ডা যুদ্ধ' কথাটির প্রয়োগ এই ধরনের কোনো দীর্ঘমেয়াদী দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক বোঝাতে ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন, উনবিংশ খ্রিস্টাব্দের শেষার্ধে এবং বিংশ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে সামরিক প্রতিযোগিতা এবং উপনিবেশ দখলের লড়াই বোঝাতে 'ঠান্ডা যুদ্ধ' কথাটির আরো ব্যাপক প্রয়োগ করা হয়। পরবর্তীকালে অবশ্য, ঠান্ডা যুদ্ধ বলতে মূলত দুই বিশ্বশক্তির দ্বন্দ্ব বোঝানো হয়। ১৯৭০-এর দশকে উভয় দেশের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক (Detenté) স্থাপনের চেষ্টা কিছুমাত্রায় সফল হয়। কিন্তু ১৯৮০-এর দশকে, সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক আফগানিস্থানে সেনা প্রেরণ করা (১৯৭৯-৮০) এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগন (Ronald Reagon) পুনরায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুধে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করার ফলে ঠান্ডা যুদ্ধের একটি নতুন পর্যায় শুরু হয়, যাকে অনেকে 'নব্য ঠান্ডা যুদ্ধ' বা 'Neo Cold War' বলে অভিহিত করেন।

১৯৮০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য ঠান্ডা যুদ্ধ সংক্রান্ত রেষারেষির অনেকখানি পরিসমাপ্তি ঘটে। এই রেষারেষি বন্ধ করার মূল উদ্যোগ নেন তৎকালীন সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি মিখাইল গোর্বাচেভ (Mikhael Gorbachev). ১৯৯১ সালের পরবর্তীকালে অবশ্য বিশ্বরাজনীতিতে আরো ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এর মধ্যে অন্যতম হল সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন। এর ফলে ১৯৯১ সালে মার্কিন-সোভিয়েত ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তি হয়।

১১.৪ ঠান্ডা যুদ্ধের পটভূমি

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ঠান্ডা যুদ্ধ উদ্ভবের পেছনে মূল কারণ হলো, মার্কিন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক। এই দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরো ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হলেও এর অনেক আগেই এই দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের সূচনা হয়।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমী ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তৎকালীন পরিস্থিতিতে অনেকেই ভেবেছিলেন যে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, বিশ্ববিপ্লবের (World Revolution) প্রথম পদক্ষেপ। রাশিয়ায় বহু প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা, যেমন, ট্রটস্কি (Trotsky) সেই সময় 'বিশ্ব বিপ্লবের কথা' বলেছিলেন এবং পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকদের বিপ্লব অনুষ্ঠিত করার কথা বলতেন। এর ফলে, পশ্চিম ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি মহলের অনেকেই সোভিয়েত নীতি সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। মার্কিন সরকার নতুন সমাজতান্ত্রিক সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে এবং মার্কিন স্বরাস্ট্র দপ্তর একটি 'রাশিয়া বিভাগ' খোলে। পূর্ব ইউরোপে ল্যাটভিয়ার (Latvia) রাজধানী রিগায় (Riga) একটি মার্কিন তথ্য সংগ্রহকারী দপ্তর খোলা হয় মূলত সোভিয়েত সরকারি কার্যকলাপের ওপর নজর রাখবার উদ্দেশ্যে। ১৯২০-র দশকের পরবর্তীকালে অবশ্য বিশ্বরাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত সরকারের সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। রাশিয়া বিশ্ব বিপ্লবের নীতি ঘোষণা থেকে নিজেকে বিরত করে। অপরদিকে, পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলি নতুন সোভিয়েত সরকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৩৩ সালে সোভিয়েত সরকারকে এই স্বীকৃতি প্রদান করে। এছাড়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন লীগ অফ্ নেশনস-এর (League of Nations) সদস্যপদ লাভ করে।

এই ধরনের সহযোগিতা অবশ্য পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং সন্দেহের পরিবেশকে সম্পূর্ণ নির্মূল করতে অক্ষম হয়। ১৯৩০-এর দশকে স্তালিনের উত্থান এবং তাঁর দ্বারা বিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠী নির্মূল করার নীতিপ্রয়োগ, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে আবার শঙ্কিত করে তোলে। এর ফলে, সোভিয়েত ইউনিয়ন শেষ পর্যন্ত নাৎসী জার্মানির সঙ্গে একটি অনাক্রমণ চুক্তি (Non Aggression Pact), ১৯৩৯ সালে স্বাক্ষর করে। এর ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে (১৯৩৯-৪১) সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে। এছাড়া, জার্মানির সঙ্গে সহযোগিতা করে রাশিয়া, পূর্ব পোল্যান্ডের কিছু এলাকা এবং ফিনল্যান্ড দখল করে নেয়।

১৯৪১ সালে জার্মানি, সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার ফলে অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন মিত্র পক্ষে যোগদান করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এক নতুন মাত্রা লাভ করে। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, নাৎসী জার্মানির নেতৃত্বাধীন অক্ষশক্তিকে ধ্বংস করার কাজে নিজেদের নিযুক্ত করে। মিত্র শক্তির এই বৃহৎ জোটকে ব্রিটেনের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী চার্চিল 'গ্র্যান্ড এলায়েন্স' (Grand Alliance) বলে অভিহিত করেছিলেন। মিত্র জোট শেষপর্যন্ত অক্ষ-জোটকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করায় ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি এবং নাৎসী জার্মানির পরাজয় ইউরোপে একটি রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি করে। মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী যা 'লাল ফৌজ' (Red Army) নামে অধিক পরিচিত ছিল, নাৎসী বাহিনীকে পরাজিত করে। নাৎসী বাহিনীর পরাজয়ের পর, লাল ফৌজের সাহায্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করে। এই দেশগুলির মধ্যে প্রধান ছিল, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, রুমেনিয়া এবং পূর্ব জার্মানি। অল্প সময়ের মধ্যে, এই দেশগুলিতে সোভিয়েত প্রভাবিত সরকার স্থাপিত হয় এবং অ-কমিউনিস্ট বিরোধী গোষ্ঠীগুলিকে নির্মূল করা হয়। পূর্ব ইউরোপ এইভাবে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে ওঠে।

অপরদিকে, পশ্চিম ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক দেশগুলিও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে মার্কিন অনুদানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এর ফলে, এই অঞ্চলে মার্কিন আধিপত্য স্থাপিত হয়।

ইউরোপ এবং পরবর্তীকালে বিশ্বরাজনীতির মানচিত্রে নিজেদের প্রভাবশীল অঞ্চল গড়ে তোলার চেষ্টা উভয় পক্ষের দ্বন্দ্ব আরো তীব্র করে তোলে।

১১.৫ ঠান্ডা যুদ্ধের উদ্ভব—প্রসার

১৯৪৫-৪৬ সালের মধ্যে মিত্র জোটের সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক ভেঙে পড়তে শুরু করে। মার্কিন জোট এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন পরস্পরের বিরুদ্ধে আগ্রাসী নীতি গ্রহণের অভিযোগ আনে। প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ৫ মার্চ ১৯৪৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে একটি ভাষণে বলেন :

"বল্টিক অঞ্চলের স্টেটন থেকে এড্রিয়াটিক অঞ্চলের ট্রাস্টে পর্যন্ত মহাদেশের মাঝামাঝি এক লৌহ যবনিকা নেমে এসেছে। সেই যবনিকার পেছনে মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপের প্রাচীন রাষ্ট্রগুলির সব রাজধানী অবস্থিত। ওয়ারশ, বার্লিন, প্রাগ, ভিয়েনা, বুদাপেস্ট, বেলগ্রেড, বুখারেস্ট এবং সোফিয়ার মতো বিখ্যাত শহরগুলি তাদের জনগণসমেত, সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে এবং সবার ওপর কোনো না কোনোভাবে মস্কোর নিয়ন্ত্রণ ক্রমবর্ধমান।"[১]

এই ভাষণের উত্তরে প্রাভদা (Pravda) সংবাদপত্রে ১৩ মার্চ ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত একটি সাক্ষাতকারে স্তালিন, মার্কিন এবং ব্রিটিশ সরকারের ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করার অভিযোগ করেন।

এই দ্বন্দ্ব উভয় পক্ষের মধ্যে এক ক্ষমতা বিস্তারের প্রতিযোগিতার জন্ম দেয়। এই দ্বন্দ্বের সূচনা প্রথম লক্ষ করা যায় তিনটি অঞ্চলে ইরান, তুরস্ক এবং গ্রীস।

১১.৫.১ ইরান, গ্রীস এবং তুর্কী সংকট

ইরান—বিশ্ব রাজনীতির মানচিত্রে ইরান সহ পশ্চিম এশিয়ার গুরুত্ব প্রধানত তার অবস্থান এবং খনিজ সম্পদের জন্য। এর ফলে উনবিংশ খ্রিস্টাব্দ থেকেই ঔপনিবেশিক দেশগুলি ইরানের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করার চেষ্টা শুরু করে, যাদের মধ্যে অন্যতম ছিল ব্রিটেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৪৭ সালে রাশিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে ব্রিটেন ইরানের ওপর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে সম্মত হয়। ১৯৩০-এর দশকে অবশ্য জার্মানি ইরানের ওপর নিজস্ব প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। এর ফলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় সোভিয়েত-ব্রিটিশ বাহিনী যৌথভাবে ইরানের সৈন্য প্রেরণ করে। ১৯৪২ সালে একটি চুক্তি অনুসারে উত্তর ইরানে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয় এবং দক্ষিণ ইরানে ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির মুখে অবশ্য সোভিয়েত-ব্রিটিশ সম্পর্কের দ্রুত অবনতি হয়। ইরানের সম্রাট রেজা পহ্লাভী নিজে ব্রিটেন এবং আমেরিকার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষে ছিলেন। তাঁর আমলে মার্কিন এবং ব্রিটিশ তেল কোম্পানিগুলি ইরানে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অধিকার কায়েম করতে শুরু করে।

১. তথ্যসূত্র : মার্টিন মেকলে—'দ্য কোলড ওয়ার এ্যাজ হিস্ট্রি (ডকুমেন্ট নং ১৯) (পৃ. ১৩২)।

ইরানে মার্কিন এবং ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পাওয়ায় স্তালিন শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং উত্তর ইরানে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ বাড়াবার উদ্যোগ নেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরানের কাছে অধিক অর্থনৈতিক অধিকার দেবার দাবি জানাতে শুরু করে। অপরদিকে, স্তালিন উত্তর ইরানে 'তুদিয়া পার্টি' (Tudea Party) নামে একটি রাজতন্ত্র বিরোধী বিচ্ছিন্নতাপন্থী গোষ্ঠীকে মদত দিতে শুরু করেন। ইরানের সরকার এই চাপের সামনে নতিস্বীকার করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করতে রাজি হয়। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে মার্কিন সরকার সোভিয়েত নীতির বিরোধিতা করতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড মার্কিন চাপের মুখে ইরান থেকে সোভিয়েত সেনা ফেরত আসে। ইরান অচিরেই পারস্য উপসাগর অঞ্চলে অন্যতম মার্কিন ঘাঁটি হয়ে উঠে।

গ্রীস—ইরানের মতন গ্রীসেও মার্কিন সোভিয়েত দ্বন্দ্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে শুরু হয়। গ্রীসে নাৎসী বিরোধী আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী ছিল—রাজতন্ত্রী গোষ্ঠী এবং কমিউনিস্ট গোষ্ঠী। ১৯৪৪-৪৫ সালে এই দুই গোষ্ঠীর বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। ব্রিটেনের তত্ত্বাবধানে ১৯৪৫ সালে গ্রীসে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং নতুন নির্বাচনের আগে একটি অস্থায়ী নজরদারি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

অস্থায়ী নজরদারি সরকার অবশ্য প্রথম থেকেই কমিউনিস্ট বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে। ফলে, কমিউনিস্ট গোষ্ঠী ১৯৪৫ সালের শান্তি চুক্তি মানতে অস্বীকার করে। ইতিমধ্যে ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচন এবং গণভোটে গ্রীসে রাজতন্ত্রী গোষ্ঠীরা জয়লাভ করে। গ্রীসে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরদিকে, কমিউনিস্ট গোষ্ঠী গ্রীসের নতুন নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে।

গ্রীসের গেরিলা যুদ্ধ অচিরেই বিশ্বরাজনীতিতে এক সংকটের সূচনা করে। পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রী দেশগুলি বিশেষত যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীসের কমিউনিস্ট গোষ্ঠীকে প্রচুর সাহায্য প্রদান করে। অপরদিকে এই সাহায্য বন্ধ করার লক্ষ্যে মার্কিন চাপ বাড়তে থাকে। মূলত এই কারণেই স্তালিন নিজে গ্রীসের কমিউনিস্ট গোষ্ঠীকে সেভাবে সাহায্য করতে পারেননি। সোভিয়েত সাহায্যের অপ্রতুলতার কারণে ১৯৪৯ সালে গ্রীসের কমিউনিস্ট বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমিত হয়।

তুরস্ক—এশিয়া এবং ইউরোপের মধ্যে সংযোগ সূত্র হিসেবে তুরস্কর গুরুত্ব অপরিসীম। স্থলপথ ছাড়া এই অঞ্চলের সামুদ্রিক খাঁড়িগুলি নৌযাত্রা এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সামুদ্রিক খাঁড়ির মধ্যে অন্যতম হল তুর্কী নিয়ন্ত্রিত 'দার্দেনেলস' (Dardanelles) খাঁড়ি, যা কৃষ্ণসাগর এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্যে সংযোগ সূত্র হিসেবে কাজ করে।

তুর্কী সংকটের সূচনা হয় এই প্রণালীর ওপর নিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তুরস্ক সরকারি নীতি হিসেবে নিজেকে নিরপেক্ষ ঘোষণা করলেও কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে মিত্র-জোটকে দার্দেনেলস খাঁড়ি ব্যবহার করতে না দিলেও গোপনে অক্ষ-শক্তির নৌবাহিনীকে এই খাঁড়ি ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে মার্কিন এবং সোভিয়েত সরকার উভয়েই তুর্কী সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে। এই সুযোগে স্তালিন তুরস্কর ওপর সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ বিস্তারে সচেষ্ট হন। দার্দেনেলস খাঁড়ির ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং তুরস্কতে সোভিয়েত সৈন্য ঘাঁটি স্থাপনের দাবি জানানো হয়। এই দাবি রূপায়ণের লক্ষে স্তালিন তুর্কী সীমান্তের কাছে সৈন্যবাহিনীও প্রেরণ করেন।

এই নীতির বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারও পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করে। ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সালে পূর্ব ভূমধ্যসাগর

অঞ্চলে বিশাল মার্কিন বাহিনী প্রেরিত হয়। মার্কিন চাপের কাছে নতি স্বীকার করে স্তালিন সেনা প্রত্যাহার করে নেন।

এই তিনটি ঘটনা মার্কিন সোভিয়েত দ্বন্দ্বকে একটি আলাদা মাত্রা এনে দেয়। মার্কিন সরকার সোভিয়েত আগ্রাসনের মোকাবিলায় একটি মজবুত ব্যবস্থা রূপায়ন করে।

১১.৫.২ ঠান্ডা যুদ্ধের প্রসার : ইউরোপ

১৯৪৬-৪৭ সালের মধ্যে মার্কিন সরকারের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে যুদ্ধবিধ্বস্ত পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির পক্ষে ইউরোপে 'সোভিয়েত আগ্রাসন' বা কমিউনিস্ট বিপ্লবের মোকাবিলা করা সম্ভব না। প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদী দেশ ব্রিটেন সরকারিভাবে তাদের প্রাক্তন অধিকৃত অঞ্চলগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিতে মার্কিন সরকারের কাছে আবেদন করে। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান, ইউরোপে মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মার্কিন কংগ্রেসে প্রদত্ত ১১ মার্চ ১৯৪৭ সালের একটি ভাষণে ট্রুম্যান তাঁর এই নীতি সুস্পষ্ট করে দেন। তিনি বলেন :

"আমার মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবশ্যই সেই নীতি গ্রহণ করা উচিত যা, স্বাধীনতাকামী মানুষদের বাইরের নিয়ন্ত্রণ বা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে মোকাবিলায় সাহায্য করবে। দারিদ্র্য এবং অভাব স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র পত্তনের বীজ রোপন করে ... মানুষের মনে উন্নত জীবনের স্বপ্নের যখন মৃত্যু হয় তখন এই বীজগুলি মহীরূহে রূপান্তরিত হয়। তাই আমাদের এই স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।"[২]

'ট্রুম্যান নীতি' অনুযায়ী মার্কিন স্বরাষ্ট্র সচিব জর্জ মার্শাল (George Marshall) ৫ জুন ১৯৪৭ সালে ইউরোপের দেশগুলিকে একগুচ্ছ অর্থনৈতিক অনুদান দেবার কথা ঘোষণা করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে 'মার্শাল নীতি' (Marshall Plan) গ্রহণে বাধা দেওয়ায় এই নীতি মূলত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

মার্কিন নীতির ফলে শঙ্কিত স্তালিন পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে নিজের নিয়ন্ত্রণ আরো বৃদ্ধি করতে শুরু করেন। ১৯৪৭ সালে 'কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরো' বা কমিনফর্ম (COMINFORM) প্রতিষ্ঠিত হয়। পোল্যান্ড সহ অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণের মাত্রা আরো বৃদ্ধি করা হয়। যুগোশ্লাভিয়ার নেতা টিটো এই নীতির বিরোধিতা করলে যুগোশ্লাভিয়াকে কমিনফর্ম থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। মার্শাল নীতির অনুকরণে সোভিয়েত তত্ত্বাবধানে পূর্ব ইউরোপে 'কমেকন' (COMECON) বলে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে।

১৯৪০-এর দশকে ঠান্ডা যুদ্ধের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে জার্মানির ভবিষ্যত কেন্দ্র করে। ১৯৪৫ থেকে পূর্ব জার্মানি সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণাধীন এবং পশ্চিম জার্মানি মার্কিন এবং ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য জার্মানিকে দীর্ঘসময় এইভাবে দুর্বল করে রাখার পক্ষপাতি ছিল না। তাই ১৯৪৭ সালে ব্রিটেন এবং আমেরিকা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাগুলি একত্রভাবে শাসন করা শুরু করে। কিছু পরে ১৯৪৮ সালে ফ্রান্সও নিজের নিয়ন্ত্রিত এলাকা ইঙ্গ-মার্কিন এলাকার সঙ্গে সংযোজিত করে। পশ্চিম জার্মানিতে নানাবিধ সংস্কার এবং গণতান্ত্রিক শাসনের কাঠামো গড়া শুরু হয়।

২. তথ্যসূত্র : মার্টিন মেকলে—'কোলড ওয়ার এ্যাজ হিস্ট্রী' (ডকুমেন্ট নং ২৪) (পৃ. ১৩৮)

এর ফলে সোভিয়েত ও মার্কিন মনোমালিন্য চরম পর্যায় পৌঁছায়। ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে স্তালিনের নির্দেশে পশ্চিম বার্লিন অবরোধ শুরু হয়। স্তালিনের ধারণা হয় যে অবরোধের ফলে মিত্র-জোট রাজধানী বার্লিন শহর সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করবে এবং তাদের জায়গায় কমিউনিস্ট গোষ্ঠী সম্পূর্ণ বার্লিন শহর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হবে।স্তালিনের এই আশা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। সোভিয়েত অবরোধের মোকাবিলায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান বিমান বাহিনীর সাহায্যে পশ্চিম বার্লিনের অবরুদ্ধ নাগরিকদের খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেন। প্রায় এগারো মাস ধরে মার্কিন ও ব্রিটিশ বিমানবাহিনী খাদ্য, তেল, কয়লা ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু পশ্চিম বার্লিনে পৌঁছে দেয়। অবশেষে বিফল মনোরথ হয়ে স্তালিন ১৯৪৯ সালের মে মাসে অবরোধ তুলে নেন।

বার্লিন অভিজ্ঞতা ঠান্ডা যুদ্ধের দ্বন্দ্বকে এক নতুন মাত্রা দেয়। উভয় শক্তিই ইউরোপে নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়। মার্কিন তত্ত্বাবধানে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিকে নিয়ে ১৯৪৯ সালে ‘নেটো’ (NATO) প্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত পূর্ব ইউরোপীয় শক্তি জোট ‘ওয়ারস গোষ্ঠী’ (Warsaw Pact) স্থাপিত হয় ১৯৫৫ সালে।

উভয় শক্তিই নিজেদের আণবিক শক্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতেও সচেষ্ট হয়। ১৯৪৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম পরমাণু শক্তিধর দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের পরিচালিত গুপ্তচরদের দ্বারা অবশ্য আণবিক অস্ত্র বানাবার কৌশল করায়ত্ব করে এবং ১৯৪৯ সালে প্রথম সোভিয়েত পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষিত হয়। এর প্রত্যুত্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫২ সালে হাইড্রোজেন বোমার সফল পরীক্ষা ঘটায়। এর পরের বছরই অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৫৩ সালে সফলভাবে নিজেদের হাইড্রাজেন বোমার পরীক্ষা ঘটায়। ব্রিটেন ১৯৫২ সালে পরমাণু শক্তিধর দেশ হয়ে ওঠে।

১১.৫.৩ ঠান্ডা যুদ্ধের প্রসার : এশিয়া

মার্কিন-সোভিয়েত দ্বন্দ্ব ইউরোপ ছাড়াও বিশ্ব মানচিত্রের অন্যান্য জায়গাতেও এর প্রভাব ফেলতে শুরু করে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল এশিয়া মহাদেশ। এশিয়াতে এসময় প্রাক্তন উপনিবেশগুলিতে ভাঙন ধরার এক প্রক্রিয়া চলছিল। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এই লড়াই মূলত আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ থেকে উদ্ভূত হলেও কোনো কোনো অঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাব লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপনিবেশবাদের বিপক্ষে হলেও এশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রসারের বিপক্ষে ছিল। এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে ঠান্ডা যুদ্ধের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হয় এশিয়াতে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুলিতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রসার রুদ্ধ করা। যেমন, ফিলিপিনসকে ১৯৪৬ সালে স্বাধীনতা দিলেও মার্কিন আধিপত্য সেখানে বজায় থাকে। জাপানে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত মার্কিন তত্ত্বাবধান জারি থাকে। ১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ করতে দিলেও ১৯৫০ সালে কোরীয় যুদ্ধ শুরু হওয়ায় কমিউনিস্ট দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এর জবাবে অন্যান্য মিত্র জোটের সদস্য দেশগুলি জাপানের সঙ্গো ১৯৫১ সালে সানফ্রানসিসকো চুক্তি অনুসারে শান্তি স্থাপন করলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন তা করতে অস্বীকার করে।

১৯৪৯ সালে মাও সে তুঙের নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন আত্মপ্রকাশ করলে এশিয়াতে ঠান্ডা যুদ্ধ এক নতুন মাত্রা লাভ করে। অচিরেই ১৯৫০ সালে চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত

হলে মার্কিন সরকার এশিয়াতে 'কমিউনিস্ট আগ্রাসন' সম্বন্ধে আরো শঙ্কিত হয়ে পড়ে। মার্কিন সরকারের তরফে যেকোনো উপায়ে এই বিস্তার রোধ করার চেষ্টা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। এর ফলে ১৯৫০-এর দশকে কোরীয় যুদ্ধ এবং ইন্দো-চীন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ঠান্ডা যুদ্ধ এক নতুন মাত্রা লাভ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে কোরিয়া দুই ভাগে বিভাজিত হয়। উত্তর কোরিয়ায় সোভিয়েত (এবং পরবর্তীকালে চীন) প্রস্তাবিত কমিউনিস্ট সরকার স্থাপিত হয় এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন প্রভাবিত গণতান্ত্রিক সরকার স্থাপিত হয়। ৩৮° দ্রাঘিমা উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সীমান্ত রূপে গণ্য হয়। ১৯৫০ সালে উত্তর কোরীয় বাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবেশ করলে কোরীয় যুদ্ধ শুরু হয় যা চার বছর ধরে (১৯৫০-৫৪) চলে। উত্তর কোরিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মূলত চীনের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সামরিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সাহায্য লাভ করে। অপরদিকে রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে মার্কিন সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ কোরিয়াকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। ১৯৫১ সালের মধ্যে উত্তরকোরিয়ার সৈন্যবাহিনীকে দক্ষিণ কোরিয়ার অঞ্চলগুলি থেকে বের করে দিতে মার্কিনী বাহিনী সক্ষম হয়। মার্কিন সেনাপতি ডগলাস ম্যাক আর্থার এক পরবর্তী ধাপ হিসেবে উত্তর কোরিয়া এবং চীনে কমিউনিস্ট সরকারের অপসারণ চাইলেও রাষ্ট্র সংঘ এবং অন্যান্য মিত্র দেশগুলির আপত্তিতে মার্কিন সরকার এই নীতি গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৩ সালে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা হয় এবং ১৯৫৪ সালে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

অপর অঞ্চল, যেখানে ঠান্ডা যুদ্ধের প্রভাব লক্ষণীয় হয়, তা হল ইন্দো-চীন অঞ্চল। ইন্দো-চীন অঞ্চলের তিনটি রাজা আন্নাম, টংকিং এবং কোচিন-চীন উনবিংশ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি উপনিবেশে রূপান্তরিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন এই অঞ্চলটি জাপান কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর এই অঞ্চলটিতে কমিউনিস্ট নেতা হো চি মিন (Ho Chi Minh)-এর নেতৃত্বে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রয়াস চালানো হয়। ফরাসি সরকার অবশ্য এইপ্রচেষ্টাকেস্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। যার ফলে, নতুন গঠিত ভিয়েতমিন (Vietminh) রাষ্ট্রের সঙ্গে ফ্রান্সের সংঘর্ষ শুরু হয়। ফরাসি সৈন্যবাহিনী অবশ্য কমিউনিস্ট গোষ্ঠীকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয় এবং দিয়েন বিয়েন ফুর (Dien Bien Phu) যুদ্ধে (১৯৫৪) ভিয়েতমিন সৈন্যবাহিনীর হাতে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হয়। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় শান্তি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় পক্ষকে আলোচনায় অংশ নিতে আহ্বান জানায়। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৪ সালের জেনিভা চুক্তি অনুসারে ভিয়েতনাম স্বাধীনতা লাভ করে। এছাড়া, ভিয়েতনামও দুই ভাগে বিভাজিত হয়। উত্তর ভিয়েতনামে হো চি মিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবংদক্ষিণ ভিয়েতনামে একটি মার্কিন প্রভাবিত সরকার স্থাপিত হয়। এছাড়া, হো চি মিনের কমিউনিস্ট সেনারা লাওস এবং কাম্বোডিয়া অঞ্চলে নিজেদের অধিকৃত এলাকা ছেড়ে দেয়।

ভিয়েতনাম সমস্যা অবশ্য শীঘ্রই আরো তীব্র হয়ে ওঠে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন সরকার প্রথমে বাও দাই সরকার এবং ১৯৫৫ সালে রাষ্ট্রপতি দিয়েম দ্বারা গঠিত সরকারকে সমর্থন জারি রাখে। কিন্তু এই সরকার নানা প্রকার দুর্নীতি এবং অপশাসনের ফলে জনসাধারণের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ ভিয়েতনামে এক 'ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করে এবং ভিয়েতকং (Vietcong) নামক এক গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলে দিয়েম সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়। ১৯৬৩ সলে দিয়েম আততায়ীর হাতে নিহত হলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। মার্কিন সরকারের কাছে এই ঘটনা প্রবাহ সমাজতান্ত্রিক আগ্রাসন রূপে গণ্য হয় এবং ভিয়েতনামে মার্কিন সৈন্যবাহিনী সুদীর্ঘ সময়

ধরে ভিয়েতকঙের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মার্কিন সৈন্যবাহিনীর নির্বিচার হত্যালীলার ফলে উত্তর এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম মিলিয়ে কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। কিন্তু মার্কিন সৈন্যবাহিনীর এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর বিস্তার রোধ করা সম্ভবপর হয়নি। অবশেষে ১৯৭২-৭৩ সালে মার্কিন সৈন্যবাহিনী ভিয়েতনাম ত্যাগ করে। ১৯৭৫ সালে দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সায়গনের পতন হয় এবং ১৯৭৬ সালে ভিয়েতনামে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভিয়েতনাম ছাড়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল, যেমন কাম্বিডিয়া ও লাওসে দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পর কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া, কমিউনিস্ট বিস্তার বন্ধের উদ্দেশ্যে 'সিয়েটো' (SEATO—South East Asia Treaty Organisation) এবং 'সেনটো' (CENTO—Central Treaty Organisation) স্থাপন করা হয়।

১১.৫.৪ পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্কের উন্নতি (Detenté) এবং নতুন ঠান্ডা যুদ্ধ

১৯৫০-এর দশকে ঠান্ডা যুদ্ধ তীব্র হলেও এই রেষারেষি বন্ধের চেষ্টাও অব্যাহত থাকে। ১৯৫০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন সম্মেলনে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকায় এই প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৯৫৩ সালে স্তালিনের মৃত্যুর পর এই প্রচেষ্টা নতুন মাত্রা লাভ করে। নতুন সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চেভ (Khruschev) ১৯৫৬ সালে পূর্ব-পশ্চিম 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান'-এর কথা ঘোষণা করেন। বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দ্বিপাক্ষিক বা যৌথভাবে আলোচনার দ্বারা সমাধানের কথাও বলা হয়। ১৯৫৬ সালে ক্রুশ্চেভ এবং প্রধানমন্ত্রী লন্ডন সফরে যান। ১৯৫৯ সালে ক্রুশ্চেভ এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার (Eisenhouer) ক্যাম্প ডেভিড শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হন। ১৯৬১ সালে ক্রুশ্চেভ পুনরায় নতুন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন কেনেডির (John Kennedy) সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন।

সম্পর্কের উন্নয়ন বা 'Detenté' অবশ্য পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে মেটাতে সক্ষম হয়নি। ১৯৫০-১৯৭০-এর মধ্যে বিশ্ব রাজনীতিতে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা, সম্পর্ককে আরো বিষিয়ে তুলেছিল। ১৯৬০ সালে প্যারিসে, মার্কিন-সোভিয়েত ছাড়া ব্রিটেন এবং ফ্রান্সকে নিয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলন প্রহসনে পরিণত হয় যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের এলাকায় একটি মার্কিন গুপ্তচর বিমান গুলি করে নামিয়ে বিমানচালক গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর ফলে, ক্রুশ্চেভ প্রথমে মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা দাবি করেন এবং মার্কিন সরকার ক্ষমা প্রার্থনা করতে অস্বীকার করলে তিনি এই বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে যান। এছাড়া পশ্চিম জার্মানি 'নেটো'র সদস্যপদ গ্রহণ করলে তিনি সেটা খারিজ করার দাবি জানাতে থাকেন।

১৯৬০-এর দশকে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঠান্ডা যুদ্ধ আবার জোরালো হয়ে ওঠে। নতুন মার্কিন রাষ্ট্রপতি কেনেডি ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর বিরোধিতায় মার্কিন সামরিক সাহায্য আরো জোরদার করেন। এছাড়া, ১৯৬০ সালে কঙ্গো স্বাধীন হলে, সেখানে রাষ্ট্রপতি লুমুম্বা (Lumumba) এবং সামরিক নেতা মোবুটু (Mobutu)-র দ্বন্দ্বের ফলে কঙ্গোয় গৃহযুদ্ধ শুরুহয়। লুমুম্বা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে মার্কিন সমর্থন মূলত মোবুটুর পক্ষেই থাকে। মার্কিন সাহায্যে উৎসাহিত হয়ে মোবুটু ১৯৬১ সালে লুমুম্বাকে হত্যা করে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করেন।

মার্কিন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে কিউবার সমস্যাকে কেন্দ্র করে। ফিদেল কাস্ত্রোরনেতৃত্বে কিউবায় কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা চালায় এই সরকারকে উৎখাত করার। কেনেডির তত্ত্বাবধানে বে অফ পিগ্‌স অঞ্চলে সামরিক চাপ বিফল হয়। ১৯৬০-এর দশকে সোভিয়েত-কিউবা

সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। ১৯৬২ সালে মার্কিন সরকার চাঞ্চল্যকরভাবে প্রমাণসহ কিউবায় সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়বার বেদী তৈরির খবর প্রকাশ করে। কেনেডি অবিলম্বে এই নির্মাণ কার্য বন্ধ করার দাবি জানান। ১২ অক্টোবর ১৯৬২ সালে কিউবায় মার্কিন নৌ অবরোধ গড়ে ওঠে এবং প্রয়োজন হলে সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার জন্যে কেনেডি যুদ্ধের হুমকিও দেন। শেষ পর্যন্ত, ক্রুশ্চেভ কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নেন। বদলে মার্কিন সরকার কাস্ত্রোকে গদিচ্যুত করা থেকে বিরত থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়।

কিউবার সমস্যা বিশ্ববাসীকে ঠান্ডা যুদ্ধের বিপদ সম্বন্ধে পুনরায় অবহিত করে। জনমতের চাপে দুই বিশ্বশক্তি পুনরায় শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হতে শুরু করে। ১৯৬২ সালে জেনিভায় একটি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মার্কিন-সোভিয়েত 'হটলাইন' স্থাপিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৬৩ সালে পরমাণু শক্তিধরদেশগুলি আংশিক পরীক্ষা বন্ধের ঘোষণা করে। ১৯৬৭ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনসন এবং সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন একটি শিখর সম্মেলনে মিলিত হন।

১৯৭০-এর দশকে মার্কিন-সোভিয়েত সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। এর অন্যতম কারণ ছিল চীন-মার্কিন সম্পর্কের উন্নয়ন এবং চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের অবনতি। এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে আরো আগ্রহী হয়ে ওঠে। পশ্চিমী দুনিয়ার কিছু অন্যান্য নেতাও (যেমন পশ্চিম জার্মানির নেতা উইলি ব্র্যান্ড Willy Brandt) এই সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য চেষ্টা চালান। এই সব প্রচেষ্টার প্রতিফলন ঘটে মার্কিন-সোভিয়েত বিভিন্ন সামরিক যুদ্ধাস্ত্র সংবরণ ও নিবারণ চুক্তিতে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সন নিজে মস্কো সফরে যান। ১৯৭২ সালে SALT-I (Strategic Arms Limitation Treaty) চুক্তির মাধ্যমে উভয় পক্ষই ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এছাড়া, ১৯৭৯ সালে মার্কিন সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকে সরকারি স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৪ সালে নিক্সন সরকার পূর্ণ জার্মানির সরকারকেও স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৫ সালে হেলসিঙ্কি শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মার্কিন সোভিয়েত সহ প্রায় ৩৪টি দেশের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন ভরসা বৃদ্ধি নীতি (Confidence Building Measures) গ্রহণ করা হয়। এছাড়া মহাকাশ গবেষণায় মার্কিন-সোভিয়েত সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

১৯৮০-র দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্থানে সেনা প্রেরণ করে সেখানে একটি সোভিয়েত প্রভাবিত সরকার স্থাপন করলে ঠান্ডা যুদ্ধের নতুন পর্যায় শুরু হয়। অনেকে এই নতুন পর্যায়কে 'নতুন বা নব্য ঠান্ডা যুদ্ধ' বলেন। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক আফগানিস্থানে সৈন্য প্রেরণের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগন (Ronald Reagan) পুনরায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'অশুভ সাম্রাজ্য' বলে অভিহিত করেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিস্ট আগ্রাসন সক্রিয়ভাবে রোধ করবার নীতি গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্যে বহু ক্ষেত্রে মার্কিন সরকার প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী শক্তিগুলিকে সাহায্য করতে শুরু করে। যেমন, আফগানিস্থানে, পাকিস্থানের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যম মার্কিন সাহায্য ইসলামী মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলির হাতে পৌঁছতে শুরু করে। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সামরিক নেতা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বৈরতান্ত্রিক সরকারগুলিকে সমর্থন জানানো হয়।

১১.৫.৫ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান

১৯৮০-র দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য ঠান্ডা যুদ্ধ সংক্রান্ত রেষারেষির অনেকখানি পরিসমাপ্তি ঘটে। এই রেষারেষি পরিসমাপ্ত করার মূল উদ্যোগ নেন তৎকালীন সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি মিখাইল গোর্বাচেভ (Mikhail Gorbachev)।

মূলত তাঁর দুটি নীতি গ্লাসনস্ত (Glassnost) এবং পেরেসট্রোইকা (Parestroika)-র ওপর ভিত্তি করে। এর মূল লক্ষ্য ছিলসোভিয়েত ইউনিয়নে অভ্যন্তরীণ সংস্কার। এছাড়া মার্কিন সরকারের সঙ্গেও গোর্বাচেভ সহযোগিতার রাস্তা নেন। এর ফলে অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নে অভ্যন্তরীণ ভাঙন দেখা যায় এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪৫ সাল থেকে চলে আসা ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তি হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার (Francis Fukuyama) মতে ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হল 'ইতিহাসের সমাপ্তি' ('End of History')। এর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান হলেও, ১৯৯১ সালের ঘটনাপ্রবাহ যে যুগান্তকারী ঘটনা এটা অস্বীকার করা যায় না।

১১.৬ ঠান্ডা যুদ্ধ উদ্ভবের দায়িত্ব

ঠান্ডা যুদ্ধ উদ্ভবের ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানী মহলে বিভিন্নভাবে করার চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৪০ এবং ১৯৫০-এর দশকে, পশ্চিমী লেখককুল ঠান্ডা যুদ্ধ উদ্ভবের জন্য মূলত সোভিয়েত আগ্রাসী নীতিকেই দায়ী করেন। জর্জ কেনান (George Kennan) হিউ সেটন ওয়াটসন (Hugh Setton Watson) প্রভৃতি সমালোচকদের মতে 'মার্কস-লেনিনবাদ', 'সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লব' এবং 'স্তালিনের আগ্রাসী নীতি' সব মিলিয়ে পশ্চিমী দেশগুলিকে শঙ্কিত করে তোলে। এই আগ্রাসন রোধ করার লক্ষ্যে মার্কিন নীতি প্রণয়ন ঠান্ডা যুদ্ধকে তীব্র করে তোলে।

এই ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার প্রথম বিরোধিতা করেন নব্য বামপন্থী সমালোচকরা। এ্যালপেরোভিটজ্ (Alperovitz), গেব্রিয়েল কলকো (Kolko) প্রভৃতি নব্য বামপন্থী লেখকরা ঠান্ডা যুদ্ধের জন্য মূলত মার্কিন নীতিকেই দায়ী করেন। এঁদের মতে ১৯৪৫-এর পরবর্তীকালে সোভিয়েত সরকার মূলত তার নিজস্ব সুরক্ষা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। মার্কিন আগ্রাসী নীতি এই সুরক্ষা নীতিকে আরো দৃঢ় করে তোলে এবং এই লক্ষেই স্তালিন পূর্ব ইউরোপের ওপর সোভিয়েত কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করেন। পশ্চিম ইউরোপ বা বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে, সমাজতান্ত্রিক প্রভাব বিস্তারের লক্ষ তাঁদের ছিল না।

১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে একদল নতুন লেখককুলের সৃষ্টি হয়েছে যারা 'উত্তর সংশোধনবাদী' (Post Revisionist) বলে পরিচিত। মার্টিন মেকলে প্রভৃতি লেখক এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই গোষ্ঠী কোনো এক বিশেষ দেশ বা সরকারকে দায়ী না করে, ঠান্ডা যুদ্ধকে একটি বহুমাত্রিক ঘটনাপ্রবাহ বলে অভিহিত করেন, যার পেছনে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও নীতি কাজ করেছিল। এঁরা উভয় দেশেরই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীকুলকে ঠান্ডা যুদ্ধ আরম্ভ ও বিস্তার করবার জন্য দায়বদ্ধ করেন। উভয় দেশেরই মূল লক্ষ্য ছিল, বিশ্বব্যাপী নিজেদের নিয়ন্ত্রণ জারি করা এবং এই লক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক ত্রায় বেশি সাফল্য লাভ করে। ক্ষমতার দখল ও নিয়ন্ত্রণের নেশাই এই ঠান্ডা যুদ্ধের উদ্ভবের জন্য মূলত দায়ী।

১১.৭ সারাংশ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপট ছিল ঠান্ডা যুদ্ধ নির্ধারিত। ঠান্ডা যুদ্ধের মূল সংজ্ঞা হল এক দীর্ঘমেয়াদী দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক, যা আপাত শান্তির আড়ালে রেষারেষি বজায় রাখে। ঠান্ডা যুদ্ধ কথাটির ব্যবহার

ইতিহাসে পূর্বে করা হলেও এর ব্যবহার মূলত ১৯৪৫ সালের পরবর্তীকালে বিশ্বরাজনীতিতে মার্কিন-সোভিয়েত দ্বন্দ্ব বোঝাতে করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে মার্কিন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বের সূচনা হয় ইরান, তুরস্ক ও গ্রীসকে কেন্দ্র করে। পরে, ট্রুম্যান-নীতি ও মার্শাল-পরিকল্পনা রূপায়ণ হলে স্তালিন পূর্ব ইউরোপে নিজের আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হন। বার্লিন অবরোধ, ন্যাটো ও ওয়ারশ গোষ্ঠী স্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে এই দ্বন্দ্ব আরো তীব্র হয়ে ওঠে।

এশিয়ায় কোরীয় যুদ্ধ এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ তীব্র হয়ে ওঠে।

১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে একদিকে যেমন সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা চলে অপরদিকে কিউবা, কঙ্গো ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে ঠান্ডা যুদ্ধ চলতে থাকে।

১৯৮০-এর দশকে রেগনের সময় নতুন করে ঠান্ডা যুদ্ধ আরো তীব্র ভাবে শুরু হয়। ১৯৮০-র শেষার্ধে গোর্বাচেভের নেতৃত্বে সম্পর্কের আবার উন্নয়ন ঘটে।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান হয়।

১১.৮ অনুশীলনী

১. ইরান, গ্রীস এবং তুরস্কের সংকটের বিবরণ দিন।
২. ঠান্ডা যুদ্ধের প্রভাব এশিয়ায় কিভাবে পড়ে?
৩. ‘Detenté’ বলতে কি বোঝেন?
৪. ঠান্ডা যুদ্ধের জন্য কে বেশি দায়ী বলে আপনি মনে করেন?
৫. ন্যাটো কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
৬. SALT-I চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?

১১.৯ উত্তর সংকেত

১. ৩.৫.১ অংশটি দেখুন।
২. ৩.৫.৩ অংশটি দেখুন।
৩. ৩.৫.৪ অংশটি দেখুন।
৪. ৩.৬ অংশটি দেখুন।
৫. ১৯৪৯ সালে।
৬. ১৯৭২ সালে।

১১.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১. পিটার ক্যালভোকোরেসী—‘ওয়ার্লড পালিটিকস্ সিনস্ ১৯৪৫’ (১৯৬৮)।
২. মার্টিন মেকলে—‘কোলড ওয়ার এস্ হিস্ট্রী’ (১৯৯৫)।
৩. জ্যাক ওয়াটসন্—‘ওয়ার্লড হিস্ট্রী সিনস্ ১৯৪৫’ (১৯৮৯)।

একক ১২ ❒ রাষ্ট্রসংঘ : উদ্ভব, কার্যকলাপ এবং শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টা

গঠন

১২.১ উদ্দেশ্য
১২.২ প্রস্তাবনা
১২.৩ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে শান্তিরক্ষার যৌথ প্রচেষ্টা
১২.৪ রাষ্ট্রসংঘের উদ্ভব
১২.৫ রাষ্ট্রসংঘ : প্রাতিষ্ঠানিক প্রকৃতি
১২.৬ রাষ্ট্রসংঘ : বিশ্বশান্তির প্রয়াস
১২.৭ সারাংশ
১২.৮ অনুশীলনী
১২.৯ উত্তর সংকেত
১২.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি যে বিষয়গুলি জানতে পারবেন সেগুলি হল :

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বিশ্বরাজনীতিতে আন্তর্জাতিক সংগঠন গঠনের প্রয়াস।
- আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে 'লীগ অফ নেশনস'-এর ব্যর্থতা।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মিত্র-জোটের নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ার প্রয়াস।
- রাষ্ট্রসংঘের উদ্ভব এবং প্রসার।
- আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার ভূমিকা।

১২.২ প্রস্তাবনা

বিশ্বরাজনীতি যেমন একদিকে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের ফলে বারবার বিপদগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি অপরদিকে এই দ্বন্দ্বের বিপরীত শক্তি হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যৌথভাবে শান্তিরক্ষার প্রয়াসও করা হয়েছে। কিন্তু আগেকার বেশির ভাগ প্রয়াসই ব্যর্থ হয়েছে। আধুনিক যুগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর (লীগ অফ নেশনস গঠনের মাধ্যমে) একটি বড়ো প্রয়াস চালানো হয়। কিন্তু ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকের দ্বন্দ্বের ফলে এই প্রচেষ্টা ব্যাহত হয় এবং ইউরোপ তথা সারা বিশ্বকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে শান্তিরক্ষার যৌথ প্রয়াস আকার নেয় রাষ্ট্রসংঘ রূপে। এই এককটির অন্যান্য অংশে আপনারা দেখবেন যে ঠান্ডা যুদ্ধ প্রসূত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও রাষ্ট্রসংঘ কিভাবে নিজের সাংগঠনিক প্রক্রিয়া বিস্তারে সক্ষম হয়েছে এবং শান্তিরক্ষার প্রয়াস চালিয়েছে।

১২.৩ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে শান্তিরক্ষার যৌথ প্রচেষ্টা

বিশ্ব রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে যৌথ প্রচেষ্টা নতুন নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে নেপোলিয়নের পতনের পর ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের ভিয়েনা কংগ্রেসে তৎকালীন প্রধান ইউরোপীয় শক্তিগুলি যৌথভাবে ইউরোপে শান্তিরক্ষা এবং বিদ্রোহ দমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এই প্রচেষ্টা অবশ্য নেতিবাচক এবং প্রগতিশীল শক্তিগুলির বিরোধিতা করেছিল বলে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এদের মূল কাজ ছিল ইউরোপে স্থিতিস্থাপকতা বজায়রাখা এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলির দমন।

যৌথভাবে শান্তিরক্ষার প্রয়াস বিংশ শতাব্দীতে আরো জোরদার হয়ে ওঠে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকুলের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতা বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আশঙ্কিত করে তোলে। সাহিত্য, পত্র পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বশান্তি রক্ষা করবার আবেদন জানানো হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৯) ভয়াবহতা এবং লোকক্ষয়, এই যৌথ শান্তির প্রয়াসে নতুন মাত্রা যোগ করে। আমেরিকার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson) এই প্রয়াসের অন্যতম সমর্থক ছিলেন। মূলত তাঁর প্রচেষ্টায় যুদ্ধ শেষে 'লীগ অফ নেশনস' গড়ে ওঠে।

লীগ অফ্ নেশনস অনেক আশা জাগালেও সেই আশা পূরণে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। প্রথমত, উইলসনের ইচ্ছা থাকলেও মার্কিন সেনেটের বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত মর্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারেনি। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম দিকে পশ্চিমী শক্তিগুলির বিরোধিতায় লীগের সদস্যপদ পায়নি। বহু পরে ১৯৪৩ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন লীগের সদস্যপদ লাভ করে। কিন্তু ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের বিরোধিতার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে যৌথ সুরক্ষা নীতি ব্যাহত হয়। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসী জার্মানির সঙ্গে ১৯৩৯ সালে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। পরবর্তীকালে সোভিয়েত কর্তৃক পোল্যান্ড দখলের পর সোভিয়েত সদস্যপদ কেড়ে নেওয়া হয়। এছাড়া লীগ, ইউরোপে অক্ষশক্তির উত্থান আটকাতে ব্যর্থ হয়। জার্মানি রাইনল্যান্ড অঞ্চলে পুনরায় সামরিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করে ; ইতালি আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) সেনা প্রেরণ করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং জাপান, উত্তর চীনের মাঞ্চুরিয়া দখল করে। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সময় লীগ-এর সরকারি ভাবে অস্তিত্ব থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তা মৃতপ্রায় হয়ে ওঠে।

১২.৪ রাষ্ট্রসংঘের উদ্ভব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চালকালীন বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সংগঠন গঠনের প্রক্রিয়া আবার নতুন উদ্যমে শুরু হয়। কিন্তু এই নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রকৃতি সম্বন্ধে মিত্র-জোটের মধ্যে নানা মতবিরোধ দেখা দেয়। রুজভেল্ট এবং চার্চিল প্রথমদিকে আঞ্চলিক সংগঠন সৃষ্টির পক্ষে ছিলেন। স্তালিন অপরদিকে লীগের ন্যায় একটি বিশ্ব সংগঠন গড়ে তোলার পক্ষে ছিলেন। অবশেষে উভয় গোষ্ঠীই আঞ্চলিক সংগঠনের পরিবর্তে একটি বৃহৎ সংগঠন গড়ার পক্ষে মত দেন।

এর আগেই অবশ্য মিত্র-জোটের সদস্যরা পারস্পরিক এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রশ্নে কাছাকাছি আসতে শুরু করে। ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে রুজভেল্ট এবং চার্চিল যৌথভাবে অতলান্তিক ঘোষণার মাধ্যমে

এই ধরনের যৌথ প্রচেষ্টার ওপর জোর দেন। 'অতলান্তিক ঘোষণা'র প্রতি সমর্থন জানিয়ে ছাব্বিশটি দেশ ১ জানুয়ারি ১৯৪১ সালে 'রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণা' জারি করে। এর পরে ১৯৪৩ সালে মস্কোতে আয়োজিত মিত্রজোটের বিদেশ মন্ত্রীদের একটি বৈঠকে 'বিশ্ব সংগঠন' গঠনের এই পরিকল্পনা সমর্থন লাভ করে।

এর পরে ১৯৪৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডামবার্টন ওকস্ (Dumbarton Oakes) অঞ্চলে পুনরায় মিত্র-জোটের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এখানে নতুন সংগঠনের জন্য একটি সংবিধানের খসড়া পত্র লেখার কাজ শুরু হয়। এই কাজে অংশগ্রহণ করে চার প্রতিনিধি দেশ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন এবং চীন। এই চার শক্তি নিজেদের এবং ফ্রান্সকে নতুন সংগঠনের সুরক্ষা পরিষদের সদস্যপদ দেয়। এই খসড়াপত্র অবশেষে ১৯৪৫ সালে ইয়াল্টায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে, তিন প্রধান শক্তির (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন) অনুমোদন লাভ করে। ইয়াল্টা সম্মেলনে ঠিক হয় যে, সুরক্ষা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের 'ভিটো' প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকবে। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে স্যান ফ্রানসিস্কো (San Francisco) শহরে একটি বিশাল সম্মেলন আয়োজিত হয়। এতে পঞ্চাশটি দেশ অংশগ্রহণ করে। এই সম্মেলনে অনুমোদিত হবার পর রাষ্ট্রসংঘ আনুষ্ঠানিক পূর্ণতা লাভ করে। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার প্রথম বৈঠক অস্থায়ীভাবে লন্ডন শহরে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে রাষ্ট্রসংঘের প্রধান দপ্তর খোলা হয়।

১২.৫ রাষ্ট্রসংঘ : প্রাতিষ্ঠানিক প্রকৃতি

রাষ্ট্রসংঘের ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্বন্ধে সংবিধান ঘোষণা করেছে—

"ভবিষ্যত প্রজন্মগুলিকে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে বাঁচানো, যা আমাদের জীবদ্দশায় দুবার মানব সভ্যতার সামনে অপরিসীম বেদনা নিয়ে এসেছে।"

এছাড়া রাষ্ট্রসংঘ মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক আইন, আর্থ-সামাজিক প্রগতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশ্ব জনমত গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছে। এর ফলে, এটি প্রথম থেকেই একটি সুবৃহৎ সংগঠন হয়ে ওঠে।

এই বিশাল সংগঠন পরিচালনার জন্যে এটিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভাগ করা হয়। সব থেকে বৃহৎ সংগঠন হল সাধারণ সভা বা জেনারেল এসেম্বলী। রাষ্ট্রসংঘের প্রতিটি দেশ এই সাধারণ সভার সদস্য এবং প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হলে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হয়। অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল নিরাপত্তা পরিষদ বা সিকিউরিটি কাউন্সিল। সিকিউরিটি কাউন্সিলের চিরস্থায়ী সদস্য সংখ্যা হল পাঁচ। এরা হল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া (আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন), গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং চীন। এছাড়া সিকিউরিটি কাউন্সিলে ছয়টি অতিরিক্ত সদস্যপদ আছে, যা একেকটি দেশ, দুবছরের জন্য ক্রমপর্যায়ে লাভ করে। মূল ক্ষমতা পাঁচটি স্থায়ী সদস্য দেশগুলির ওপর থাকে এবং 'ভিটো' প্রয়োগের ক্ষমতা এরাই ভোগ করে।

এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন ছাড়া রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সংগঠনগুলি হল 'অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ' বা ইকনমিক এ্যান্ড সোস্যাল কাউন্সিল, 'অছি পরিষদ' বা ট্রাস্টশিপ কাউন্সিল, 'আন্তর্জাতিক আইন পরিষদ' বা ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ্ জাস্টিস'। রাষ্ট্রসংঘ পরিচালিত 'অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ' বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। এগুলি হল 'ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন', 'ওয়ার্ল্ড

হেলথ অর্গানাইজেশন’, ‘ইউনাইটেড নেশনস হাই-কমিশনার ফর রিফিউজিস’, ‘ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেনস ইমারজেন্সি ফান্ড’, ‘ফুড এ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন’, ‘ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক এ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন’, ‘ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশনস ইউনিয়ন’, ‘ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন’, ‘ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন’ এবং ‘ওয়ার্ল্ড মেটিরিয়ওলোজিকাল অর্গানাইজেশন’।

এছাড়া ১৯৫৪ সালে ব্রেটন উডস্ চুক্তির দ্বারা সংগঠিত দুটি নতুন সংগঠন—‘ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড’ এবং ‘ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক’ রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলে।

এই নানাবিধ কর্মযজ্ঞের প্রধান কাণ্ডারি হিসেবে কাজ করে রাষ্ট্রসংঘের সচিবালয় বা ‘সেক্রেট্যারিয়ট’। এর প্রধান হলেন মহাসচিব বা সেক্রেট্যারি জেনারেল। রাষ্ট্রসংঘের প্রথম মহাসচিব ছিলেন নরওয়ের কূটনীতিবিদ্ ট্রীগভী লাই।

১২.৬ রাষ্ট্রসংঘ : বিশ্বশান্তির প্রয়াস

রাষ্ট্রসংঘ মূলত দুই ধরনের কাজকর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে—উন্নয়নমুখী কার্যক্রম এবং আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা। কিন্তু এই দুটি কার্যক্রমের রূপায়নেই রাষ্ট্রসংঘ নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এর মূল কারণ ছিল, বিশ্ব রাজনীতিতে ঠান্ডা যুদ্ধের পটভূমি। অপরদিকে, তৃতীয় বিশ্বের উত্থান এবং ‘উত্তর-দক্ষিণ’ (North-South) বিরোধ রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়নশীল পরিকল্পনা ব্যাহত করতে শুরু করে।

নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য দেশগুলি বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের ঠান্ডা যুদ্ধ প্রভাবিত মানসিকতার পরিচয় দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৯৪৯ সালে চীনে মাও সে তুং ক্ষমতায় এলেও দীর্ঘ সময় ধরে মার্কিন চাপের ফলে চীনের সদস্যপদের দাবি অগ্রাহ্য করা হয়। এমনকি রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে চীনের প্রতিনিধিত্ব করে ফরমোসায় (তাইওয়ান) চিয়াং কাই শেকের নেতৃত্বে কুয়োমিনতাং সরকার। দীর্ঘ সময় পরে ১৯৭১ সালে সম্পর্কের উন্নতির পর মার্কিন সরকার নিরাপত্তা পরিষদে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সদস্যপদের দাবি মেনে নেয়। অপরদিকে ‘ভিটো’ প্রয়োগ করার প্রবণতা রাষ্ট্রসংঘের কাজকর্মকে তীব্রভাবে ব্যাহত করে।

এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রসংঘ বিশ্বরাজনীতিতে বিভিন্ন ধরনের সংঘাত এড়াতে পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে শান্তিরক্ষার প্রয়াস বিভিন্ন ধারায় বিবর্তিত হয়। দ্বিপাক্ষিক আলোচনা, অনুসন্ধানী দল প্রেরণ, এমনকি সামরিক শান্তিবাহিনী প্রেরণ, বিভিন্ন উপায়ে রাষ্ট্রসংঘ সংঘর্ষ থামানোর ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে। অবশ্য ঠান্ডা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসংঘের এই সব প্রয়াস সব সময়ে বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকতো না। ১৯৪০-এর দশকে গ্রীসের গৃহযুদ্ধ চলাকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে গ্রীক কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর ওপর দমন নীতির প্রয়োগ নিয়ে অভিযোগ করলে নিরাপত্তা পরিষদ তা খারিজ করে দেয়। কিন্তু পরবর্তীকালে গ্রীক সরকার পূর্ব ইউরোপেরসমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে গ্রীক কমিউনিস্টদের সাহায্য করার অভিযোগ জানালে রাষ্ট্রসংঘ সেখানে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। কিন্তু এও স্বীকার করতে হয় যে অনেকক্ষেত্রেই রাষ্ট্রসংঘ শান্তির প্রয়াসে, নিরপেক্ষভাবে কাজ করার চেষ্টা করেছে।

১৯৪০-এর দশকে এশিয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে এই মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঔপনিবেশিক সংঘর্ষ একটি নতুন মাত্রা লাভ করে। এইসব ক্ষেত্রে

সংঘর্ষ রোধ করার চেষ্টায়, রাষ্ট্রসংঘ অবতীর্ণ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ইন্দোনেশিয়ায়, ডাচ এবং ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধ করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রসংঘ পদক্ষেপ নেয় এবং রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে ১৯৪৯ সালে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪০-এর দশকে রাষ্ট্রসংঘ কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বন্ধ করার পদক্ষেপ নেয়। ১৯৪৮-৪৯ সালের প্রথম ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ মূলত রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে বন্ধ হয়। ১৯৪৯ সালে কাশ্মীরে রাষ্ট্রসংঘের একটি পর্যবেক্ষণ সমিতিস্থাপিত হয় যা আজো অবস্থিত আছে। এছাড়া ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বন্ধ করার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রসংঘ উদ্যোগী হয়। এছাড়া, প্যালেস্টাইন অঞ্চলে নতুন ইজরায়েল রাষ্ট্র স্থাপনকে কেন্দ্র করে যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রসংঘ তা মেটাবার উদ্যোগ নেয়। রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে ১৯৪৯ সালে আরব লীগ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি এবং ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হলেও আঞ্চলিক শান্তি ফেরাতে রাষ্ট্রসংঘ ব্যর্থ হয়। পরবর্তীকালে ১৯৫৬ সালের সুয়েজ যুদ্ধকালে মূলত মার্কিন উদ্যোগে রাষ্ট্রসংঘ শান্তির পক্ষে পদক্ষেপ নিতে শুরুকরে। মিশর এবং ইজরায়েলের সীমান্ত এলাকার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ইউনাইটেড নেশনস এমারজেন্সি ফোর্স (UNEF)-এর হাতে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে সুয়েজ খাঁড়িও পুনরায় খুলে দেওয়া হয়। আরব ইজরায়েল সংঘর্ষ পুনরায় ১৯৬৭ সালে শুরু হয়। রাষ্ট্রসংঘ চেষ্টা করা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত এই যুদ্ধএড়াতে ব্যর্থ হয়। ১৯৭৩ সালে য়োম কিপুর (Yom Kippur) যুদ্ধের পর রাষ্ট্রসংঘ পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে পুনরায় উদ্যোগী হলেও এই উদ্দেশ্য খুব একটা সাফল্য লাভ করেনি।

এশিয়ার অন্যত্র কোরীয় সংঘর্ষ বন্ধ করবার উদ্যোগ অবশ্য সাফল্য লাভ করে। ১৯৫০-৫৪ পর্যন্ত চলা এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে বন্ধ হয়। লেবানন এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের মধ্যে ১৯৫৮ সালে সংঘর্ষ রোধে রাষ্ট্রসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৫৯ সালে লাওসে ১৯৭০-এর দশকে সাইপ্রাস সহ বিভিন্ন জায়গায় গৃহযুদ্ধ বা অন্য ধরনের সংঘর্ষ এড়াতে রাষ্ট্রসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও রাষ্ট্রসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৬৭ সালে নাইজেরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হলে রাষ্ট্রসংঘ তা মেটাতে উদ্যোগী হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮০-র দশকেও নাইজেরিয়ায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বন্ধে রাষ্ট্রসংঘ উদ্যোগ নেয়। এছাড়া অন্যান্য দেশে, যেমন মোজামবিক ও এ্যাঙ্গোলাতেও রাষ্ট্রসংঘ এই ধরনের উদ্যোগ নেয়। এছাড়া দীর্ঘসময় ধরে চলে আসা দক্ষিণ আফ্রিকার এপ্যারথিড (Apartheid) নীতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘ মূলত 'দক্ষিণ' গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির চাপে কিছু পদক্ষেপ নিলেও পশ্চিম গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির, বিশেষত ব্রিটেনের বিরোধিতায় এই পদক্ষেপ খুব একটা কার্যকরী হয়নি।

সব মিলিয়ে বলা যায় যে, রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে শান্তিরক্ষার প্রয়াস, সাফল্য ও ব্যর্থতার মিশ্র ইতিহাস। রাষ্ট্রসংঘের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৪ সালে 'ইউনাইটেড নেশনস হাই-কমিশনার ফর রিফিউজিস' এবং ১৯৬৫ সালে 'ইউনিসেফ' নোবেল শান্তি পুরস্কারলাভ করে। আরো পরে ১৯৮০-এর দশকে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিবাহিনী এই পুরস্কার লাভ করে।

এছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রসংঘ বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করেছে। অবশ্য 'উত্তর' গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির চাপে এই পদক্ষেপগুলি খুব একটু কার্যকর হয়ে ওঠেনি।

১৯৮০-র দশকের শেষার্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের দুর্বলতা এবং পতনের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত একমাত্রিক বিশ্বরাজনীতি গড়ে ওঠার প্রবণতা দেখা দেয়। এর ফলে রাষ্ট্রসংঘের কার্যকলাপ আরো সংকুচিত

হয়ে পড়ে। ১৯৮০-র দশকে ইরাক দ্বারা কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট যুদ্ধের মাধ্যমে ইরাককে পরাজিত করে সেই দেশেরওপর নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করে। রাষ্ট্রসংঘের সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনরূপে কাজ করার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। অন্যান্য বিষয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসংঘকে ব্যবহার করার প্রবণতা ভবিষ্যতে বিপজ্জনক হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা রয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের সামনে এক সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। বিভিন্ন ধরনের চাপ ও প্রলোভন উপেক্ষা করে রাষ্ট্রসংঘ যদি নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যেতে পারে তবে বিশ্বরাজনীতিতে এই সংগঠনের গুরুত্ব বজায় থাকবে। নয়ত, লীগের মতনই এই সংগঠনের ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। এছাড়া রাষ্ট্রসংঘের কিছু কাঠামোগত পরিবর্তনও আবশ্যিক। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যের সংখ্যা বাড়াবার জন্যে দীর্ঘ সময় থেকেই বহু মহল আগ্রহী। মহাসচিবের হাতেও অধিকতর ক্ষমতা দেওয়ার কথা কিছু লেখক বলেছেন। কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন ছাড়া রাষ্ট্রসংঘের কার্যকলাপের কোনো আশু পরিবর্তন অসম্ভব।

১২.৭ সারাংশ

বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম ধারা হিসেবে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব যেমন বাস্তব, অপরদিকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বিশ্বসংগঠনের মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি এবং সহযোগিতার প্রয়াসও তেমনি সত্যি। ১৯৪৫ সালে রাষ্ট্রসংঘ স্থাপনের মধ্য দিয়ে সেই সহযোগিতার ধারা একটি নতুন মাত্রা পেলেও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্ববর্তী ধারা রয়েছে (যেমন, লীগ অফ নেশনস)।

রাষ্ট্রসংঘের উদ্ভব সম্ভব হয় মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মিত্র-জোটের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে। এই যুদ্ধকালীন সহযোগিতা পরবর্তীকালে পূর্ণতা লাভ করে ১৯৪৫ সালে রাষ্ট্রসংঘ গঠনের মাধ্যমে।

প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি, কাঠামো এবং সাংগঠনিক কার্যকলাপের ভিত্তিতে প্রাক্তন লীগেরসঙ্গেকিছু মিল থাকলেও রাষ্ট্রসংঘ আরো ব্যাপক এবং বিস্তারিত কর্মসূচির সঙ্গে নিজেকে যোগ করেছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন কর্মসূচিতে নতুন মাত্রার সংযোগ ঘটিয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের অন্যতম কাজ হল বিশ্ব শান্তির প্রয়াস। নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও রাষ্ট্রসংঘ এই লক্ষে সাফল্য লাভ করেছে।

১৯৯০-এর দশকে রাষ্ট্রসংঘ নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে যার মধ্যে মূল হল মার্কিন নেতৃত্বাধীন একমাত্রিক বিশ্ব গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। রাষ্ট্রসংঘকে তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হলে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।

১২.৮ অনুশীলনী

১. রাষ্ট্রসংঘের সাংগঠনিক কাঠামোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

২. রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে বিশ্বশান্তির প্রয়াসের ওপর একটি টীকা লিখুন। রাষ্ট্রসংঘ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

৩. ডামবার্টন ওকস সম্মেলনে কোন কোন প্রতিনিধি দেশ খসড়া পত্র তৈরির দায়িত্ব পায়?

৪. রাষ্ট্রসংঘের প্রথম মহাসচিব কে ছিলেন?

১২.৯ উত্তর সংকেত

১. ১২.৫ অংশটি দেখুন।

২. ১২.৬ অংশটি দেখুন।

৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন এবং চীন।

৪. ট্রিগভি লাই।

১২.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১. পিটার ক্যালভোকোরেসী—'ওয়ার্লড পলিটিকস্ সিনস্ ১৯৪৫' (১৯৬৮)।

২. এইচ. জি. নিকোলাস—'দ্য ইউনাইটেড নেশনস এ্যাজ এ পলিটিক্যাল ইনস্‌টিটিউশন' (১৯৫৯)।

৩. ইভান লুয়ার্ড—'এ হিস্ট্রি অফ্ দ্য ইউনাইটেড নেশনস্' (১৯৮২)।

একক ১৩ ❑ আরব জাতীয়তাবাদ (১৯১৯—১৯৫৬)

গঠন

১৩.০ উদ্দেশ্য

১৩.১ প্রস্তাবনা

১৩.২ আরব দুনিয়া—১৯০০

১৩.৩ আরব জাতীয় সত্তার উন্মেষ

১৩.৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং আরব জাতীয়তাবাদ

১৩.৪.১ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং আরব জাতীয়তাবাদ

১৩.৪.২ সাইক্স-পিকো চুক্তি এবং বিশ্বযুদ্ধোত্তর আরব দুনিয়ার নতুন মানচিত্র

১৩.৫ আরব জাতীয়তাবাদের তিন ধারা

১৩.৫.১ উরবা **(Pan-Arabism)**

১৩.৫.২ ইসলামী উরবা

১৩.৫.৩ জাতিরাষ্ট্র-ভিত্তিক আরব জাতীয়তাবাদ

১৩.৬ জাতিরাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদ ১৯২০—১৯৬৫

১৩.৬.১ লেবানন

১৩.৬.২ সিরিয়া

১৩.৬.৩ মিশর

১৩.৬.৪ ট্রান্সজর্ডন

১৩.৬.৫ ইরাক

১৩.৬.৬ সৌদি আরব

১৩.৭ প্যালেস্তাইন, ইজরায়েল এবং আরব দুনিয়া ১৯১৭—১৯৬৫

১৩.৮ সারাংশ

১৩.৯ অনুশীলনী

১৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১৩.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন—

- আরব জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষাপট।
- আরব জাতীয়তাবাদের ধারাসমূহ।
- ১৯১৯—১৯৫৬ সময়কালে আরব জাতীয়তাবাদ ও রাজনীতির গতিপ্রকৃতি।

১৩.১ প্রস্তাবনা

তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির মত আরব দুনিয়াতেও বিংশ শতাব্দীতেই জাতীয়তাবাদ এক প্রবল রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতীয়মান হয়। এই এককে আরব দুনিয়ায় জাতীয়তাবাদের আবির্ভাবের ইতিহাস আলোচনা করা হবে।

এই এককের মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন কোন রাজনৈতিক তথা সামাজিক পশ্চাৎপটে অটোমান শাসনাধীন আরব দুনিয়ায় আরব সত্তার উন্মেষ এবং বিকাশ ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দরুন এবং তার পরবর্তীকালে সেই আরব সত্তা কীভাবে একাধিক রাজনৈতিক ধারার জন্ম দেয় তাও এই এককে আলোচিত হবে। সবশেষে, এই বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী ধারার সঙ্গে বিশ্ব রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে ১৯১৯-১৯৫৬ সময়কালের আরব রাজনীতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হবে।

১৩.২ আরব দুনিয়া ১৯০০

বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে আরব দুনিয়ায় বস্তুতঃ কোন ধরনেরই জাতীয়তাবাদ দেখা যায় নি। আরব দুনিয়ায় এক বিশাল অংশ জুড়ে তখন অটোমান তুর্কী শাসন। উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া এবং মিশর; ভূমধ্যসাগরীয় এশিয়ায় সিরিয়া, লেবানন এবং প্যালেস্তাইন, সাম্রাজ্যের পূর্বসীমায় পরবর্তীকালের ইরাক, আরব উপদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত হেজাজ (Hejaz) অঞ্চল (যার অন্যতম দুটি স্থান হল মক্কা ও মদিনা)—সর্বত্রই অটোমান শাসন চলে আসছিল বহু শতাব্দী ধরে। এমন কি আরব উপদ্বীপের দক্ষিণের নেজ্দ (Nejd) অঞ্চল, ইয়েমেন এবং পূর্ব উপকূলের শাসকেরাও হয় অটোমান নয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়ায় থাকতেন।

বর্তমানের আরব দুনিয়ায় বহু রাষ্ট্রেরই কোন ঐক্যবদ্ধ প্রশাসনিক অস্তিত্ব ছিল না। যেমন অটোমান শাসনকালে ইরাক বিভক্ত ছিল বাগদাদ, বসরা, এবং মাসুল নামক তিনটি প্রদেশে; তৎকালীন সিরিয়া ছিল বহু প্রদেশে বিভক্ত যার একটা বড় অংশ বর্তমানে লেবাননের অন্তর্ভুক্ত, বর্তমানের জর্ডান রাজ্যের উত্তরাঞ্চল বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে ছিল সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং দক্ষিণাঞ্চল ছিল প্যালেস্তাইনের অংশ বিশেষ। বর্তমানের ইজরায়েল এবং প্যালেস্তাইন অটোমান আমলে ছিল একটি অখণ্ড প্রদেশ। আরব উপদ্বীপ ছিল তিনভাগে বিভক্ত যার উত্তর তথা পশ্চিমে ছিল অটোমান শাসান।

প্রাদেশিক ঐক্যের অভাবকে আরও চরম পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল অটোমান প্রশাসন যন্ত্র। মুষ্টিমেয় কিছু অঞ্চল বাদ দিলে, বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে অটোমান সাম্রাজ্যের বেশির ভাগ অঞ্চলেই প্রত্যক্ষ কেন্দ্রীয় শাসন অনুপস্থিত ছিল। শাসনভার ন্যস্ত থাকত মূলত আঞ্চলিক প্রতিপত্তিশালী উপজাতীয় নেতা বা সেনাধ্যক্ষের হাতে। ফলে তুর্কী শাসনে আরব সমাজপতিদের রাজনৈতিক তথা সামাজিক প্রতিপত্তি কোনভাবে ক্ষুণ্ণ হয়নি এবং তারা তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে তেমন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হননি। গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরে সাম্রাজ্য যখন ক্রমেই দুর্বল হতে থাকে, আঞ্চলিক শাসকদের ক্ষমতা অনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। ১৯শ শতাব্দীতে যেমন মিশর কার্যত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই পরিচালিত হত। ১৮৮০-র দশকে যখন মিশরে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তা অটোমান সাম্রাজ্যে তেমন কোন প্রত্যক্ষ নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি-মিশরের সঙ্গে সাম্রাজ্যের আর্থ-রাজনৈতিক যোগ এতটাই ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল।

এ রকম চরম রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় বসবাসকারী আরবদের মধ্যে কোন সমষ্টি-চেতনা বিকাশের অবকাশ বিশেষ ছিল না। কেবলমাত্র বিংশ শতাব্দীব প্রথম দশকে ঘটা কিছু পরিবর্তনের সুবাদহেই এই চেতনার উন্মেষ সম্ভব হয়।

১৩.৩ আরব জাতীয় সত্তার উন্মেষ

অটোমান সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি তুরস্কের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালায় প্রায় গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে। পাশ্চাত্যের শক্তিগুলির প্রভাব ঠেকাতে অটোমানরা রাষ্ট্রযন্ত্র আধুনিকীকরণের জন্য সচেষ্ট হন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে, যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল মূলত তুর্কী জাতিভুক্ত সামরিক বাহিনীর সংস্কার। সামরিক বাহিনীর সংস্কারের ফলে এক প্রগতিশীল গোষ্ঠী সমরবিভাগের পুরোভাগে উঠে আসেন, যাদের বলা হয় "তরুণ তুর্কী"।

১৯০৮ সালে "তরুণ তুর্কী"দের নেতৃত্বে ইস্তাম্বুলে এক অভ্যুত্থান হয়, যার দরুন তুরস্কে একটি সংবিধান প্রণীত হয়। তরুণ তুর্কীদের ক্ষমতালাভের হাত ধরে জন্ম নেয় তুর্কী জাতীয়তাবাদ। নব উদ্যমে তুর্কী সামরিক এবং প্রশাসনিক এলিট (elite) সম্প্রদায় সমগ্র সাম্রাজ্যে তুর্কী আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা করতে থাকেন, সাম্রাজ্যের পুনরুত্থানের উদ্দেশ্যে।

আরব জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব ঘটে মূলত এই নবাগত তুর্কী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়া হিসাবে। তুর্কী জাতীয়তাবাদের আবির্ভাবের আগে অটোমান সুলতানের ইসলামী দুনিয়ার খলিফা হিসেবে স্বীকৃতিই তাঁর মুসলিম প্রজাদের আনুগত্য পাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু নবাগত তুর্কী জাতীয়তাবাদে ইসলামের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ায়, এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বত্রই তুর্কী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ক্রমশ ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। এই ক্ষোভ চরমে ওঠে যখন দেখা যায় যে ক্ষমতাসীন তুর্কী শাসকদের প্রণীত নীতির ফলে অটোমান সাম্রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই আরব বণিক এবং পেশাজীবী সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং লাভবান হচ্ছে শুধু তুর্কী জাতিভুক্ত প্রজারা।

আরব জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটে মূলত শিক্ষিত পেশাজীবী এবং সম্পন্ন বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ, বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা মূলত ইসলাম ধর্মালম্বী লক্ষাধিক লোকের মধ্যে জাতিসত্তার মূল সূত্র ছিল আরবীভাষা। লিবিয়া থেকে ইরাক অবধি ছড়িয়ে থাকা আরব সভ্যতায় সামাজিক চরিত্রে আরবী ভাষা ছাড়া অন্য গ্রন্থটি ছিল ইসলাম। কিন্তু অটোমান সুলতান স্বয়ং ইসলামী জগতেই খলিফা হবার দরুন তুর্কী জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে যে আরব জাতীয়তাবাদের জন্ম হয় তাতে আরবী ভাষার গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। তাই প্রাক-১৯১৪ সময়কালে আরবী ভাষাভাষি মুসলিম, খ্রীশ্চান এবং ইহুদী প্রজারা একজোট হয়ে অটোমান সাম্রাজ্যের তুর্কীকরণের (Turkification) বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তুর্কীকরণের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ এবং আরব চেতনার উৎপত্তি, উভয়েই মূলত অটোমান সাম্রাজ্যের আরব দুনিয়ার নগরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে।

শিক্ষিত পেশাজীবী সম্প্রদায়ের মূল দাবী ছিল তুর্কী শাসকদের বৈষম্যমূলক নীতির অবসান ঘটানো। সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন তাদের উদ্দেশ্য ছিল না, অন্ততঃ প্রথম দিকে, এদের মূল দাবী ছিল বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্বায়ত্বশাসন। কিন্তু জাতীয় সত্তার বিকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই আরও অনেক বিকল্পের সন্ধান মিলতে তাকে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল আরব সত্তার সঙ্গে ইসলামী সত্তার

তথাকথিত "অবিচ্ছেদ্য" যোগের ধারণা। আব্দ আল-রহমান আল-কাওয়াকিবি (১৮৪৯-১৯০২) মত অনুসরণ করে অনেকে বলতে শুরু করেন যে প্রকৃতি ইসলামী উম্মার (কৌম, সমাজ) নেতৃত্ব দিতে শুধু আরবী জাতিভুক্তি খলিফাই পারে। এই মতানুসারে ইসলামের মূল্যবোধ বস্তুতঃ আরব মূল্যবোধেরই প্রকৃষ্ট রূপ। ফলে অটোমান শাসন কোন সচেতন আরব বা ধর্মনিষ্ঠ মুসলিমের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

এই জাতীয় চেতনা অটোমান শাসনাধীন অঞ্চলের বাইরেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৮৮০-র দশক থেকে ব্রিটিশ শাসনাধীন মিশর এবং ১৯১২ থেকে ইতালীর শাসনাধীন থাকা লিবায়েতেও আরব জাতীয় চেতনার প্রভাব দেখা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই এই চেতনা বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে জনমত (এবং লিবিয়াতে প্রতিরোধ) গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

এসব সত্ত্বেও প্রাক-১৯১৪ পর্বে আরব জাতীয় চেতনা প্রকৃত অর্থে আরব জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হতে পারে নি। সাধারণ মুসলিম প্রজার কাছে খলিফার বিরোধিতা করা অচিন্তনীয় ছিল। ফলে তুর্কী জাতীয়তাবাদের দরুন অটোমান সাম্রাজ্য যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সুলতানের খলিফা হবার সুবাদে তা অনেকটাই পূরণ হয়েছিল।

১৩.৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তাদের জাতীয়তাবাদ

১৩.৪.১ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এবং আরব বিদ্রোহ

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ এবং রাশিয়ার প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পেতে অটোমান সাম্রাজ্য এদের বিরুদ্ধে জার্মানির তরফে যুদ্ধে যোগ দেয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বসবাসকারী মুসলমানদের ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিতে খলিফা তাঁর অংশগ্রহণকে জেহাদ হিসেবে ঘোষণা করেন। পাশাপাশি, আরব আনুগত্য বিষয়ে সন্দিহান তুর্কী শাসকেরা এক চরম দমননীতির আশ্রয় নেয়। যাতে আরব উম্মা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

ব্রিটিশ শক্তি এই সময়ে অটোমান সাম্রাজ্যে আরব ভাবাবেগকে প্রশয় দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। হালমী বংশোদ্ভূত (অর্থাৎ হজরত মহম্মদের বংশ) মক্কা শহরে শরিফ হুসেনের সামাজিক প্রভাবের কথা ভেবে মিশরের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে আশ্বাস দেন, যে তিনি তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে ব্রিটেনের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। কিন্তু ব্রিটেন বাগদাদ, বসরা এবং লেবাননের উপকূল বৃহত্তর আরব রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে নারাজ হওয়ায় শরিফ হুসেন বিদ্রোহ থেকে প্রথম বিরত থাকেন। কিন্তু আরবদের ওপর তুর্কী অত্যাচার চরমে ওঠা শরিফ হুসেন ১৯১৬ সালে সমগ্র আরব জাতিকে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে আহ্বান জানান। মিশরের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ T.E.Lawrence (Lawrence of Arabia) -কে পাঠান আরব বিদ্রোহকে এক সুংগঠিত অভ্যুত্থানের রূপ দিতে। ১৯১৭ সালের মধ্যে আরব উপদ্বীপের পশ্চিমে সমগ্র হেজাজ অঞ্চল এবং তারপরে প্যালেস্তাইন জয় করে নেন হুসেনের জ্যেষ্ঠপুত্র ফয়জল। ব্রিটিশ মদতপুষ্ট ফয়জল এরপর ১৯১৮ সালে সিরিয়াকে তুর্কীশাসন থেকে মুক্ত করেন। অনতিবিলম্বে অটোমান সাম্রাজ্য পরাজয় স্বীকর করে আত্মসমর্পণ করে (অক্টোবর ১৯১৮)।

অন্যদিকে, ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনী অটোমানদের হাত থেকে বর্তমান ইরাক জয় করে নেবার পাশাপাশি আরব উপদ্বীপের দক্ষিণের নেজ্‌দ অঞ্চলের শাসক আব্দল আজিত ইব্‌ন সৌদ-কে উৎসাহিত করে উপদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত জবল শম্মর অঞ্চল জয় করে নিতে। তুরস্কের সমর্থক ইবন রশিদের গোষ্ঠী দ্বারা শাসিত

জবল শম্মর অঞ্চলে ইব্‌ন সৌদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়াতে প্রায় সমগ্র আরব দুনিয়াতেই অটোমান শক্তির পতন ঘটে এবং ব্রিটিশ উপস্থিতি মজবুত হয়।

১৩.৪.২ সাইক্‌স-পিকো চুক্তি এবং বিশ্বযুদ্ধোত্তর আরব দুনিয়ার নতুন মানচিত্র

প্যালেস্তাইন, সিরিয়া এবং ইরাকের প্রভাবশালী লোকেরা ব্রিটেনের মদতে আরব বিদ্রোহে যোগ দেয়। বিনিময়ে তারা স্বাধীনতা আশা করেছিল। মিশরে ব্রিটিশ হাইকমিশনার স্যার হেনরি ম্যাকম্যাহন শরিফ হুসনকে ১৯১৮ সালেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে উপদ্বীপের হেজাজ অঞ্চল এবং সিরিয়া-প্যালেস্তাইন থেকে বর্তমান ইরাক জুড়ে হুসেনের হালমী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে।

কিন্তু ১৯১৬ সালে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার মধ্যে এক গোপন চুক্তি হয়। এই সাইক্‌স-পিকো (Sykes-Picot) চুক্তি অনুসারে তুরস্কের একটা বড় অঞ্চল রাশিয়াকে দিতে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স সম্মত হয়। বিনিময়ে সিরিয়ার সংলগ্ন উপকূল অঞ্চল (অর্থাৎ, বর্তমান লেবানন), সিরিয়া এবং মসুলে ফ্রান্সের কর্তৃত্বের কথা বলা হয়। ব্রিটেনকে প্যালেস্তাইনের ওপর অধিকার দেওয়া হয়। কেবলমাত্র আরব উপদ্বীপেই কোন পশ্চিমী শক্তি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা থেকে বিরত থাকে। তার ওপর ১৯১৭ সালে বালফোর (Balfour) ঘোষণা অনুসারে ব্রিটেন প্যালেস্তাইনে ইহুদী জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ বাসভূমি দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল।

এ হেন পরস্পরবিরোধী প্রত্যাশা এবং অঙ্গীকারের মধ্যে প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে আরব দুনিয়ার নতুন মানচিত্র তৈরী হয়। প্রভাবশালী মার্কিন রাষ্ট্রপতি শান্তি সম্মেলনে স্ব-শাসনের পক্ষে জোরালো সওয়াল করায় ভূতপূর্ব অটোমান সাম্রাজ্যের কোন অংশ সরাসরি ব্রিটিশ বা ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা থেকে লন্ডন এবং প্যারিস বিরত থাকে। পরিবর্তে ঠিক হয়, এই অঞ্চলের অধিবাসীরা স্ব-শাসনের জন্য যথেষ্ট উন্নত না হওয়া পর্যন্ত জাতিসংঘ (League of Nations)-এর আদি, (Mandate) অনুসারে ব্রিটিশ বা ফরাসী শক্তির অধীনে থাকবে।

বলা বাহুল্য আরব জাতীয়তাবাদী এর তীব্র বিরোধিতা করে। শরিফ হুসেনের জ্যেষ্ঠপুত্র ফয়জল দামাস্কাসে তুর্কী শাসনের অবসান ঘটিয়ে সেখানকার সমাজপতিদের সম্মতি অনুসারে এক অনর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেছিলেন। ১৯১৮-১৯ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতির পাঠানো কিং-ক্রেন (King-Crane) কমিশন আরবদের অভিমতের সমীক্ষা করতে এসেই ফরাসী শাসন এবং ইহুদী বাসভূমির বিরুদ্ধে আরব ঐক্যমত সম্বন্ধে জানতে পারনে। কিং-ক্রেনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে ব্রিটেন উপকূলবর্তী বেইরুটে এবং পরে সিরিয়াতে ফরাসী সেনা ঢুকতে দেয়। এর প্রতিবাদে আরব জাতীয়তাবাদীরা ১৯২০ সালের মার্চ মাসে সিরিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেয়। কিন্তু জুলাই মাসের মধ্যে ফরাসী সেনার হাতে আরবরা পরাজিত হয়। এবং অন্তর্বর্তীকালীন হালমী সরকারের পতন ঘটে।

জাতিসংঘের অনুমতিক্রমে ফ্রান্স নবনির্মিত (লেবানন এবং সিরিয়া রাষ্ট্র দুটির শাসক (Mandatory Power) হিসেবে নিযুক্ত হয়। ব্রিটেন প্যালেস্তাইন, মসুল, বসরা এবং বাগদাদ প্রদেশে শাসনাধিকার পায়। মসুল, বাগদাদ এবং বসরা (যার থেকে কুয়েত নাম বা অঞ্চলটি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়)-কে একত্রে এনে ইরাক রাষ্ট্র সৃষ্টি করে ব্রিটেন। জনরোষ সামাল দিতে দামাস্কাস থেকে ক্ষমতাচ্যুত ফয়জলকে ইরাকের রাজা ঘোষণা করা হয়। ইরাক যাকে দেবার কথা প্রথম ভাবা হয়েছিল, ফয়জলের ছোট ভাই আব্দুল্লাহ্‌কে তুষ্ট করতে জর্ডান নদীর উত্তরে অবস্থিত বেদুইন-প্রধান অঞ্চল প্যালেস্তাইন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ট্রান্সজর্ডান আমির শাহী সৃষ্টি করা হয়—এবং তা আব্দুল্লাহ্‌-র হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্যালেস্তাইনের অবশিষ্ট অঞ্চল সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে রাখা হয়, এবং ধীরে ধীরে ইহুদীদের অভিবাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এভাবে এই অঞ্চলে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক জটিলতার পথ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।

১৩.৫ আরব জাতীয়তাবাদের তিন ধারা

বিশ্বযুদ্ধোত্তর আরব দুনিয়ায় জাতীয়তাবাদ রাজনীতির মঞ্চে এক প্রবল শক্তি হিসেবে দেখা দেয়। বহু শতাব্দী ব্যাপী তুর্কী শাসন থেকে মুক্ত হয়ে আরব দুনিয়ার সর্বত্র ছিল নতুন সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার তাগিদ। এর মধ্যে অন্যতম ছিল একটি ন্যায় ও সংহত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন। রাষ্ট্রনির্মাণের কেন্দ্রে আরব জাতীয়তাবাদ থাকলেও, যুদ্ধোত্তর যুগে আরব জাতীয়তাবাদ তিন ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল—উরুবা বা Pan-Arabism (নিখিল আরবীয়তা) ইসলামী উরুবা (অর্থাৎ ইসলাম এবং আরবীয়তার যৌথসত্তা) এবং জাতিরাষ্ট্র-ভিত্তিক আরব জাতীয়তাবাদ (যেমন, মিশরীয় জাতীয়তাবাদ, সিরিয় জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি)। এর মধ্যে প্রথম দুটি ধারার অনুগামীরা জাতিরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের থেকেও আরব সত্তাকে বেশী প্রাধান্য দিতেন। তৃতীয় মতাবলম্বীরা মনে করতেন ধর্ম, সামাজিক চরিত্র এবং ঐতিহাসিক কারণে আরব দুনিয়া এত বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল যে নিছক আরব ভাষাকে কেন্দ্র করে একটি রাষ্ট্র গঠন বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। এছাড়া ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব। সুতরাং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য স্মরণে রেখে জাতিরাষ্ট্র গড়ে তোলাই যুগপোযোগী পদক্ষেপ হবে।

১৩.৫.১ উরবা (Pan-Arabism)

উরবা (Pan-Arabism বা নিখিল-আরবীয়তা) বলতে আরব জাতীয়তাবাদের সেই ধারাকে বোঝায় যা আরব জগতকে ধর্মীয় বা জাতিরাষ্ট্রের নামে বিভাজনের বিরুদ্ধে। উরুবার মূল উপজীব্য হল আরব ভাষাগত তথা সাংস্কৃতিক ঐক্যকে কেন্দ্র করে এক ঐক্যবদ্ধ আরব রাজনৈতিক ব্যবস্থা করে তোলা।

উরবা তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন সাতি আল-হাসরি (১৮৮০-১৯৬৮)। আল-হাসরির মতে কোন জাতি শুধু বিশেষ একটি গোষ্ঠীর সমষ্টিগত ভাবে থাকার এবং চিহ্নিত হবার ইচ্ছা থেকেই জন্ম নিতে পারে না। বাস্তবেও তার ভিত্তি থাকা আবশ্যক। এই বাস্তব ভিত্তি আসে ভাষাগত সাযুজ্য থেকে যা সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক উপাদানের মাধ্যমে আরও জোরালো হয়। আরবী ভাষার দৌলতে আরব জাতির যে বাস্তব ভিত্তি রয়েছে তা আল-হাসরির মতে অনস্বীকার্য।

আল-হাসরির অনুগামী উরবা মতাবলম্বীদের বক্তব্য ছিল যে নিখিল আরবীয় ঐক্যের ধারণা আরব জাতির অস্তিত্বেরই প্রমাণ মাত্র। আল-হাসরি এবং অন্যান্য উরুবাবাদীরা মনে করতেন এই আরব জাতীয় সত্তায়, আরব সংস্কৃতিতে ইসলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও একমাত্র বা অন্যতম উপাদানও নয়। ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মীয় ঐতিহ্যেরও ঊর্ধ্বে উরুবাবাদীরা দেখতেন একটি সাধারণ আরবী জীবনদর্শন এবং মূল্যবোধ যা আরবীভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তাই আল-হাসরি এবং সমমনোভাবাপন্ন আরবদের চোখে আরব জাতিসত্তার ধর্মীয় ভেদাভেদের কোন স্থান ছিল না।

একইভাবে উরুবাবাদীরা জাতিরাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তাবাদকেও মেনে নেননি। আল-হাসরি বলতেন ধর্ম, শ্রেণী নির্বিশেষে যে কোন মিশরীয় (এবং অন্য ক্ষেত্রে যে কোন রাষ্ট্রের অধিবাসী) তার দেশের অন্য যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে একটা ক্ষেত্রেই অভিন্ন—সেটি হচ্ছে ভাষা। তাই যে কোন আরবী ভাষাভাষী ব্যক্তির পক্ষে ব্যক্তিগত সামাজিক অবস্থানের ঊর্ধ্বে উঠে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করা সম্ভব হলে, সেই আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে নিখিল আরবীয়তায় বিশ্বাস না করার কোন কারণ নেই।

ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে আবার জাতিসত্তা সন্ধানের এই প্রয়াস অ-মুসলিম আরবদের কাছে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। যুদ্ধোত্তর প্রথম দশকে মিশর সিরিয়া, লেবানন এবং ইরাকে বসবাসকারী। খ্রিস্টান এবং অন্যান্য

ছোটখাটো ধর্মাচরণকারী জনগোষ্ঠী (যেমন— লেবানন, সিরিয়া এবং ইরাকের শিয়া মুসলিম সম্প্রদায়) খুব বড় সংখ্যায় উরবা মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়। উরবা মতবাদ কালক্রমে জনপ্রিয়তা হারালেও তা ১৯৫০-এর দশকে বাথ রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রে এই ধারণা কতকটা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

১৩.৫.২ ইসলামী উরবা

ইসলামী উরবা হল আরব জাতীয়তাবাদের সেই ধারা যাতে আরব জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ইসলামী বিশ্বভ্রাতৃত্বের মিশ্রণ ঘটেছিল। জাতি-রাষ্ট্র ভিত্তিক সংকীর্ণ আরব জাতীয়তাবাদ। বিশ্বযুদ্ধোত্তর আরব দুনিয়ায় যখন মাথা চাড়া দিচ্ছিল, এবং উরবা (Pan-Arabism) বা নিখিল আরবীয়তা) ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল, তখন ইসলাম এবং আরবীয়তার মিশ্রণে আরব দুনিয়ার রাজনৈতিক বিভাজনের বিরুধ্বে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এই মতবাদের উত্থান ঘটে।

বস্তুতঃ ইসলাম এবং আরবীয়তাকে অবিচ্ছেদ্য হিসাবে দেখার প্রবণতা প্রাক-১৯১৪ যুগ থেকেই দেখা গিয়েছিল আব্দ আল রহমান আল-কাওয়াকিবি ইসলামী মূল্যবোধকে আরবী মূল্যবোধেরই উৎকৃষ্টতম নিদর্শন মনে করতেন। বিশ্বযুদ্ধের পরে এই চেতনাকে সুসংহত রাজনৈতিক মতবাদের রূপ দেন শাকিব আরস্‌লান (১৮৬৯-১৯৪৬)। ইসলামী পুনর্জাগরণের দুই অন্যতম রূপকার মহম্মদ আব্দুহ এবং রশিদ রিদার সংস্পর্শে এসে আরস্‌লান উরবা এবং ইসলামের পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য যোগ উপলব্ধি করেন। তাই ব্যক্তিগতভাবে লেবানন দ্রুজ (Druze) নামক ক্ষুদ্র এক মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক হওয়া সত্ত্বেও আরস্‌লাম গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে উঠে বৃহত্তর ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে আরব দুনিয়ার ঐক্যসাধনের পক্ষে সওয়াল করেন।

ইসলামী উরবার প্রবক্তরা মনে করতেন আরব সভ্যতা, আরব ইতিহাস এবং সংস্কৃতির প্রেরণা ছিল ইসলাম। আরবীভাষা এবং আরব সংস্কৃতির প্রাক-ইসলাম পর্বে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলির বর্জন এবং ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলির পরিমার্জিত এবং প্রকৃষ্ট রূপই হল ইসলাম। তাই ইসলামেরও যে সর্বজনগ্রাহ্য চরিত্র তা ছাড়াও ইসলামী জীবনাদর্শের প্রাণকেন্দ্রে এক আরব জীবনবোধের নির্যাস দেখতে পেতেন ইসলামী উরবার প্রবক্তরা।

আপাতদৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষ উরবার তুলনায় ইসলামী উরবার গ্রহণযোগ্যতা বেশি হওয়া উচিত ছিল। তুলনামূলক জনপ্রিয়তার বিচারে দেখলে ইসলামী উরবা কতকটা এগিয়ে ছিল তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তাও ইসলামী উরবা বিশ, ত্রিশ বা চল্লিশের দশকে রাজনৈতিক বিকল্প হিসাবে খুব একটা জনপ্রিয় হয় নি। তার কারণ ইসলামী উরবা মতবাদে আরব-ভ্রাতৃত্বের তুলনায় নিখিল ঐসলামিক ধারণার প্রভাব অনেক বেশি পড়েছিল এবং সে যুগে রাজনৈতিক প্রভাবসম্পন্ন সামাজিক গোষ্ঠীগুলিতে নিখিল ঐসলামিক মতবাদের (Pan-Islam) প্রভাব তেমন জোরালো ছিল না। ফলে ইসলামী চরিত্রের জন্যই ইসলাম উরবা জাতিরাষ্ট্র ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিকল্প হিসেবে প্রতিভাত হতে পারে নি।

১৩.৫.৩ জাতিরাষ্ট্র ভিত্তিক আরব জাতীয়তাবাদ

উরবা এবং ইসলামী উরবার বিপরীতে ছিল ছোট ছোট জাতিরাষ্ট্র কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আরব জাতীয়তাবাদ। জনপ্রিয়তার নিরীখে এই সংকীর্ণ আরব জাতীয়তাবাদ সমূহ দুটি বিশ্বযুদ্ধে অন্তর্বর্তী সময়ে আরব রাজনৈতিক জগতে অগ্রগণ্য হয়েছিল।

রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আরব জাতীয়তাবাদের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ আরব দুনিয়ার বাস্তব এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে অটোমান-সাম্রাজ্য উত্তর আরব দুনিয়ার যে নতুন রাজনৈতিক মানচিত্র

তৈরী হয় তা কার্যত পশ্চিমী শক্তিগুলির স্বার্থানুসারে হলেও আরব সমাজে (কতকটা অজান্তেই) ব্যাপক পরিবর্তনে সহায়ক হয়। তুর্কী শাসনকালে প্রশাসনের সুবিধার স্বার্থে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর (ধর্মীয়, উপজাতীয় প্রভৃতি) ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বহু প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রিটেন এবং ফ্রান্স নিজের স্বার্থে এরকম একাধিক প্রদেশকে যুক্ত করে, এবং ধর্মীয় উপজাতীয় বিবাদ সত্ত্বেও এগুলিকে 'ঐতিহাসিক' কারণে জাতিসত্ত্বা হিসেবে নির্দিষ্ট করে। যেমন অটোমান শাসিত সিরিয় প্রদেশগুলির উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি বিচ্ছিন্ন করে ফ্রান্স লেবানন রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। জর্ডান নদীর উত্তরে অবস্থিত অংশটি প্যালেস্তাইনের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ট্রান্সজর্ডান রাজ্যের জন্ম দেয় ব্রিটেন। অটোমান-শাসিত মেসোপটেমিয়ার বাগদাদ, মসুল এবং বসরা প্রদেশ যুক্ত করে সৃষ্ট হয় ইরাক। বস্তুতঃ মিশর এবং লিবিয়া ছাড়া আরব দুনিয়ার প্রায় সর্বত্রই অটোমান-উত্তর প্রশাসনিক বিভাজনকে রাষ্ট্রীয় বিভাজনের রূপ দেওয়া হয়।

এই সদ্যসৃষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে নাগরিকরা আরবী ভাষাভাষী হলেও ধর্ম, সম্প্রদায় বা উপজাতির কারণে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। লেবাননে যেমন ১৮টি সম্প্রদায় সরকারীভাবে স্বীকৃত, সিরিয়াতেও কোন গোষ্ঠীরই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা কখনো ছিল না। এই অঞ্চলে ১৯২০-এর দশকে তাই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে রাষ্ট্রগঠনের জন্য রাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রয়োজন হয়েছিল। এই প্রয়োজনের অন্যতম কারণ তুর্কীশাসনমুক্ত হবার পরে আরব গোষ্ঠীসমূহ পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ফিরে পাবার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ণ প্রয়াস চালায়। এক্ষেত্রে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উঠে পশ্চিমী শক্তির বিরুদ্ধাচরণের প্রবণতা উরবা এবং ইসলামী উরবার দরুন মজবুত হয়েছিল। জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টি হবার ফলে সবকটি রাষ্ট্রেই একাধিক গোষ্ঠী লাভবান হওয়াতে সেই গোষ্ঠীগুলি তাদের অনুকূল অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা ধরে রাখতে চেয়েছিল। তাই রাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ—প্রথমত, সৃষ্ট রাষ্ট্রকে পশ্চিমী বলয় থেকে সরিয়ে আনতে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে কাজ করা ; দ্বিতীয়ত, উরবা বা ইসলামী উরবার বলয় থেকে রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন রাখতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্যের দাবী জানানো।

রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে আরব জগতে একাধিক ধরন দেখা যায়। যেসব দেশে অ-মুসলিম নাগরিকের সংখ্যা নগণ্য ছিল না, সে সব ক্ষেত্রে সে অঞ্চলের প্রাক-ইসলামী ইতিহাসের সময় থেকে রাষ্ট্রচেতনার উপাদান খোঁজা হত। যেমন মিশরীয় জাতীয়চেতনায় আরবীয়তা এবং ইসলামকে মেনে নিয়েও মিশরের প্রাক-ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসকে অবশিষ্ট আরব দুনিয়ার থেকে তার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্যবহার করা হত। একইভাবে, সিরিয় জাতীয়তাবাদকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের উর্ধ্বে এবং আরব তথা ইসলামী বৃত্তের বাইরে রাখতে সে অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে আধুনিক সিরিয় রাষ্ট্রের যোগ স্থাপনের চেষ্টা করতে হয়। সব থেকে চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটে লেবাননের ক্ষেত্রে। 'প্রাক-১৯১৯ লেবাননের আঞ্চলিক চেতনা ম্যারনাইট খ্রিষ্টান সত্ত্বাকে ঘিরে উঠেছিল। ১৯২০-এ নবনির্মিত বৃহত্তর লেবানন রাষ্ট্রে সিরিয়ার মুসলিম প্রধান উপকূলবর্তী অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নতুন জাতীয় চেতনার প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই নতুন রাষ্ট্রীয় চেতনা গড়ে তুলতে সহায়ক হয় প্রাচীন ফিনিশীয় সভ্যতার সঙ্গে সদ্যোজাত রাষ্ট্রের এক কাল্পনিক যোগসূত্র, যার মূল ছিল মূলত সমুদ্র বাণিজ্য নির্ভর সামাজিক জীবনযাত্রা (যা কিনা ওই অঞ্চলের চিরকালীন বৈশিষ্ট্য)।

যে সব ক্ষেত্রে অ-মুসলিম জনগণের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য সে সব রাষ্ট্রে জাতীয় চেতনা গড়ে তোলার জন্য ইসলামি ছিল অন্যতম উপাদান। লিবিয়াতে সানুসিয়া সুফী সম্প্রদায়ের নেতা প্রথম ইদ্রিস গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ লিবিয়ার অধিবাসীদের সানুসিয়া ইসলামের সাহায্যে একত্রিত করেন এবং ইতালীয় ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ১৯১১ সাল থেকে প্রায় চার দশক ধরে ইতালীয় শাসনের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামের দরুনই জন্ম নিয়েছিল লিবিয় জাতীয়তাবাদ। এমন কী বিশের দশকে যখন নেজ্‌দের শাসক

ইব্‌ন সৌদ সমগ্র আবর উপদ্বীপে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সৌদি আরব রাষ্ট্রের পত্তন করেন, ইসলাম হয়ে উঠেছিল তাঁর রাষ্ট্রনির্মাণের সব থেকে বড় উপাদান। ওয়াহবি ইসলামের সাহায্যে রক্ষণশীল বেদুইনের সহায়তায় ইব্‌ন সৌদ সমগ্র উপদ্বীপে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

১৩.৬ জাতিরাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদ (১৯২০—৫৬)

১৯২০ সালে প্যারিস শান্তি সম্মেলনের অন্তর্গত সান রেমো চুক্তি অনুসারে আরব দুনিয়ায় যে সব রাষ্ট্রগুলির আবির্ভাব ঘটে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই সেগুলি নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক তথা রাজনৈতিক রূপরেখা পেয়ে যায়। '২০ এবং '৩০ এর দশক ছিল এ অঞ্চলে রাষ্ট্রনির্মাণের যুগ। কোন কোন দেশে রাষ্ট্রনির্মাণ সম্পন্ন হয়েছিল পাশ্চাত্য শক্তির তত্ত্বাবধানে, অন্যত্র আঞ্চলিক নেতৃত্ব হয়ে উঠেছিল রাষ্ট্র নির্মাণের মূল স্তম্ভ। বিভিন্ন রাজনৈতিক তথা সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে প্রত্যেকটি সদ্য নির্মিত রাষ্ট্রেই জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির থেকে পৃথক ছিল।

১৩.৬.১ লেবানন

১৯২০ সালে যে লেবানন সৃষ্টি হয়, তা অটোমান-শাসিত খ্রিস্টান প্রধান লেবাননের সঙ্গে সিরিয়ার কিছুটা অংশের সংযুক্তিকরণের ফল। রাষ্ট্রসংঘের দ্বারা লেবাননের শাসনাধিকার প্রাপ্ত শক্তি (Mandatory Power) ফ্রান্সের উদ্দেশ্য ছিল লেবানন অঞ্চলটি অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলা, যাতে শাসক হিসাবে ঔপনিবেশিক শক্তি ফ্রান্সও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়। ফলে নবনির্মিত লেবাননে উপকূল এবং পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত হয় উর্বর কৃষি জমি। কিন্তু একই সঙ্গে খ্রিস্টান প্রধান লেবাননে বিপুল সংখ্যক মুসলিম অধিবাসীও নাগরিকত্ব লাভ করে, এবং মোট জনসংখ্যার নিরীখে খ্রিস্টান এবং মুসলিম ধর্মাবলম্বী হয়ে দাঁড়ায় প্রায় সমসংখ্যক।

জনসংখ্যার সংখ্যাগত এবং গুণগত পরিবর্তনের ফলে লেবাননের জাতীয়চেতনায়-এ পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রাক ১৯২০ পর্বে লেবাননে যে আঞ্চলিক সত্তা গড়ে উঠেছিল তার মূলে ছিল সেখানকার খ্রিস্টানরা, বিশেষ অনুমতিবলে ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং রাশিয়া যথাক্রমে ম্যারনাইট, প্রটেস্টান্ট এবং অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের জন্য যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সৃষ্টি করেছিল সেগুলির সূত্রেই লেবাননের শিক্ষিত জনমানসে ইউরোপীয় চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটে—এর অন্যতম ছিল জাতীয়তাবাদী চেতনা। লেবাননের খ্রিস্টানরা নিজস্ব ভেদাভেদের উর্ধ্বে উঠে বৈষম্যমূলক তুর্কী ব্যবস্থার অবসান চেয়েছিলেন। অটোমান শক্তির পতনের পর তাঁরা তাই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছিলেন।

মুসলিম-প্রধান কৃষি অঞ্চল লেবাননের সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে লেবাননের আর্থিক লাভ বৈ ক্ষতি হয় নি। ফলে সদ্য সংযোজিত অঞ্চলের বাসিন্দাদেরও লেবাননের প্রতি আনুগত্য নিশ্চিত করতে ধর্মীয় চেতনার উর্ধ্বে উঠে জাতিরাষ্ট্রের নির্মাণকার্য আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। এক্ষেত্রে উরবা একটি বিকল্প হতে পারত, কিন্তু তা হলে লেবাননের স্বায়ত্বশাসন সম্ভব না হবার প্রবল সম্ভাবনা ছিল।

এ সমস্ত কারণে বিশের দশকে লেবাননের স্বাতন্ত্র্য জনমানসে প্রতিষ্ঠা করতে প্রাক-রোমান যুগের ফিনিশীয় সভ্যতার সঙ্গে আধুনিক লেবাননের যোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। নিখাদ "লেবানীয়" এই চেতনার কেন্দ্রে রাখা হয় সমুদ্র বাণিজ্য কেন্দ্রিক সমাজ জীবন। পরবর্তী যুগে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের পদানত হবার পরেও এই বিশেষ লেবানীয় সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামের ইতিহাসই হয়ে ওঠে আধুনিক লেবানন রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রস্তর।

এই জীবনবোধের শরিক হিসেবে খ্রিস্টান (ম্যারনাইট, প্রটেস্ট্যান্ট, অর্থোডক্স ইত্যাদি) এবং মুসলিম (সুন্নি, শিয়া, দ্রুজ) গোষ্ঠীসমূহ নিজেদের এই জাতিভুক্ত বলে ভাবতে শিখেছে ১৯২০-এর দশক থেকে।

'২০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে লেবাননে ফরাসী শাসনের অবসানের দাবী উঠতে থাকে। ১৯২৬ সালে যে সংবিধান প্রবর্তিত হয় ফরাসীদের দ্বারা তাতে খ্রিস্টান এবং মুসলিমদের মধ্যে ক্ষমতা সমানভাবে বন্টন করে দেওয়া হয়। ক্ষমতার আনুপাতিক বন্টন যাদের মনঃপূত হয় নি, তারা উরবা বা সিরিয় জাতীয়তাবাদের দিকে ঝোঁকেন। লেবানীয় জাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতা বন্টন মেনে নিলেও ফরাসী হাইকমিশনারের মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা নিয়ে অসন্তোষ জাহির করেন। ফলে ১৯৩২ এবং ১৯৩৯ সালে সাময়িকভাবে সংবিধান বিলম্বিত করা হয়। তবু সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের সুবাদে লেবাননকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে মেনে নেওয়ার দাবী উঠলে ফ্রান্স তা মেনে নেয়। ১৯৩৪ সালে জন্ম হয় স্বাধীন লেবাননের।

১৯৪৮ সালে ইজরায়েল স্বাধীন হবার পরে যে যুদ্ধ হয় তাতে বহু প্যালেস্তিনীয় আরব লেবাননে আশ্রয় নেয়। ফলত লেবাননের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিকাঠামোয় যে চাপ পড়ে তাতে ইজরায়েলের প্রতি বিরূপ মানসিকতার জন্ম হয় এবং লেবাননের রাষ্ট্রীয় চেতনায় আরবী সত্তার প্রবেশ ঘটতে শুরু করে। তবে লেবানীয় সত্তার এই বিবর্তন আরও প্রকট হয়ে ওঠে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে।

১৩.৬.২ সিরিয়া

সান রেমো চুক্তি অনুসারে সিরিয়ার শাসনাধিকার পেয়ে ফ্রান্স আরব জগতের মানচিত্রে যে পরিবর্তনগুলি ঘটায় আধুনিক সিরিয়ার সৃষ্টি তার অন্যতম। ওমাইয়াদ বংশের শাসনকাল থেকে (৭ম শতাব্দী) প্রায় হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে মোটের ওপর সিরিয়ার যে প্রশাসনিক ঐক্য ছিল, লেবাননকে অটোমান-সিরিয়ার কিছুটা অংশ দিয়ে দেওয়াতে সেই ঐক্য প্রথম ভেঙে যায়। ফলে বিংশ শতাব্দীর সিরিয় জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রে রয়েছে কতকটা ভূগোল এবং কতকটা ইতিহাস—কারণ সিরিয়ার গ্রহণযোগ্য কোন ভৌগোলিক সংজ্ঞা দেওয়াই সিরিয় জাতীয়তাবাদের মূল পরিচিতি।

প্রাক-১৯১৪ যুগে সুন্নি মুসলিম প্রধান সিরিয়ায় তুর্কী বৈষম্যের প্রতিবাদে আরব জাতীয়তাবাদের জোয়ার ওঠে এবং বিশ্বযুদ্ধের সময়ে হালমী যুবরাজ ফয়জল ব্রিটিশ মদতে সিরিয়ায় উপস্থিত হলে অটোমানদের বিতাড়নে তিনি সিরিয়ার মদত পেয়েছিলেন। স্বাধীন আরব রাজ্যের প্রতিশ্রুতি পূরণের সম্ভাবনা যখন সান রেমো চুক্তিতে শেষ হয়ে যায়, ফয়জল সিরিয় অধিবাসীদের সমর্থনে পশ্চিমী শক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাধীন রাজ্য এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই ফ্রান্স বাহুবলে রাজধানী দামাস্কাসে প্রবেশ করে এবং ফয়জল এবং উরবাপন্থীরা পালাতে বাধ্য হন।

শাসন কায়েম করতে গিয়ে প্রতি পদে সিরিয়ার সংখ্যাগুরু সুন্নিদের বিরোধিতার মুখে পড়ে ফ্রান্স সিরিয়ার একটি মুসলিম প্রধান অঞ্চল লেবাননকে দিয়ে দেয়, এবং অবশিষ্ট সিরিয়াকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে দেয়। সুন্নি প্রধান আলেপ্পো এবং দামাস্কাস ছাড়া আলাওয়ি (Alawiye), শিয়াদের জন্য লাটকিয়া, তুর্কীপ্রধান আলেকজান্দ্রা এবং দ্রুজদের জন্য জাবাল দ্রুজ অঞ্চলে সৃষ্টি করা হয়—উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করে সিরিয়াদের ঐক্য ব্যাহত করা। তার ওপরে, শহুরে শিক্ষিত সুন্নি আরবদের সামাজিক প্রাধান্য খর্ব করতে সিরিয় সেনাবাহিনীতে সংখ্যালঘুদের বেশি করে নিয়োগ করা হয়।

তবু ফরাসী শাসনের দমনমূলক চরিত্রের জন্য ফ্রান্স কোনদিন সিরিয়দের আনুগত্য পায়নি। সংখ্যাগুরু সুন্নি এবং সংখ্যালঘু শিয়া এবং খ্রিস্টান-সকলেই ফরাসী শাসনের বিরোধিতায় মুখর হয়। ১৯২৫ সালে আলাওয়ি

শিয়া এবং দামাস্কাসের আরব জাতীয়তাবাদীরা এক যোগে এক সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটায়। বহু কষ্টে এই বিদ্রোহ দমনের পরে একদিকে ফ্রান্স যেমন একটু নমনীয় হয় তেমনই সিরিয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব ক্রমশ সাংবিধানিক রাজনীতির দিকে ঝোঁকেন ; ১৯২৮ সালে এক সংবিধান সভা আহ্বান করা হয়, কিন্তু কোন খসড়া তৈরী হবার আগেই সেটিকে বাতিল করতে হয়—কারণ লেবানন, আলেকজান্দ্রা এবং জবল দ্রুজকে অখণ্ড সিরিয়ার অংশ হিসাবে দেখতে ফ্রান্স নারাজ ছিল।

১৯৩৬ সালে ফ্রান্স-এর সঙ্গে সিরিয়ার মৈত্রী চুক্তির সুবাদে সম্পর্কের উন্নতি হলেও ১৯৩৯ সালে তুরস্ককে আলেকজান্দ্রাত্তা প্রদেশ হস্তান্তরের বিরুদ্ধে সিরিয় জাতয়ীতাবাদীরা সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯৪০ সালে জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সিরিয়ায় বিক্ষোভ চরমে উঠলে ১৯১১ সালে ভিশি সরকার সিরিয়াকে আংশিক স্বায়ত্বশাসন দিতে রাজী হয়। সেই বছরেই স্বাধীন ফ্রান্সের নেতা দ্যগল সিরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেন (যুদ্ধকালীন সহায়তার আশায়)। সেই অনুসারে ১৯৪৩ সালে সিরিয়ায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় এবং ১৯৪৬ সালে সিরিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে।

ফরাসী শাসনের অবসানের পরে সিরিয় জাতীয়তাবাদ মূলত তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। বাণিজ্য নির্ভর গোষ্ঠী সিরিয় রাষ্ট্রের নির্ধারিত সীমায় সন্তুষ্ট থেকে দূরবর্তী আরব রাজ্য (যেমন মিশর এবং সৌদি আরব)-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু কৃষি নির্ভর এবং ভূস্বামী গোষ্ঠীগুলি চায় বৃহত্তর সিরিয়া যাতে ১৯২০-এ হারানো কৃষিপ্রধান অঞ্চল (যা লেবানন, প্যালেস্তাইন, জর্ডান এবং ইরাকের অন্তর্ভুক্ত) ফিরে পাওয়া যায়। ১৯৫০-এর দশক থেকে তৃতীয় একটি ধারার আবির্ভাব ঘটেছে, যা সিরিয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে আরবীয়তাকে যুক্ত করতে সচেষ্ট—এর অন্যতম প্রবক্তা ছিল ব্যাথ (Baath) পার্টি, বাথ শাসনক্ষমতা লাভ করে, ১৯৫৬ সালে এবং আজও সিরিয়া বাথ শাসনাধীন।

১৩.৬.৩ মিশর

প্রাক বিশ্বযুদ্ধ আমলেই মিশরের রাজনৈতিক বিবর্তন বাকী আরব দুনিয়ার থেকে এতটাই এগিয়ে গিয়েছিল যে অন্যত্র যখন তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে আরবীয় সত্তা সবে জেগে উঠছে, মিশরে তখন আরবীয়তার পাশাপাশি মিশরীয় জাতীয়তাবাদ জোরালো আন্দোলনের রূপ নিতে শুরু করে। এর অন্যতম কারণ ছিল ১৮৮০-র দশক থেকে মিশরের ওপর কার্যত নিরঙ্কুশ ব্রিটিশ আধিপত্য। ব্রিটিশ শাসনে একদিকে যেমন তুর্কী শাসনের থেকে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য পায় মিশর, তেমনই অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধেও জনমত গড়ে উঠতে থাকে। সান রেমো চুক্তিতে তাই ব্রিটেন জাতিসংঘের থেকে মিশরের শাসনাধিকার (Mandate) পেলেও ১৯২২ সালেই মিশরকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয় ব্রিটেন। সুলতান ফাদ স্বাধীন মিশরের রাজা হন। অন্যান্য আরব রাষ্ট্রে যখন রাষ্ট্রে ভৌগোলিক সংজ্ঞা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, মিশরে তখন মূল প্রশ্ন ছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে জনসমাজের যোগ বিষয়ক। প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সূচনা হয় ১৯২৩ সালে এবং অবিলম্বেই প্রশ্ন ওঠে মিশরে ইসলামের ভূমিকা কি হবে?

চার দশকের ব্রিটিশ শাসনের ফলে মিশরে পাশ্চাত্য শিক্ষার যে প্রসার হয় তাতে সমাজের প্রতিপত্তিশালী এবং বিত্তশালী অংশ বিশেষ লাভবান হয়। এঁরা স্বাধীন মিশরের আধুনিকীকরণের তথা পশ্চিমায়নের পক্ষে সওয়াল করেন। এঁদের মতে ইসলাম ব্যক্তি জীবনের নিজস্ব বিষয়, জনজীবনে তার কোন স্থান নেই। পক্ষান্তরে অন্যরা পশ্চিমায়নের বিরোধিতা করে সনাতন মিশরীয় ইসলামী জীবনাদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পক্ষে দাবী রাখেন। এ দাবী বিশেষত তাঁদের যারা ব্রিটিশ শাসনে আনা পরিবর্তন হয় মেনে নিতে পারেন নি, নয়ত তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন।

আধুনিকীকরণ এবং পশ্চিমায়নের প্রবক্তারা মোটের ওপর শাসনযন্ত্র কুক্ষিগত করে রাখে এবং ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে চলে। পশ্চিমায়নের বিরোধী ইসলামপন্থীরা এবং কট্টর জাতীয়তাবাদীরা (যারা মিশরে ব্রিটিশ প্রভাবের অবসান চাইছিলেন) সরকারের ওপর পশ্চিমী প্রভাবের তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন, যা চরমে ওঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন সরকারী সহায়তা পেলেও জনসমর্থন পায় নি। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইজরায়েল প্রসঙ্গে ব্রিটেন ইজরায়েলকে সমর্থন করায় পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়। প্যালেস্তাইন প্রসঙ্গে আরব ভাবাবেগকে সামাল দিতে মিশর তাই ইজরায়েল রাষ্ট্রগঠনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘে ভোট দেয়। পশ্চিমের প্রতি বিরাগও বাড়তে থাকে।

১৯৪৮ সালে সদ্য নির্মিত ইজরায়েলের সঙ্গে আরব দুনিয়ার যুদ্ধে মিশরের সেনাবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়, এবং তার পরে প্যালেস্তিনীয় শরণার্থীদের আগমনের ফলে মিশরের অর্থনীতিতে পড়া চাপের পরিণাম স্বরূপ নতুন রাজা ফারুক কোণঠাসা হয়ে পড়েন। মিশরকে ব্রিটিশ প্রভাবমুক্ত করতে না পারার দরুন তাঁর বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের সুত্রপাত ঘটে, ১৯৫২ সালে তা এক অভ্যুত্থানের আকার নেয় এবং ফারুক ক্ষমতাচ্যুত হন। এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে ছিলেন, কট্টর জাতীয়তাবাদী সামরিক বাহিনীর জেনারেল নাগিব এবং নাসের।

নাগিব এবং পরে নাসেরের অধীনে মিশর পাশ্চাত্য প্রভাবমুক্ত হতে সচেষ্ট হন, যার চরম পর্যায় ছিল ১৯৪৬ সালে সুয়েজ খালের নিয়ন্ত্রণাধিকার নিয়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ। পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চাইলেও এই কট্টর জাতীয়তাবাদীরা ইসলাম পন্থীদের সঙ্গে হাত না মেলানোই বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। ফলে ৫০-এর দশকেও মিশরীয় জাতীয়তাবাদে ইসলামের প্রবেশ ঘটে নি।

১৩.৬.৪ ট্রান্সজর্ডান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর আরব জগতে ট্রান্সজর্ডান (বর্তমান জর্ডন) সম্ভবত একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে জাতীয়তাবাদের মূল উৎস শাসক বংশের প্রতি আনুগত্য। ১৯২০-এর আগে ভৌগোলিকভাবে ট্রান্সজর্ডান ছিল প্যালেস্তাইনের অন্তর্গত এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সিরিয়ার অধীনে। তাই এই অঞ্চলে কোন সময়েই কোন আঞ্চলিক চেতনা গড়ে ওঠেনি।

১৯২০ সালে সান রেমো চুক্তির পরে দেখা যায় যে বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন আরব বিদ্রোহের মূল স্তম্ভ হেজাজ-এর হালমি বংশকে যে আরব রাজ্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা রক্ষা করা হবে না। যুদ্ধ শেষের পরেও বলা হয়েছিল আরব উপদ্বীপে মক্কার শরিফ হুসেন রাজত্ব করবেন ; সিরিয়া থাকবে তাঁর জ্যৈষ্ঠপুত্র ফয়জলের এবং মেসোপটেমিয়া থাকবে কনিষ্ঠ পুত্র আব্দাল্লাহ-এর অধীনে। কিন্তু সিরিয়া ফরাসী নিয়ন্ত্রণে যাবার পরে আব্দাল্লাহ জর্ডান নদীর উত্তরে (অর্থাৎ পূর্ব উপকূলে) সেখানকার বেদুইন গোষ্ঠীগুলিকে একত্রিত করতে থাকেন সিরিয়া পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে। হালমি বংশের ক্ষোভ সামাল দিতে সিরিয়া চ্যুত-ফয়জলকে মেসোপটেমিয়া বা ইরাক শাসন করতে ডাকা হয়। পাশাপাশি আব্দাল্লাহ্‌কে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে ইরাকের পরিবর্তে জর্ডান নদীর পূর্বে অবস্থিত বেদুইন অঞ্চলে তাঁর জন্য একটি স্বতন্ত্র আমীর শাহী সৃষ্টি করা হবে। আব্দাল্লাহ্ উপলব্ধি করেন যে বাহুবলে ফরাসীদের থেকে সিরিয়া পুনরুদ্ধার প্রায় অসম্ভব, তাই তিনি এ প্রস্তাব মেনে নেন। ১৯২৩ সালে জন্ম হয় ট্রান্সজর্ডান আমির শাহী।

আরব বিদ্রোহ চলাকালীন আব্দাল্লাহ ঐ অঞ্চলের বেদুইনদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে স্বাধীন আমীরশাহী হিসেবে জন্মলগ্নে এই ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাই ছিল আব্দাল্লাহ্ তথা সমস্ত হালমি বংশের অবলম্বন। সদ্যোজাত রাজ্যটিকে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা দিতে ব্রিটেন প্রশাসনিক, আর্থিক এবং সামরিক সাহায্য করে। ফলে পাঁচ বছরের মধ্যেই ট্রান্সজর্ডান একটি সুসংহত রাষ্ট্রে পরিণত হয়, যার ক্ষমতার মূল আধার ছিল ব্রিটিশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরব জগতের শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী Arab Legion।

আব্দাল্লাহ্ তাঁর বেদুইন প্রজাদের আনুগত্য আদায় করতে আরবীয়তা এবং ইসলাম উভয়েরই ব্যবহার করেন। জনসংখ্যা প্রায় পুরোপুরি আরব এবং মুসলিম হবার ফলে রাজা তাঁর হজরত মহম্মদের হালমি বংশোদ্ভূত হবার সুফল পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করেন।

১৯৩০-এর দশকে উদারপন্থী ইস্তকলাল আন্দোলনের উত্থান ঘটলে আব্দাল্লাহ্ তাঁর বিদেশনীতি পরিমার্জন করতে থাকেন। উত্তরে সিরিয়া এবং দক্ষিণে হেজাদ অঞ্চল (সৌদি শাসিত) পুনরুদ্ধারে প্রকল্প ঘোষিত হলে ইস্তকলাল আন্দোলনও রাজাকে সমর্থন জানায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ট্রান্সজর্ডান মিত্রশক্তিকে পূর্ণ সমর্থন দেয়—এই আশায় যে সিরিয়া, লেবানন, প্যালেস্তাইন এবং ট্রান্সজর্ডানকে মিলিয়ে একটি অখণ্ড আরব রাষ্ট্র সৃষ্টি হবে। কিন্তু মিশর, ফ্রান্স, সৌদি আরব কেউ-ই চায় নি অত শক্তিশালী একটি আরব রাজ্য সৃষ্টি হোক। ফলে ১৯৪৬ সালে আব্দাল্লাহ্‌কে পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

উত্তর ১৯৪৬ পর্বে ইজরায়েলের জন্ম হলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আব্দাল্লাহ্ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে Arab Legion-এর সাফল্যের দরুণ জর্ডান নদীর পশ্চিম তট (প্যালেস্তাইনের প্রায় ২০% অঞ্চল) ১৯৪৮ সালে ট্রান্সজর্ডানের অধীনে চলে আসে। সঙ্গে আসে সহস্রাধিক প্যালেস্তিনীয় শরণার্থী। আব্দাল্লাহ্ অবিলম্বে রাজ্যের নাম বদলে তা করে দেন জর্ডান। সমগ্র আরব দুনিয়া মনে করে এটি আব্দাল্লাহ্-র সুবিধাবাদ ও আগ্রাসী মনোভাবের পরিচায়ক। কিন্তু আব্দাল্লাহ্-এর কাছে এটির সঙ্গে তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের কোন বিরোধ ছিল না, কারণ তিনি একটি অখণ্ড আরব রাজ্যের স্বপ্ন দেখতেন। তার প্রমাণ স্বরূপ আব্দাল্লাহ্ পশ্চিমতট জয়ের অব্যবহিত পরেই প্যালেস্তিনীয় শরণার্থীদের নাগরিক অধিকার দিয়ে দেন—যা অন্য কোন আরব রাষ্ট্রে প্যালেস্তিনীয়রা আজ অবধি পায়নি।

১৩.৬.৫ ইরাক

১৯২০-এর দশকে স্থাপিত অন্য হালমি রাজ্যটি ছিল ইরাক। অটোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তের তিন প্রদেশ—মসুল, বাগদাদ এবং বসরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দখল করে নেয় ব্রিটিশ সেনা। ১৯২০ সালে জাতিসংঘের থেকে সান রেমো চুক্তি অনুসারে শাসনাধিকার পেয়ে ব্রিটেন এই তিনটি প্রদেশকে জুড়ে সৃষ্টি করে আধুনিক ইরাক।

জনগোষ্ঠীর ভিত্তিতে দেখলে ইরাক বহুধাবিভক্ত। ইরাকের অধিবাসীরা মূলত আরব হলে প্রায় ২০% লোক কূর্দ গোষ্ঠীভুক্ত। অর্ধেকের সামান্য বেশিসংখ্যক ইরাকী শিয়া ধর্মাবলম্বী, সুন্নি মুসলিমদের সংখ্যা তার কিছু কম। তাছাড়া ইরাকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নগর সভ্যতা থাকলেও বহু অঞ্চলে নগরায়ন দেখা দেয় নি। ব্রিটিশ শাসন যেহেতু অদূর ভবিষ্যতে ক্ষমতা হস্তান্তরের অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল, ১৯২০ সালে সেহেতু ব্রিটেনের প্রয়োজন ছিল, এমন কোন শাসক যে একাধারে ব্রিটেনের দীর্ঘকালীন স্বার্থরক্ষা করবে এবং সদ্যগঠিত রাষ্ট্রটিকে ধরে রাখতে সক্ষম হবে। হালমি বংশ ছিল স্বাভাবিক পছন্দ কারণ হালমি বংশ আরব গোষ্ঠীভুক্ত এবং তার ওপর খোদ মহম্মদের বংশ হওয়ায় শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে, আরবদের আনুগত্যের দাবীদার। তাছাড়া ব্রিটিশ সামরিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল হওয়াতে হালমি শাসনের ব্রিটিশ স্বার্থ সুরক্ষিত থাকতে পারত। তাই দামাস্কাস থেকে বিতাড়িত হবার পরে শরিক হুসেনের জ্যেষ্ঠপুত্র ফয়জলকে ইরাকের রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ফয়জলের ছত্রচ্ছায়ায় যে জাতীয়তাবাদী চেতনা ইরাকে গড়ে ওঠে তাতে হালমি বংশের প্রতি আনুগত্য থাকলেও তা মূলত ছিল আরব জাতীয়তাবাদ। এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু বোঝা যায় ১৯৩৩ সালে ফয়জলের মৃত্যুর পরে ইরাকের রাজনীতিতে যুযুধান দুই গোষ্ঠীর উত্থানের মাধ্যমে। ১৯৩৬ সাল থেকে ইরাকের রাজনীতিতে প্রায় নিয়মিত সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে থাকে যার লক্ষ্য মন্ত্রীসভার পরিবর্তন ঘটিয়ে রাজার সমর্থন আদায় করা। একটি গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন নুরি-আল-সইদ। অন্য গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন রশিদ আলি আল-গেলানি।

নুরি-আল-সইদ ব্রিটিশ সমর্থন লাভ করেছিলেন কারণ তিনি ও তাঁর সমর্থকেরা মনে করতেন ইরাকের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর উন্নয়নে পাশ্চাত্য প্রযুক্তি এবং সহায়তা একান্ত প্রয়োজনীয়। নুরির মতে ইরাকের আরব প্রতিবেশীদের সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক যোগাযোগ নিবিড় হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ আরব রাষ্ট্র স্থাপনের তিনি বিরোধী ছিলেন।

পক্ষান্তরে রশিদ আলি ও তাঁর গোষ্ঠী মনে করতেন যে ইরাকের উন্নয়ন ব্রিটিশ প্রভাবের জন্যই ব্যাহত হচ্ছে, এবং ইরাকের প্রকৃত উন্নয়ন পাশ্চাত্য দুনিয়ার নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না হলে সম্ভব নয়। এঁরা মনে করতেন আরব দুনিয়ার রাজনৈতিক ঐক্য নিছক আর্থ-সামাজিক নৈকট্যের থেকে বেশি বাঞ্ছনীয়।

১৯৫৮ সাল অবধি হাশমি ইরাকের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। প্রায় আড়াই দশকের শাসনকালে ইরাকের পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ ঘটা সত্ত্বেও বৃহত্তর জনজীবনে তার ইতিবাচক প্রভাব প্রকট হয়নি। ফলত নুরি এবং পশ্চিমায়নের বিরোধিতা ক্রমশঃ জনপ্রিয় হতে থাকে। শীতলযুদ্ধের সময়ে ইরাক ১৯৫৫ সালে বাগদাদ চুক্তির মাধ্যমে পাশ্চাত্য শক্তিবলয়ে প্রত্যক্ষভাবে প্রবেশ করায় কট্টর জাতীয়তাবাদী প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ সঙ্কটের সময়ে পশ্চিমী দুনিয়ার প্রতি বিরাগ চরমে ওঠে। ওর দু-বছর বাদে এরা বিপ্লবের মাধ্যমে ইরাকের হাশমি রাজবংশ, নুরি এবং তাঁর অধিকাংশ অনুগামীদের হত্যা করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৩.৬.৬ সৌদি আরব

সৌদি আরবে আরব জাতীয়তাবাদের এক অদ্ভুত নিদর্শন পাওয়া যায়, কারণ ওই জাতিরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় চেতনায় আরবীয়তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে ইসলাম এবং উপজাতীয় জীবনযাত্রা। শাসকবংশের প্রতি আনুগত্য আদায়ে ধর্মীয় এবং সমাজব্যবস্থার এরকম ব্যবহার সচরাচর দেখা যায় না। আরব উপদ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত নেজদ্ নামক মরু অঞ্চলের শাসনভার ছিল ইব্‌ন সৌদ বংশের হাতে। ১৮শ শতাব্দীতে চরম রক্ষণশীল ওয়াহাবী ইসলামকে অবলম্বন করে সৌদি বংশ নেজদ্ অঞ্চলের বাইরে প্রভাব বিস্তারের ব্যর্থ চেষ্টা করে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় আরব আল-আজিজ্ ইব্‌ন সৌদের নেতৃত্বে সৌদি ক্ষমতার পুনরুজ্জীবন ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের দশকে ইব্‌ন সৌদ মরু অঞ্চলের বেদুইনদের সহায়তায় প্রথমে নেজ্‌দ (১৯০৬) এবং পরে আল-হাসা (১৯১৩) বা উপদ্বীপের পূর্ব উপকূল জয় করে নেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতের ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন পেয়ে উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চলের অবশিষ্ট অঞ্চল আক্রমণ করেন ইব্‌ন সৌদ, এবং ১৯২০ সালে নেজ্‌দের উত্তরে অবস্থিত আসির অঞ্চলেও কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। মূলত ইব্‌ন সৌদের সামরিক সাফল্যের কারণেই শরিফ হুসেনকে ১৯২০ সালে সমগ্র আরব উপদ্বীপের পরিবর্তে হেজাজ অঞ্চলেই কর্তৃত্ব নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ১৯২৫ সালে ইব্‌ন সৌদ হেজাজের হাশমী শাসনের অবসান ঘটান, এবং নিজেকে হেজাজ এবং নেজ্‌দের অধীশ্বর বলে ঘোষণা করেন। ১৯৩২ সালে হেজাজ এবং নেজ্‌দ রাজ্য যুক্ত করে সৃষ্টি হয় সৌদি আরব।

সৌদি আরব, অর্থাৎ সৌদি শাসনাধীন আরব দেশে জাতীয় চেতনার মূলে ছিল ওয়াহাবী ইসলাম। আপসহীন একেশ্বরবাদী এই ইসলামী তত্ত্ব রক্ষণশীল বেদুইনদের আকৃষ্ট করেছিল। ইব্‌ন সৌদ বেদুইন সামরিক শক্তিকে ব্যবহার করে ক্ষমতাসীন হবার পরে উপদ্বীপে ইসলামের এই রক্ষণশীল ধারা আরোপ করেছিলেন। ১৯২৫ সালে মক্কা ও মদিনার কর্তৃত্ব পেয়ে তাঁর রাজ্যের প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র হবার দাবী আরও জোরালো হয়। ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক রাখার দরুণ তাঁকে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়, এবং ১৯২৯ সালে বেদুইনদের আধা-সামরিক আধা-রাজনৈতিক সংগঠন ইখ্‌ওয়ান (Brotherhood)-এর বিদ্রোহেরও সম্মুখীন হন ইব্‌ন সৌদ।

কিন্তু শরিয়তি আইনব্যবস্থা রাষ্ট্রের আইন বলে ঘোষণার সুবাদে (এমনকি রাজাকেও সেই আইনের ঊর্ধ্বে না রাখতে) ইসলামের প্রতি ইব্‌ন সৌদের নিষ্ঠা নিয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ ছিল না।

সৌদি রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বাঁধন হল আরব উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে রাজবংশ তথা রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য যোগ। সমগ্র উপদ্বীপের উপজাতীয় আনুগত্য নিশ্চিত করতে ইব্‌ন সৌদের বংশের সঙ্গে সমস্ত উপজাতীয় নেতৃবর্গের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা শুরু করেন ইব্‌ন সৌদ। রাজপরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা ছাড়াও কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় সমস্ত উপজাতীয় শক্তির উপস্থিতির ব্যবস্থা করেছিলেন ইব্‌ন সৌদ। ফলে প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উপজাতীয় শক্তিই রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারে সফল হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তৈলজাত রাজস্ব রাষ্ট্রের মাধ্যমে সবার কাছেই পৌঁছানোতে রাষ্ট্রের সঙ্গে উপজাতীয় নেতৃবর্গের বাঁধন আরও মজবুত হয়েছে, এবং তার ফলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা আরও মজবুত হয়েছে।

১৩.৭ প্যালেস্তাইন, ইজরায়েল এবং আরব দুনিয়া (১৯১৭-৫৬)

আরব জগতে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল অটোমান প্যালেস্তাইন অঞ্চলে ইহুদী রাষ্ট্র ইজরায়েলের প্রতিষ্ঠা। ইজরায়েলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আরব রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে পরিবর্তন শুরু হয়, বর্তমান পশ্চিম এশিয় রাজনীতির সংঘর্ষ-প্রবণতা তারই পরিণাম।

প্যালেস্তাইন হলো অটোমান সাম্রাজ্যের আরব প্রধান একমাত্র অঞ্চল যেখানে কোন আরব রাষ্ট্র স্থাপিত হয় নি। বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালেও অটোমান সিরিয়া প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত প্যালেস্তাইন অঞ্চলে আরব সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই ছিল না। ইহুদী, খ্রীশ্চান এবং মুসলিম—এই তিন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছেই প্যালেস্তাইন এবং মূলত জেরুজামেলের বিশেষ তাৎপর্য থাকাতে আরব গোষ্ঠীভুক্ত খ্রীশ্চান এবং মুসলিমরা ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে আসছিল। অটোমান শাসনকালে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পারস্পরিক সম্পর্ক রাষ্ট্রের মধ্যস্থতার দরুন কোন সময়েই তিক্ততার পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি।

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে এই অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। ১৮৯০-এর দশকে থিয়োডর হার্জল (Theodore Herzl) ইউরোপের সর্বত্র ইহুদী বিদ্বেষের নির্মম রূপ দেখে (Ziomist) আন্দোলনের সূচনা করেন। এই আন্দোলন বিশ্ব জুড়ে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা ইহুদী ধর্মের অনুগামীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করে। কিংবদন্তী অনুসারে জেরুজালেমেই সুদূর অতীতে ইহুদীদের বাসস্থান ছিল, যেখান থেকে কালক্রমে তারা চলে যেতে বাধ্য হয়। হার্জলের আন্দোলনে সেই অতীতের ইহুদীদের রাজ্য জুডেয়া (Judea) যেখানে ছিল সেখানেই ইহুদী জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। এ অঞ্চলে অটোমান শাসিত প্যালেস্তাইনের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরে ইহুদীরা এ অঞ্চলে জমি কিনে যৌথ খামার (Kibbute) স্থাপনেই নিজেদের সীমিত রেখেছিল। অঞ্চলের জাতি-বিন্যাসে ভারসাম্য বজায় রাখতে অটোমান শাসকরা খুব বেশী সংখ্যক ইহুদীদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়নি। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ অবধি পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ইহুদী পুঁজিপতিদের সাহায্য পেতে ব্রিটেন সচেষ্ট হন। ফলে ১৯১৭ সালে বালফোর ঘোষণা অনুসারে ব্রিটেন প্যালেস্তাইনে ইহুদীদের একটি বাসভূমি দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। সান রেমো চুক্তির দরুন ব্রিটেন প্যালেস্তাইন শাসনের অধিকার পেয়ে নিয়ন্ত্রিতভাবে প্যালেস্তাইনে ইহুদীদের অভিবাসনের ব্যবস্থা করে। Jewish Agency, ভাদ লিউমি প্রভৃতি সংস্থার মাধ্যমে আরবদের থেকে জমি কেনা বিপুল

সংখ্যায় বেড়ে যায়, এবং ইহুদী অধিবাসীদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ১৯৩৯ সালে প্রায় ২৫০টি বসতিতে আনুমানিক পাঁচ লক্ষ ইহুদী প্যালেস্তাইনে বসবাস করেছিলেন।

প্রথম দিকে উষর জমি ইহুদীদের কাছে চড়া মূল্যে বেচে দিতে আরবরা দ্বিধা করেনি। কিন্তু বিশের দশক থেকেই ইহুদীদের সংখ্যা বাড়তে থাকায় সামান্য সমস্যা দেখা দিতে থাকে। এই সমস্যা একটি অর্থনৈতিক রূপ নেয় যখন দেখা যায় যে ইহুদীরা তাদের খামার বা অন্যান্য উদ্যোগে আরবদের যুক্ত করার চেয়ে অন্য ইহুদীদেরই বেশী প্রাধান্য দিতে সচেষ্ট।

বিশের দশকে ইহুদী অভিবাসনকে কেন্দ্র করেই বস্তুত গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ প্যালেস্তিনীয় আরবরা প্রথম ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চেষ্টা করে। কিন্তু প্যালেস্তাইনের সামাজিক চরিত্র এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। প্যালেস্তিনীয় সমাজপতিরা মূলত ভূস্বামী শ্রেণীর, ফলে এদের মূল সামাজিক প্রভাব নগরাঞ্চলের বাইরেই বেশী ছিল। মুষ্টিমেয় শহুরে মধ্যবিত্ত এবং পেশাজীবী শ্রেণীর লোকেরা প্রশাসন যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে থাকার সুবাদে গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত সমাজপতিদের প্রভাবে খানিকটা ভাগ বসাতে সক্ষম হয়েছিল। অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরে নগরকেন্দ্রিক সমাজপতিরা চেয়েছিলেন প্যালেস্তাইন বৃহত্তর সিরিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হোক। এই উদ্দেশ্যে ধর্মীয় ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে খ্রীশ্চান এবং মুসলিম আরবরা যৌথ রাজনৈতিক কার্যকলাপের সূত্রপাত করেন। ইহুদী অভিবাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম এক শহুরে সমাজপতিদের থেকেই প্রতিবাদ দেখা দেয়।

বিশের দশকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে ইহুদী অভিবাসনের বিরুদ্ধে যে তীব্র জন-আন্দোলন শুরু হয় তার উদ্যোক্তা ছিলেন মূলত ভূস্বামী এবং ধর্মীয় নেতৃবর্গ। জেরুসালেমের মুফতি আল-হজ মহম্মদ আল-হুসেইনী ইহুদী অভিবাসনের প্রতিবাদ করতে জন সমর্থনের প্রয়োজন অনুভব করেন। প্যালেস্তিনীয় সমাজের শিক্ষার প্রচলন তেমন না থাকায় সেখানকার আরবদের তুচ্ছ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব অতিক্রম করতে একমাত্র অবলম্বন হতে পারত ইসলাম। আল-হুসেইনী আরব জাতীয়চেতনাকে ইসলামের সঙ্গে একীকৃত করে ইহুদী জাতির চেতনার মোকাবিলা করতে চান। ভূস্বামী সম্প্রদায়ের মধ্যেই আল-হুসেইনীর প্রতিপক্ষরাও একইভাবে ইসলাম এবং প্যালেস্তিনীয় জাতীয় সত্তাকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা খুব সচেতনভাবেই নিজেদের আল-হুসেইনী এবং তাঁর ইহুদী বিদ্বেষের থেকে দূরে রাখেন। ফলে বিশের দশকে প্যালেস্তিনীয় প্রতিরোধ আন্দোলন বিশেষ দানা বেঁদে উঠতে পারেনি।

১৯৩০-এর দশকে ইহুদী সংখ্যা ব্যাপক বেড়ে যাওয়ায় প্যালেস্তিনীয় প্রতিরোধ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। সমাজপতিদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, খ্রীশ্চান-মুসলিম অবিশ্বাস ইত্যাদি বিভাজন রেখা অতিক্রম করে প্যালেস্তিনীয় যুবসমাজ ক্রমশ চরমপন্থী হয়ে ওঠে, ব্রিটিশ এবং ইহুদী—উভয়েই প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র সংগ্রামের সম্মুখীন হতে থাকে। কিছু ইহুদী গোষ্ঠী এই চরমপন্থী আন্দোলনের প্রত্যুত্তরে সন্ত্রাসের আশ্রয় নিলে আরব-ইজরায়েলী সংঘর্ষ চরম আকার ধারণ করে। এই পরিস্থিতিতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ব্রিটিশ অভিবাসনের নীতিতে পরিবর্তন আনা হয়। ঠিক যে সময়ে জার্মানীতে ইহুদী নির্যাতন চরমে ওঠে, সেই সময়ে অভিবাসন কেন্দ্র করে আনুপাতিক হারে চড়তে থাকা আরব-ইহুদী উত্তেজনার পারদ নিয়ন্ত্রণে রাখতে, এবং সর্বোপরি আরবদের ব্রিটিশ শক্তির পক্ষে ধরে রাখতে ইহুদীদের অভিবাসন এবং জমি কেনা-বেচা নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময়ে আরব অভ্যুত্থান না ঘটলেই ইহুদীরা তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বদ্ধ পরিকর হয়ে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাতে থাকে।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরব-ইহুদী সংঘর্ষ আবার চরমে উঠতে থাকে। এই রকম উত্তেজক পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালে ব্রিটেন রাষ্ট্রসংঘকে জানায় তারা প্যালেস্তাইন থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে চায়। আরব-ইহুদী উত্তেজনার দরুন ব্রিটেনের অনুপস্থিতিতে অবস্থা অগ্নিগর্ভ হবার

আশঙ্কায় রাষ্ট্রসংঘ UNSCOP (United Nations Special Commission of Palestine) বা রাষ্ট্রসংঘের প্যালেস্তাইন সংক্রান্ত বিশেষ কমিশন প্যালেস্তাইনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

সরেজমিনে গিয়ে UNSCOP দ্বিধাবিভক্তি হয়ে ফিরে আসে। কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা প্যালেস্তাইনে ইহুদী এবং আরবদের জন্য দুটি পৃথক স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলের প্রস্তাব করে। কমিশনের সংখ্যালঘু সদস্যরা একটি অখণ্ড রাষ্ট্রে আরব-ইহুদী সহাবস্থানের কথা বলে। জেরুসালেমে উভয়পক্ষই আন্তর্জাতিক শাসনের প্রস্তাব করা হয়। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রস্তাব অনুমোদিত হলে আরব দুনিয়া এককাট্টা হয়ে প্রতিবাদ জানায়—তার ঘোষণা করে প্রয়োজনে বাহুবলে প্যালেস্তাইনের বিভাজন তারা রুখবে।

প্যালেস্তাইনের ভবিষ্যত নির্ধারণ করতে আরব দেশগুলি সামরিক সমাধানের কথা ভাবে মূলত দুটি কারণে, প্রথমতঃ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই পশ্চিমী প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছুক আবর দেশগুলিতে প্রায় সর্বত্রই নিখিল আরবীয়তা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল—বিশেষত জাতিরাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের সুফল সমাজের মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমিত থাকার কারণে। এই প্রবণতা থেকে ১৯৪৫ সালে সৃষ্টি হয়েছিল আরব লীগ-যার অন্যতম উদ্যোক্তা জর্ডান, ইরাক এবং মিশর। নিখিল আরবীয়তা প্যালেস্তাইন প্রশ্নে আরব দুনিয়ায় যে পাশ্চাত্য বিরোধিতার জোয়ার তুলতে সক্ষম হয়েছিল, তারই ফলে আরব দেশগুলি সামরিক বিকল্পের কথা ভাবে—নচেৎ আরব সরকারগুলির জনপ্রিয়তা হারাবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, জনমতের আড়ালে আরব রাষ্ট্রগুলির দুরভিসন্ধিও কিছু ক্ষেত্রে কাজ করেছিল। যেমন, মিশরের অভিপ্রায় ছিল প্যালেস্তাইনের অন্তর্গত সিনাই অঞ্চলের দখল নেয়া। ইরাকের উদ্দেশ্য ছিল প্যালেস্তাইনের হয়ে যুদ্ধ করার পাশাপাশি ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দেবার প্রস্তুতি চালানো। তবে বিনিময়ে ইরাক চাইছিল সিরিয়ায় ইরাকের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইরাকের সম্মতি, ট্রান্স জর্ডানের উদ্দেশ্য ছিল জেরুসালেম অধিকার করে নেওয়া। প্রত্যক্ষ কোন স্বার্থ না থাকাতে সৌদি আরব সামরিক সমাধানের পথে অগ্রসর হবার চেষ্টাও করেনি।

১৯৪৮ সালের মে মাসে ব্রিটেন প্যালেস্তাইন থেকে সেনা অপসারণ করা মাত্র মিশর, ট্রান্সজর্ডান, ইরাক, সিরিয়া এবং লেবানন একজোট হয়ে সদ্যোজাত ইজরায়েল আক্রমণ করা স্থির করে। সেনা অপসারণের আগের দিন ডেভিড বেন-গুরিয়ন (David Ben-Gurion)-এর নেতৃত্বে Jewish Agency ইজরায়েল রাষ্ট্রের পত্তন করলে, আরব উষ্মা আরও বেড়ে যায়। ফলে ব্রিটিশ সেনা অপসারণের অব্যবহিত পরেই মিশর, ট্রান্সজর্ডান, ইরাক, সিরিয়া এবং লেবানন একজোট হয়ে ইজরায়েল আক্রমণ করে, দু'দফার আরব-ইজরায়েলী যুদ্ধের পরে ইজরায়েল আরব দেশগুলির যৌথ আক্রমণ প্রতিহত করে আরব সেনাবাহিনীগুলি বিতাড়নে সক্ষম হয়। প্যালেস্তিনীয় আরবরা এর পরে প্রাণভয়ে প্রতিবেশী আরব দেশগুলিতে পালাতে বাধ্য হয়। প্রায় পাঁচ লক্ষ প্যালেস্তিনীয় মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে, এক আরব লীগের সদস্যগুলির কাছে তাদের স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তন এবং স্বাধীনতার দাবী জানাতে থাকে।

রাষ্ট্রসংঘের করা প্যালেস্তাইনের বিভাজন অনুসারে প্যালেস্তাইনের ৫৭% অঞ্চল ইজরায়েলকে দেওয়া হয়েছিল। আরবরা এই বিভাজন মানতে নারাজ ছিল কারণ প্যালেস্তাইনের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ এবং ৫৫% জমির মালিকানা ছিল আরবদের। ১৯৪৮ সালে যুদ্ধের ফলে জর্ডান নদীর পশ্চিমতট (West Bank) ট্রান্সজর্ডান অধিকার করে নেয় ; আরব প্যালেস্তাইনের অবশিষ্ট এলাকা ইজরায়েলের অধীনে চলে আসে। ফলে পলাতক প্যালেস্তিনীয়দের ইজরায়েল অধিকৃত প্যালেস্তাইনে প্রত্যাবর্তন এবং আরব দুনিয়ার অন্যত্র থেকে যাওয়া ছাড়া তৃতীয় একটি বিকল্প থেকে যায়—তা হল আরব রাষ্ট্রগুলিকে ইজরায়েলের ওপর চাপ বজায় রাখতে বাধ্য করা। প্রায় সর্বত্র প্যালেস্তিনীয়রা এই তৃতীয় বিকল্পটিই বেছে নেয়।

আরব দেশগুলিতে প্যালেস্তিনীয় শরণার্থীদের উপস্থিতি দুটি কারণে খুব উত্তেজক হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত, ইজরায়েল রাষ্ট্রস্থাপনে পশ্চিমী দুনিয়ার প্রত্যক্ষ মদত পশ্চিম-বিরোধী আরব জনমতকে আরও তীব্র করে তোলে। দ্বিতীয়ত, ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় আরব দেশগুলির সামরিক দুর্বলতা—অর্থাৎ সরকারের অকর্মণ্যতা স্পষ্ট দেখা যায়। এই দুই কারণে সরকার বিরোধী কার্যকলাপ বাড়তে থাকে, এবং পশ্চিমায়নের সমর্থক বা পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রাখায় সরকার চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এই রাজনৈতিক বিরোধিতার পুরোভাগে ছিল মূলত উরবাপন্থী শিক্ষিত সামরিক পদাধিকারীর দল। এদের চাপের ফলে ১৯৪৯ সালে অধিকাংশ দেশ আলাদাভাবে ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরাম ঘোষণা করলেও কোন আরব রাষ্ট্রই ইজরায়েলকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃত দেয়নি।

১৯৫০-এর দশক থেকে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ আরব দুনিয়ার ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসে এবং সামরিক পদাধিকারীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করতে শুরু করে। ১৯৫০-এর দশকে এই উরবাপন্থীরা আরব শাসকবর্গ মিশর, সিরিয়া এবং ইরাকে ক্ষমতায় আসে—আবার জেগে ওঠে বৃহত্তর আরব রাষ্ট্রের স্বপ্ন। কিন্তু প্রায় অর্ধশতাব্দী স্বাধীনভাবে চলার পরে ঐক্যবদ্ধ আরবরাষ্ট্র গঠন করা বা তার প্রচেষ্টা করার উৎসাহ কতকটা স্তিমিত হয়ে আসে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে তাই উরবা বিদেশনীতি আরব ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলেও, আদতে জাতিরাষ্ট্র কেন্দ্রিক জাতীয় চেতনাই আরব দুনিয়ার অন্যতম রাজনৈতিক মতবাদ বলে স্বীকৃত হয়।

১৩.৮ সারাংশ

আরব জাতীয় চেতনার প্রকাশ ঘটে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় তুর্কী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে। তার আগে অবধি অটোমান তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র আরব দুনিয়া জাতিগত কারণে বৈষম্যের শিকার না হওয়াতে আরব সত্তা জাগ্রত হয় নি। কিন্তু ১৯০৮ সালের পর উত্তরোত্তর তুর্কী বৈষম্যের শিকার আরব ভাষাভাষীরা ঐক্যবদ্ধ হবার কারণ সম্বন্ধে সচেতন নয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সদ্যোজাত আরবজাতীয় সত্তা বিশাল ব্যাপ্তি পায়। সমগ্র আরব জগতে জাতীয়তাবাদীদের প্রত্যক্ষ মদত দেয় অটোমান শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ব্রিটিশ সরকার। অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে যুদ্ধোত্তরকালে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি পেয়ে মক্কার হালেমি বংশোদ্ভূত শরিফ হুসেনীর নেতৃত্বে আরব বিদ্রোহের সূচনা হয় ; আরব উপদ্বীপের দক্ষিণে ব্রিটিশ মদতপুষ্ট ইব্‌ন সৌদ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ; মেসোপটেমিয়া ব্রিটিশরা জয় করে নেয়।

যুদ্ধোত্তর পর্বে আরব দুনিয়ায় আধিপত্য বজায় রাখার ইদ্-ফরাসী অভিপ্রায় মার্কিন স্বশাসনের নীতি সমর্থনের কারণে ভেস্তে যায়। ফলে আরব দুনিয়াকে ব্রিটেন বা ফরাসী শক্তি তত্ত্বাবধানে রেখে স্বশাসনের অঙ্গীকার নিয়ে ছোট ছোট রাষ্ট্রে ভাগ করে দেওয়া হয়। এর ফলে আরব দুনিয়ায় আরব জাতীয়তাবাদের তিনটি রূপ দেখা যায়।

উরবা বা নিখিল আরবীয়তা আরব জগতে সমগ্র বাসিন্দাকে একই জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে মনে করে। ধর্ম, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, ইতিহাস—এ সবের ঊর্ধ্বে আরবভাষা এবং সংস্কৃতি ঘিরে যে আরব মূল্যবোধ রয়েছে উরবাপন্থীরা সেই বোধকে আরব জাতিসত্তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলে মনে করেন। এঁদের লক্ষ্য ছিল বৃহত্তর আরব রাজনৈতিক ঐক্য।

ইসলামী উরবা পন্থীরা মনে করতেন আরবীভাষা এবং ইসলামী ধর্ম এবং সংস্কৃতিই ছিল আরব জাতীয় চেতনার আধার। আরব সংস্কৃতি, আরব মূল্যবোধকে স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে গেলে বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐক্যই যথেস্ট নয়। আরবজগত পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুক্ত করে ইসলামী আদর্শ এবং আরব মূল্যবোধকে রাষ্ট্রচিন্তায় প্রতিফলিত করাই এদের লক্ষ্য।

মহাযুদ্ধোত্তর আরব দুনিয়ায় স্বতন্ত্র রাষ্ট্রকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল তৃতীয় এক ধরনের আরব জাতীয়তাবাদ। এই প্রকৃতির জাতীয়তাবাদীরা তাঁদের আরব সত্তা স্বীকার করে নিয়েও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেন। এঁদের মূল উদ্দেশ্য সৃষ্ট রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখে বৃহত্তর আরব ভ্রাতৃত্ববোধের সূত্র ধরে আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সহাবস্থান।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে আরব রাজনীতি এই তিনটি ধারার জাতীয়তাবাদ ঘিরে আবর্তিত হতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পক্ষে ইজরায়েলের জন্ম এবং প্যালেস্তাইন সমস্যার আলোকে আরব জাতীয়তাবাদ নবকলেবর ধারণ করে আঞ্চলিক রাজনীতিতে যে পরিবর্তন এনেছিল, তার পরিণাম পরবর্তী অর্ধশতাব্দীতে প্রকট হয়ে ওঠে।

১৩.৯ অনুশীলনী

১৩.৯.১ সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আরব উপদ্বীপে অটোমান-বিরোধী জাতীয়তাবাদের নেতা কে ছিলেন?

(খ) মহাযুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতি অনুসারে যুদ্ধোত্তর পর্বে ইরাক এবং সিরিয়াতে কোন বংশের শাসন হবার কথা ছিল?

(গ) সাইক্‌স পিকো চুক্তি অনুসারে অটোমান সাম্রাজ্যের কোন অঞ্চলগুলি যথাক্রমে ব্রিটিশ এবং ফরাসী শাসনাধীন রাখা হয়েছিল?

(ঘ) উরবা জাতীয়তাবাদের মূল বৈশিষ্ট্য কী?

(ঙ) ইসলামী উরবার মূল তত্ত্ব কী?

(চ) সিরিয়া কোন সময়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে?

(ছ) কবে এবং কোন মিশরের রাজা ফারুক ক্ষমতাচ্যুত হন?

(জ) ১৯১৭ সালের বালফোর ঘোষণায় কী বলা হয়েছিল?

১৩.৯.২

(ক) কোন পরিস্থিতিতে আরব জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয়?

(খ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে আরব জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক কোথায়?

(গ) আরব জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন ধারা সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

(ঘ) আরব দুনিয়ার জাতিরাষ্ট্রভিত্তিক আরব জাতীয়তাবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

(ঙ) প্যালেস্তাইন সমস্যা আরব জাতীয়তাবাদকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

(চ) প্যালেস্তাইন সমস্যার স্বরূপ আলোচনা করুন।

১৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

1. G. Lenczowski—Middle East in World Affais.
2. M. Curfis (Ed.)—Religion and Politics in the Middle East.
3. D. Gerner (Ed.)—Understanding Contemporary Middle East.

একক ১৪ ❑ আফ্রিকায় জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম

গঠন

১৪.০ উদ্দেশ্য
১৪.১ প্রস্তাবনা
১৪.২ ইউরোপ ও আফ্রিকা - ১৯৯০
১৪.৩ আফ্রিকায় ইউরোপের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার
১৪.৪ জাতীয়তাবোধের উন্মেষ
১৪.৫ আফ্রিকায় স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু
১৪.৬ স্বাধীনতার স্বাদ ঃ ইংরেজ শাসিত অঞ্চল
১৪.৭ স্বাধীনতার স্বাদ ঃ ফরাসীদের শাসিত অঞ্চল
১৪.৮ স্বাধীনতার স্বাদ ঃ পর্তুগাল শাসিত অঞ্চল
১৪.৯ স্বাধীনতার স্বাদ ঃ বেলজিয়াম শাসিত অঞ্চল
১৪.১০ স্বাধীনতার স্বাদ ঃ জার্মানি ও ইতালি শাসিত অঞ্চল
১৪.১১ বর্ণবিদ্বেষের কুৎসিত মুখ
১৪.১২ পশ্চিমের রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও পরাধীন আফ্রিকা
১৪.১৩ ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম
১৪.১৪ অনুশীলনী
১৪.১৫ গ্রন্থপঞ্জি

১৪.০ উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল থেকে আরব সাগরের ওপারে গেলেই আফ্রিকা। বিশাল মহাদেশ। আশি কোটি লোকের বাসস্থান। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে আফ্রিকা আমাদের খুব কাছে। কিন্তু এই মহাদেশ ও তার অধিবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের ভীষণ অজ্ঞতা। এই এককের উদ্দেশ্য।

- কিছু তথ্য ও তথ্যবিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই অজ্ঞতার আংশিক দূরীকরণ।
- ইউরোপ ও আফ্রিকার সম্পর্কের বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সাব-সাহারার আফ্রিকায় জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও ইউরোপের উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্যালোচনা।
- আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনে পশ্চিমি রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ভূমিকার আলোচনা।
- সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতবর্ষ আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনে কি ভূমিকা নিয়েছিল তার আলোচনা।

১৪.১ প্রস্তাবনা

Thomas Babington Macaulay-র দর্শনে অনুপ্রাণিত যে শিক্ষাব্যবস্থা ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষে প্রবর্তন করেছিল, সেই শিক্ষা ব্যবস্থার দৌলতে শিক্ষিত ভারতবাসী ইংলন্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর সব কটি পত্নীর নাম জানতেন কিন্তু প্রতিবেশী মহাদেশ আফ্রিকা সম্পর্কে কোন খবর রাখতেন না। ইউরোপ প্রচার করেছিল আফ্রিকার কোন ইতিহাস নেই এবং 'racial hierarchy'-তে শ্বেতকায়রা, সর্বশীর্ষে এবং কৃষ্ণকায়রা সর্ব নিম্নে। আফ্রিকার গায়ে 'dark continent'-এর যে তকমা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ভারতবর্ষ সেটাই গ্রহণ করল। শিক্ষা সহায়কের কাজ হবে সেই অপপ্রচার যে কত ভ্রান্ত সেটা বোঝান।

- ইউরোপের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের অনেক আগেই আফ্রিকার অনেক অঞ্চলে বিশাল সাম্রাজ্যের আবির্ভাব হয়েছিল, মজবুত প্রশাসনিক কাঠামো তৈরী হয়েছিল, বিদেশের সঙ্গে ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল—তার বিশদ বিবরণ আরব ঐতিহাসিক, ভ্রমণকারী এবং সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণ থেকে পাওয়া যায়।
- যে মহাদেশ নেলসন মেন্ডেলার মত ব্যক্তিত্ব, Wole Soyinka-র মত লেখক, Edward Wilmot Blyden-র মত তীক্ষ্ণধী বুদ্ধিজীবি পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে, শুধু কৃষ্ণকায় হওয়ার জন্য আফ্রিকানদের মস্তিষ্কের বিকাশ সম্ভব নয় Racial hirarchy-র মত অবৈজ্ঞানিক ধারণা প্রসূত এই ধরণের সিদ্ধান্ত কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়।
- আফ্রিকার দেশগুলি ও নেতাদের নাম ইংরেজীতে দেওয়া হয়েছে। বাংলায় দিলে এক ধরনের বিকৃতি ঘটত। আমাদের বিশ্বাস নামগুলির শুদ্ধ বানান জানলে পাঠকদের উপকার হবে।
- আশা করি শিক্ষা সহায়করা বৈঠক পরিচালনার সময় মানচিত্র ব্যবহার করবেন। মানচিত্রবিহীন ইতিহাস পড়ানো অনুচিত।

সারাংশ

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ভৌগোলিক অভিযানের যুগে আফ্রিকা ও ইউরোপের সম্পর্কের শুরু। প্রথমে বিভিন্ন ধরনের পণ্যের আদানপ্রদানের ভিত্তিতে ব্যবসা, পরে দাস ব্যবসা এবং আরও পরে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার—এই তিন অধ্যায় ইউরোপ ও আফ্রিকার সম্পর্কের দ্রুত বিবর্তন ঘটে। ইংলন্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল, ইতালি, জার্মানি বেলজিয়াম, স্পেইন—সব দেশ আফ্রিকাকে ছিঁড়ে খাবার দৌড়ে নেমেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে সাব-সাহারান আফ্রিকা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উপনিবেশে পরিণত হল এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে এক শ্বেতকায় গোষ্ঠী সংখ্যালঘু-সরকার গঠন করে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে 'বৃহত্তর আফ্রিকায়'—অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কৃষ্ণকায়দের মধ্যে এক ধরণের জাগরণের সূচনা হয়। কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের নিজস্ব সত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে গর্বের সঙ্গে সেটা ঘোষণা করতে শুরু করল। কৃষ্ণকায়দের আত্মসমীক্ষা সাহিত্য ও বিভিন্ন ধরনের সংগঠন প্রতিষ্ঠায় প্রতিফলিত হয়। স্থাপিত হয় Pan African Congress, ক্রমশ সেই আলোড়নের ঢেউ আফ্রিকার মূল ভূখন্ডে আসে এবং ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির আন্দোলন শুরু হয়। রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের চরিত্র ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত হোত সেই দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া ও শাসকগোষ্ঠীর

প্রতিক্রিয়া দ্বারা। ইংরেজ ও ফরাসী উপনিবেশে সমগ্র আন্দোলন প্রায় অনুপস্থিত। পর্তুগালের স্বৈরাচারী শাসক ও উপনিবেশগুলির অগণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল বে-আইনী। তাই সেখানকার স্বাধীনতা সংগ্রাম হোল গোপনীয় এক ব্যাপার। তার চরিত্র হোল রক্তক্ষয়ী। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও সংগ্রাম হোল সশস্ত্র।

হীরে, সোনা এবং অন্যান্য মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনীতি আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে সব চাইতে মজবুত। তার সাথে বাণিজ্য ও সেই দেশে লগ্নির প্রলোভন আমেরিকা, ইংলন্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী কিছুতেই দমন করতে পারত না। ফ্রান্স ও জার্মানী সামরিক বিমান, আগ্নেয়াস্ত্র—সব কিছু বিক্রী করত দক্ষিণ আফ্রিকাকে। NATO-র সদস্য পর্তুগাল, Angola ও Mozambique-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে আফ্রিকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পাশে থেকে আন্তর্জাতিক সমাবেশ ও সংগঠনে নির্ভয়ে আফ্রিকার জনগণের আন্দোলনকে সমর্থন করেছে।

১৪.২ ইউরোপ ও আফ্রিকা

আফ্রিকা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। এর আয়তন ১১,৬৯৩,০০০ বর্গমাইল। জনসংখ্যা আশি কোটি। এই মহাদেশে এখন ৫৪টি স্বাধীন রাষ্ট্র আছে। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে আফ্রিকার উত্তরভাগের সঙ্গে দক্ষিণভাগের বিভিন্ন ব্যাপারে একটি পার্থক্য আছে। সাহারা মরুভুমির উত্তরে দেশগুলি সপ্তম শতাব্দী থেকে আরব সভ্যতা ও ইসলাম ধর্মের আওতায় আসে। সাহারার দক্ষিণের বিশাল অঞ্চল—যাকে বলা হয় Sub Saharan Africa-সেই প্রভাব থেকে প্রায় মুক্ত। আরবি ভাষা ও ইসলাম ধর্ম আফ্রিকার উত্তরের দেশগুলিকে মধ্যপ্রাচ্যের (Middle East) দেশগুলির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের সেতু স্থাপন করেছে। তাই এইসব দেশের জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ইতিহাস আরব জাতীয়তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পূর্ববর্তী এককে তার বিশেষ আলোচনা হয়েছে। তাই আফ্রিকা জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ইতিহাস আলোচনায় আমরা সাহারা মরুভূমির দক্ষিণদিকের দেশগুলির ঘটনাবলীতেই নিজেদের আবদ্ধ রাখব।

এশিয়া ও দক্ষিণ-আমেরিকার মত আফ্রিকার প্রায় সব দেশ ইতিহাসের এক বিশেষ যুগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক কর্তৃত্বাধীন ছিল। বিভিন্ন সময়ে পর্তুগাল, ইংলন্ড, ফ্রান্স, স্পেইন, বেলজিয়াম, ইতালী ও জার্মানী সাব-সাহারান আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

ইউরোপের শাসন থেকে মুক্ত হবার ইতিহাসই আফ্রিকার জাতীয়তার ইতিহাস। তাই আফ্রিকার মুক্তি যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও মূল চরিত্র বুঝতে হলে ইউরোপের সঙ্গে আফ্রিকার সম্পর্কের বিবর্তনের ইতিহাসের মূল কথাগুলি জানা দরকার।

ভূমধ্যসাগরের সান্নিধ্য উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপের মধ্যে বহু পুরানো বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। লোহিত সাগরের (Red Sea) নিকটবর্তী পূর্ব আফ্রিকার ইথিওপিয়ার রাজবংশ ও জনগণের এক বিশেষ অংশ চতুর্থ শতাব্দী থেকেই খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী। তাই খ্রীষ্টান ইউরোপের ইথিওপিয়া সম্পর্কে এক ধরনের ঔৎসুক্য এবং বিচ্ছিন্নভাবে সংযোজন ছিল। সাহারার দক্ষিণের বাকী দেশগুলির সঙ্গে ইউরোপের বস্তুত কোন অভিজ্ঞতা বা সম্পর্ক ছিল না। সেই সম্পর্কের সূত্রপাত হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন পর্তুগীজরা ১৮১৫

সালে মরক্কোর নিকটে অবস্থিত Centa শহর দখল করে এবং সেখান থেকে আট বছর ধরে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল ঘেঁষে ধীরে ধীরে দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার অনেক নতুন অঞ্চল ইউরোপের নাবিক ও ব্যবসায়ীদের গোচরে আনে। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু হয়। গোড়ার দিকে সেই বাণিজ্য পর্তুগালের ছিল একচেটিয়া আধিপত্য। পরে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী নাবিকরা সেই বাণিজ্যে যোগ দেয়।

ইউরোপ নিয়ে আসত কাপড় (যদিও এশিয়ার কোন দেশে তৈরী), লোহা ও অন্যান্য ধাতুর তৈরী সামগ্রী, বন্দুক, গোলা বারুদ, ব্রান্ডি, রাম, জিন ইত্যাদি মাদক দ্রব্য। আফ্রিকা থেকে ইউরোপ নিত সোনা, হাতির দাঁত, কাঠ, এক ধরনের আঠা, ভেজিটেবল তেল ইত্যাদি। কিছুদিন পর এই বাণিজ্যের চেহারা বদলে গেল। পণ্য হিসাবে সব চাইতে বেশী চাহিদা হল ভাল স্বাস্থ্যের আফ্রিকান যুবক যুবতীদের। অতলান্তিক সাগরের দুই পারের মধ্যে শুরু হল দাস ব্যবসা। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন উপনিবেশের চা, কফি, তুলা, আঁখ-এর খামারে ও খনিতে কাজের জন্য প্রচুর লোক দরকার হোত। ক্রীতদাস লাগালে মুনাফা অনেক বেশি হবে। তাই আফ্রিকা থেকে লক্ষ লক্ষ লোক ধরে নিয়ে বিক্রি করা হোত উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে। এই ঘৃণ্য ব্যবসা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছিল দু'শ বছরের বেশী। আফ্রিকা হারিয়ে ছিল ১ কোটি ২০ লক্ষের বেশী স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্যবতী যুবক ও যুবতী। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে ও শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে ক্রীতদাস কাজ করানো আর অতটা লাভজনক হোত না। ১৮০৩ সালে ডেনমার্ক ও ১৮০৭ সালে ইংলণ্ড এবং পরের বছর আমেরিকা দাস ব্যবসা বেআইনী ঘোষণা করে। ইউরোপের বাকী দেশগুলি ইংলণ্ড ও আমেরিকার পথ অনুসরণ করল। মানব ইতিহাসের অত্যন্ত ঘৃণ্য ও রক্তাক্ত এক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হোল। ইউরোপের সঙ্গে আফ্রিকার বাণিজ্য কিন্তু বন্ধ হোল না। নতুন পণ্যের আবির্ভাব হোল। পাম গাছের তেল, পামের শাঁস, বাদাম এবং পরবর্তীকালে কোকো, কফি আফ্রিকার প্রধান রপ্তানীর সামগ্রী হিসাবে গৃহীত হোল।

ইউরোপের সঙ্গে আফ্রিকার বাণিজ্যের এই নতুন রূপ এক ধরনের রাজনৈতিক সমস্যা তৈরী করল। বাণিজ্যের প্রথা অনুযায়ী ইউরোপের ব্যবসায়ীরা অতলান্তিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর অথবা আরব সাগরের উপকূলের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়েছিল। আফ্রিকান দালালরা (Middlemen) ঘাঁটির নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে কাঁচামাল জোগাড় করে ইউরোপের ব্যবসায়ীদের ঘাঁটিতে এসে বিক্রি করত। অভ্যন্তরের শান্তি শৃঙ্খলার অভাব প্রায়ই মাল সরবরাহে অনিশ্চয়তা আনত। দালালের জন্য ইউরোপীয়দের মুনাফা একটু কমত। ইউরোপের ব্যবসায়ীরা এই সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন কোন ব্যবস্থার কথা ভাবতে শুরু করল। যদি ইউরোপের দেশগুলি নিজ নিজ প্রভাবাধীন অঞ্চলের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তাহলে আইন শৃঙ্খলাজনিত সমস্যার সমাধান হবে এবং দালালদের ওপর নির্ভরশীলতাও কমবে। কেন ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল—ঐতিহাসিকরা তার ব্যাখ্যা নানাভাবে করেছেন। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বাণিজ্যিক সুবিধাকে সুদৃঢ় করবে—তাই উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজন আছে—এই চিন্তাধারা ইউরোপকে আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনে প্রভাবিত করেছে এই মতই আধুনিকতম গবেষণা সবচাইতে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারকরা আগে থেকেই আফ্রিকার অভ্যন্তরে কাজ করছিলেন। তাঁরা মনে করতেন রাজনৈতিক ক্ষমতা ধর্ম প্রচারে এবং ইউরোপীয় ভাবধারা প্রবর্তনে অনেক সাহায্য করবে। ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে পর্তুগাল, ইংলণ্ড, ফ্রান্স যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেছিল, আফ্রিকা দখলে আনলে সেই ক্ষমতা অটুট রাখতে সাহায্য করবে—

এই ধারণাও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। তাই শুরু হোল আফ্রিকাকে ছিঁড়ে খাবার জন্য ইউরোপীয়ানদের মধ্যে প্রতিযোগিতা—যা ইতিহাসে 'Scramble for Africa' নামে পরিচিত।

১৪.৩ আফ্রিকায় ইউরোপের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার

পর্তুগাল দখল করল দক্ষিণ পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় Angola ও Mozambique, পশ্চিম আফ্রিকার Portuguese Guinea এবং Cape Verde, Sao Tome ও Principe দ্বীপগুলি। স্পেইন অধিকার করল Morocco ও Manritania মধ্যবর্তী Spanish Sahara, Fernando Po এবং Rio Muni দ্বীপ যা এখন যুক্তভাবে Republic of Equatorial Guine নামে পরিচিত। Morocco এর কাছে Ifri নামে ছোট্ট একটি দ্বীপও স্পেইন-এর অধিকারে আসে। ইংলণ্ডের অধিকারে আসে পশ্চিম আফ্রিকায় The Gambic, Gold Coast (এখন Ghana নামে পরিচিত), Nigeria ও Sierra Leone। পূর্ব আফ্রিকায় Kenya, Uganda Malawi, দক্ষিণ আফ্রিকায় South ও North Rhodisia। দক্ষিণ রোডেসিয়ার বর্তমান নাম Zimbabwe এবং উত্তর রোডেসিয়া বর্তমানে Zambia নামে পরিচিত। Bolswara, Lesotho, Swajiland (পুরোনো নাম Bechuanaland, Basuloland, Swaziland-এর নামের কোন পরিবর্তন হয় নি) প্রশাসকি দায়িত্বও পরোক্ষভাবে ইংরেজদের কাছেই এল। আরও দক্ষিণে যেটা তখন Republic of South Africa। সেখানে বসবাসকারী ইংরেজরা আগে থেকে আসা ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যাপারে এক ধরনের বোঝাপড়া করে নিল। ফ্রান্স পেল বিশাল এক সাম্রাজ্য। পশ্চিমে ছিল Cameroon, Dahomey, Guinea, Ivory Coast, Senegal ও Upper Volta (যার বর্তমান নাম 'Barkina Faso')। । মধ্য আফ্রিকায় Conge (Parzzaville), Gabon ও Central African Republic জার্মানির অধিকারে এল South West Africa (বর্তমান নাম Namibia), মধ্য আফ্রিকায় Rwanda ও Busundi, পশ্চিম আফ্রিকায় Tago এবং পূর্ব আফ্রিকায় Tanganyika। বেলজিয়াম এবং রাজা King Leopold ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে Congo (বর্তমান নাম Zaire)-এর ওপর শাসন চালাত। ১৯০৮ সালে Congo, Belgium এর উপনিবেশে পরিণত হোল। ইতালি পেল পূর্ব আফ্রিকার Somalia এবং Eritoca। সাব সাহারান আফ্রিকার পশ্চিমে সইবেরিয়া ও পূর্বে ইথিওপিয়া বাদে সমস্ত অঞ্চল ইউরোপীয়ানদের দখলে আসে। লাইবেরিয়া তৈরী হয়েছিল আমেরিকার সরকার ও American Colonization Society-র যৌথ প্রচেষ্টায়। আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসদের সন্তান সন্ততীর মধ্যে যারা দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে, তাদের আফ্রিকায় ফিরিয়ে নতুন জীবন যাপনের সুযোগ দেবার জন্যই মার্কিন সরকার ১৮২২ সালে লাইবেরিয়াতে একটি 'settlement' স্থাপন করে। ১৮৪৭ সালে লাইবেরিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। আমেরিকার ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা লাইবেরিয়ার সার্বভৌমত্ব ইংলণ্ড ফ্রান্স বা অন্য কোন ইউরোপীয় দেশ কেড়ে নিতে সাহস পায় নি। ইথিওপিয়া অতি প্রাচীন ও ঐতিহ্যসম্পন্ন দেশ। পাশের দেশ সোমালিল্যাণ্ড ও ইরিটিয়া ছিল ইতালির দখলে। ইতালি চেষ্টা করল ইথিওপিয়াতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিস্তার করতে। কিন্তু ১৮৯৬ সালে অ্যাডোয়ার যুদ্ধে (Battle of Adowa) ইথিওপিয়ার সম্রাট মেনেলিক ইতালীকে পরাস্ত করেন। তাই ইথিওপিয়া তার স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা বজায় রাখতে পারছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে মুসোলিনীর আমলে ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪১ সাল অবধি পাঁচ বছর ইথিওপিয়া কখনও স্বাধীনতা হারায় নি।

আফ্রিকাকে টুকরো টুকরো করে ভাগ নিয়ে নেবার এই জঘন্য কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে রাজনৈতিক

গুণ্ডাবাজির এক নিকৃষ্ট উদাহরণ। স্বাভাবিক কারণে, কে কতটা নেবে তা নিয়ে ইউরোপীয় দেশগুলির পরস্পরের মধ্যে কিছু রক্তক্ষয় ও মন কষাকষি হয়। তা মেটাবার জন্য ১৮৮৪-৮৫ সালে বার্লিনে এক অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে আফ্রিকার জমি বন্টনকে আন্তর্জাতিক অনুমোদন দেওয়া হয়। বার্লিনের সেই সমাবেশে সুইজারল্যাণ্ড বাদে ইউরোপের সব দেশ উপস্থিত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও উপস্থিত ছিল। কিন্তু আফ্রিকার কোন প্রতিনিধি ছিল না। Colonial Africa-র একটি রঙ্গীন ম্যাপ—রং এর মাধ্যমে ইউরোপের কোন দেশ কোথায় রাজত্ব করছে, সেটা দেখিয়ে দেওয়া—এখানে প্রয়োজন।

১৪.৪ কৃষ্মাঙ্গদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ

আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস মানে ইউরোপ অধিকৃত আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস। বিষয়টির ব্যাপ্তি বিশাল এবং চরিত্র জটিল। কারণ আমরা কোন একটি বিশেষ দেশের কথা বলছি না—বলছি প্রায় গোটা একটি মহাদেশ নিয়ে। সেখানে আছে অনেকগুলি দেশ যাদের ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব করছে ইউরোপের অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র। তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব একটা প্রশাসনিক নীতি ছিল। তাই আফ্রিকানদের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং মুক্তি সংগ্রাম আলাদা রূপ নিয়েছে।

পৃথিবীর অনেক দেশে জাতীয়তাবোধের উন্মেষের আগে সাহিত্য ও চিন্তার জগতে এক ধরনের আলোড়ন লক্ষ্য করা যায়। এক অর্থে আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামেও এই ধরনের এক আলোড়ন দেখা যায়। তবে সেটা আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডে শুরু হয়নি, হয়েছিল 'বৃহত্তর আফ্রিকা'য়—অর্থাৎ African diaspora তে। নিগ্রোজাতির অনেকে যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকা বা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বসবাস করতেন—তাদের মধ্যে। কৃষ্মাঙ্গারা তাদের নিজস্ব সত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে গর্বের সঙ্গে সেটা ঘোষণা করতে শুরু করল। তীক্ষ্ণধী কৃষ্মাঙ্গ চিন্তাবিদ Edward Wilmot Blyden আফ্রিকার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব (African personality) সম্পর্কে লিখলেন। পরে নিগ্রোজাতির নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঘোষণা করা হোল 'Negritude' ধারণার মাধ্যমে। আমেরিকার কৃষ্মাঙ্গ কবি Langston Hughes লিখলেন—

'I am a Negro
Black as the night is black
Black like the depths of my Africa'

সেনেগালের কবি David Diop লিখলেন

'Suffer poor Negro
Negro 'black like grief'

আফ্রিকার সঙ্গে আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কৃষ্মাঙ্গদের একাত্মতা জোর গলায় ঘোষিত হোল। Langston Hughes লিখলেন।

We are related you and I
You from West Indies
I from kentucky.

We are related you and I
You from Africa
I from the states
We are brothers—you and I.

দাস ব্যবসা ও দাসত্বের অত্যাচারের সব চাইতে বড় শিকার কৃষ্মকায়রা এক ধরনের হীনমন্যতায় ভুগত। কালো গায়ের রং-এর সঙ্গে পরাজয় ও গ্লানির এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আফ্রিকানদের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করেছিল। কৃষ্মকায়দের সাহিত্য সেই মনোভাব থেকে নিজেদের মুক্তির প্রচেষ্টার প্রতিফলন। সেনেগালের কবি Leopold Senghor যিনি পরে স্বাধীন সেনেগালের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিল। তিনি লিখলেন

'Woman mide, woman black
Clad in your colour which is life
Your beauty strickes me to the heart
As lighting strikes the eagle'.

সাহিত্য ও চিন্তায় প্রতিফলিত এই চেতনা কিছু দিনের মধ্যে এক কৃষ্মাঙ্গ সংগঠন প্রতিষ্ঠায় রূপ নিল। Pan African Congress-এর জন্ম হোল। প্রথম অধিবেশন হয়েছিল London-এ ১৯০০ সালে। তারপর প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে নিয়মিতভাবে এই সংগঠনের অধিবেশন বসত ইউরোপের বিভিন্ন শহরে। প্রথম দিকে আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ন আইল্যান্ডের কৃষ্মাঙ্গ চিন্তানায়ক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা এই সংগঠনের প্রাণপুরুষ ছিলেন। পরে আফ্রিকার মূল ভূখণ্ড থেকে উচ্চশিক্ষিত ও মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী অনেক নেতা যোগ দিলেন। কিনিয়ার Jomo Kenyatta, গোল্ড কোষ্টের Kwame Nkrumah, ট্যাঙ্গানিকার Julius Nyerere, নাইজেরিয়ার Nnamdi Azikiwe এবং আরও অনেকে চল্লিশের দশকের প্যান আফ্রিকান কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

১৪.৫ আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু

কৃষ্মাঙ্গ বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়করা যখন নিগ্রোজাতির পৃথক সত্তা ও অনন্যতা ব্যাখ্যায় মুখর তখন মূল ভুখণ্ডেও পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ঔপনিবেশিক শাসনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে এসেছিল অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন, কাঁচামাল বিদেশে পাঠাবার জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট ও যানবাহন, পশ্চিমি শিক্ষা ব্যবস্থা, খ্রীষ্টান ধর্ম, নগরের পত্তন হয়েছিল এবং নাগরিক জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ হিসাবে এসেছিল নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবধারা। পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত আফ্রিকানদের গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা এই সব ধারণা, ইউরোপে তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ণ ও নাগরিক জীবনে তার প্রয়োগ সম্পর্কে অনেক খবর ভয়ানক ভাবে আকৃষ্ট করল। ইউরোপের দেশগুলির এই চালচিত্রের পাশে দেখল নিজেদের দেশের করুণ অবস্থা। দারিদ্র, কুসংস্কার, অশিক্ষা, বর্ণবৈষম্য ও অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা—এই চিত্র বড়ই পীড়াদায়ক। 'পরাধীনতাই এই সবের মূল'—

শিক্ষিত আফ্রিকানদের এটা ছিল বদ্ধমূল ধারণা। "Seek Ye First the Political Kingdom" গোল্ডকোস্টের নেতা Kwame Nkrumah-এর এই শ্লোগান অতি সহজেই আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের শিক্ষিত

ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করল। শিক্ষকতা, ওকালতি, ডাক্তারি এই সব পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের পেশার ভিত্তিতে গঠিত সংগঠনগুলি দেশের ও সাধারণ দেশবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা ও ঔপনিবেশিক শাসনের প্রকৃত রূপ কি—এই সব আলোচনার প্রধান মঞ্চে পরিণত হোল। বলা হয় কোলকাতার হাইকোর্টের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছিল। নাইজেরিয়া, গোল্ডকোস্ট, কিনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আফ্রিকার আরও অনেক দেশের আইনজীবীরাই নিজ নিজ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন।

সব জাতীয় আন্দোলন এক অর্থে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন। আফ্রিকার সব দেশেই ঔপনিবেশিক সরকারের শিল্প-বাণিজ্যিক নীতি ও দেশের লোকদের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার অভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাতীয় আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। ইউরোপীয় শাসনের ফলে সব দেশেই খনিজ সম্পদের বাণিজ্যিক প্রয়োগ শুরু হয়েছিল। সেই সম্পদের ভিত্তিতে কিছু মাঝারি ধরনের শিল্পও প্রায় সব দেশেই স্থাপিত হয়েছিল। ইংরেজ ও ফরাসী উপনিবেশগুলিতে বেশ কিছু বেতনভোগী শ্রমিক (Wage-earner) তৈরী হয়েছিল। ফরাসী অধিকৃত পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলিতে এদের সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন লক্ষ। ইংরেজ কলোনী নাইজেরিয়ায় পাঁচ লক্ষ, গোল্ডকোষ্টে দুই লক্ষ, কিনিয়ায় সাড়ে চার লক্ষ, উত্তর ও দক্ষিণ রোডেসিয়ায় প্রায় আট লক্ষ। স্বভাবতই কাজের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক সংগঠন (Trade Union) তৈরী হোল। কিছুদিনের মধ্যেই মালিকদের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করার জন্য অথবা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিবাদ জানাবার জন্য শ্রমিক সংগঠনগুলি ধর্মঘটকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করল।

অর্থনৈতিক দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম এর এই হাওয়া গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। কৃষকরা পণ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর অধিকতর মূল্য ও বিভিন্ন ব্যাপারে সরকারী সাহায্যের জন্য আন্দোলন করতে শিখল। আফ্রিকার বহু দেশেই বাণিজ্যের বিভিন্ন স্তরে ইউরোপের মধ্যপ্রাচ্যের—বিশেষ করে লেবানন ও সিরিয়ার—লোকেরা ও ভারতীয়রা আধিপত্য বিস্তার করেছিল। স্থানীয় লোকেরা চাইল দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। ব্যবসায়ে স্থানীয় লোকদের বৃহত্তর ভূমিকার দাবী স্বভাবতই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করল।

ধর্মীয় সংগঠনগুলিও বিভিন্নভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দৃঢ় করতে সাহায্য করেছিল। সাব-সাহারান আফ্রিকায় খ্রীষ্টানধর্ম, ইসলাম ও চিরাচরিত আফ্রিকার ধর্মীয় বিশ্বাস—এই তিন ধারা একই সঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছিল। ঔপনিবেশিক শাসন ও ইউরোপীয় কৃষ্মাঙ্গ মিশনারীদের প্রচেষ্টার ফলে অনেক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী আফ্রিকান খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পশ্চিমি আদব কায়দার মোড়কে ঢাকা খ্রীষ্টান চার্চের দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে নানান প্রশ্ন তুললেন। ফলে বেশ কয়েকটি আফ্রিকান চার্চ প্রতিষ্ঠিত হোল। আমেরিকার বিখ্যাত কৃষ্মকায় নেতা Marcus Garvey প্রতিষ্ঠা করেছিলেন African Orthodox Church। মার্কাস গার্ভের যুক্তি ছিল যীশু এশিয়ার সন্তান। ইউরোপীয়রা নিজেদের গায়ের রং-এর সঙ্গে মিলিয়ে তাঁকে ও মেরী মাতাকে শ্বেতকায় হিসাবে বিশ্বময় প্রচার করেছে। কৃষ্মকায় আফ্রিকানরা কেন যীশুকে ও মেরী মাতাকে কৃষ্মকায় হিসাবে দেখবে না? মার্কাস গার্ভের চার্চ Black Madonna-কে পূজা করত। তারই অনুকরণে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত হোল Ternfu Church, নাইজেরিয়ায় United Native African Church এবং পশ্চিম আফ্রিকার লাইবেরিয়া ও আইভরিকোষ্টে Prophet Harris Church, হ্যারিস জন্মেছিলেন

লাইবেরিয়াতে। তিনি খ্রীষ্টান ধর্মের সঙ্গে আফ্রিকান রীতি নীতি মিশিয়ে ধর্মপ্রচারে ব্যাপৃত হন। তাঁর প্রভাবে সাধারণ আফ্রিকানদের এক বিরাট অংশ Prophet Harris Church-এ যোগ দেয়।

আফ্রিকার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ছোঁয়া লাগান এই খ্রীষ্টানধর্মকে এক কথায় বলা যায় 'Syncretic Christianity'—সংকর খ্রীষ্টানধর্ম। বহুপত্নী বিবাহ, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ কর্তন (Circumcision)—যে প্রথা মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত, আফ্রিকার চিরাচরিত চিকিৎসা পদ্ধতি—এই সব কিছুই নতুন চার্চগুলির অনুমোদন পেয়েছিল। রবিবারে গীর্জার সমাবেশে নতুন চার্চগুলি আফ্রিকান বাদ্যযন্ত্র ও আফ্রিকান নৃত্য সহ ধর্ম সঙ্গীত পরিবেশন করত। ইউরোপ থেকে আসা পাদ্রীদের প্রবর্তিত ধর্মচর্চার পদ্ধতিকে বাতিল করে আফ্রিকার নিজস্ব এক রীতিকে প্রবর্তন করে ধর্মজগতে এক বিশেষ আলোড়ন আনলেন আফ্রিকার ধর্মযাজকরা। এই আলোড়ন আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ভীষণভাবে সমৃদ্ধ করেছিল। জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিণতি রাজনৈতিক দল গঠন ও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন। আফ্রিকার সব চাইতে জনবহুল দেশ নাইজিরিয়ায় তৈরী হোল বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল। National Council of Nigerian Citizens (NCNC), Action Party, Northern People's Congress (NPC) ছিল নাইজেরিয়ার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দল। গোল্ডকোষ্টে ছিল Convention People's party (CPP) ও United Gold Coast Convention (UGCC), কিনিয়ায় তৈরী হল Kenya African Union (KAU) এবং সিয়েরা লিয়নে Sierra Leone People's Party (SLPP) ফরাসী উপনিবেশ সেনেগালে তৈরী হয়েছিল Union Progressive Senegalaise (UPS) এবং Parti du Regronpement African (PRA) এবং আইভরি কোষ্টে Rassemblement Democratique African (RDA)।

সব দেশেই রাজনৈতিক দল তৈরী হয়েছিল। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি দলের নাম উল্লেখ করা হোল। আফ্রিকানদের জন্য অধিকতর সুযোগ সুবিধা, বর্ণভিত্তিক বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সার্বিকভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের দাবী—সব রাজনৈতিক দলের কর্মসূচীর মূল অঙ্গ ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে। মিত্রপক্ষ এই যুদ্ধকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের যুদ্ধ হিসাবে দেখত এবং সেইভাবে প্রচার করত। ১৯৪১ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট Franklin Roosevelt এবং ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী Winston Churchill আটলান্টিক মহাসাগরে এক জাহাজে বসে তৈরী করলেন 'Atlantic Charter'। এই সনদে ৮টি বিষয়ের উল্লেখ ছিল। তৃতীয় বিষয়টি ছিল "They respect the rights of all to choose the form of government under which they live"। আটলান্টিক চার্টার আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মুক্তি আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। স্বাধীনতার আন্দোলনে আফ্রিকার নেতারা বার বার আটলান্টিক চার্টারের এই ঘোষণা উদ্ধৃত করতেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে 'বৃহত্তর আফ্রিকা'র কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্বে Pan African Congress সংগঠিত হয়েছিল এবং সেই সংস্থা ১৯০১ সাল থেকে নিয়মিতভাবে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে অধিবেশন করত। ১৯৪৫ সালে ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার শহরে Pan African Congress-এর এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশন সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয় "We demand for Black Africa autonomy and independence, so far and no further, that it is possible in this one World for groups and peoples to rule themsleves subject to inevitable world unity

and federation ... We are determined to be free.” জোর গলায় আফ্রিকার নেতারা তাদের লক্ষ্য ঘোষণা করলেন—স্বাধীনতা তাদের চাই এবং কয়েক বছরের মধ্যে তারা স্বাধীনতা পেলেন।

১৪.৬ স্বাধীনতার স্বাদ ঃ ইংরাজ শাসিত অঞ্চল

ঔপনিবেশিক শাসন থেকে সবার আগে বেরিয়ে আসে পশ্চিম আফ্রিকার ইংরেজ শাসিত গোল্ডকোষ্ট। ১৯৫৬ সালে গোল্ডকোষ্টে সাধারণ নির্বাচন হয়। সেই নির্বাচনে UGCC দল থেকে বেরিয়ে আসা চরমপন্থীদের নেতা Kwame Nkrumah-র CPP ১০৪টি আসনের ৭২টি আসন পেল জাতীয় সংসদে। ঐতিহ্যমণ্ডিত আশান্তি সাম্রাজ্যের রাজধানী Kumasi-তে তৈরী National Liberation Movement (NLM) ঐ অঞ্চলে এবং উত্তরের রাজনৈতিক দল Northern People’s Party (NPP) উত্তরাঞ্চলে ভাল করলেও কোয়ামি ন্‌ক্রুমার দলকে আটকাতে পারল না। ১৯৫৭ সালের ৬ মার্চ গোল্ডকোষ্ট স্বাধীন হোল। প্রায় এক হাজার বছরের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার ঘানা সাম্রাজ্যের স্মৃতিকে পৃথিবীর কাছে নতুন করে তুলে ধরার জন্য ন্‌ক্রুমা গোল্ডকোষ্টের নতুন নাম দিলেন ঘানা।

Harold Mcmillan ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন একটি ভাষণে বলেছিলেন আফ্রিকায় পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। ১৯৬০ সালে বেশ কয়েকটি ইংরেজ কলোনীকে স্বাধীনতা দেবার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে ম্যাক্‌মিলান বুঝিয়েদিলেন তিনি কি বলতে চাইছিলেন। আফ্রিকার সবচাইতে জনবহুল দেশ নাইজেরিয়া স্বাধীন হয় ১৯৬০ সালের পয়লা অক্টোবর। নাইজেরিয়ার রাজধানীতে ধর্ম ও আঞ্চলিকতা এই দুয়ের প্রচুর প্রভাব। উত্তরে Hausa ও Fulani দের মধ্যে ইস্‌লাম ধর্মের প্রচণ্ড প্রভাব। পশ্চিমে Yoruba-দের আর পূর্বে Ibo দের আধিপত্য। পূর্ব ও পশ্চিমে খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী অনেক যদিও আফ্রিকার চিরাচরিত ধর্মে বিশ্বাসীর সংখ্যাও কম নয়। উত্তরের রাজনৈতিক দল Northern People’s Congress-এর নেতা Alhaji Abubakar Tafewa Belewa ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের অবিসংবাদী নেতা। Yoruba-দের চালাতেন Action Party-র নেতা Chief Awaolowo। Dr. Nnamdi Azikiwe (যিনি ‘ZIK’ নামে পরিচিত) ছিলেন NCNC রাজনৈতিক দলের নেতা। ZIK ছিলেন Ibo কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক দলের আদর্শ আঞ্চলিক ছিল না। তাই ব্যক্তি হিসাবে Dr. Azikiwe ছিলেন প্রায় সর্বজন গ্রাহ্য। ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা পাবার পর প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন উত্তরের নেতা Tafewe Balewa। ১৯৬৩ সালে নতুন সংবিধান তৈরী হোল এবং নাইজেরিয়া একটি Federation বা যুক্তরাজ্য হিসাবে ঘোষিত হোল। Dr. Azikiwe হলেন যুক্তরাজ্যের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং Balewa প্রধানমন্ত্রীর পদে আবার অভিষিক্ত হলেন।

পশ্চিম আফ্রিকার Sierra Leone স্বাধীন হয় ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে, Gambia ১৯৬৩ সালে স্বায়ত্বশাসন ও ১৯৬৫ সালে পূর্ণ স্বাধীনতা পায়।

পূর্ব আফ্রিকায় ইংরেজ প্রভাবাধীন Uganda স্বাধীনতা পায় ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে। একই বছর এপ্রিল মাসে উগাণ্ডায় সাধারণ নির্বাচন হয়। সেই নির্বাচনে Uganda People’s Congress (UPC) Dr. Milton Obote-র নেতৃত্বে সব চাইতে বেশী সংখ্যক আসন জেতে কিন্তু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় আর একটি দলের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সরকার গঠন করে। ডাঃ ও বোটি স্বাধীন উগাণ্ডার প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

Malawi মধ্য আফ্রিকায় অবস্থিত। আগেকার নাম Nyasaland। ইংরেজ আমলে Malawai ছিল Federation of Rhodesia and Nyasaland এর অংশ। ১৯৬৩ সালে সেই Federation ভেঙে যায়। একই বছর Malawai স্বায়ত্বশাসনের অধিকার পায়। পরের বছর পূর্ণ স্বাধীনতা পায়। Malawi Congress Party-র নেতা Dr. Hastings Banda হন স্বাধীন Malawi-র প্রথম প্রধানমন্ত্রী। Zambia-র আগের নাম ছিল Northern Rhodesia। Zambia Federation of Rhodesia and Nyasaland এর অংশ ছিল। ফেডারেশন ভেঙ্গো যাবার পর নতুন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হোল ১৯৬৪ সালে। সেই নির্বাচন United National Independence Party (UNIP) জয়ী হয় এবং একই বছর UNIP-র নেতা Kenneth Kaunda স্বাধীন Zambia-র প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে Bechuanaland, Swaziland এবং Basutoland নামে তিনটি High Commission Territory ছিল। এগুলি ছিল ইংরেজ সরকারের 'protected' রাজ্য। স্থানীয় রাজবংশের সঙ্গো চুক্তির ভিত্তিতে ইংরেজ সরকার এদের শাসন করত। বেচুয়ানাল্যান্ডের বর্তমান নাম Botswana। বটসওয়ানা স্বাধীনতা পায় ১৯৬৬ সালে। ১৯৬৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে Bechuanaland Democratic Party জাতীয় সংসদের ৩১টি আসনের মধ্যে ২৮টি অধিকার করে এবং BDP-র নেতা Seretse Khama Botswana-র প্রথম প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। Swziland-এর রাজা Sobhuza II দেশের রাজনৈতিক বিবর্তনে এক বিরাট অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরই দল Imbokodvo Nationalist Movement ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়। রাজা, Senate এবং পুরোপুরি জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত আইনসভা দেশের শাসনের দায়িত্বে আছে। নির্বাচনের পর রাজকুমার Makhosimi Dhlamini স্বাধীন Swaziland-এর প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। শাসনের এক বিরাট দায়িত্ব অবশ্য রাজার হাতেই থেকে যায়। Swaziland পূর্ণ স্বাধীনতা পায় ১৯৬৮ সালে। Basutoland-এর বর্তমান নাম Lesotho চারদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা দিয়ে ঘেরা এই দেশের শাসন ব্যবস্থা Swaziland-এর মত। রাজা Moshoeshoe II রাজনৈতিক শক্তির উৎস—শাসনে সাহায্যের জন্য আছে সেনেট ও জাতীয় আইনসভা। ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে Basutoland National Party (BNP) জয়ী হন এবং তার নেতা Leabua Jonathan দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। Lesotho পূর্ণ স্বাধীনতা পায় ১৯৬৬ সালে।

১৪.৭ স্বাধীনতার স্বাদ ঃ ফরাসী দেশ শাসিত অঞ্চল

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে আফ্রিকার উপনিবেশ প্রশাসন নীতিতে বিরাট পার্থক্য ছিল। ইংলণ্ড Lord Lugasd-এর প্রবর্তিত 'Indirect Rule' এর নীতি অনুসরণ করত। ইংরেজ শাসিত দেশগুলির বিভিন্ন Tribe-এর প্রধান বা Chief-দের পুরোপুরি ক্ষমতাচ্যুত না করে তাদের মাধ্যমে শাসন-ই ছিল ইংরেজ শাসনের বৈশিষ্ট্য। সেই প্রধানদের ওপর কড়া নজরদারী চলত এবং বেয়াদপি করলে প্রচণ্ড সাজা দেবার ব্যবস্থা হোত। কিন্তু 'পরোক্ষ শাসনের' জন্য আফ্রিকানদের পুরানো জীবনযাত্রা অথবা দৈনন্দিন শাসনে বিদেশী হাত চোখে পরত না।

ফরাসীরা উপনিবেশ শাসনে অন্য নীতিতে বিশ্বাস করত। ফরাসী ভাষা ও সংস্কৃতি ছড়াতে হবে এবং তার মাধ্যমে আফ্রিকানরা হবে কৃষ্মকায় ফরাসী। কৃষ্মকায় ফরাসীদের ধ্যান ধারণা হবে প্যারিস যাওয়া এবং

প্রায় শ্বেতকায় ফরাসী হওয়া। আফ্রিকানদের মধ্যে এই মনোভাবের বিস্তার হলে ফরাসী উপনিবেশে কখনো ভাঙন ধরবে না—এটা ছিল প্যারিসের শাসককুলের দৃঢ় বিশ্বাস।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফরাসী উপনিবেশের কোন কোন নেতা হিটলারের ফ্রান্স অধিকারের বিপক্ষে ছিলেন। কেউ কেউ প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত হিটলারের তাঁবেদার গোষ্ঠির সমর্থক ছিলেন। নাৎসী অধিকারের বিরুধে সব চাইতে বড় প্রবক্তা Charles de Gaulle ঠিক করলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সের উচিত নতুন এক আফ্রিকা নীতি গ্রহণ করা। তাই ১৯৪৪ সালে ফরাসী কঙ্গোর রাজধানী Brazzarille-এ এক অধিবেশন ডাকলেন। ফ্রান্স ও আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশ—এরা এক এবং অবিচ্ছেদ্য—সব ফরাসীদের মত de Gaulle-ও সেই মতে বিশ্বাস করতেন। তবে তিনি টের পেয়েছিলেন যে আফ্রিকায় পরিবর্তনের হাওয়া বইছে এবং শিক্ষিত আফ্রিকানদের বিরাট একটা অংশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে। তাঁদের ইচ্ছা একেবারে অগ্রাহ্য করা মূর্খতা হবে। তাই Brazzaville অধিবেশনে তিনি বললেন যে যুদ্ধ পরবর্তী ফরাসী সংবিধান তৈরীর কাজে আফ্রিকার প্রতিনিধিরা প্যারিসের সমস্ত বৈঠকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। ঠিক হোল আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে 'আঞ্চলিক বিধান সভা' গঠিত হবে এবং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। ১৯৫৬ সালে ফরাসী সংসদ Loi Cadre পাশ করল। এই আইন আফ্রিকার আঞ্চলিক বিধানসভাগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ে আইন প্রণয়ন ও কার্য নির্বাহের ক্ষমতা দিল। সেই ক্ষমতা বিভাজন কিভাবে হবে তা নিয়ে আফ্রিকার নেতাদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দিল। গিনির নেতা Sekou Touri মনে করতেন সব দেশে বিধানসভা না করে দুটো বৃহত্তর 'Federal type' বিধানসভা করা উচিত। একটা হবে সমস্ত পশ্চিম আফ্রিকার জন্য—যাতে থাকবে Cameraoun, Dahonuy, Guinea, Ivory Coast, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo এবং Uper Vocta। আর একটা হবে Frenh Equatorial Africa-র জন্য। যাতে (Brazzaville) থাকবে Central African Republic, Congo (Brazzaville) (Gabon এবং Tehad Nkwame Nkrumah এর মত Sekou Touri আফ্রিকার ঐক্যে বিশ্বাস করতেন। তাই আফ্রিকার Balkanization বা অতিখন্ডন তিনি পছন্দ করতেন। Ivory Coast-এর নেতা Felix Honphonet-Boigney অপরদিকে মনে করতেন সব কটি দেশে আঞ্চলিক বিধানসভা হওয়া উচিত।

১৯৫৮ সালে de Gaulle-এর নেতৃত্ব ফ্রান্স যে সংবিধান গ্রহণ করল সেই সংবিধান 'ফ্রান্স এবং আফ্রিকায় ফ্রান্সের উপনিবেশ এক এবং অবিচ্ছেদ্য' এই বিশ্বাসকে চিরতরে বিসর্জন দিল। ঠিক হোল প্রতিটি দেশেই আঞ্চলিক বিধানসভা থাকবে এবং সমস্ত ফরাসী অধিকৃত আফ্রিকার দেশ ও ফ্রান্স মিলে একটা 'Communane' তৈরী হবে। কম্যুনিটির সদস্যরা সবাই পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন ভোগ করবে, কিন্তু প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারের মূল নীতি নির্ধারণ করবেন কম্যুনিটির মন্ত্রীরা অর্থাৎ প্যারিসের ফরাসীরা। মাঝে মাঝেই সব সদস্যদের প্রধানমন্ত্রীরা বৈঠকে বসবেন—সেই বৈঠকে নেতৃত্ব দেবেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি de Gaulle।

সেই বছরই সেপ্টেম্বর মাসে সব দেখে ভোট হলে এই ব্যবস্থা তারা চায় কি না নির্ধারণ করার জন্য। যারা চাইবে না তাদের দেওয়া হবে তাৎক্ষণিক পূর্ণ স্বাধীনতা। আর যারা চাইবে তারা কম্যুনিটির সদস্য হিসাবে ফ্রান্সের সংগে যোগ রেখে কোন কোন মৌলিক ব্যাপারে ফ্রান্সের কর্তৃত্ব স্বীকার করে এক ধরণের স্বায়ত্ব শাসন ভোগ করবে। Sekou Touri-এর নেতৃত্বে গিনি পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে রায় দিল। বাকী সব দেশ ঠিক করল তার কম্যুনিটির সদস্য হিসাবে থাকবে। গিনি ১৯৫৮ সালে স্বাধীনতা পেল। Parti Democratique

de Guinee (PDG)-র নেতা Sekou Touri শাসনভার গ্রহণ করলেন এবং de Gaulle-এর বিরোধিতা করায় ফ্রান্সের বিরাগ ভাজন হলেন। ফ্রান্স রাতারাতি গিনি থেকে সব রকম সাহায্য, লোকজন তুলে নিল। ঔপনিবেশিকতার কদর্য এক ভাবমূর্তির আক্রমণাত্মক প্রকাশের শিকার হোল গিনি।

Ivory Caost-এর নেতা ছিলেন Felix Houphonet Boigney। তাঁর নিজের দল ছিল Parti Democratique Cote d'ivoire এবং তিনি ফরাসী ভাষাভাষী আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক কাজ করার জন্য তৈরী Rassemblement Democratique African (RDA) দলের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। de Gaulle-এর ১৯৫৮ সালের প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় Ivory Coast 'Communante' এর সদস্য হিসাবে ছিল কয়েক বছর। ১৯৬০ সালে de Gaulle সেই ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে আফ্রিকার সমস্ত ফরাসী উপনিবেশগুলিকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করলেন। Houphonet Boigney-কে রাষ্ট্রপতি করে Ivory Coast স্বাধীন হোল।

Senegal-এর রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস Ivory Coast-এর মত সেনেগাল ১৯৫৮ সালে de Gaulle-এর প্রস্তাবে সায় দিয়েছিল। সেনেগালে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ছিল বেশী। মূল দল ছিল Union Progressiste Segegalaijse (UPS) যার নেতা বিখ্যাত কবি ও বুদ্ধিজীবী Leopold Senghor। তাছাড়া ছিল Parti due Regrupment African (PRA) এবং Parti African de I'Inedependance (PAI)। PAI প্রায় কম্যুনিষ্ট উগ্রপন্থী দল হিসাবে পরিচিত। ১৯৫৮ সালে de Gaulle-এর প্রস্তাবে বিরোধিতা করে PAI ফ্রান্সের বিরাগভাজন হয় এবং ১৯৫৯ সালে বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়। Senegal ১৯৬০ সালে স্বাধীন হয় এবং স্বাধীন সেনেগালের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন Leopold Senghor।

Upper Volta (বর্তমান নাম Burkisa Faso)-র প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল ছিল RDA-র স্থানীয় সংস্থা Union De'moaratique Voltcque. UDV-র নেতা Maurice Yameogo ছিলেন Upper Volta-এর প্রথম রাষ্ট্রপতি। Upper Volta ১৯৬০ সালে স্বাধীন হয় Dahomey (বর্তমান নাম Benin) একই সময় স্বাধীন হয়। Hubert Maga হন প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং MSM Apithy হন প্রথম রাষ্ট্রপতি।

French Equatorial Africa-র সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ দেশ ফরাসী Congo যাকে বেলজিয়াম অধিকৃত Congo-র থেকে পৃথক করার জন্য দেশের রাজধানীর নাম যোগ করে Congo (brazzaville) বলা হয়। Brazzaville ছিল সমস্ত French Equatorial Africa-র কেন্দ্রবিন্দু। এই শহরেই de Gaulle তাঁর ঐতিহাসিক অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন। Congo স্বাধীন হয় ১৯৫০ সালে। RDA-র স্থানীয় রাজনৈতিক Union Democratique de Defense de Intirets Africans (UDDAI) ছিল Congo-র সব চাইতে প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল। Congo-র প্রথম রাষ্ট্রপতি UDDAI-র নেতা Abbe Fulbort Youlon। Gabon আফ্রিকা ছোট দেশগুলির মধ্যে সব চাইতে সমৃদ্ধিশালী। Gabon-এ RDA-র আঞ্চলিক রাজনৈতিক সংস্থা Bloc Democratique Gabonais (BDG) সব চাইতে প্রভাবশালী দল। ১৯৬০ সালে স্বাধীনতার পর Leon Mba হল Gabon-এর প্রথম রাষ্ট্রপতি। তেল ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ Gobon-কে আফ্রিকার অন্যান্য দেশ থেকে পৃথক করেছে।

১৪.৮ স্বাধীনতার স্বাদ ঃ পর্তুগাল শাসিত অঞ্চল

আফ্রিকায় পর্তুগালের বিশাল সাম্রাজ্য ছিল। সেই সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল ৮ লক্ষ বর্গমাইল—পর্তুগালের আয়তনের কুড়ি গুণেরও বেশী। আগেই বলা হয়েছে সেই সাম্রাজ্যে ছিল মূল ভূখন্ডের Angola, Mazambique ও Portuguese Guine এবং Cape Verde, Sao Thome and Principe দ্বীপগুলি। পর্তুগাল পশ্চিম ইউরোপের সব চাইতে দরিদ্র দেশ। পর্তুগালের স্বাক্ষরতার হার ইউরোপে সব চাইতে কম। তাই পর্তুগালের সরকার যে নিজের দেশকেই সমৃদ্ধ করতে পারেনি—সে উপনিবেশকে সমৃদ্ধ করবে এটা আশা করাই ভুল। কিন্তু আর্থিক ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও পর্তুগাল ৫০০ বছরেরও বেশী আফ্রিকায় ছিল এবং গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করত যে পর্তুগাল আরও ৫০০ বছর আফ্রিকায় থাকবে। এই ধরনের লড়াই-এর ভিত্তি কি তা জানতে হলে পর্তুগালের ঔপনিবেশিক নীতির মূল কথাগুলি জানা দরকার।

পর্তুগাল মনে করত সাগরপারের উপনিবেশগুলি আসলে পর্তুগালের অচ্ছেদ্য অংশ। ওগুলি উপনিবেশ নয়। তাই তাদের স্বাধীনতা দেবার কথা অবান্তর। দ্বিতীয়ত পর্তুগাল উপনিবেশগুলিতে সরকারি কোন শিক্ষানীতির প্রবর্তন করেনি। সমস্ত বিদ্যালয়—অধিকাংশই প্রাথমিক স্তরের-ক্যাথলিক চার্চের অধীনে ছিল। খ্রীষ্টান পাদ্রীরাই শিক্ষার নীতি নির্ধারণ করত। সরকার কিছু অনুদান দিত মাত্র। পাদ্রীদের অধীনে থাকায় শিক্ষার চাইতে ধর্মপ্রচার অনেক বেশি হোত। অনেক উপনিবেশে অর্ধেকের বেশি আফ্রিকান খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। ধর্মান্তরের এত উঁচু হার অন্য কোন উপনিবেশে দেখা যায় না। তৃতীয়ত পর্তুগাল আফ্রিকার উপনিবেশ forced labour বা ‘প্রায় দাসপ্রথা’ নিয়মিত ব্যবহার করত। আফ্রিকান শ্রমিকদের ওপর শারীরিক অত্যাচারের ঘটনাও বিরল ছিল না। চতুর্থতঃ ইংরেজ ও ফরাসী অধিকৃত আফ্রিকা যখন স্বাধীনতা পেল স্বভাবতই পর্তুগালের উপনিবেশগুলিতে তার ঢেউ লাগল। স্বাধীনতা সংগ্রাম সেখানেও শুরু হলো এবং সেই সংগ্রাম দমন করতে প্রায় দেড় লক্ষ পর্তুগীজ সৈন্য আফ্রিকায় মোতায়েন করা হোল। সামরিক খাতে এই ব্যয় পর্তুগালের জাতীয় বাজেটের ৪৭ শতাংশের বেশি ছিল। যে সব আফ্রিকানরা সরকারের বিরুদ্ধে কার্যকলাপে ব্যাপৃত থাকত তাদের অমানুষিক শাস্তি দেওয়া হোত। Palmatoria Chicote-র ব্যবহার ছিল অবাধ। Palmatoria কাঠের ডান্ডা যার সামনের দিকে সুবিধার জন্য কিছু ফুটো থাকে। Chicote হচ্ছে চামড়ার চাবুক।

১৯৩২ থেকে ১৯৬৮ সাল অবধি পর্তুগাল ছিল কুখ্যাত স্বৈরাচারী সালাজারের অধীনে। সালাজার ভাবতেন আফ্রিকায় পর্তুগালের শাসন অটুট থাকবে কারণ ওখানকার জনগণের একটা বিরাট অংশ নিজেদের পর্তুগালের বাসিন্দা মনে করে। এটা ঠিক যে বহুসংখ্যক পর্তুগীজ সৈন্য বা অন্য পেশায় কর্মরত ব্যক্তি আফ্রিকান মহিলাকে বিয়ে করেছিল এবং এই উদার race policy’-র জন্য Angola, Mazambique এবং অন্যান্য পর্তুগীজ উপনিবেশে এক করেছি এবং এই উদার ‘nace policy’-র জন্য Angola, Mazambique এবং অন্যান্য পর্তুগীজ উপনিবেশে এক বিরাট ‘সংকর গোষ্ঠীর’ উদ্ভব হয়। সালাজারে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এরাই পর্তুগালের হয়ে অবিমিশ্র আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে লড়বে।

পর্তুগালের উপনিবেশগুলিতে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া না থাকায় এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ বেআইনি হওয়ায় স্বাধীনতা সংগ্রাম সশস্ত্র, হিংসাত্মক হোল এবং স্বভাবতই গোপন খাতে প্রবাহিত হোল। পশ্চিম আফ্রিকার

Protuguese Guinea সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী ছিল Partido Africano da Independincia da Guinee। Cabo Verde (PAIGC)-এর নেতা ছিলেন American Cabral (PAIGC) কাজ করত সেনেগাল ও গিনির ঘাঁটি থেকে।

Angola-র গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৬১ সাল থেকে। তিনটি গোষ্ঠী পর্তুগালের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। প্রথমটি Popular Movement for the Liberation of Angola (MPLA)। MPLA-র নেতা ছিলেন Dr. Antonio Agostinho Neto। দ্বিতীয় দল ছিল National Union for the Total Independence of Angola (UNITA) নেতার Jonha Savimbi। তৃতীয় দলের নাম Angolan National Liberation Front (FNLA)। নেতার নাম olden Roberto সবাইকে কাজ করতে হোত দেশের বাইরে থেকে। সাহায্য নিতে হোত অন্যান্য আফ্রিকান রাষ্ট্রের কাছ থেকে অথবা পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে পর্তুগাল NATO-র সদস্য ছিল। তাই আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি পর্তুগাল সরকারকে এবং পর্তুগালের গোয়েন্দা বাহিনী PIDE-কে সাহায্য করত।

Mozambian-এর তিনটি সংগ্রামী গোষ্ঠী ১৯৬২ সালে একত্রিত হয়ে Frente de Liberatacao de Mozambique (FRELIMO) তৈরী করল। ট্যাঙ্গোনিকার রাজধানী Dar-es-Salam-এ FRELIMO-র ঘাঁটি স্থাপিত হোল। সভাপতি নির্বাচিত হলেন Dr. Eduarodo Modlane।

পর্তুগীজ গিনি, অ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বহুদিন চলেছিল। ১৯৭৪ সালে পর্তুগালে এক সামরিক অভ্যুত্থান হয়। নেতা Spinola। গেরিলা সংগ্রাম পর্তুগালের দুর্বল অর্থনীতিকে দেউলিয়ার পর্যায় নিয়ে এসেছিল। পর্তুগালের পক্ষে সেটা আর সহ্য করা সম্ভব ছিল না। ১৯৭৫ সালে পর্তুগাল আফ্রিকার কলোনীগুলির স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

১৪.৯ স্বাধীনতার স্বাদ : বেলজিয়াম শাসিত অঞ্চল

১৮৮৫ সাল থেকে ১৯০৭ অবধি বেলজিয়ামের রাজা Leopold II মধ্য আফ্রিকার Congo-তে যার বর্তমান নাম Zaire, রাজধানী Kinshasa পুরানো নাম Leopoldille ব্যক্তিগত রাজত্ব করেছেন। সেই বছর বেলজিয়ামের সরকার Congo-কে বেলজিয়ামের উপনিবেশ হিসাবে শাসনভার নেয়। বেলজিয়ামের শাসন প্রণালী ছিল পিতৃতান্ত্রিক। সমস্ত ভাল চাকুরী থেকে বঞ্চিত আফ্রিকানরা সরকারি বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সর্ব নিম্নস্তরে অল্প মাইনেতে জীবন কাটাত। হীরে, কোবাল্ট, তামা, সোনা, শিষে এবং অনেক খনিজ সম্পদে ভরপুর এই দেশের স্থানীয় বাসিন্দারা স্বভাবতই ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করল। গোড়াতে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বেআইনী ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক আন্দোলন বন্ধ করা অসম্ভব হোল। ১৯৬০ সালে বেলজিয়াম কঙ্গোর পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। Abako Party-র নেতা Jorph Kasavisbu প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন, Congoluse National Movement (MNC)-র নেতা Ptrice Lumumba হলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ৭ মাস পরেই কঙ্গো এক নারকীয় গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হয় যার জের বহু বছর ছিল।

১৪.১০ স্বাধীনতার স্বাদ ঃ জার্মানি ও ইতালি শাসিত অঞ্চল

আফ্রিকা জমি দখলের ঘোড়দৌড়ে জার্মানি অনেক পরে যোগ দেয়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই জার্মানি পশ্চিম আফ্রিকায় Cameroon ও Togo দখল করে, দক্ষিণ আফ্রিকায় নেয় South West Africa (বর্তমান নাম Namibia) এবং মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকায় Rwanda-Burundi এবং Ganganyika। ইতালির উপনিবেশ ছিল পূর্ব আফ্রিকায় Eritraca Somilia-তে। জার্মানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাস্ত হয় এবং যুদ্ধান্তে স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তার সমস্ত কলোনীর ওপর অধিকার হারায়। জার্মান কলোনীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বর্তায় League of Nation এর ওপর। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তাদের পছন্দমত কোন এক 'সভ্য' রাষ্ট্রকে সেই সব কলোনী শাসন করার দায়িত্ব দেয়। South West Africa শাসনের দায়িত্ব পরে South Africa-র ওপর, Cameroon ও Tago-র আংশিকভাবে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের ওপর, Rwanda Burundi-র দায়িত্ব পায় বেলজিয়াম ও Tangonyika-র শাসনের ভার পায় ইংলন্ড। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাষ্ট্রসংঘ, জাতিপুঞ্জের দায়িত্ব পায় এবং প্রাক্তন জার্মান কলোনীগুলির শাসনের দায়িত্ব একই রাষ্ট্রের হাতে রাখে।

Cameroon-এর পূর্বাংশ যেটা ফরাসী শাসনে ছিল, এবং পশ্চিমাংশ যেটা ইংলন্ডের শাসনাধীন ছিল দুটোই United Nations-এর Trust Teritory হিসাবে—ঠিক করল তারা একত্রিত হয়ে একটি যুক্তরাজ্য গঠন করবে। ১৯৬১ সালে সেই যুক্তরাজ্য স্বাধীন হয়। দক্ষিণ Camroon ১৯৬০ সালে নাইজেরিয়ার সঙ্গে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রসংঘের ট্রাষ্ট টেরিটরি হিসাবে ইংলন্ড শাসিত Togo ঘানার সঙ্গে যোগ দেয়। ফরাসী শাসিত Togo স্বাধীনতা পায় ১৯৬০ সালে। Sylvanus Olympio ছিলেন Togo-র প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

South West Africa এক বিশাল অঞ্চল। আয়তন প্রায় তিন লক্ষ বর্গমাইল। হীরে ও অন্যান্য খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকা গোড়া থেকেই South West Africa-কে নিজের রাজ্য হিসাবে শাসন করত। প্রথমে League of Nation-এর কাছে এবং পরে United Nations-র কাছে তার যে দায়িত্ব ছিল তা কিছুই পালন করত না এবং রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত নির্দেশ অমান্য করত। ১৯৪৮ সালের পর যখন Nationalist Party দক্ষিণ আফ্রিকার ঘৃণ্য apartheid (apartheid ও bantustan এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে দেওয়া আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রসঙ্গে Africans এর বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে) নীতি প্রবর্তন করার চেষ্টা করেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার Bantustan নীতিও South West Africa-তে প্রবর্তনের চেষ্টা করছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বে-আইনি কাজ রুখতে বিভিন্ন রাষ্ট্র বেশ কয়েক বার আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে গিয়েছে, রাষ্ট্রসংঘ বিশেষ কমিটি তৈরী করে রিপোর্ট প্রকাশিত করেছে—কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা তার ব্যবহার বদলায়নি।

South West Africa-তে বেশ কিছু রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হয়েছিল। শ্বেতকায় ইংরেজ ভাষাভাষীরা গঠন করল United National South West Party (UNSWP), Africans ভাষাভাষীরা দক্ষিণ আফ্রিকার Nationalist Party কেই সমর্থন করত। শহরের বুদ্ধিজীবীদের দল হোল South West African National Union (Swanu)। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠদের দল এবং সবচাইতে সক্রিয় দল ছিল South West African People's Organisation (SWAPO) যার নেতা ছিলেন Sam Nujoma। জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম, রাষ্ট্রসংঘ

এবং সমস্ত বিশ্বের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে অবশেষে ১৯৯০ সালে সাউথ আফ্রিকা South West Africa-র স্বাধীনতা ঘোষণা করল। Sam Nujoma হলেন নতুন রাষ্ট্র নামিবিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি।

জার্মানির আর এক উপনিবেশ প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংলন্ডের তত্ত্বাবধানে আসে League of Nations এর মাধ্যমে। তার নাম Tanganyika (বর্তমানে Zamzibar-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে, নাম হয়েছে Tangania)। ট্যাঙ্গানিকার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল Tanganyika African National Union (TANU)। TANU-র অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন Dr. Julius K. Nyerere। ১৯৬০ সালে নির্বাচনে তাঁর দল সংসদের ৭১টি আসনের মধ্যে ৭০টি আসন পায়। ১৯৬১ সালে Tanganyika স্বাধীন হয় এবং ডাঃ নাইজেরি স্বাধীন ট্যাঙ্গানিকার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন।

মধ্য আফ্রিকার জার্মান উপনিবেশ ছিল Rwanda-Burundu-তে। রুয়ান্ডা বুরুন্ডি তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পায় বেলজিয়াম। বেলজিয়াম Congo-র সঙ্গে রুয়ান্ডা-বুরুন্ডি শাসন করত। দুটো দেশই ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে স্বাধীনতা পায়।

ইটালী ইরিট্রিয়া হারাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। ইংল্যান্ড রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে ইরিট্রিয়ার শাসন তত্ত্বাবধান করতে শুরু করল ১৯৪১ সাল থেকে। ১৯৫২ সালে ইরিট্রিয়া ইথিওপিয়ার অংশ হয়। ইরিট্রিয়ার জনগণ কিন্তু সেটা পছন্দ করেনি তাই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চলতে লাগল। ১৯৯৬ সালের মে মাসে ইরিট্রিয়া স্বাধীনতা পায়।

একই সময়ে ইটালী সোমালিয়া হারিয়েছিল। শাসনের দায়িত্ব এল ইংলন্ডের হাতে। কিন্তু ইংলন্ড কিছুদিন পর ইতালীকে দেয়। সোমালিয়ার যে অংশ ইংলন্ডের কলোনী ছিল সেই অংশের সঙ্গে ইতালীর অংশ যুক্ত হোল। যুক্ত সোমালিয়া স্বাধীন হয় ১৯৬০ সালে। মহম্মদ এগাল (Mohammad Egal) হলেন স্বাধীন সোমালিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

১৪.১১ বর্ণবিদ্বেষের কুৎসিত মুখ

আফ্রিকার কোন কোন উপনিবেশে শ্বেতকায় ইউরোপীয়ানরা বসতি স্থাপন করেছিল। পূর্ব আফ্রিকার কিনিয়াতে ছিল প্রায় ৩০০০০ ইংরেজ। দক্ষিণ রোডেসিয়ার (বর্তমান মান Zimbabwe) ছিল প্রায় আড়াই লক্ষ শ্বেতকায়। দুটো দেশই ছিল ইংরেজের অধীন। এই শ্বেতকায় ইংরেজদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য ওখানকার সরকার অনেক পক্ষপাত দুষ্ট প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিত। তাই ওই সব দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। রাজনৈতিক অধিকারের দাবী ও বৈষম্যমূলক জমি বন্টন ও স্থানীয় লোকদের উৎখাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—দুটো আন্দোলন একই সঙ্গে চলে।

কিনিয়ার শ্বেতকায়রা বিশাল খামার করত। Crown Lands Ordinance এর দৌলতে অন্যায়ভাবে শ্বেতকায়রা দেশের সমস্ত ভাল জমি দখল করেছিল। সেখানেই খামার। খামারের জমি দখল করার জন্য একটা বিরাট সংখ্যক আফ্রিকান—বিশেষ করে Kikuyu গোষ্ঠীর লোক—বাস্তুহারা হোল। এই জমিবিহীন লোকদের একটা অংশ গুপ্ত সশস্ত্র আন্দোলনে নামে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে। এই আন্দোলন Man Man আন্দোলন নামে পরিচিত। এই সশস্ত্র গুপ্ত আন্দোলনের পাশাপাশি চলছিল প্রকাশ্য স্বাধীনতা সংগ্রাম। Kikuyu Central Association ছিল প্রথম আফ্রিকান রাজনৈতিক দল। পরে আরও রাজনৈতিক দল তৈরী হয়। Kenya

African National Union (KADU) এই সব দলের মধ্যে সবচাইতে প্রভাবশালী ছিল। কোন কোন অঞ্চলে Kenya African Democratic Union (KADU) প্রভাব ভালই ছিল। KANU-র সব চাইতে বড় নেতা ছিলেন Jomo Kenyatta। Kenyatta সশস্ত্র আন্দোলন ও Man Man দের সঙ্গে যুক্ত এই অভিযোগে ঔপনিবেশিক সরকার প্রায়ই তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে রাখত। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে লন্ডনের Lancastu House-এ তিনটি অধিবেশন হয় কিনিয়ার রাজনৈতিক নেতা ও ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। ১৯৬৩ সালে অধিবেশনে স্বীকৃত শর্ত অনুযায়ী ওই বছর ডিসেম্বর ১২ তারিখে জেমো কেনিয়াট্টা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কিনিয়া স্বাধীন হয়। এক বছর পর কিনিয়া Republic-এ পরিণত হয়। KADU KANU-র সঙ্গে মিলে যায়। জোমো কেনিয়াট্টা হন কিনিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি। সদ্যলুপ্ত KADU-র নেতা Oginga Odinga নির্বাচিত হন উপ-রাষ্ট্রপতি।

দক্ষিণ রোডেসিয়ার আড়াই লক্ষ শ্বেতকায় বেশ কিছু বড় খামারের মালিক ছিল এবং ঔপনিবেশিক শাসনে অনেক বিশেষ সুবিধা উপভোগ করছিল। তারা চাইছিল না দক্ষিণ রোডেসিয়া স্বাধীন হোক। সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকানদের সরকার তৈরী হলে সেই সব সুবিধা আর থাকবে না, তাই তাদের নেতা Ian Smith ১৯৬০ সালে দক্ষিণ রোডেসিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করলেন। তখনো দক্ষিণ রোডেসিয়া ইংরেজ কলোনী। এই ঘোষণাকে বলা হয় Unilatral Declaration of Independence (UDI)। লন্ডন সেই ঘোষণাকে অবৈধ মনে করত। ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী Harold Wilson ইয়ান স্মিথ এর সরকারের বিরুদ্ধে 'অর্থনৈতিক অবরোধ' আরোপ করলেন। ইয়ান স্মিথের বে-আইনী সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার অনুকরণে বিভিন্ন ধরনের বর্ণভিত্তিক বৈষম্যমূলক আইন প্রনয়ণ করল। বছর দুই পর রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সীমিত 'সামরিক অবরোধ' আরোপ করে দক্ষিণ রোডেসিয়ার বিরুদ্ধে। হারল্ড উইলসন্ ভাবতেন অর্থনৈতিক অবরোধের চাপে স্মিথের অবৈধ সরকারের কিছুদিনের মধ্যেই পতন হবে। কিন্তু দক্ষিণ রোডেসিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকা, পর্তুগীজ কলোনী মোজাম্বিক ও এ্যাঙ্গোলা প্রকাশ্যে এবং ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ গোপনে স্মিথের সরকারকে সব ব্যাপারে সাহায্য করছিল। তাই স্মিথের সরকার ১৩ বছর—অর্থাৎ ১৯৭৮ সাল অবধি ইংলন্ড, রাষ্ট্রসংঘ ও তৃতীয় বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের সক্রিয় বিরোধিতা সত্ত্বেও চলছিল। অর্থনৈতিক চাপ ও রাজনৈতিক একাকীত্ব ক্রমশ স্মিথকে দুর্বল করে দেয়। তাই স্মিথের সরকার বছর দুই নানান ধরনের রাজনৈতিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালালেন। উদ্দেশ্য ছিল তার নিজের পছন্দসই এক আফ্রিকানকে মসনদে বসিয়ে পর্দার অন্তরাল থেকে মূল শাসন চালানো। সেটা বেশি দিন চলল না। স্বাধীনতা পেতে এবং পরবর্তীকালে স্মিথের বেআইনী সরকার দূর করতে বেশ কয়েকটি আফ্রিকান রাজনৈতিক দল তৈরী হয়েছিল।

যেহেতু দেশে রাজনীতি বে-আইনী ছিল, সেই সংস্থাগুলি আফ্রিকার অন্য দেশে ঘাঁটি করে কাজ করত। এদের মধ্যে সব চাইতে প্রভাবশালী ছিল Joshna Nkoma-র নেতৃত্বে তৈরী Zimbabwe African People's Union (ZAPU) এবং Sithobe-র Zimbabwe African National Union (ZANU) Sithobe পর ZANU-র নেতা হন Robert Mugabe। রাষ্ট্রসংঘ, কমনওয়েলথ্, ইংরেজ সরকার এবং আরও অনেক সংস্থার মধ্যস্থতায় অবশেষে রোডোসিয়ার রাজনৈতিক অব্যবস্থার অবসান হোল। ১৯৮০ সালে সাধারণ নির্বাচন হল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে সংসদে নেতৃত্ব পেল ZANU। Robert Mugabe প্রথম কৃষ্ণকায় আফ্রিকান রাষ্ট্রপতি হিসাবে জিম্বাবোয়ের শাসনভার গ্রহণ করলেন।

আফ্রিকায় বসতি স্থাপন করে শ্বেতকায়রা সব চাইতে জটিল সমস্যার তৈরী করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ওলন্দাজরা Cape of Good Hope-এ বসতি স্থাপন করে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের পরাস্ত করে ভেতরে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। তারপর আসে ইংরেজরা। দুয়ের সংঘর্ষ হয় অনিবার্য। যে সব ওলন্দাজরা ওখানে বসতি স্থাপন করেছিল তাদের বলা হত Boer অথবা Afrikaners। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে বুয়ররা পরাস্ত হয়। Transuae ও Orange Free State-এ বুয়রদের এক ধরনের স্বায়ত্বশাসন দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইংরেজরা তাদের সঙ্গে আপোষ করে। ১৯১০ সালে Union of South Africa তৈরী হয়। প্রায় শুরুতেই শ্বেতকায়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংখ্যালঘু সরকার কৃষ্মকায়দের বঞ্চিত করে বৈষম্যমূলক ভূমি বন্টন করে। দক্ষিণ আফ্রিকার জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ কৃষ্মাঙ্গ, ১৪ শতাংশ শ্বেতকায়। এছাড়া রয়েছে ভারতবর্ষ থেকে আসা লোকেদের সন্তান সন্ততিরা এবং বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণে জাত এক সম্প্রদায় যাকে বলা হয় 'Coloured'। নতুন ভূমি আইনের ফলে ১৪ শতাংশ শ্বেতকায়রা দেশের ৮০ শতাংশ জমির মালিক হয়।

দেশের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ কৃষ্মকায়রা পেল মাত্র ১৩ শতাংশ জমি। এবং সে জমিও বহুলাংশে অনুর্বর। ১৯৪৮ সালে National Party ক্ষমতায় আসে এবং বর্ণভিত্তিক ঘৃণ্য বৈষম্যমূলক আইন প্রবর্তন করে। সম্মিলিতভাবে এই আইন প্রয়োগের ফলে যে প্রথা প্রবর্তিত হল তাকে বলা হয় Apartheid। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সাদা-কালোর বৈষম্য কুৎসিত আকারে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন পায়। দক্ষিণ আফ্রিকার সব চাইতে পরিচিত ব্যক্তিত্ব Nelson Mandela তাঁর জীবনী 'Long Walk to Freedom'-এ অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় অত্যাচারিত কৃষ্মাঙ্গদের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। "It was crime to walk through a whites onlydoor, a crime to ride a whites only bus, a crime to use a whites only drinking fountain, a crime to walk on a whites only beach, a crime to be on the streets past eleven, a crime not to have a psssbook and a crime to have the wrong signature on that book, a crime to be unemployed and a crime to be employed in the wrong place, a crime to live in a certain place and a crime to have no place to live."

রাজনৈতিক ও সামরিক জীবনের এই অস্বাভাবিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ আফ্রিকার অশ্বেতকায়দের সংগ্রামের দুটো দিক ছিল। প্রথমত apartheid এর বিরুদ্ধে লড়াই করে মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয়ত অগণতান্ত্রিক সংখ্যালঘুর সরকার সরিয়ে দিয়ে কৃষ্মাঙ্গদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং গণতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠদের সরকার গঠন। আফ্রিকার অন্যান্য দেশের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের পার্থক্য এই যে অন্যান্য দেশ শাসন করত ইংরেজ বা ফরাসী বা পর্তুগীজরা লন্ডন, প্যারিস বা লিসবন থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার চালাত যারা তারা ওখানকার বাসিন্দা। তাদের পূর্ব-পুরুষরা ২০০ বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিল। এদের অন্য কোথাও চলে যাবার জায়গা নেই।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে শ্বেতকায়দের একটা অংশ apartheid সমর্থন করত না। United Party, Progressive Party, Liberal Party—সবই ছিল শ্বেতকায়দের রাজনৈতিক দল। কিন্তু এই দলগুলি বর্ণবৈষম্যের অবসান, মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস করত। কিন্তু এদের অনেকেই শ্বেতকায়দের রাজনৈতিক প্রাধান্য বজায় থাক—সেটা চাইত।

কৃষ্মাঙ্গাদের সব চাইতে পুরানো রাজনৈতিক দল Atrican National Congress (ANC)। ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই দলে উদারপন্থী অনেক শ্বেতকায় সদস্য বা সমর্থক হিসাবে আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার Communist Party ১৯৫১ সালে বে-আইনী হয়ে যাবার পর গোপনে ANC-র সঙ্গে মিলে কাজ করছিল। ১৯৬০ সালে ANC বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়। এর কারণ ঐ বছরের একটি ঘটনা যা ইতিহাসে Sharpeville massacre নামে পরিচিত। দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশ 'পাশ আইনের' বিরুদ্ধে সমাবেশে Sharpeville ও Langa শহরে গুলি চালায়। ঐ ঘটনা ও পরবর্তী ঘটনাগুলিতে ৮৩ জন কৃষ্মাঙ্গ প্রাণ হারায় ও ৩৬৫ জন আহত হয়। সরকার সশস্ত্র ও অহিংস এক সমাবেশে পরিকল্পনা অনুযায়ী গুলি চালিয়ে অস্বাভাবিক অবস্থা তৈরী করে এবং ২০০০ আফ্রিকান নেতাকে গ্রেপ্তার করে। একই সময় কৃষ্মাঙ্গাদের আরও একটি রাজনৈতিক দল Pan-Africanist Congress (PAC) বে-আইনী ঘোষিত হয়। কৃষ্মাঙ্গাদেরগোপনে কাজ করা ও চরমপন্থী হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

ANC-র প্রথম দিকের নেতা ছিলেন Albert Luthuli। তাঁর ব্যক্তিত্ব, নিষ্ঠা ও নির্ভীক সংগ্রামের জন্য সমস্ত বিশ্ব তাঁকে সম্মান জানিয়েছিল শান্তির নোবেল পুরস্কার দিয়ে। তারপর ANC পায় Olivu, Tambo Nelson Mendela ও Thabo Mabeki-র মত অসাধারণ ব্যক্তিত্বের নেতৃত্ব। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার Suppression of Communism Act এর ধারা অনুযায়ী অথবা 'teason' এর অভিযোগ এনে এদের অনেককেই জেলে বন্দী করে রেখেছিল। নেলসন ম্যান্ডেলা জীবনের ২৭ বছর জেলে কাটিয়েছেন সাধারণ কয়েদীদের মত কায়িক পরিশ্রম করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার অমানবিক সমাজ ব্যবস্থা, স্বৈরাচারী শাসন পদ্ধতি রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন অধিবেশনে আলোচনা হয়েছে। কমনওয়েলথ্ও এ নিয়ে অনেক উত্তপ্ত আলোচনায় ব্যাপৃত হোত এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার কিন্তু এ সবে আমল দিত না। রাষ্ট্রসংঘে পর্তুগাল ছাড়া অন্য কোন দেশ তার সপক্ষে ভোটদিত না। মাঝে মাঝে পশ্চিমী রাষ্ট্রের কেউ কেউ ভোটদানে বিরত থাকত, যদিও বিপুল ভোটে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হোত।

আর্ন্তর্জাতিক চাপের মুখে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার 'Bantustan Policy' নামে নতুন এক প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করল। বিভিন্ন Tribe-দের কেন্দ্র করে বিভিন্ন অঞ্চলে তথাকথিত 'স্বাধীন রাষ্ট্র' তৈরি করল। সরকারের সঙ্গে সদ্ভাব আছে এমন কিছু লোককে এই সব 'স্বাধীন রাষ্ট্রের' সর্বোচ্চ পদে বসান হোল। বলা হল কৃষ্মাঙ্গারা বিভিন্ন অঞ্চলে এখন নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করছে। সেখানে apartheid নেই এবং শ্বেতকায়দের একচেটিয়া রাজনৈতিকক্ষমতার ব্যবহার নেই। কিন্তু এই সব 'রাষ্ট্র' আন্তর্জাতিক স্বীকৃত পেল না। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল ধারার কোন গোষ্ঠীই এই 'Bantustan' নীতিকে একেবারেই আমল দিল না।

দেশের অভ্যন্তরে সর্বস্তরে নিরবচ্ছিন্ন বিক্ষোভ, মাঝে মাঝে সশস্ত্র সরকার বিরোধী অভ্যুত্থান, সমস্ত বিশ্বে নিন্দা ও আন্তর্জাতিক সংগঠন, ক্রীড়া, প্রতিযোগিতা ও সমাবেশ থেকে বহিষ্কার আর বেশি দিন সহ্য করা দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের পক্ষে সম্ভব হোল না। ১৯৯০ সালে নেলসন ম্যান্ডেলা মুক্তি পেলেন। দেশের রাষ্ট্রপতি F. W. de clerk কৃষ্মাঙ্গ রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। Apartheid দূর হোল এবং জাতি বর্ণ নির্বিশেষে প্রকৃত গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী প্রথম নির্বাচনের দিন স্থির হোল। সেই নির্বাচনে

ANC বিপুল ভোটে জয়ী হয়। ১৯৯৪ সালে নেলসন মান্ডেলা প্রকৃত স্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি হিসাবে গণতান্ত্রিক সরকারেরকার্যভার গ্রহণ করেন। সাব-সাহারাণ আফ্রিকার রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রামের অবসান হোল।

১৪.১২ পশ্চিমের রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও পরাধীন আফ্রিকা

আফ্রিকার জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। যদিও পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম জোরালো হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। চলে কয়েক দশক অর্থাৎ মুক্তি আন্দোলনের মূল অধ্যায় এবং ঠান্ডা লড়াই একই সময় চলছিল। সেই ঠান্ডা লড়াই-এর দুই নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তাদের তাবেদার রাষ্ট্রগোষ্ঠী কিভাবে আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনকে দেখত সে সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আমরা লক্ষ্য করেছি পর্তুগাল শাসিত দেশগুলিও দক্ষিণ আফ্রিকা সবার শেষে স্বাধীনতা বা গণতান্ত্রিক সরকার পেল। তাই এই দুই দেশের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অথবা সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মনোভাব আলোচনা করলেই এ বিষয়ে কিছু ধারণা হবে।

পর্তুগাল ছিল NATO-র সক্রিয় সদস্য এবং পর্তুগালের সংজ্ঞা অনুযায়ী Angola, Mozambique ইত্যাদি পর্তুগীজ কলোনীগুলি ছিল পর্তুগালের অচ্ছেদ্য অংশ। উপনিবেশ নয়। তাই NATO-র সদস্য হিসাবে পর্তুগাল NATO-র কাছে তার 'Overseas Territory' রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সাহায্য চাইতে পারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বদা সেই সাহায্য দিত। PIDE ছিল পর্তুগালের Secret Police Service। PIDE, NATO-র সদস্যদের কাছ থেকে প্রচুর তথ্য ও আধুনিক সরঞ্জাম পেত। সেই সাহায্য পর্তুগালকে মুক্তি আন্দোলন দমন করতে খুব সাহায্য করেছে। পর্তুগালের কলোনীগুলির আন্দোলন ছিল সশস্ত্র ও গুপ্ত। তাদের নেতারা বাধ্য হয়ে ঠান্ডা লড়াই-এর বিপরীত মেরুতে যেতেন সাহায্যের জন্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন অথবা অনুগামী পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি অস্ত্র, খাদ্য, চিকিৎসার সাহায্য ও কুটনৈতিকসাহায্য দিত। আন্দোলনে যুক্ত-আফ্রিকার দলগুলির সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে এই সম্পর্কের জন্য পর্তুগাল তাদের দমনের অভিযানকে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে অভিযান বলে চালাত। ফলে আমেরিকা ও কম্যুনিষ্ট বিরোধী পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির নিরবচ্ছিন্ন সাহায্য পর্তুগাল পেত।

দক্ষিণ আফ্রিকা হীরে, সোনা, কয়লা এবং অন্যান্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অনন্য এক দেশ। সেই খনিজ সম্পদ ভূগর্ভ থেকে তোলা, তাকে ব্যবহারযোগ্য করে এবং পৃথিবীর বাজারে পাঠানোর সমস্ত কাজ করত বহুজাতিক কোম্পানীগুলি যাদের মূল ঘাঁটি আমেরিকা, ইংলন্ড, ফ্রান্স বা জার্মানীতে। দক্ষিণ আফ্রিকার সব বড় ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিও একইভাবে পশ্চিমী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমেরিকা সরাসরি দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারকে সামরিক সাহায্য করত না কিন্তু ইংলন্ড উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটস্থ Simonstown-এ একটি সামরিক ঘাঁটির তত্ত্বাবধান করত। আমেরিকার সামরিক সাহায্যও পর্তুগাল এবং ইজরাইলের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারেরকাছে পৌঁছত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ

নাই। আফ্রিকার সবচাইতে মজবুত অর্থনীতি দক্ষিণ আফ্রিকার। তার সাথে বাণিজ্যের প্রলোভন ইংলন্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী কিছুতেই দমন করতে পারত না। ফ্রান্স ও জার্মানী সামরিক বিমান, আগ্নেয়াস্ত্র সব কিছুই বিক্রি করত দক্ষিণ আফ্রিকাকে।

আগেই বলা হয়েছে রাজনৈতিক কার্য-কলাপ বে-আইনী হওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের আন্দোলন ছিল সশস্ত্র ও গোপন। Angola ও Mozambique-এর মত এদেরও সাহায্য আসতো সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপ বা চীন থেকে। কম্যুনিস্ট সংযোগের কথা বলে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার Suppression of Communism Act ব্যবহার করে আন্দোলন দমন করত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কম্যুনিষ্ট বিরোধী দলগুলির সহানুভূতি ও সক্রিয় সাহায্য আদায় করত। ঠান্ডা লড়াই এর যুগে এটা ছিল তুরুপের তাস। মার্কিনসহানুভূতি পেতে এই অস্ত্র ছিল অমোঘ।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে বর্ণের ভিত্তিতে এক ধরনের সহানুভূতি দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যালঘু শ্বেতকায়দের সরকার বিশ্বের প্রায় সব শ্বেতকায়দের দেশে পেত। কৃষ্ণাঙ্গরা জাতি হিসাবে নিকৃষ্ট ও অকর্মণ্য— ঊনবিংশ শতাব্দীর এই অবৈজ্ঞানিক নৃতাত্ত্বিক ধারণা যা ঔপনিবেশবাদকে পুষ্ট করেছে, দুর্ভাগ্যবশত সেই মনোভাবের জের বিংশ শতাব্দীতে চলছিল।

১৯৬৩ সালে আফ্রিকার দেশগুলি মিলিত হয়ে Organisation of African Unity তৈরি করে। মূল অফিস হয় ইথিওপিয়ার রাজধানী Addis Ababa-তে। আফ্রিকার দেশগুলিকে তাদের মুক্তি আন্দোলনে বিভিন্নভাবে সাহায্য করা এই সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। OAU তার ‘Liberation Committee’-র বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাহায্য করেছিল।

১৪.১৩ ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম

ভৌগোলিক কারণে ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মিল থাকায় আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনে ভারতবর্ষ নীরব দর্শক ছিল না। আফ্রিকার ব্যাপারে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতাদের ঔৎসুক্য বহু পুরানো। মুসোলিনী ইথিওপিয়া আক্রমণ করলে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে) ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে তার নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশজুড়ে Abbysinia Day (ইথিওপিয়ার পুরানো নাম) পালিত হয়েছিল। আফ্রিকার অনেক দেশে ভারতীয় বংশদ্ভুত অনেকে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে আছে। তাদের সংখ্যা প্রচুর। সাংস্কৃতিক ও আবেগজনিত কারণে তারা এখনো দুঃসময়ে ভারতের দিকে তাকায়। তাছাড়া জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক হাতে খড়ি দিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় দুই দশক ছিলেন। নীতিগতভাবে ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সাহায্য করবে— এটাই স্বাভাবিক। আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পর্তুগালের সঙ্গে ভারতের বিবাদ গোয়া দখল নিয়ে। আফ্রিকার পর্তুগালের অত্যাচারীর ভূমিকা সেই বিবাদকে নতুন মাত্রা দিল। ভারতের সঙ্গে পর্তুগালের বহুদিন কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গেও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। কমনওয়েলথ্-এর সমাবেশে, রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে এবং সমস্ত আন্তর্জাতিক সমাবেশে ভারতীয় প্রতিনিধিরা দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারি নীতির বিপক্ষে সোচ্চার ছিল। আফ্রিকার নেতারা বিভিন্ন ব্যাপারে ভারতবর্ষের সাহায্যের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন।

বর্তমান আফ্রিকার একটি রঙ্গীন মানচিত্র দেওয়া প্রয়োজন। মানচিত্রে আফ্রিকার সমস্ত দেশগুলির নাম ও রাজধানীর নাম থাকলে ভাল হয়। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলি থাকলেও ভাল হয়—সাহারা, কালাহারি, নীলনদ, লেক ভিক্টোরিয়া ইত্যাদি।

১৪.১৪ অনুশীলনী

১. আফ্রিকার জাতীয়তাবোধ উন্মেষের ব্যাপারে কি কি ধারণা বা ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল?

২. একদিকে ইংরেজ ও ফরাসী উপনিবেশ অন্যদিকে পর্তুগালের কর্তৃত্বাধীনে কয়েকটি দেশ—এই দুয়ের প্রশাসনিক ব্যাপারে পার্থক্য ও মুক্তি আন্দোলনে চরিত্রগত পার্থক্য সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লিখুন।

৩. দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিযুদ্ধের চরিত্রগত পার্থক্য, আন্দোলনের বিবর্তন এবং অবশেষে সংখ্যা গরিষ্ঠদের বিজয় সম্পর্ক একটি নিবন্ধ লিখুন।

৪. নামিবিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে যাহা জানেন লিখুন। ওখনকার মুক্তি আন্দোলন আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলের আন্দোলন থেকে পৃথক কেন?

৫. আফ্রিকার দেশগুলির স্বাধীনতা সংগ্রামে আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির ভূমিকা কি ছিল?

৬. জিম্বাবোয়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য কি?

৭. আফ্রিকার খ্রীষ্টানদের এক অংশ কেন নিজস্ব চার্চ তৈরী করলেন? সেই আফ্রিকান চার্চগুলির বৈশিষ্ট্য কি ছিল?

৮. আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবর্ষের ভূমিকা কি ছিল?

৯. টীকা লিখুন ঃ

(ক) Negritude

(খ) Langston Hughes

(গ) Leopold Senghor

(ঘ) Pan African Congress

(ঙ) Atlantic Charter

(চ) Albert Luthuli

(ছ) Kwame Nkrumah

(জ) lan Smith

(ঝ) African National Congress

(ঞ) Battle of Adowa

(ট) Bantustan Policy.

(১-৫ প্রশ্নগুলির উত্তর অপেক্ষাকৃত বড় হবে। ৬-৮ অপেক্ষাকৃত ছোট।
৯ স্বভাবতঃই ছোট আকারের এগারটি উত্তর।)

১. সাব-সাহারান আফ্রিকার অবস্থান কোথায়?
(ক) আফ্রিকার উত্তর প্রান্তে
(খ) সাহারা মরুভূমির পশ্চিমে
(গ) সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে
(ঘ) সাহারা মরুভূমির পূর্ব প্রান্তে।

২. পর্তুগীজ নাবিকদের অভিযানের আগে ইউরোপের অধিবাসীরা—
(ক) উত্তর আফ্রিকা সম্পর্কে কিছুই জানত না
(খ) সাব-সাহারান আফ্রিকা সম্পর্কে কিছুই জানত না
(গ) সাব-সাহারান আফ্রিকার দু-একটি দেশ বাদে বাকীদের সম্পর্কে কিছুই জানত না
(ঘ) সমস্ত আফ্রিকা সম্বন্ধে কিছুই জানত না।

৩. বাদাম, কোকো, কফি ইত্যাদি ইউরোপ-আফ্রিকা বাণিজ্যের—
(ক) তৃতীয় অধ্যায়ের পণ্য
(খ) প্রথম অধ্যায়ের পণ্য
(গ) দ্বিতীয় অধ্যায়ের পণ্য
(ঘ) এগুলি কখনোই কোনো বাণিজ্যের পণ্য ছিল না।

৪. নীচে দুটি তালিকা আছে। প্রথমটি আফ্রিকার দেশের নামেরতালিকা, দ্বিতীয়টি ইউরোপের দেশের নামের তালিকা যারা আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। প্রথম তালিকা কার সঙ্গে মেলে দ্বিতীয় তালিকা করে সেটা দেখাও।

তালিকা-১	তালিকা-২
A মেজোম্বিক	1 ইংরেজ উপনিবেশ ছিল
B উগান্ডা	2 বেলজিয়ামের উপনিবেশ ছিল
C আইভরি কোষ্ট	3 পর্তুগালের উপনিবেশ ছিল
D কঙ্গো	4 ফ্রাসের উপনিবেশ ছিল

	A	B	C	D
(ক)	3	1	2	4
(খ)	1	3	2	4
(গ)	4	1	2	4
(ঘ)	3	1	4	2

৫. Pan-African Congress-এর প্রথম অধিবেশন হয়েছিল কোথায়?
(ক) নিউইয়র্ক
(খ) কায়রো
(গ) জেনেভা
(ঘ) লন্ডন

৬. আফ্রিকান অর্থডক্স চার্চের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

(ক) হ্যারিস

(খ) মার্কাস গার্ভে

(গ) ব্লেক ম্যাডোনা

(ঘ) এদের কেউ নয়।

৭. প্রথম তালিকায় আছে কয়েকটি আফ্রিকার দেশের পুরানো নাম। দ্বিতীয় তালিকায় আছে সেই দেশগুলির নতুন নাম। কোন নামটা কার ছিল মেলাও।

তালিকা-১	তালিকা-২
A বেচুয়ানাল্যান্ড	1 জাম্বিয়া
B নর্দান রোডেসিয়া	2 নামিবিয়া
C আপার ভল্টা	3 বটস্‌ওয়ানা
D সাউথ্ ওয়েষ্ট আফ্রিকা	4 বার্কিনা ফাসো

	A	B	C	D
(ক)	1	3	2	4
(খ)	3	1	4	2
(গ)	3	1	2	4
(ঘ)	4	2	1	3

৮. কোন সালে নেলসন ম্যান্ডেলা কারগার থেকে মুক্তি পেলেন?

(ক) ১৯৯৮

(খ) ১৯৯২

(গ) ১৯৯০

(ঘ) ১৯৯১

৯. কোন সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হোল?

(ক) ১৯৯১

(খ) ১৯৯৪

(গ) ১৯৯৭

(ঘ) ১৯৯৩

১০. কোন্ রাজনৈতিকদল কোন দেশের নীচে দেওয়া তালিকা থেকে মেলাও।

তালিকা-১	তালিকা-২
A কনভেনশন পিপ্‌লস্ পার্টি	1 সাউথ আফ্রিকা
B ইউনাইটেড ন্যাশানাল ইনডিপেন্ডেস্ পার্টি	2 নামিবিয়া

C সাউথ ওয়েস্ট আফ্রিকান পিপ্‌লস অর্গানাইজেশন 3 জাম্বিয়া

D আফ্রিকান্‌ ন্যাশনাল কংগ্রেস 4 ঘানা

	A	B	C	D
(ক)	1	2	3	4
(খ)	1	2	4	3
(গ)	4	3	1	2
(ঘ)	4	3	2	1

১১. ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল অবধি ইরিট্রিয়া কার সঙ্গে যুক্ত ছিল?

(ক) ইতালী

(খ) ইথিওপিয়া

(গ) ইংলন্ড

(ঘ) রাষ্ট্রসংঘ

১২. ইয়ান স্মিথের 'ইউনিল্যাটারেল ডিক্লারেশন অব ইন্‌ডিপেন্ডেস' কোন দেশ সমর্থন করেছিল?

(ক) শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা

(খ) রাষ্ট্রসংঘ

(গ) ইংলন্ড

(ঘ) দক্ষিণ আফ্রিকা ও পর্তুগাল

১৩. 'শার্পেভিল হত্যাকান্ড' কোন সালে হয়েছিল?

(ক) ১৯৬০

(খ) ১৯৬২

(গ) ১৯৬৬

(ঘ) ১৯৬৪

১৪. দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ শ্বেতকায় রাষ্ট্রপতি ছিলেন কে?

(ক) পি. ডব্লু. বোথা

(খ) ইয়ান স্মিথ

(গ) ডেসমন্ড টুটু

(ঘ) এফ. ডব্লু. ডি ক্লার্ক।

১৫। প্রথম তালিকায় কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম আছে। দ্বিতীয় তালিকায় কয়েকটি দেশের নাম আছে। কে কোথাকার মেলাও।

তালিকা—১	তালিকা—২
A জোমো কেনিয়াট্টা	1. টানজানিয়া
B নান্‌দি আনিকোয়ে	2. পর্তুগীজ গিনি
C জুলিয়াস নাইরোবি	3. নাইজেরিয়া
D আমিলকার কাব্রাল	4. কিনিয়া

	A	B	C	D
(ক)	4	3	2	1
(খ)	1	2	3	4
(গ)	4	3	1	2
(ঘ)	2	1	3	4

১৪.১৫ গ্রন্থপঞ্জি

1. 'A History of Africa' by J. D. Fage, Hutchinson & Co. (London), 1985
2. 'Pan-Africanism : A short Political Guide' by Colin Legum, Frederick Praeger, (New York), 1962
3. 'Nationalism in Colonial Africa' by Thomas Hodgkin, New York University Press (New York), 1969.
4. 'Long Walk to freedom : The Autobiography of Nelson Mandela' by Nelson Mandela (Little Brown).
5. 'Time Longer Than Rope' by Edward Roux, The University of Wiscondin Press, (Madison), 1996.

একক ১৫ ❑ নব্য-উপনিবেশবাদ এবং নতুন নিয়ন্ত্রণ নীতি

গঠন

১৫.১ উদ্দেশ্য
১৫.২ প্রস্তাবনা
১৫.৩ নব্য উপনিবেশবাদ ঃ সংজ্ঞা
১৫.৪ নব্য উপনিবেশবাদের প্রসার ঃ ঐতিহাসিক ধারা
১৫.৫ নব্য ঔপনিবেশিক শোষণ ঃ অর্থনৈতিক
১৫.৬ নব্য-ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ ঃ সাংস্কৃতিক
১৫.৭ সারাংশ
১৫.৮ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
১৫.৯ উত্তরমালা
১৫.১০ অনুশীলনী
১৫.১১ নির্বাচিত গ্রন্থাবলী

১৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি আপনাকে অধুনা উন্নয়নশীল, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অন্যতম আধুনিক সমস্যা, 'নব্য-উপনিবেশবাদ' সম্বন্ধে অভিহিত করবার উদ্দেশ্য রচিত হয়েছে।

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন—

- উপনিবেশবাদ এবং নব্য-উপনিবেশবাদের পার্থক্য।
- নব্য-উপনিবেশবাদের অর্থ।
- নব্য-উপনিবেশবাদের উদ্ভব, প্রসার এবং আধুনিক প্রকৃতি।
- নব্য-ঔপনিবেশিক শোষণের ধারা—অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য।
- উন্নয়নশীল বিশ্বে নব্য-ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রসার এবং দেশীয় প্রভাব এবং সংস্কৃতির ধ্বংসসাধন।

১৫.২ প্রস্তাবনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে, এশিয়া এবং আফ্রিকার বহু উপনিবেশ স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করলেও, এই দেশগুলি অর্থনৈতিক

এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এত দুর্বল থাকে যে, তাদের প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা তাদের ওপর পরোক্ষভাবে, নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এই পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বলা হয় 'নব্য-উপনিবেশবাদ' 'Neo-Colonialism'। এই এককের অন্যান্য অংশে এই নব্য-উপনিবেশবাদের সংজ্ঞা, প্রকৃতি এবং বিশ্বব্যাপী প্রসার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পড়ে আপনারা আরো জানতে পারবেন যে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া, নব্য-উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলি কীভাবে নব্য-উপনিবেশগুলির ওপর নিজেদের আচার এবং সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়, যা তাদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অন্যতম হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

১৫.৩ নব্য-উপনিবেশবাদ ঃ সংজ্ঞা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্যায়ে, বিশ্ব রাজনৈতিক মানচিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ঠাণ্ডা যুদ্ধের (Cold War) আরম্ভ এবং বিশ্ব রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের (Third World) উত্থান। ১৯৪৫-১৯৭০ সালের মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা মিলিয়ে, প্রায় ৬৬টি উপনিবেশ, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তৃতীয় বিশ্বের এই মুক্তিলাভ প্রক্রিয়াকে প্রত্যেকেই স্বাগত জানান। ঠাণ্ডা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দুই গোষ্ঠী, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এর ব্যতিক্রমী ছিল না। কিন্তু কিছু সময়ের মধ্যেই দেখা গেল যে, উপনিবেশগুলির, তাদের প্রাক্তন ঔপনিবেশিক প্রভুদের ওপর নির্ভরতা বজায় আছে, বা কোন কোন ক্ষেত্রে বেড়ে যাচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হল প্রাক্তন উপনিবেশগুলির অর্থনৈতিক দুর্বলতা। প্রধানত কৃষি পণ্য এবং কাঁচামাল যোগানকারী তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি, স্বাধীনতার পূর্বে, শিল্পদ্রব্য এবং মূলধন বা পুঁজির যোগানের জন্য মূলত, তাদেরসাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরও তাদের এই নির্ভরতা বজায় থাকে। নতুন মূলধন যোগানকারী বা ঋণদানকারী সংস্থাগুলি, যেমন বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank) বা, ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড (International Monetary Fund, I.M.F.) ছিল প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রথম বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির নিয়ন্ত্রণে। তাই এই সংস্থাগুলির মাধ্যমে ঋণদান বা বিভিন্ন প্রকল্পের সাহায্য করে, বা কখনো সরাসরিভাবে আর্থিক সাহায্য, ঋণদান, শিল্পদ্রব্য রপ্তানি ইত্যাদি ক্ষেত্রে, প্রথম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে সক্ষম হয়। এখানে মনে রাখা উচিত যে, নব্য-উপনিবেশবাদ শুধুমাত্র বিশ্বেরই নিয়ন্ত্রণ নীতি ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই ধরণের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। পরবর্তীকালে অনেক জায়গায় সরাসরি বাহিনী পাঠিয়ে, এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। তবে এ কথা স্বীকার্য যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনায়, প্রথম বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত, নব্য-উপনিবেশবাদ ছিল আরো ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। তাই, নব্য উপনিবেশবাদ বলতে আমরা মূলত, প্রথম বিশ্ব-নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির কথাই আলোচনা করব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্যায়ে তৃতীয় বিশ্বের উত্থান এবং নব্য-উপনিবেশবাদ সমস্যা প্রকট হলে সমাজ বিজ্ঞানীদের (Social Scientists) বিভিন্ন গোষ্ঠী এর সংজ্ঞা নিরূপণ, ব্যাখ্যা এবং এর প্রতিকারের উপায় সন্ধানে সচেষ্ট হন। এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল 'নব্য' মার্কসীয় (Neo-Marxist) গোষ্ঠীর। রাজনৈতিক বিজ্ঞান এবং আন্তর্দেশীয় সম্পর্ক আলোচনায় এই গোষ্ঠীভুক্ত পণ্ডিতরা মার্কসীয় তত্ত্ব প্রয়োগ করে, একটি নতুন ধারার উদ্ভব ঘটাতে সক্ষম হন। নব্য-মার্কসীয় গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য ছিল, বিশ্ব রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের

দেশগুলির ওপর প্রথম বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দেখানো। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে, তাঁরা একটি নতুন তত্ত্ব প্রয়োগ করেন, যার নাম 'নির্ভরতা তত্ত্ব' (Dependency Theory)। নব-মার্কসীয় মতে তৃতীয় বিশ্বের, প্রথম বিশ্বের ওপর এই নির্ভরতার পেছনে রয়েছে, অন্তর্দেশীয় সম্পর্কের কিছু কাঠামোগত (Structural) ত্রুটি। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, প্রথম বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিকে 'কেন্দ্র' (Centre) হিসাবে অভিহিত করা হয়। অপরদিকে, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলি হলো 'প্রান্তিক' (Periphery) অঞ্চল।

তৃতীয় বিশ্বের 'প্রান্তিক' রাষ্ট্রগুলি, একদা উপনিবেশ হিসেবে 'কেন্দ্রীয়' সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে কৃষি পণ্য এবং শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের যোগান দিয়ে এসেছে। পরিবর্তে, তারা অনেক অধিক দামে শিল্পদ্রব্য এবং ঋণ করতে বাধ্য হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, 'প্রান্তিক' দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করলেও, তাদের অর্থনৈতিক নির্ভরতা কোন অংশে কমেনি। নব্য-মার্কসীয় মতে, অন্তর্দেশীয় সম্পর্কে কাঠামোগত (Structural) পরিবর্তন না ঘটলে এই শোষণ অব্যাহত থাকবে। নব্য-মার্কসীয় 'নির্ভরতা তত্ত্ব' আরো সহজ করে বোঝানোর জন্য নিচে একটি সূত্র দেওয়া হলো।

'নির্ভরতা তত্ত্ব'—সাম্রাজ্যবাদ—প্রথম বিশ্ব এবং তৃতীয় বিশ্বের সম্পর্ক নব্য-মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সঙ্গী করে, অনেক সমাজ বিজ্ঞানী তৃতীয় বিশ্বের এই আধুনিক সমস্যা নিয়ে লিখতে শুরু করেন। এই লেখককুলের মধ্যে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক এবং তাঁদের রচিত গ্রন্থের নাম দেওয়া হলো।

১। ফ্রানজ্ ফ্যানন্—'এই বিশ্বের হতভাগ্যরা'।
Frantz Fanon—'The Wretched of the Earth'.

২। কোয়ামে নক্রুমা—'নব্য-উপনিবেশবাদ-সাম্রাজ্যবাদের শেষ অধ্যায়'।
Kwame Nkruma—Neo-colonialism-the last stage of Imperialism.

৩। ওয়াল্টার রডনী—'ইউরোপ কিভাবে আফ্রিকাকে অনুন্নত করেছে'।
Walter Rodney—'How Europe Underdeveloped Africa'.

এই লেখককুলের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলেন ঘানার রাষ্ট্রপতি এবং আফ্রিকার এককালীন ঐক্য আন্দোলনের নেতা, কোয়ামে নক্রুমা। নক্রুমার নব্য-উপনিবেশবাদের ওপর লেখা গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে। এই গ্রন্থে, নক্রুমা দেখিয়েছেন যে কিভাবেনব্য-উপনিবেশবাদকে কেন্দ্র করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় দেশগুলি আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। নক্রুমার মতে, "আজকের নব্য-উপনিবেশবাদ হলো সাম্রাজ্যবাদের শেষ এবংবোধ হয় সবথেকে বিপজ্জনক অধ্যায়"—(''The noe-colonialism of today represents imperialism in its final and perhaps its most dangerous stage''). কোয়ামে নক্রুমা 'নিও কলোনিয়ালিজম ঃ দ্য লাস্ট স্টেজ অফ ইম্পিরিয়ালিজম'। (পৃঃ IX), নেলসন পাবলির্শাস। ১৯৬৫, (Kwame Nkrumah—'Neo-colonialism : The last stage of Imperialism (Pg. IX). Nelson Pub. 1965)

নক্রুমাও নব্য-উপনিবেশবাদ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রধানত, তৃতীয় বিশ্বে অবস্থিত দেশগুলির অর্থনৈতিক নির্ভরতা এবং দুর্দশার কথা লিখেছেন। অর্থনৈতিক শোষণ নব্য-উপনিবেশবাদের প্রধান প্রকৃতি হলেও অন্যান্য লেখকরা, অন্য কিছু বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক, জাঁ পল সার্ত্র (Jan Paul Sarte) যেমন দেখিয়েছেন যে, ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রভাবে কীভাবে বিভিন্ন দেশীয় সংস্কৃতি

এবং লোকসংস্কৃতি ধীরে ধীরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে অন্য অনেক লেখক এই ধরনের সাংস্কৃতির সাম্রাজ্যবাদ (Cultural Imperialism) সম্বন্ধে লিখেছেন। সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা, ১৫.৬ অংশে করা হয়েছে।

প্রশ্নাবলী ঃ

১। নব্য-সাম্রাজ্যবাদ বলতে কী বোঝেন?

১৫.৪ নব্য উপনিবেশবাদের প্রসার—ঐতিহাসিক ধারা

নব্য-উপনিবেশবাদ কথাটির প্রথম ব্যবহার দেখা যায় 'নিউ স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায়, ১৯৬১ সালে। ১৯৬০ এবং ১৯৭০ দশকে, এই তত্ত্বের ব্যবহার সমাজ বিজ্ঞানী মহলে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আরো দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু নব্য-উপনিবেশবাদের উত্থান, আরো আগে, বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই লক্ষ্য করা যায়। এই নীতির প্রধান উদ্ভাবক ছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি নিজেদের মধ্যে রেষারেষির ফলে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সংঘাতের দিকে এগিয়ে চলেছে, তখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবর্তিত এই নীতি লক্ষ্য করা যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সরাসরি সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী তীব্র সমালোচনাও করে। কিন্তু তার পরিবর্তে মার্কিন সরকার, আর্থিক অনুদান ও সামরিক সাহায্যের মাধ্যমে দক্ষিণ আমেরিকা এবং কিউবার ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে সচেষ্ট হয়। এই নীতিই পরবর্তীকালে আরো ব্যাপকভাবে নব্য-উপনিবেশবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

নব্য-উপনিবেশবাদের প্রথম প্রয়োগ আমরা কিউবায় দেখতে পাই। ১৮৯৯ পর্যন্ত কিউবা স্পেনের উপনিবেশ ছিল। ১৮৯৯ সালে স্বাধীনতা লাভ করলেও অমিত শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার ওপর অধিকার বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়। ১৯০২ সালে এই নব্য-সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন কিছুটা প্রতিহত হলেও, ১৯০৯ সাল থেকে মার্কিন আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কিউবায় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সফল হওয়া পর্যন্ত বজায় থাকে।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য অনেক দেশেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। ১৯০৩ সালে পানামার নবনিযুক্ত স্বাধীন সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তির মাধ্যমে মার্কিন সরকার, গুরুত্বপূর্ণ পানামা খাঁড়ির (Panama Canel) ওপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। অর্থনৈতিক অনুদানের মাধ্যমে, লাতিন আমেরিকার অন্য দেশের যেমন ডোমিনিক প্রজাতন্ত্র, ব্রাজিল, হাইতি দ্বীপপুঞ্জ, আর্জেন্টিনা এবং চিলি প্রভৃতির ওপর মার্কিন নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়।

১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশক পর্যন্ত অবশ্য নব্য-উপনিবেশবাদ সেভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি এবং মূলত দক্ষিণ আমেরিকায় মার্কিন আধিপত্য বিস্তার নীতিতেই আবদ্ধ ছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কিন্তু, এই ধারা আরো ব্যাপক আকারে, বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। এই বিস্তারের পেছনে মূল কারণ ছিলো দুটি—(১) তৃতীয় বিশ্বের উত্থান এবং (২) ঠান্ডা যুদ্ধ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবার ফলে, যুদ্ধ শেষে দেখা যায় যে ইউরোপীয় দেশগুলি যাদের অধিকাংশ

ছিল সাম্রাজ্যবাদী তারা অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য দুর্বলতার ফলে তাদের উপনিবেশগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলো। এছাড়া, এই সময় উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা তীব্র হয়ে উঠেছিলো। এর ফলে, এশিয়া এবং আফ্রিকা সহ দেশের বিভিন্ন উপনিবেশগুলি স্বাধীন হয়ে উঠেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি সাম্রাজ্যবাদ নীতির বিরোধী ছিলো। তাই তৃতীয় বিশ্বের স্বাধীনতার আন্দোলন তাদের সমর্থন লাভ করে। কিন্তু অপরদিকে, ১৯৪৫-এর পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্ব-রাজনীতিতে নিজেকে আরো ব্যাপকভাবে অংশীদার করতে শুরু করে।

বিশ্ব রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার এই তাগিদ প্রধানত দেখা দেয় ঠাণ্ডা যুদ্ধ উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতার লড়াইয়ের মূল রঙ্গাভূমি হয়ে ওঠে, ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশ। পূর্ব ইউরোপ, সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজের আধিপত্য বিস্তার করলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, পশ্চিম ইউরোপে নিজের আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়। এবং এই আধিপত্য বিস্তারের প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে ঋণ এবং অন্যান্য আর্থিক অনুদান। দেশীয় পর্যায়ে ঋণদান ছাড়া, নতুন গঠিত প্রতিষ্ঠান, যেমন—বিশ্বব্যাঙ্ক বা ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড ছিলো প্রধানত মার্কিন মূলধন নিয়ে গঠিত। পশ্চিম ইউরোপে আধিপত্য বিস্তার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, একদা ইউরোপীয় উপনিবেশগুলিতেও নিজেদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়। এর একটি কারণ ছিলো এশিয়া এবং আফ্রিকার কাঁচামাল রপ্তানী এবং বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ। অপর কারণ ছিলো, সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা বা উন্নয়নের পথে। বাধা সৃষ্টি করা, যাতে এই দেশগুলির ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্য না বিস্তার পায়।

নব্য সাম্রাজ্যবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে, পরোক্ষভাবে বা প্রধানত অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বিকশিত হলেও ঠাণ্ডা যুদ্ধের পটভূমিকায় 'শক্তি-রাজনীতি' বা 'Power Politics', সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলা সম্ভব ছিল না। নিজেদের অর্থনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত করবার লক্ষ্যে প্রয়োজন মতন সামরিক শক্তিরও ব্যবহার করা হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। জাপানে মার্কিন সামরিক অবস্থান অব্যাহত থাকে। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী সরে যাওয়ার পর ভারত মহাসাগরে, দিওগো গার্সিয়া (Diego Garcia) দ্বীপে, মার্কিন সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এশিয়ার অন্যান্য দেশে, যেমন—ফিলিপিনসে ১৯৪৬ সালে স্বাধীনতা লাভের পর মার্কিন সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিম এশিয়াতে নব্য-উপনিবেশবাদের মূল লক্ষ্য হয় এই অঞ্চলে তেল এবং অন্যান্য খনিজ সম্পদ। এইখানেও, মার্কিন সৈন্য ঘাঁটি কিছু কিছু অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়। আফ্রিকার বহু দেশে মার্কিন অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারিত হয়। সামরিক ঘাঁটি ছাড়া বহু জায়গায় স্বৈরতান্ত্রিক সরকার মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হয়।

১৫.৫ নব্য-ঔপনিবেশিক শোষণ ঃ অর্থনৈতিক

নব্য-ঔপনিবেশিক শোষণের অন্যতম ধারা হলো অর্থনৈতিক শোষণ। এই অংশে আমরা এই অর্থনৈতিক শোষণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

নব্য-ঔপনিবেশিক নীতির সরাসরি অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হলো ঋণ এবং আর্থিক অনুদান। সরাসরি দেশীয় ভিত্তিতে ঋণদান এবং অনুদান ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিতে বিশ্বব্যাঙ্ক বা আই.এম.এফ.—এই ঋণ বা

অনুদান প্রকল্পগুলি চালিত হয়। ঋণগ্রহণকারী তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে দুটি আবশ্যিক শর্ত পালন করতে হতো। প্রথমটি হলো সমাজতান্ত্রিক মডেল না মেনে, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে উন্নয়নের এই মডেলটি দ্রুতহারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। অধিকাংশ লভ্যাংশ পুঁজিবাদের হাতে গচ্ছিত থাকছে, জনসাধারণ তার সুফল ভোগ করছে না। উদাহরণ স্বরূপ আমরা ব্রেজিলের কথা এখানে বলতে পারি। ১৯৬০ দশকের শুরুতে, ব্রেজিল বিশ্বের অন্যতম ঋণী রাষ্ট্র হয়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বের কাছ থেকে অবাধে ঋণগ্রহণ করা সত্ত্বেও কিন্তু, ব্রেজিলের অর্থনীতি দ্রুতহারে বিকশিত হয়নি। অধিকাংশ বিনিয়োগ ঘটে ভোগ্যপণ্য শিল্পে, ভারী শিল্প বা পরিকাঠামোয় নয়। তাই প্রচুর ঋণ গ্রহণ করা সত্ত্বেও ব্রেজিলের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো দুর্বল হয়েই থাকে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হলো নব্য-ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আরো বৃদ্ধি পাওয়া। ব্রেজিলের মত উদাহরণ, এশিয়া এবং আফ্রিকার আরো অনেক দেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন প্রকল্পে ঋণ এবং অন্যান্য অনুদান যে আসলে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম হাতিয়ার সেটা ১৯৫৬ সালের সুয়েজ সংকটের ঘটনায় পরিষ্কার হয়ে যায়। মিশরের রাষ্ট্রপতি নাসের, প্রথম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাহায্যে মাধ্যমে, নীল নদের ওপর আসওয়ান (Aswan) বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প শুরু করলেও, অচিরেই সাহায্যকারী দেশগুলির সঙ্গে নাসেরের বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধের মূল কারণ ছিলো, নাসের দ্বারা, সোভিয়েত সমর্থিত দ্বিতীয় বিশ্ব গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং অস্ত্র ক্রয়কে কেন্দ্র করে। নাসেরের এই নীতির বিরোধিতা করে, সাহায্যকারী গোষ্ঠী (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন এবং বিশ্বব্যাঙ্ক)। আসওয়ান প্রকল্পে সাহায্য অনুদান বন্ধ করে দেয়। এর জবাবে নাসের সুয়েজ খাঁড়ির জাতীয়করণ করলে, সুয়েজ সংকট দেখা দেয়।

১৯৫০ দশকের সুয়েজ সংকট, এটা পরিষ্কার করে দেয় যে, প্রথম বিশ্বের দ্বারা তৃতীয় বিশ্বকে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ এবং অনুদান বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই, পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হবে এবং এই নিয়ন্ত্রণ নীতি আবার ছিলো ঠাণ্ডা যুদ্ধের মানসিকতা দ্বারা প্রভাবিত।

ঋণ এবং অনুদানের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন সম্বন্ধে প্রথম বিশ্বের যে অর্থনীতিবিদরা জোরদার সওয়াল করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডব্লিউ. ডব্লিউ. রস্‌টো (W. W. Rostou) ১৯৬০ সালে প্রকাশিত তার বিখ্যাত গ্রন্থে 'দ্য স্টেজেস অফ ইকনমিক গ্রোথ ঃ এ নন কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো'। (The Stages of Economic Growth : A Non-Communist Manifesto)। রস্‌টো লেখেন যে একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতি যদি সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ এবং অনুদান লাভ করে এবং তার সদ্-ব্যবহার করতেসক্ষম হয় তবে সেই অর্থনীতি দ্রুতহারে উন্নত হতে সক্ষম। প্রথম বিশ্বের তৎকালীন অনেক সরকারেরকাছে, রস্‌টোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে এবং ১৯৬০-র দশকে, এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশে এই নীতি অনুসারে, ঋণ দান শুরু হয়।

রস্‌টোর এই মডেল অবশ্য, তৃতীয় বিশ্বে আশানুরূপ উন্নয়ন আনতে ব্যর্থ হয়। সামান্য যা উন্নয়ন ঘটে, তার ফল তৃতীয় বিশ্বে অবস্থিত সমাজের উচ্চবর্গ ভোগ করে। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্গের সেরকম কোন অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটেনি। এছাড়া, ক্রমাগত ঋণ এবং অনুদান গ্রহণ করার ফলে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশগুলি ঋণজালে (Debt trap) জড়িয়ে যায় ; যার ফলে আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংকট

দেখা দেয়। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির ওপর মার্কিন নিয়ন্ত্রণের কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৯৫০-১৯৮০'র মধ্যে ক্রমবর্ধমান মার্কিন আধিপত্যের ফলে, দক্ষিণ আমেরিকার আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। ব্রেজিলের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এছাড়া আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, পেরু, মেক্সিকো, চিলি, কলম্পিয়া, পানামা প্রভৃতি দেশগুলিও মার্কিন অর্থনৈতিক এবং সামরিক আধিপত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ঋণ এবং অনুদান, দক্ষিণ আমেরিকার মূল সমস্যাগুলি দূরকরতে অসফল হয়। কোনপ্রকার বিপ্লব ঠেকানোর লক্ষ্যে দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশেই, মার্কিন সরকার, প্রতিক্রিয়াশীল, সামরিক শাসন বা একনায়কতন্ত্র সমর্থন করে। এরফলে, প্রকৃত উন্নয়ন কর্ম ব্যাহত হয়। ঋণ এবং আর্থিক অনুদানের ফলে এশীয় এবং আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিও দ্রুত ঋণজালে আবন্ধ হয়ে পড়ে।

নব্য-ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণের আরেকটি মাত্রা হলো বহুজাতিক কোম্পানীগুলির অবাধ প্রবেশ। বহুজাতিক সংস্থাগুলি তাদের প্রচুর মূলধন এবং উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে দেশীয় সংস্থাগুলিকে বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় অবাধে হারিয়ে দিতে সক্ষম হয়। এর পরবর্তী ধাপে তারা দেশীয় সংস্থাগুলিকে অপেক্ষাকৃত কম দামে কিনে নিতে সক্ষম হয় এবং দেশীয় বাজারের উপর, একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে পুঁজিপতিদের বিনিয়োগের অন্যতম লক্ষ্য হল, যথাসম্ভব মুনাফা বৃদ্ধি করা এবং বাজারের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ। এই মুনাফা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। একটি উদাহরণ দিলে, এই মুনাফার পরিমাণ সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। ১৯৫০-১৯৫১ এর মধ্যে আফ্রিকায় মার্কিন বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ছিলো প্রায় ৪৫০০ মিলিয়ান ডলার। এই বিনিয়োগের থেকে মুনাফা বা লাভের পরিমাণ হয় প্রায় ৮,৩০০ মিলিয়ন ডলার। একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছাড়া, এই পরিমাণ মুনাফা সম্ভবপর ছিলো না। মার্কিনী বহুজাতিক সংস্থাগুলি তাদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ জারী করে দেশীয় অর্থনৈতিক নীতি অনেকটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।

বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে, শেষ পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশীয় সরকারের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা হয়। এটাই নব্য-ঔপনিবেশিক দেশগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়। কোন কোন দেশে সরকার শেষ পর্যন্ত নব্য-সাম্রাজ্যবাদী দেশের ক্রীড়নকে পরিণত হয়। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারকে প্রথম বিশ্বের সমর্থন-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অন্যান্য ক্ষেত্রে এতটা সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে দেশীয় সরকারকে বাধ্য করা হয় এমন নীতি প্রয়োগ করতে যাতে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বা বহুজাতিক সংস্থাগুলির সুবিধা হয়। শেষ পর্যন্ত, তৃতীয় বিশ্বের এই নির্ভরতা হয়ে ওঠে অন্তহীন। যতদিন এই নির্ভরতা বজায় থাকে, ততদিন তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক দুর্বলতা বজায় থাকা অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয় বিশ্বের ওপর এই অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের একটিগুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ ফল হলো, দেশীয় কৃষি ব্যবস্থা এবং পরিকল্পনাগুলি চাপিয়ে দেবার ফলে, দেশীয় অর্থনীতি, তার স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে ফেলে। পুঁজি নির্ভর পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তিগ্রহণ করার ফলে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা প্রথম থেকেই সীমিত হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদী পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে, কর্মসংকোচন দেখা দেয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা, নতুন কর্মের সৃষ্টি বেশী করতে পারে না। যার ফলে জনসাধারণের একটা বৃহৎ অংশ উন্নয়নের কোন সুফল ভোগ করে না।

একদিকে নতুন প্রকল্পগুলি বেশি মাত্রায় কর্মের চাহিদা বৃদ্ধি করতে পারেনা অপর দিকে পুঁজিবাদী নীতি এবং বহুজাতিক অনুপ্রবেশ চিরাচরিত কর্মের উৎসগুলিতেও চরম আঘাত হানে। তৃতীয় বিশ্বের কৃষিক্ষেত্রে যেমন,

১৯৬০ দশকে 'সবুজ বিপ্লব' (Green Revolution) ঘটাবার একটি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এই পরিকল্পনা ছিলো পুরোপুরি পুঁজি নির্ভর। তাই উচ্চফলনের এই পরিকল্পনা দেশীয়কৃষি ক্ষেত্রে স্বল্প সংখ্যক ধনী কৃষককুলের পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দরিদ্র কৃষকেরপক্ষে এই পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভবপর হয়নি। অপরদিকে, কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদী পরিকল্পনা আগমনের ফলে, বহু ধনী কৃষক, খাদ্যশস্যের পরিবর্তে অর্থকারী ফসল উৎপাদন শুরু করে। এর ফলে নিম্নশ্রেণির খাদ্যশস্য উৎপাদন কমে যায়। যেহেতু ভারতবর্ষসহ বহু তৃতীয় বিশ্বের দেশেরসাধারণ গ্রামীণ জনসাধারণের কাছে এই ধরনের খাদ্যশস্যই হলো জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন, এক বিরাট শ্রেণির কাছে খাদ্য শস্যর অপ্রতুলতা প্রধান হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে শিল্প ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগ এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলির আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্পে সংকোচন শুরু হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন কুটীর শিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় যার ফলে অর্থনৈতিক সংকট আরো বৃদ্ধি পায়।

সব মিলিয়ে, নব্য-উপনিবেশবাদের মূল শোষণের ধারা হলো অর্থনৈতিক শোষণ। আমাদের এই গ্রন্থের নির্দিষ্ট সময়সীমা অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের পরও কিন্তু এই ধারা অব্যাহত। ১৯৯০ সালে ঠাণ্ডা যুদ্ধ সমাপ্তির পর বিশ্ব অর্থনীতিতে যে বিশ্বায়ণ ঘটেছে, তার মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন মাত্রায় নব্য-উপনিবেশবাদ লুকিয়ে আছে। প্রথম বিশ্ব তৃতীয় বিশ্ব দ্বন্দ্ব আজকের সময়ে রূপ নিয়েছে, 'উত্তর' (North) এবং 'দক্ষিণ' (South)-এর দ্বন্দ্বে।

প্রথম বিশ্ব প্রভাবিত এই অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে, ১৯৬০'র দশক থেকেই তৃতীয় বিশ্বের প্রতিবাদ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এর আগেই ১৯৫৫ সালে বান্দুং সম্মেলন, ১৯৬১ সালে নির্জোট আন্দোলন শুরু হলে, তৃতীয় বিশ্বরাজনীতির মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করতে শুরু করেছিলো। ১৯৬০-র দশকে ঋণ এবং অনুদানের বিরোধিতা করে, তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি বিশ্ব অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন দাবী করতে শুরু করে। তৃতীয় বিশ্বের এই আন্দোলনের মূল রঙ্গমঞ্চও হয়ে ওঠে, রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন অধিবেশন। নতুন অর্থনৈতিক কাঠামোর দাবী সর্বপ্রথম করা হয় ১৯৬২ সালে, রাষ্ট্রসংঘ পরিচালিত, বাণিজ্য এবং উন্নয়ন সম্বন্ধীয় আলোচনা সভায় (United Nations Conference on Trade and Development, U.N.C.T.D.A)-এর পরে। ১৯৬৮ সালে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনে, পুনরায় ওই দাবী তোলা হয়। তৃতীয় বিশ্বের নতুন অর্থনৈতিক অধিকারের দাবী সরাসরিভাবে গৃহীত না হলেও, এই প্রতিরোধের ফলে, প্রথম বিশ্ব, তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কর কিছু পরিবর্তন আনতে শুরু করে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক যেমন, ইন্টারন্যাশন্যাল ডেভেলপ্মেন্ট এজেন্সি (International Development Agency)-নামক একটি নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করে, যেটি অপেক্ষাকৃত কম সুদে তৃতীয় বিশ্বকে ঋণ দিতে শুরু করে। এছাড়া, গঠিত ইউরোপীয়ান ইকনমিক কমিউনিটি (Economic Community, EEC) সুবিধাজনক শর্তে, আফ্রিকায় অবস্থিত বহু দেশকে, অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে শুরু করে। ১৯৭৪ সালে, লোম্ (Lome) শহরে গৃহীত একটি চুক্তি দ্বারা, ইউরোপীয়ান ইকনমিক কমিউনিটি এবং এ. সি. পি. (African, Carithean and Pacific, ACP) অর্থাৎ আফ্রিকা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে অবস্থিত ৪৬ দেশের মধ্যে পাঁচ বছর মেয়াদী অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই চুক্তি ১৯৭৯ সালে পুনরায় স্বাক্ষরিত হয়। লোম্ চুক্তির ফলে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির কিছু উন্নয়ন হলেও এর ফলে তৃতীয় বিশ্বের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়।

প্রথম বিশ্বের ওপর নির্ভরশীলতা কম করার লক্ষ্যে UNCTAO'র চতুর্থ সম্মেলন, আফ্রিকার নাইরোবি

শহরে, ১৯৭৬ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে এবং ১৯৭৯ সালে, ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত পঞ্চম সম্মেলনে, তৃতীয় বিশ্ব এবং প্রথম বিশ্বেরদ্বন্দ্ব জোরদার হয়ে ওঠে। এই দ্বন্দ্বকে আরো প্রকট করে তোলে ১৯৭০'র দশকে ওপেক (OPEC, Organisation of Petroleum Exporting Countries) গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি, খনিজ তেলের দাম বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে। ওপেকের এই সিদ্ধান্ত, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি সমর্থন করলেও প্রথম বিশ্বের তুলনায়, তারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্তহয়। এছাড়া, এর ফলে তৃতীয় বিশ্বের ভাঙন লক্ষনীয় হয়ে ওঠে, যার ফলে জোটবদ্ধ আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯৮০ দশকে, দ্বিতীয় বিশ্বের দুর্বল হয়ে ওঠা এবং অবশেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন বিশ্ব রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই পালা বদলের ফলে, নব্য-উপনিবেশবাদের প্রকৃতিতে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক কাঠামোর, প্রথম বিশ্বের (যা এখন 'উত্তর' গোষ্ঠী বলে অধিক পরিচিত) নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত। তবে এই নিয়ন্ত্রণ এখন সরকারী ঋণদানের মাধ্যমে না হয়ে, আন্তর্জাতিক আর্থিক সংগঠনগুলি এবং বহুজাতিক সংগঠনগুলি দ্বারা, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে বহু 'দক্ষিণ' গোষ্ঠীভুক্ত দেশ বিশ্বব্যাঙ্ক দ্বারা 'উন্নয়ন মডেল' গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এই মডেলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও খরচ কমানো এবং বেসরকারিকরণের মাধ্যমে, বেসরকারি (দেশী ও বিদেশী) পুঁজি বিনিয়োগ।

এর ফলে, দক্ষিণ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির ওপর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত আছে। পুঁজি বিনিয়োগ সম্বন্ধীয় অনিশ্চয়তা অনেক ক্ষেত্রেই আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে আনছে। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির ১৯৯৭ সালের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং দক্ষিণ আমেরিকায়, আর্জেন্টিনায়, অর্থনৈতিক দুরবস্থা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১৫.৬ নব্য-ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ ঃ সংস্কৃতি

আগের অংশ পড়ে আপনারা জেনেছেন যে, নব্য-ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণের মূল প্রকৃতি হলো বিভিন্ন মাত্রায় অর্থনৈতিক শোষণ এবং নিয়ন্ত্রণ। আপনারা এও জেনেছেন যে, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর বিশ্বে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর ছিলো না বলেই এই পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের উদ্ভব হয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও, নব্য-উপনিবেশবাদের প্রকৃত ধারা গোপন রাখা প্রয়োজনীয় ছিলো। এবং এই প্রয়োজন থেকেই শেষ পর্যন্ত জন্ম নেয় সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

নব্য-উপনিবেশবাদের প্রকৃত চেহারা গোপন রাখার প্রধান দায়িত্ব নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রথম বিশ্বের অন্যান্য দেশ নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম। বিশ্বের বৃহত্তম সংবাদ মাধ্যমগুলি, যাদের প্রচার বিশ্বস্ত এবং সঠিক হিসেবে গ্রহণযোগ্য, যেমন ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন বা বি.বি.সি. (B.B.C.), ভয়েস অফ্ আমেরিকা (Voice of America) বা সি.এন.এন. (C.N.N.) প্রভৃতি, কিন্তু প্রথম বিশ্বের আদর্শগত চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়। ঠান্ডাযুদ্ধ চলাকালীন এই সংবাদ মাধ্যম এবং সংবাদপত্রগুলি পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনায় মুখর ছিলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থিত এশীয় বা আফ্রিকার, স্বৈরাচারী শক্তিগুলির ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি এদের সংবাদের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠত। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমী ইউরোপীয় সমর্থিত নব্য-উপনিবেশবাদ সম্বন্ধে এরা বেশিরভাগ সময়ে নীরবতা পালন করে।

নিয়ন্ত্রিত সংবাদ ছাড়া, প্রথম বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বের ওপর নিজস্ব সংস্কৃতি আরোপ করতে চেষ্টা করে। এক্ষেত্রেও, প্রচার মাধ্যমের গুরুত্ব অপরিসীম। কোয়ামে নক্রুমা, তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে কিভাবে হলিউডের তৈরী মার্কিনী চলচ্চিত্র, তৃতীয় বিশ্বের যুবক, এবং কিশোর গোষ্ঠীকে প্রথম বিশ্বের আদর্শগত ধারার সঙ্গে একাত্ম করে দেয়। আধুনিক প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতির সাহায্যে, এই প্রচার মাধ্যমের ক্ষমতা আরো ব্যাপক হয়ে উঠেছে। তৃতীয় বিশ্বে, রেডিও টেলিভিশন এবং আধুনিক ইন্টারনেটের সাহায্যে, পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রসার আরো ব্যাপক হয়ে উঠেছে। এই সংস্কৃতির প্রভাব আর শুধু কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে নেই। আদর্শগত পরিবর্তন ছাড়া, নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা আমাদের দেখাচ্ছে যে, খাদ্যবস্তু, বেশ-ভূষা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রভাবের ফলে, দেশীয় সংস্কৃতি, বিভিন্ন লোকাচার আজ অবলুপ্তির পথে। এছাড়া পশ্চিমী সংস্কৃতি, প্রথম বিশ্বের উজ্জ্বল দিকটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়। এর প্রভাবে তৃতীয় বিশ্বের জনগণ, প্রথম বিশ্বের চিন্তাধারা এবং আদর্শের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতে শুরু করে। নব্য-ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তারা বিস্মৃত হয়। এর ফলে, নব্য-ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ আরো সহজ হয়ে ওঠে।

নব্য-ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ অবশ্য একচেটিয়া সাফল্য লাভ করতে পারেনি। তৃতীয় বিশ্বে, নব্য-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বহু জায়গায় জনমত সংগঠিত হয়েছে, নব্য-উপনিবেশবাদ আদর্শগতভাবেও মোকাবিলা করবার প্রচেষ্টা হয়েছে। এই আদর্শগত বিরোধের অন্যতম দুটি কেন্দ্রবিন্দু হলো তৃতীয় বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এবং নির্জোট আন্দোলন। পরবর্তী এককে আপনারা নির্জোট আন্দোলন সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

১৫.৭ সারাংশ

তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত প্রাক্তন উপনিবেশগুলি ১৯৪৫ সালের পর স্বাধীনতা লাভ করলেও নব্য-উপনিবেশবাদ তাদের সামনে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে।

নব্য-উপনিবেশবাদ বলতে আমরা পরোক্ষভাবে, প্রথম বিশ্বের দেশগুলির দ্বারা তৃতীয় বিশ্বের ওপর নিয়ন্ত্রণের কথা বলি। এই নিয়ন্ত্রণের প্রধান হলো, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক।

নব্য-উপনিবেশবাদের প্রথম প্রসার দেখা যায় দক্ষিণ আমেরিকায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে, মার্কিন আধিপত্য বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অনেক সময়, নতুন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন বিশ্ব ব্যাঙ্ক বা আই. এম. এফ. এই বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

আর্থিক নিয়ন্ত্রণের মূল লক্ষ্য হয় মুনাফা বৃদ্ধি, কিন্তু এর ফলে দেশীয় আর্থিক পরিকাঠামো অনেক ক্ষেত্রে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নব্য-ঔপনিবেশিক নীতির বিরোধিতা করে তৃতীয় বিশ্বে দুটি নির্দিষ্ট ধারা গড়ে ওঠে। সে দুটি হলো, সমাজতন্ত্র এবং নির্জোট আন্দোলন।

১৫.৮ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১. নব্য-উপনিবেশবাদ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে কিভাবে গড়ে উঠেছিল?
বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে এই ধারার কিভাবে ব্যাপ্তি হোল?

২. নব্য-ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।

৩. 'সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ' মানে কী?
তৃতীয় বিশ্বে এর প্রভাব কিভাবে বাড়ছে?

৪. 'কোয়ামে নক্রুমা' কে ছিলেন?

৫. নব্য-উপনিবেশবাদ নিয়ে লেখা তিনটি গ্রন্থ এবং লেখকদের নাম লিখুন।

১৫.৯ উত্তরমালা

১৫.৩ প্রশ্নের উত্তর — ১৫.৩ অংশটি দেখুন।

১. ১৫.৪ অংশটি দেখুন।

২. ১৫.৫ অংশটি দেখুন।

৩. ১৫.৬ অংশটি দেখুন। (আপনি আরো দু-একটি উদাহর খুঁজে দেখতে পারেন।)

৪. ১৫.৩ অংশটি দেখুন। (আপনি নিজে আরো উদাহরণ দিতে পারেন)।

১৫.১০ অনুশীলনী

১৫.১০.১ নব্য-মার্কসীয় 'নির্ভরতা তত্ত্ব' বলতে কি বোঝেন?

১৫.১০.২ অধুনা বিশ্বায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে, নব্য-উপনিবেশবাদ কিভাবে বিস্তারিত হচ্ছে বলে আপনার মনে হয়?

১৫.১১ নির্বাচিত গ্রন্থাবলী

১. কোয়ামে নক্রুমা — 'নিও-কলোনিয়ালিজম্' ঃ দ্য লাস্ট স্টেজ অফ্ ইম্পিরিয়াজম। নেলসন পাবলিশার্স, ১৯৬৫।

২. ফ্রানজ ফ্যানন — 'দ্য রেচেড্ অফ্ দি আর্থ' (১৯৭৪)।

একক ১৬ ❑ নির্জোট নীতি (The Policy of Non-Alignment)

গঠন

১৬.১ উদ্দেশ্য
১৬.২ প্রস্তাবনা
১৬.৩ বিশ্বরাজনীতির পটভূমি
১৬.৪ নির্জোট নীতি ঃ প্রকৃতি
১৬.৫ নির্জোট নীতি নির্ধারণে জওহরলাল নেহরুর ভূমিকা
১৬.৬ নির্জোট আন্দোলনের উদ্ভব এবং প্রসার—একটি ঐতিহাসিক রূপরেখা
১৬.৬ ১ প্রসার এবং কার্যকলাপ
১৬.৭ নির্জোটনীতির ভবিষ্যৎ
১৬.৮ সারাংশ
১৬.৯ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
১৬.১০ উত্তরমালা
১৬.১১ অনুশীলনী
১৬.১২ নির্বাচিত গ্রন্থাবলী

১৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি যে বিষয়গুলি জানতে পারবেন, সেগুলি হলো ঃ

- ১৯৪৫ সালের পর বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপট।
- ঠান্ডা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বের উদ্ভব।
- নির্জোট নীতির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি।
- নির্জোট নীতি রূপায়ণে নেহরুর ভূমিকা।
- নির্জোট নীতির উদ্ভব ও বিকাশ।
- নির্জোট নীতির ভবিষ্যত।

১৬.২ প্রস্তাবনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, এশিয়া এবং আফ্রিকার বহু উপনিবেশ স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু এই স্বাধীনতা, অনেক ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও প্রথম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি, তৃতীয় বিশ্বের প্রাক্তন উপনিবেশগুলির ওপর, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য নীতি প্রয়োগ করে, পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

এর আগের এককটিতে আপনারা, নব্য-উপনিবেশবাদের মাধ্যমে এই ধরনের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের কথা পড়েছেন। এছাড়া বিশ্ব রাজনীতিতে ঠান্ডা যুদ্ধের উদ্ভবের সঙ্গে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, বিশ্বের সমস্ত দেশকে, এক গোষ্ঠী নয়ত অপর গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করতে সচেষ্ট হয়।

ঠান্ডা যুদ্ধ এবং নব্য উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন গড়ে ওঠে, যা হল নির্জোট আন্দোলন। এর অন্যতম প্রধান রূপকার ছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু।

এই এককের অন্যান্য অংশে নির্জোট নীতির উদ্ভব, প্রকৃতি এবং বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

১৬.৩ বিশ্বরাজনীতির পটভূমি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্যায়ে, বিশ্ব রাজনীতিতে এক সংকটময় পরিস্থিতির সূচনা হয়। মিত্র শক্তি, গোষ্ঠীর দ্বারা, জার্মানীর নেতৃত্বাধীন অক্ষশক্তির চূড়ান্ত পরাজয় ঘটলেও, মিত্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রধান ইউরোপীয় শক্তিগুলির অর্থনৈতিক অবস্থান ঘটে। এর ফলে, ১৯৪৫ সালের পর বিশ্ব রাজনীতিতে, ইউরোপীয় শক্তিগুলির আধিপত্যের অবসান হয়। বিশ্ব রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়, দুই নতুন শক্তি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন। এবং নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার প্রচেষ্টা, বিশ্ব রাজনীতিতে এক দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের সৃষ্টি করে যাকে ঠান্ডা যুদ্ধ বা 'Cold War' বলে অভিহিত করা হয়।

ঠাণ্ডা যুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো, দুটি দেশেরই নিজেদের গোষ্ঠীভুক্ত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা। সোভিয়েত ইউনিয়ন যেমন, পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির ওপর নিজস্ব কর্তৃত্ব স্থাপিত করে, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সরাসরি না হলেও বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং আর্থিক অনুদানের (যেমন, মার্শাল পরিকল্পনা) সাহায্যে, পশ্চিম ইউরোপীয় অঞ্চলে নিজস্ব আধিপত বিস্তারে সচেষ্ট হয়। অচিরেই, এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরো বৃদ্ধি পায়, যখন মার্কি্ন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, উভয় দেশই, সামরিক সংঘ গঠনে সচেষ্ট হয়। মার্কিন চুক্তি যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত, 'উত্তর অতলান্তিক সংঘ বা North Atlantic Organisation (NATO) স্থাপিত হয় ১৯৪৯ সালে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এর প্রত্যুত্তরে গঠন করে ওয়ার্শ (Warshaw Pact) গোষ্ঠী। সামরিক সংগঠন গড়ে তোলার এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র ইউরোপেই আবদ্ধ থাকে না। এশিয়া মহাদেশে মার্কিনী মদতে তৈরী হয় দুটি নতুন সামরিক সংগঠন, 'কেন্দ্রীয় চুক্তি সংঘ্য' বা 'সেণ্ট্রাল ট্রিটি অরগানাইজেশন' (Central Treaty Organisalion CENTO) এবং 'দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংঘ' বা 'সাউথ-ইষ্ট এশিয়া ট্রিটী অরগানাইজেশন' (South East Asia Treaty Organisation, SEATO)।

এছাড়া, উভয় দেশই, আর্থিক অনুদান, সামরিক সাহায্য এবং অন্যান্য নীতির মাধ্যমে এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার অনুন্নত বা উন্নয়নশীল, সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়াবার লক্ষ্যে সচেষ্ট হয়।

ঠান্ডা যুদ্ধের প্রসার ছাড়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম পরিবর্তন হলো এশিয়া, আফ্রিকার, বহু ইউরোপীয় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা লাভ। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের এই দেশগুলি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করলেও, তাদের আর্থিক এবং পরিকাঠামোগত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, প্রথম বিশ্ব এবং দ্বিতীয় বিশ্ব তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। এছাড়া ঠান্ডা যুদ্ধের আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে এই দেশগুলিকে এক বা অপর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করবার প্রচেষ্টা শুরু হয়।

ঠান্ডা যুদ্ধ এবং গোষ্ঠীকরণ নীতির বিরোধিতা করে, তৃতীয় বিশ্বে, এক শক্তিশালী প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে যার নাম, নির্জোট আন্দোলন। এর অন্যতম রূপকার ছিলেন জওহরলাল নেহরু।

প্রশ্নাবলী ঃ

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বরাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন কী ঘটেছিলো?

২. কত সালে উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়?

১৬.৪ নির্জোট নীতি ঃ প্রকৃতি

তৃতীয় বিশ্বে, নির্জোট আন্দোলন গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এর প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য নিয়ে রাজনীতি—বিজ্ঞানী এবং সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, প্রথম দিকে এই নীতিকে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখেছিলো। এই নীতির অনেক অপব্যাখ্যাও লক্ষ্য করা যায়। পিটার ক্যালভোকোরেসী (Peter Calvocoressi) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ, 'ওয়ার্ল্ড পলিটিকস সিন্স ১৯৪৫' (World Politics Since 1945) বা, ১৯৪৫ পরবর্তী বিশ্বরাজনীতি-তে নির্জোট নীতিকে নিরপেক্ষনীতি বা নিউট্রালিজম (Neutralism) বলে অভিহিত করেছেন। অনেকে আবার একে সুবিধাবাদী নীতি বলে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু নির্জোট নীতির রূপকারেরা এই নীতিকে কখনোই নিরপেক্ষ বা নিষ্ক্রিয় নীতি হিসেবে প্রচলিত করতে চাননি। নিরপেক্ষ নীতির অন্যতম রূপকার, নেহরু এই প্রসঙ্গে, ১৯৪৯ সালে, মার্কিন কংগ্রেসে দেওয়া এক ভাষণে, বলেন, "...... আমাদের নীতি নিরপেক্ষ নয় বরং আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা শান্তি রক্ষা বা যদি সম্ভব হয়, শান্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা......।"

('..........our Policy is not neutralist but one of active endeavour to preserve, and if possible, establish peace on firm foundation')। তথ্যসূত্র ঃ এস. এন. ধর—ইন্টারন্যাশনাল এ্যান্ড ওয়ালর্ড পলিটিকস্ সিনস্ ১৯১৯। (পৃ. ৪৮৩)(Source : 'S. N. Dhar – International Relations and World Politics since 1919' (P 483)।

নির্জোট নীতিকে তাই একটি ইতিবাচক নীতি হিসেবে অভিহিত করা যায়। যার প্রয়োগের ফলে একটি রাষ্ট্র বিশ্বরাজনীতিতে স্বাধীন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে এবং বিভিন্ন ঘটনার ওপর নিজের স্বাধীন মতবাদ এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়।

নির্জোট নীতির মূল কিছু বৈশিষ্ট্য হলো —

প্রথমত, নির্জোট নীতির মূল লক্ষ্য হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিচালিত, কোন গোষ্ঠীরই সদস্যপদ গ্রহণ না করে, বিশ্ব রাজনীতিতে স্বাধীনভাবে অধিষ্ঠিত হওয়া। নির্জোট নীতি মূলত কোন সামরিক গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার বিরোধিতা করে। ১৯৫০ এর দশকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক সংঘগুলির সদস্য ছিলো প্রায় চল্লিশটি দেশ। অপরদিকে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণাধীন সদস্য দেশগুলির সংখ্যা ছিলো এগারো। নির্জোট নীতি এই ধরনের সামরিক সংঘের বিরোধিতা করে কারণ, এর ফলে বিশ্ব শান্তির প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, নির্জোট নীতির লক্ষ্য ছিলো বিদেশ - নীতি গ্রহণ বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা। কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত হলে এই স্বাধীনতা কোন দেশের পক্ষে বজায় রাখা সম্ভবপর ছিলো না।

তৃতীয়ত, নিরপেক্ষ নীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিলো, পারস্পরিক সুসম্পর্কের মাধ্যমে, ঠান্ডা যুদ্ধ নিয়ন্ত্রিত দ্বন্দ্বমূলক আন্তর্দেশীয় সম্পর্কের পরিবর্তে, বিশ্ব শান্তি এবং সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক স্থাপন।

১৬.৫ নির্জোট নীতি নির্ধারণে জওহরলাল নেহরুর ভূমিকা

নির্জোট নীতি রূপায়ণ এবং আন্দোলন গঠনে জওহরলাল নেহরুর ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৭-১৯৬৪ পর্যন্ত স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রী হিসেবে ভারতের বিদেশ-নীতি নির্ধারণে, নেহরু একটি নির্দিষ্ট ঘরানা সুস্পষ্ট করে যান। ভারতকে তিনি কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত করবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে ভারতবর্ষের মতন একটি বিশাল এবং বহুত্ববাদী দেশের পক্ষে কোন নির্দিষ্ট সামরিক গোষ্ঠীভুক্ত হওয়া সম্ভবপর ছিলো না। তাই প্রথম থেকেই নেহরু, বিদেশীনীতির ক্ষেত্রে, স্বাধীন চিন্তাধারার পক্ষপাতী ছিলেন।

নেহরু শুধু নিজের দেশের ক্ষেত্রে এই নীতি গ্রহণ করে নিশ্চিন্ত থাকেননি। বরং এই নীতিকে কেন্দ্র করে তিনি এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলিকে সংঘবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালান, যা শেষ পর্যন্ত জন্ম দেয় তৃতীয় বিশ্বে, নির্জোট আন্দোলনের। পিটার ক্যালভোকোরেসীর মতে, মূলত, ভারতের মতন বৃহৎ দেশের নেতৃত্বের ফলেই, বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চে, তৃতীয় বিশ্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

নেহরুর মতে, নির্জোট নীতি হলো একটি ইতিবাচক এবং গতিশীল নীতি। এছাড়া এই নীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিলো সামরিক গোষ্ঠী গঠনের বিরোধিতা করা, অন্যান্য ধরনের সহযোগিতার ক্ষেত্রে নয়। ১৯৫৮ সালে, ভারতীয় লোকসভায় দেওয়া একটি ভাষণে, নেহরু বলেন। "........আমরা যখন বলি যে আমাদের নীতি হলো নির্জোট নীতি, আমরা নিশ্চিত ভাবে, সামরিক জোটের থেকে নির্জোট থাকার কথা বলি। এটি কোনো নেতিবাচক নীতি নয়। বরং, এটি একটি ইতিবাচক এবং সুস্পষ্ট নীতি আর আমার বিশ্বাস, গতিশীলও... ..."।

"When we say our policy is one of non-alignment, obviousky we mean no alignment with military blocs. It is not a negative policy. It is positive one, a definite one and, I hope, a dynamic one." আপ্পাদোরাই এ্যান্ড এম.এস. রাজন—'ইন্ডিয়ান্স ফরেন পলিশি এ্যান্ড রিলেশন্‌স (পৃ. ৩৯)। সাউথ এশিয়া পাবলিশার্স, ১৯৮৫।

নেহরু নির্জোট নীতিকে, নিরপেক্ষ নীতি বলে অভিহিত করবার প্রবণতার তীব্র বিরোধিতা করেন। এই প্রসঙ্গে ১৯৬০ সালে লোকসভায় প্রদত্ত আরেকটি ভাষণে, নেহরু বলেন —

".... .... আমি বার বার বলেছি যে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে 'নিরপেক্ষ' শব্দটির ব্যবহার আমার পছন্দ হয় না। কোন কোন দেশে ভারতের নীতিকে যে 'ইতিবাচক নিরপেক্ষতা' বলে অভিহিত করা হয়, এটাও আমার পছন্দের নয়, নিঃসন্দেহে, আমরা কোনো জোটভুক্ত নই, আমরা কোনো সামরিক জোটের প্রতি দায়বদ্ধ নই, কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো, আমরা বিভিন্ন নীতি, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য এবং নিয়মের প্রতি দায়বদ্ধ... ...।"

"... ... ... As I have said repeatedly, I do not like the word neutral" as being applied to India. I do not even like India's policy referred to us "positive neutrality" as is done in some countries. Without doubt, we are unaligned, we are uncommitted to military blocs ; but the important fact is that we are committed to various policies,

various urges,. various objectives, and various principles... ...” আপ্পাদোরাই এ্যান্ড এম.এস.রাজন—‘ইন্ডিয়ান্স ফরেন পলিসি এ্যান্ড রিলেশন্‌স (পৃ. ৩৯)। সাউথ এশিয়া পাবলিশার্স, ১৯৮৫।

নেহরুর নেতৃত্বে তৃতীয় বিশ্ব ঐক্য আন্দোলনের প্রচেষ্টা গতিশীল হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ এবং ১৯৪৯ সালে, নেহরু নতুন দিল্লীতে দুটি এশিয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেন। এছাড়া, ১৯৫৫ সালের বান্দুং সম্মেলন নেহরু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যুগোশ্লোভিয়ার নেতা টিটো এবং মিশরের নেতা নাসেরের সঙ্গে, নেহেরু ছিলেন, ১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত, প্রথম নির্জোট সম্মেলনের (বেলগ্রেড) অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব।

১৬.৬ নির্জোট আন্দোলনের উদ্ভব এবং প্রসারের একটি ঐতিহাসিক রূপরেখা

তৃতীয় বিশ্বের উদ্ভবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, একটি ঐক্য আন্দোলনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। নেহরুর নেতৃত্বে যেমন, ১৯৪৭ এবং ১৯৪৯ সালে, নতুন দিল্লীতে দুটি এশীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রথমটি, অনুষ্ঠিত হয়, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে, ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে। প্রথম সম্মেলনে, আঠাশটি (২৮) এশীয় দেশ থেকে আগত সদস্যেরা অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিলো সদ্যগঠিত রাষ্ট্রসংঘে, এশীয় দেশগুলিকে ভূমিকা সম্বন্ধে যৌথ নীতি গ্রহণ করা।

নতুন দিল্লীতে, দ্বিতীয় সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়, ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে। এই সম্মেলনে, এশীয় বহু দেশ ছাড়া, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড থেকে পর্যবেক্ষক পাঠানো হয়। এই সম্মেলনে, ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ বা ওলন্দাজ আগ্রাসনের নিন্দা করা হয় এখানের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়।

১৯৫০-এর দশকে, তৃতীয় বিশ্বের ঐক্য আন্দোলনের প্রয়োজন আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঠান্ডা যুদ্ধ নির্ধারিত সামরিক সংঘগুলি এশিয়াতেও গড়ে উঠতে শুরু করে। ভারত সহ অন্যান্য নির্জোটপন্থী দেশ, এই প্রবণতার তীব্র বিরোধিতা করে। ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান, কেন্দ্রীয় চুক্তি সংঘ বা সেন্ট্রাল ট্রিটী অরগানাইজেশনের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও, ভারত তার নির্জোট নীতি অবলম্বন করে চলায় অবিচল থাকে। এছাড়া নেহরু, চীনের নবগঠিত, কমিউনিস্ট সরকারের সঙ্গে, ১৯৫৪ সালে পঞ্চশীল চুক্তি স্বাক্ষরিত করেন। ঠান্ডা যুদ্ধ এশিয়া এবং আফ্রিকায় আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায়, ১৯৫৪-৫৫ সালে, একটি আফ্রো-এশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এই সিদ্ধান্তর রূপায়ণ ঘটে বান্দুং-এ (Bandung) অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে। ১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন নেহরু এবং ইন্দোনেশিয়ার নেতা, সুকর্ণ। মোট ঊনত্রিশটি দেশ (২৯) এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে, আফ্রিকার প্রতিনিধিত্ব করে ছটি দেশ, যথা মিশর, লিবিয়া, সুদান, ইথিওপিয়া, লাইবেরিয়া এবং ঘানা।

বান্দুং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পরবর্তী পর্যায়ে, আরো অনেক দেশ, এই আন্দোলনের অংশীদার হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে, আফ্রিকার প্রতিনিধিত্ব করে ছটি দেশ, যথা মিশর, লিবিয়া, সুদান, ইথিওপিয়া, লাইবেরিয়া এবং ঘানা।

বান্দুং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পরবর্তী পর্যায়ে, আরো অনেক দেশ, এই আন্দোলনের অংশীদার হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো, নাসেরের নেতৃত্বে মিশর এবং টিটোর নেতৃত্বে যুগোশ্লোভিয়া। মূলত নেহরুর

প্রচেষ্টায়, চীনকেও এই আন্দোলনের অংশীদার হবার আমন্ত্রণ জানানো হয়। ব্রিয়োনীতে (Brioni) অনুষ্ঠিত এক আলোচনায়, নির্জোট দেশগুলির একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং প্রথম নির্জোট সম্মেলন, যুগোশ্লাভিয়ার বেলগ্রেড শহরে, ১৯৬১ সালে, অনুষ্ঠিত হয়।

১৬.৬.১ প্রসার এবং কার্যকলাপ

নির্জোট আন্দোলনে, তৃতীয় বিশ্বের ঐক্য, বিশ্ব রাজনীতিতে শান্তি স্থাপন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করেছেন।

নির্জোট আন্দোলন, বিশ্ব রাজনীতির এক সন্ধিক্ষণে জন্ম নেয়। একদিকে, তৃতীয় বিশ্বের আবির্ভাব ও অপরদিকে, ঠান্ডা যুদ্ধ সংক্রান্ত অস্থিরতা। এই পরিস্থিতিতে, নির্জোট আন্দোলন এক নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টির লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করে। এর ফলে, নির্জোট আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে রাজনীতি বেশী গুরুত্ব লাভ করে। নির্জোট সম্মেলনের মূল লক্ষ্য হয়, ঠান্ডা যুদ্ধ তৈরী, বিশ্ব রাজনীতির গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের বিরোধিত করা। অপরদিকে, উপনিবেশবাদ ও নব্য উপনিবেশবাদ, প্রথম বিশ্বের দ্বারা তৃতীয় বিশ্বের উপর আর্থিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি, বিষয়ের ওপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৬৪ সালে, মিশরের কায়রোয় অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে, ৪৭টি সদস্য দেশ, নব্য-উপনিবেশবাদ এবং তৃতীয় বিশ্বে বিদেশী সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত করা নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

নির্জোট আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তৃতীয় বিশ্বের স্বাধীনতা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন জানানো, এমন কিছু আন্দোলন হলো ১৯৪৭-৪৯ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন।

(খ) ১৯৪৯-৫২ পর্যন্ত লিবিয়া, এরিট্রিয়া এবং ইতালিয় সেমালিল্যান্ডের আন্দোলন।

(গ) ১৯৫১-৫৬ মরক্কোয় আন্দোলন।

(ঘ) ১৯৫২-৫৬ তিউনিশিয়ার আন্দোলন।

(ঙ) ১৯৫৫-৬০ আলজেরিয়ার আন্দোলন।

(চ) ১৯৫৬-৬০ সাইপ্রাসের আন্দোলন।

বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধেও নির্জোট আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারত যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকার 'এ্যাপারাথাইড' (Apartheid) নীতির বিরুদ্ধে, কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছেদ করে। এই সম্পর্ক দীর্ঘকাল পরে দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃক এই নীতি বর্জনের পরে, আবার স্থাপন করা হয়। ১৯৫২ সালে ভারতসহ ১৩টি তৃতীয়. বিশ্বের রাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকার এই বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে,. রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের কাছে অভিযোগ জানায়।

নির্জোট দেশগুলির পক্ষ থেকে, বিশ্বরাজনীতিতে শান্তি স্থাপন প্রক্রিয়া শুরু করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, উভয় দেশকেই তারা বারবার ঠান্ডা যুদ্ধ বন্ধ করবার আবেদন জানায়। নির্জোট দেশগুলি, এছাড়া, বিভিন্ন পর্যায়ে নিরস্ত্রীকরণ এবং পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন বন্ধের পক্ষে জোরদার সওয়াল করে। প্রকৃতপক্ষে, এর ফলে ঠান্ডা যুদ্ধ বন্ধ না হলেও, নির্জোট আন্দোলনের এই পদক্ষেপগুলি বিশ্ব রাজনীতিতে একটি স্বতন্ত্র ধারার উদ্ভব ঘটাতে সক্ষম হয়।

১৬.৭ নির্জোট নীতির ভবিষ্যত

আমাদের নির্দিষ্ট সময় সীমার বাইরে হলেও, নির্জোট আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা প্রয়োজন। ১৯৬১ সালের প্রথম সম্মেলনের পর অনেক বছর কেটে গেলেও,. নির্জোট আন্দোলন, তার গুরুত্ব হারায়নি। ১৯৭০ এবং ১৯৮০ দশকে, নির্জোট আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে ওঠে, তৃতীয় বিশ্বের শোষণমুক্ত অর্থনৈতিক অধিকার। এর অন্যতম লক্ষ্য হয় নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (New International Economic Order, NIEC) স্থাপন করা।

এই লক্ষ্যে নির্জোট সদস্য ভুক্ত দেশগুলি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনে তাদের দাবি জানিয়েছে। এগুলির মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো ইউনাইটেড নেশন্স কনফারেন্স অন ট্রেড ডেভেলপমেন্ট (United Nations conference of Trade and Development, UNCTAD) এছাড়া, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি নিয়ে গঠিত, অর্থনৈতিক সংগঠন জি-৭৭ (G-77) গঠনেও, নির্জোট গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আন্তর্জাতিক স্তরে, নতুন অর্থনৈতিক সংগঠন পরিকল্পনা, শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেও রাজনীতির ইতিহাসে, এটা ছিলো একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

১৯৯০ সালের পর বিশ্ব রাজনীতির নতুন প্রেক্ষাপট নির্জোট নীতি সম্বন্ধে আবার নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডাযুদ্ধের অবসান হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, নির্জোট নীতি কিছুটা প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রথম বিশ্ব-তৃতীয় বিশ্ব সম্পর্ক তাঁর প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি, এই সম্পর্ক নবরূপে, উত্তরে (North) এবং দক্ষিণ (South) সম্পর্ক হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক শোষণ, নব্য-উপনিবেশবাদ ইত্যাদি বিষয় আজো সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বিশ্ব রাজনীতির নতুন প্রেক্ষাপটে, তাই নির্জোট আন্দোলন, দক্ষিণ গোষ্ঠীর দেশগুলির অন্যতম নীতি হয়ে উঠতে পারে।

ঠান্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বে, নির্জোট আন্দোলন, তাই রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিবর্তে, অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির প্রতি আরো গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করেছে। ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তির পর, প্রথম নির্জোট শীর্ষ সম্মেলন, ১৯৯২ সালে, ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত হয়। এবং সম্মেলনেই. নির্জোট আন্দোলনের নতুন কর্মসূচির খসড়া গৃহীত হয়। নতুন খসড়ায় তৃতীয় বিশ্বের সমস্যাগুলির সমাধান এবং প্রথম বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথা, পুনরায় বলা বলেও, বিশ্বব্যাপী নতুন অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে, প্রথম বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত সংগঠনগুলির সঙ্গে, সহযোগিতার কথা বলা হয়। এই সহযোগিতা অবশ্য তখনই সম্ভব, যখন, দক্ষিণ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা লাভে সক্ষম হবে। এই লক্ষ্যে, নির্জোট আন্দোলন পুনরায় দক্ষিণ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং সম্বন্ধ বাড়াবার আবেদন জানায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত শেষ নির্জোট সম্মেলন (১৯৯৮), 'দক্ষিণ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার কথা পুনরায় বলা হয়েছে। উত্তর গোষ্ঠীর দেশগুলির বিরুদ্ধে, আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতাও এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে। নব্য-উপনিবেশবাদ এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া, অন্যান্য বিষয় যেমন, প্রাকৃতিক দূষণ রোধে যৌথ প্রচেষ্টা উত্তর গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির নিয়ন্ত্রণে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।'

উত্তর দক্ষিণ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির অন্যতম সংগঠন হিসেবে, নির্জোট এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করতে পারে।

১৬.৮ সারাংশ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপট ছিলো ঠান্ডা যুদ্ধ নির্ধারিত। এই পরিস্থিতিতে তৃতীয় বিশ্বের উদ্ভব হলে, এরা সমস্যার সম্মুখীন হয়।

তৃতীয় বিশ্বের একটি স্বতন্ত্র পথের সন্ধান দিতে উদ্ভব হয় নির্জোট নীতির। নির্জোট নীতি কোনো নিরপেক্ষ বা নিষ্ক্রিয় নীতি নয়, এটি একটি ইতিবাচক নীতি, যা প্রথম বিশ্ব বা দ্বিতীয় বিশ্বের কোন সামরিক সংঘের অর্ন্তভুক্ত হবার বিরোধিতা করে। নির্জোট নীতির প্রধান রূপকারেরা হলেন, নেহরু, নাসের, সুকর্ণ এবং টিটো।

এঁদের মধ্যে জওহরলাল নেহরু ছিলেন এই নীতির প্রথম ও প্রধান রূপকার। মূলত তাঁর প্রচেষ্টায়, নির্জোট আন্দোলন, তৃতীয় বিশ্বের ঐক্যলাভের প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

নির্জোট আন্দোলন উদ্ভবের লক্ষ্যে অন্যতম গুরত্বপূর্ণ ছিলো ১৯৫৫ সালের বান্দুং সম্মেলন। এর কিছু পরে ১৯৬১ সালে, বেলগ্রেডে নির্জোট সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

দীর্ঘ সময় ধরে নির্জোট আন্দোলন বিশ্বরাজনীতিতে তার প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯০-এ ঠান্ডাযুদ্ধ বন্ধ হবার পরও এই প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। অধুনা 'দক্ষিণের' দেশগুলির কাছে, নির্জোট আন্দোলন তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৬.৯ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১. নির্জোট নীতিকে কী আপনি নিরপেক্ষ নীতি বলবেন?
২. নির্জোট নীতির রূপকার হিসেবে নেহরুর ভূমিকা কী ছিলো?
৩. তৃতীয় বিশ্ব ঐক্য সাধনে, নির্জোট নীতির ভূমিকা কী ছিলো?
৪. নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দুটি এশীয় সম্মেলন (১৯৪৭, ১৯৪৯) সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।
৫. প্রথম নির্জোট সম্মেলন কবে, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

১৬.১০ উত্তরমালা

১৬. ৩ প্রঃ (১) ১৬.৩ অংশ দেখুন। (২) ১৯৪৯ সালে।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১. ১৬.৪ অংশটি দেখুন।
২. ১৬.৫ অংশটি দেখুন।
৩. ১৬.৬.২ অংশটি দেখুন।
৪. ১৬.৬.১ অংশটি দেখুন।
৫. বেলগ্রেড (যুগোশ্লাভিয়া), ১৯৬১ সালে।

১৬.১১ অনুশীলনী

১. নির্জোট নীতিকে কি 'ইতিবাচক নিরপেক্ষ' নীতি বলে আপনি অভিহিত করবেন?

২. বর্তমান যুগে নির্জোট আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা কী বলে আপনি মনে করেন। (আপনি নিজে আরো উদাহরণ দিতে পারেন।)

১৬.০ নির্বাচিত গ্রন্থাবলী

১. পিটার ক্যালভোকোয়েসী — 'ওয়ালর্ড পলিটিক্স সিনস্ ১৯৪৫' (১৯৬৮)।

২. অ. আপ্পাদুরাই এবং এম. এস. রাজন 'ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসী এ্যান্ড রিলেশন্স' (১৯৮৫)।

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

— সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

— Subhas Chandra Bose

Price : Rs. 150.00

(NSOU-র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700 064 & Printed at : The Saraswati Printing Works, 2, Guru Prosad Chowdhury Lane, Kolkata 700 006